প্রথম প্রকাশ : আষাঢ় ১৯৬০ ।

প্রকাশক : গৌরাঙ্গ সান্যাল । সান্যাল প্রকাশন
১৬ নবীন কুণ্ডু লেন । কলিকাতা-৯

মুদ্রক : জয়গুরু প্রিন্টার্স
৪এ, বৃন্দাবন বোস লেন । কলিকাতা-৬

সূচি

সম্পাদকের নিবেদন

১৯৬০ সালের কথা। সে সময় প্রগতি প্রকাশনের নাম ছিল 'বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়'। তখন কবি শ্রী সমর সেনের অনুবাদে তলস্তোয়ের চারটি গল্প নিয়ে বেরিয়েছিল 'বড়ো ও ছোট গল্প'। 'দুই হুজার', 'সুখের সংসার', 'পক্ষিরাজ' ও 'বল-নাচের পর' অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তার। বারো বৎসর পরে ১৯৬০ সালে শ্রী সমর সেনেরই অনুবাদে প্রগতি প্রকাশন থেকে বেরোয় আরেকটি বই: 'দুটি বড়ো গল্প'। তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'ক্রয়টজার সোনাটা' এবং বিশ্বসাহিত্যে অনন্যসাধারণ কাহিনী 'ইভান ইলিচের মৃত্যু'।

বর্তমান গ্রন্থ 'ফাদার সিয়েগি' ও অন্যান্য গল্প' বলা যেতে পারে, 'বড়ো ও ছোট গল্প'-য়েরই একটি বর্ধিত সংস্করণ। যুক্ত হয়েছে শুধুমাত্র একটি বড়ো গল্প: 'ফাদার সিয়েগি' — বাঙালী পাঠকের নিকট অদ্যাবধি প্রায় অপরিচিত, অথচ তলস্তোয়-মানসের প্রতিভূকল্প কাহিনী এটি। প্রখ্যাত সোভিয়েত সাহিত্যিক লেওনিদ লেওনভের ভূমিকা (আংশিক) গ্রন্থের আদিতে এবং অন্তিমে লিদিয়া অপুলস্কায়া সংকলিত তলস্তোয়-জীবনের ঘটনাপঞ্জীও এই প্রথম তলস্তোয়ের কোনো বাংলা অনুবাদে সংযোজিত হল। লেওনিদ লেওনভ প্রদত্ত ভাষণটির পূর্ণাঙ্গ রূপ ইংরেজি ভাষাজ্ঞানী পাঠক প্রগতি প্রকাশন থেকেই ১৯৬০ সালে প্রকাশিত তলস্তোয়-

গল্পসংকলন 'Short Stories'য়ে পেয়ে যাবেন। লিদিয়া অপ্লেস্কায়ার রচনাটিও প্র্বোল্লিখিত ইংরেজি গ্রন্থে প্রাপ্তব্য।

সম্পাদক হিসেবে আমার দায়িত্ব যেমনই থাকুক না কেন, আমাকে করতে হয়েছে অতি অল্প। শ্রদ্ধেয় কবি সমর সেনের অসাধারণ চমৎকার অন্বাদে হস্তক্ষেপ করার কোনো স্বযোগই আমার ছিল না। র্শী শব্দের বাংলা বানানে কয়েকটি অপ্রণিধানযোগ্য ত্র্টি সংশোধন এবং ম্ল থেকে ঈষৎ দ্রে চলে যাওয়ায় দ্-এক স্থানে প্নর্বিন্যাস ব্যতিরেকে কিছ্ই করতে হয় নি আমাকে। পাদটীকাগ্লো অবশ্য আমার উদ্ভাবন; কেননা আমার মনে হয়েছে, বাঙালী পাঠক এতে উপকৃত হবেন। গ্রন্থের নামকরণও আমার; 'ফাদার সিয়েগি' ও অন্যান্য গল্প' নামে কোনো র্শী গ্রন্থ তল্স্তোয়ের নেই।

পরিশেষে বলি, 'ফাদার সিয়েগি'' ভাষান্তরের ম্ল্যায়নভার নিঃসন্দেহে পাঠকের; তবে গল্পটি বাংলায় অন্বাদের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, আর তাতে আমাকে ভূমিকা গ্রহণের স্বযোগ দেয়ায় প্রগতি প্রকাশনের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। এ হল মহৎ শিল্পীর সেই হ্রস্বায়তন স্ৃষ্টি যার মধ্যে ভাস্বর হয়ে ওঠে তাঁর মানসভূগোল, সংশ্লিষ্ট করে দেন তাঁর অন্তর্বিশ্ব। আমার ধারণায়, টোমাস মানের যেমন 'টোনিও ক্রয়গার', লেভ তল্স্তোয়ের তেমনি 'ফাদার সিয়েগি''।

তল্স্তোয়ের এহেন একটি গল্পসংকলন উপহার দেয়ায় আমার মতো সমগ্র বাঙালী পাঠকসমাজ এই সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানটির নিকট ঋণী বোধ করবেন, সন্দেহ নেই।

তল্‌স্তোয় প্রসঙ্গ*

আমাদের সামাজিক ধ্যানধারণায় তল্‌স্তোয়ের যে-ভূমিকা বর্তমান, তার উপর বারংবার গুরুত্বারোপ করেছেন রুশ সাহিত্যিকেরা। তল্‌স্তোয়ের মৃত্যুর দশ বৎসর পূর্বে ইয়াল্‌তা থেকে লিখেছিলেন চেখভ: '...আমার ভয়, তল্‌স্তোয় কবে মারা যান। তিনি মারা গেলে আমার জীবনে বিরাট শূন্যতা এসে যাবে... তাঁকে ছাড়া আমাদের সাহিত্য যেন রাখাল ছাড়া একটি পাল...।' এরও বিশ বৎসর পূর্বে ইভান তুর্গেনেভও ঠিক এমনটাই ভেবেছিলেন এবং তল্‌স্তোয়ের জীবনাবসানের দুই বৎসর আগে আলেক্সান্দ্‌র্‌ ব্লোকও। প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবিরাই যে শুধু তাঁর মৃত্যুতে নিজেদের অনাথ, এমন কি নেতৃহীন, ভাবতেন তা নয়; রাশিয়ার অন্ত্যজ আপামর জনসাধারণ তাঁর শূন্যতা হৃদয়ে অনুভব করেছিল। সত্য, সে সব দিনে অবস্থা এমন ছিল যে, সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তিও বহু দেরিতে বহু পথ ঘুরে নিম্নশ্রেণীর লোকজনের হাতে গিয়ে পৌঁছুত; কোনো লেখকের জীবৎকালে তাঁর সম্পর্কে সাধারণ লোকের ধারণা প্রায়শঃই জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠত।

* লেভ তল্‌স্তোয়ের ৫০-ম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৯৬০ সালের ১৯শে নভেম্বরে বল্‌শয় থিয়েটারে অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভায় লেওনিদ লেওনভ যে সুদীর্ঘ ভাষণ দেন, তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হয়েছে।

কিন্তু তল্‌স্তোয় বেঁচে ছিলেন সমস্ত জনগণের চোখের সামনে — নিজের আত্মাকে উন্মোচন করে দেখিয়েছেন কখনো-বা স্বনামে, কখনো-বা অলেনিন, কি লেভিন, বা নেখ্‌লিউদভের ছদ্মনামের আড়ালে*; সর্বদা ছুটে গেছেন সমকাল ও চল্‌তি হাওয়ার বিপরীতে, লড়েছেন অন্যায় অর্থ, আলস্য ও হিংসার বিরুদ্ধে, জীর্ণ সভ্যতার পুঞ্জীভূত কদর্যতার সঙ্গে সংগ্রাম করে গেছেন। যেহেতু তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন, জনগণের ভিতরে প্রগতিশীল মনন সান্ত্বনা লাভ করত এই দেখে যে, তাদের নিকটেই একজনের হৃৎস্পন্দন শোনা যাচ্ছে যে-হৃদয় কলুষিত হবে না কখনো, তীক্ষ্ন দৃষ্টি মেলে তিনি তাকিয়ে দেখছেন তাদের অমানুষিক শ্রম ও বঞ্চনা, কান পেতে শুনে যাচ্ছেন তাদের ক্রন্দন ও সঙ্গীত, আর সময় হলে এ সবই রূপান্তরিত হবে খাঁটি সোনায়, ভবিষ্যতের নতুন পৃথিবীর ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে যাবে।

কেননা, বিভিন্ন সাহিত্যের স্বর্ণভাণ্ডারের আসল সম্পত্তি তো সে সব যুগের চিন্তা ও অনুপ্রেরণা, আশা ও বিজিত সন্দেহ; এবং এই সাহিত্যের জীবদ্দশা সম্পূর্ণতঃ নির্ভর করবে সমকালের কতখানি ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা সে জারিত করে নিতে পেরেছে, তার উপর: মামুলি গুণের ক্ষেত্রে তা আবদ্ধ থাকে নিজস্ব জাতির ইতিহাসভাণ্ডার, আর মহোত্তম প্রতিভা হলে তা আহৃত হয় সমগ্র মানবসভ্যতা থেকে।

সংক্ষেপে, খাঁটি সোনার পক্ষেই শুধু সম্ভব বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে না যাওয়া।

* আত্মজৈবনিক 'কসাক' উপন্যাসের নায়ক অলেনিন; লেভিন ও নেখ্‌লিউদভ যথাক্রমে 'আন্না কারেনিনা' ও 'পুনরুত্থান' উপন্যাসের নায়ক। — সম্পাঃ

মহাকালের পরীক্ষায় যাঁদের সৃষ্টি উত্তীর্ণ হয়েছে তলস্তোয় তাঁদের অন্যতম। আমাদের মাতৃভাষার অন্তর্লীন যাদুকরী সঙ্গীত আবিষ্কার করেছিলেন পুশকিন, আর তলস্তোয় তারই সাহায্যে রুশ জনমানসের স্বপ্ন, আনন্দ ও বেদনা, নেপোলিয়ন কবলিত বহুভাষী ইউরোপের সাথে রুশ জনগণের দ্বন্দ্ব, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তার বিন্যাস, ন্যায়ের জন্য সংগ্রামে তার যত বীরত্বময় রূপান্তর ঘটেছে জাতি বা শান্তিপ্রিয় মানুষের জীবনে — সবই এমনভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন যা তাঁর পূর্বে আর কেউ করেন নি। 'যুদ্ধ ও শান্তি', 'কসাক', 'আন্না কারেনিনা' ও 'পুনরুত্থানে'র যিনি স্রষ্টা, তাঁর কাছে চরাচরের সমস্ত কিছুই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল: ক্রুদ্ধ ঝঞ্ঝাবেগ ও মৃদুতম বায়ুহিল্লোল, মরচক্ষুর পক্ষে যা ধারণা করা সম্ভব নয় এবং যা চোখ এড়িয়ে যায় মানুষের সে রকম বিশাল ও ক্ষুদ্র উভয়ই, মানুষের ব্যক্তিসত্তার মধ্যাহ্নপ্রাখর্য ও অস্তরাগ — সবই ধরা দিয়েছিল তাঁর কাছে। অন্যদিকে, অজস্র বিরোধে সংক্ষুব্ধ তাঁর ব্যক্তিগত জীবন বহু অপ্রত্যাশিত ভঙ্গিমায় মনুষ্য-হৃদয়কে পর্যবেক্ষণ করতে সাহায্য করেছিল; এবং একমাত্র রুসো ব্যতিরেকে তৎপরবর্তীকালে আর কেউই পাঠকের নিকট হৃদয়ের উন্মোচন এভাবে ঘটান নি। বর্তমানে, অর্ধশতক অতিবাহিত হয়ে যাবার পর, তলস্তোয়ের বিশাল মহিমা সম্পূর্ণতঃ উপলব্ধির জন্য কোনো পাদপ্রদীপের আলো প্রয়োজন নেই: যা তিনি অর্জন করেছেন, শুধু তাই নয়, তাঁর দোলাচলও; তাঁর উৎকেন্দ্রিকতা ও ভ্রান্তি — সত্যসন্ধের পথে যার আবির্ভাব অপরিহার্য, সে সবও আমরা স্পষ্টভাবে এখন উপলব্ধি করতে পারি, কেননা অপাপবিদ্ধ মনুষ্য-আত্মার নিকটে সত্য কখনো ধরা দেয় না।

বিশাল এই মনুষ্যপ্রাণের মহীয়ুহতা আমাদের জানা সমুদয় সাহিত্যেতিহাস অতিক্রম করে গেছে। বেলিন্‌স্কি একবার বলেছিলেন যে, সাদামাঠা কথায় পুশ্‌কিন সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে নিজেরই লজ্জা আসে; আজ তল্‌স্তোয় সম্পর্কেও কিছু বলতে গেলে সালঙ্কার বাক্যবিন্যাস প্রয়োগ অনিবার্য। মহোত্তম সাহিত্যিকদের — সভ্যতার আদিকাল থেকে অদ্যাবধি তার সংখ্যা দশ-বারো জনও হবে কিনা সন্দেহ — তালিকায় অনিবার্য তাঁর আসন। তাঁর কর্মকাণ্ডের কথা মনে হলে হার্কিউলিসের পরিশ্রম মনে পড়ে যায়। তিনি যেন প্রগতির ইতিহাসে বিশাল এক পর্বত, যার সন্নত শীর্ষদেশ হতে মনুষ্যচিন্তার শতাব্দীবাহিত পদচিহ্ন অবলোকন করা সম্ভব।

লেওনিদ লেওনভ

দুই ইয়ার



কাউণ্টেস ম. ন. তল্‌স্তায়ার করকমলে

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক তখন, যে সময়ে বালাই ছিল না রেলপথের বা রাজপথের, গ্যাসের বা চর্বির বাতির, ছিল না স্প্রিং-এর নিচু সোফা বা লাক্ষায় বার্নিশ-না-করা আসবাব; ছিল না মনোক্‌ল-পরা মোহমুক্ত যুবকবৃন্দ বা মতামতে উদারপন্থী মহিলা-দার্শনিক, ছিল না আমাদের সময়কার মতো অগুনতি dames aux camélias; যে সরল দিনে মস্কো থেকে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে যেতে হলে লোকে শকট বা গাড়ি বোঝাই করত রাঁধা খাবারে। ভাজা কাটলেট, বুব্‌লিক* ও ভাল্‌দাই-গাড়ির ঘণ্টার হাতে নিজেকে সমর্পণ করে নরম ধুলো বা কাদা-ভরা রাস্তা দিয়ে চলত পুরো আটটা দিন আর রাত্রি; যে সময়ে হেমন্তের দীর্ঘ সন্ধ্যায় ধূমন্ত মোমবাতির আলো পড়ত বিশ থেকে তিরিশ জনের পরিবারবর্গের ওপর, বল-ঘরের ঝাড়ে বসানো হত মোম ও স্পার্মাসেটির বাতি, সার বেঁধে মুখোমুখি রাখা হত আসবাবপত্র, আমাদের বাপ ঠাকুর্দার যৌবন বোঝা যেত শুধু মুখে কাল রেখা আর মাথায় পাকা চুলের অভাব থেকে নয়, বোঝা যেত

* বুব্‌লিক — চক্রাকার একপ্রকার গোল সরু পাঁউরুটি, আকারে বেশি বড় হয় না। — সম্পাঃ

মেয়েদের নিয়ে তাঁদের ডুয়েলের হিড়িক থেকে, আর যে রকম তড়াক করে ঘরের এক কোণ থেকে অন্য কোণে গিয়ে আচমকা বা অন্যভাবে পড়ে যাওয়া মেয়েলী রুমাল তুলে নিতেন তা থেকে; যে কালে আমাদের মায়েরা পরতেন প্রকাণ্ড আস্তিনওয়ালা কোমর-খাটো গাউন আর বাড়ির সব সমস্যার সমাধান করতেন লটারির মতো করে; যে সব দিনে দিনের আলো সইতে পারতেন না সুন্দরী dames aux camélias; ম্যাসনিক লজ, মার্তিনপন্থী ও টুগেন্ডবুন্ডের* সেই সব সরল দিনে — মিলরাদভিচ,** দাভিদভ*** ও পুশকিনের সেই কালে একদা গুবের্নিয়ার কেন্দ্র ক... সহরে অধিবেশন বসেছিল ধনী জমিদারদের। অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচন সবে মাত্র সাঙ্গ হয়েছে।

* ম্যাসনিক লজ — গুহ্যতাত্ত্বিক ধর্ম-সম্প্রদায়। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপে উদ্ভূত হয়ে এ চর্চা দ্রুত রাশিয়ায় পৌঁছয়। ১৮২২ সালে রাশিয়ায় সরকারীভাবে একে নিষিদ্ধ করা হয়।

মার্তিনপন্থী —১৭৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত রুশ ম্যাসনদের সম্প্রদায়। ফরাসী থিওজফিস্ট স'-মার্তিনের নামে এর নামকরণ।

টুগেন্ডবুন্ড — 'ধার্মিক সংঘ' — উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের জার্মান রাজনৈতিক সম্প্রদায়। — সম্পাঃ

** মিলরাদভিচ — বিখ্যাত রুশ জেনারেল, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ১৮১২ সালের স্বদেশপ্রেমিক যুদ্ধে নেমেছিলেন। — সম্পাঃ

*** দাভিদভ, দেনিস — রুশ কবি, ১৮১২ সালের যুদ্ধের বীর, পার্টিজান আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। দাভিদভের স্বাধীনতামুখর কবিতাকে উচ্চ মূল্য দিতেন পুশকিন ও সমকালীন অন্যান্য লোকেরা। — সম্পাঃ

১

'যাক গে, দরকার হলে বৈঠকখানায় আস্তানা গাড়ব,' স্লেজ থেকে সবে মাত্র নেমে ক... সহরের সেরা হোটেলে ঢুকতে ঢুকতে বললেন একটি নবীন অফিসার, পরনে ওভারকোট, মাথায় হুসার* সৈনিকের টুপি।

'বেজায় ভিড়, হুজুর, অগুনতি লোক,' বলল ছোকরা চাকরটি, অফিসারের ভৃত্যের কাছে সে ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছে ভদ্রলোকটি হলেন কাউণ্ট তুর্বিন, তাই 'হুজুর' বলে খাতির করছে তাঁকে। 'আফ্রেমভ্‌কা জমিদারির কর্ত্রী ঠাকরুন কথা দিয়েছেন সন্ধ্যেবেলায় মেয়েদের নিয়ে চলে যাবেন, আপনি যদি চান তাহলে খালি হলে এগারো নম্বর ঘরে তুলতে পারি,' সে বলল। করিডরে লঘু পায়ে কাউণ্টের সামনে যেতে যেতে বারবার ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল সে।

বৈঠকখানায় জার আলেক্সান্দ্রের একটি কালের ছাপে মলিন পুর্ণাজ প্রতিকৃতি; তার নীচে ছোট টেবিলে বসে কয়েক জন শ্যাম্পেন টানছিল, তারা স্থানীয় বাবু সম্প্রদায়ের, সন্দেহ নেই, তাদের কিছু দূরে বসে ঘোর নীল ক্লোক-পরা কয়েকটি বহিরাগত সওদাগর।

ঘরে ঢুকে প্রকাণ্ড ছাই রঙা কুকুরটাকে ডেকে — ব্লুচার তার নাম — অফিসারটি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন কলারে তখনো বরফের কুচি-লাগা কোটটা, ভোদকা আনতে বলে সাটিনের নীল সার্ট গায়ে টেবিলে বসে পড়ে আলাপ শুরু করে দিলেন ভদ্রলোকদের

* হুসার — অতীত রাশিয়ায় অশ্বারোহী বাহিনী। — সম্পাঃ

সঙ্গে, তাঁর সুন্দর চেহারায় আর মুখের দরাজ ভাবে আকৃষ্ট হয়ে তারা এক গেলাস শ্যাম্পেন খেতে বলল তাঁকে। কাউণ্ট এক গেলাস ভোদকা প্রথমে এক চুমুকে শেষ করলেন, তারপর নতুন আলাপীদের আপ্যায়ন করার জন্য হুকুম দিলেন আর একটা বোতলের। ঠিক সে সময়ে শ্লেজ-চালক ঘরে এল ভোদকার পয়সা চাইতে।

'সাশ্‌কা!' চেঁচিয়ে ডাকলেন কাউণ্ট। 'দে তো ওকে টাকাটা!' শ্লেজ-চালক বেরিয়ে গিয়ে ফিরে এল অল্পক্ষণের মধ্যেই, তার খোলা হাতে খুচরো পয়সা।

'দেখুন দিকি হুজুর, আপনার জন্যে কত ধকল সইলাম আর আপনি বললেন আধ-রুবল দেবেন, আর ও আমাকে দিচ্ছে কিনা একটা সিকি!'

'সাশ্‌কা! এক রুবল দিয়ে দে ওকে!'

বেজার মুখে শ্লেজ-চালকের বুটের দিকে তাকিয়ে রইল সাশ্‌কা।

'ওর ও-ই যথেষ্ট,' সে বলল ভারি মোটা গলায়। 'তাছাড়া, আমার কাছে আর টাকাপয়সা নেই।'

ব্যাগ থেকে শেষ সম্বল পাঁচ রুবলের দুটো নোট বের করে কাউণ্ট একটা দিলেন শ্লেজ-চালককে; সে তাঁর হাতে চুমো খেয়ে বেরিয়ে গেল।

'কী দশায় পড়েছি!' বললেন কাউণ্ট। 'শেষ পাঁচটা রুবল!'

'এই তো হল খাঁটি হুসার!' মৃদু হেসে বললেন একটি ভদ্রলোক। তাঁর গোঁফ, গলা আর পা জোড়ার একটা অস্থির আলগা ভাব থেকে মনে হয় তিনি অশ্বারোহী বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসার।

'এখানে আপনার কি বেশ কিছু দিন কাটানোর অভিলাষ, কাউণ্ট?'



'কিছু টাকার জোগাড় না করলে নয়, নইলে থাকব না। হতচ্ছাড়া হোটেলটায় ঘরও পাওয়া যাবে না, ধুত্তোর ছাই!'

অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারটি বললেন:

'তাহলে দয়া করে আমার সঙ্গে থাকবেন কি, কাউণ্ট? সাত নম্বর ঘরে আমি আছি। আমার সঙ্গে থাকতে আপত্তি না থাকলে রাত কাটিয়ে যান। দিন তিনেক আমাদের সঙ্গে থেকে যান। আজ রাত্তিরে মার্শাল*-এর ওখানে একটা বল-নাচ। আপনাকে দেখে তিনি অত্যন্ত খুশি হবেন।'

'ঠিক ঠিক, কাউণ্ট, থেকে যান,' দলের একজন সুদর্শন যুবক বলে উঠল। 'আপনার তাড়া কিসের? সত্যি তো, নির্বাচনের ব্যাপারটা তিন বছরে মাত্র একবার হয়। আমাদের নবীনাদের অন্তত একবার দেখে নেওয়া উচিত, কাউণ্ট!'

'সাশ্‌কা! জামাকাপড় বের করো, আমি যাচ্ছি গোসলখানায়,' উঠতে উঠতে বললেন কাউণ্ট। 'তারপর দেখা যাবে — হয়ত একবার সত্যি ঢুঁ মারব মার্শালের ওখানে।'

একটি ওয়েটারকে ডেকে কী একটা বলাতে সে মৃদু হেসে 'সবই সম্ভব, হুজুর,' বলে বেরিয়ে গেল।

দরজার বাইরে থেকে ডেকে কাউণ্ট বললেন, 'তাহলে ওদের বলি আপনার ঘরে স্যুটকেসটা রাখতে।'

'অত্যন্ত বাধিত বোধ করব,' দোরগোড়ায় ছুটে গিয়ে বললেন অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারটি। 'আপনার অসীম দয়া। সাত নম্বর ঘর, ভুলবেন না যেন!'

* প্রাক্‌বিপ্লব রাশিয়ায় প্রদেশ বা জেলার অভিজাত সম্প্রদায়ের নির্বাচিত নেতা। — সম্পাঃ

কাউণ্টের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাওয়া মাত্র অশ্বারোহী বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসার নিজের জায়গায় ফিরে এসে কেরানীর আরো কাছে চেয়ারটা টেনে এনে সোজা তার চোখে চেয়ে হেসে বললেন:

'ইনিই হলেন তিনি!'

'কে?'

'সত্যিই তাই, বলছি শোনো — ডুয়েল লড়তে ওস্তাদ, নামকরা হুসার। নাম তুর্বিন, সবাই চেনে। বাজি রেখে বলতে পারি আমাকে চিনেছে — নির্ঘাত চিনেছে। লেবেদিয়ানে নতুন ঘোড়া জোগাড় করতে একবার আমাকে পাঠায় — সে সময়ে তিন হপ্তা ধরে একটানা হুল্লোড় চালাই দুজনে। ছোট্ট একটা কাণ্ড ঘটে, দায়ী ছিল ও আর এই শর্মা: সেজন্যে আমাকে না চেনার ভান করলেন। খাসা লোক, তাই না?'

'খাসা লোক। আর আদবকায়দা কী সুন্দর! ও যে এ রকমের চীজ কেউ টেরটি পাবে না,' বলল সুদর্শন যুবকটি। 'আর কী তাড়াতাড়ি আলাপ জমে গেল... বয়স পঁচিশ, তার বেশী নয় নিশ্চয়?'

'এ রকম দেখতে শুধু, কিন্তু পঁচিশের বেশী। ওকে বুঝতে হলে ভালো করে চেনা দরকার কিন্তু। মাদাম মিগুনোভার সঙ্গে সটকে পড়েছিল কে? ইনিই। সাব্লিনকে খতম করে দিয়েছিল কে? ইনিই। আর কে মাত্নেভের পা পাকড়ে ফেলে দিয়েছিল জানলা থেকে? ডিউক নেস্তেরভের কাছে তিন লক্ষ রুবল জিতেছিল কে? ও এত বেপরোয়া যে আপনার ধারণার বাইরে! জুয়াড়ি, ডুয়েল লড়িয়ে, রমণীমোহন লোক। কিন্তু মনটা ওর হুসারের, খাঁটি হুসারের। লোকে আমাদের নিন্দে করে বটে, কিন্তু সাচ্চা হুসার যে কী চীজ বোঝে না। হ্যাঁ, ছিল বটে সে সব দিন!'

অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারটি বিশদভাবে বলতে শুরু করে দিলেন লেবেদিয়ানে কাউণ্টের সঙ্গে তাঁর বেলেল্লাপনার কাহিনী, যে ব্যাপারটি শুধু যে ঘটে নি তাই নয়, ঘটতে পারে না কখনো। ঘটতে পারে না, কারণ প্রথমত, তিনি এর আগে কাউণ্টকে চোখে দেখেন নি কখনো, কাউণ্ট অশ্বারোহী বাহিনীতে ঢোকার দু বছর আগে তিনি অবসর গ্রহণ করেছিলেন, আর দ্বিতীয়ত, অশ্বারোহী বাহিনীর এই অফিসারপ্রবর কখনো অশ্বারোহী বাহিনীতে কাজ করেন নি, বেলেভ্স্কি রেজিমেণ্টে সামান্যতম ক্যাডেট হিসেবে চার বছর কাটিয়ে অফিসারের পদ পাবার সঙ্গে সঙ্গে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু দশ বছর আগে পৈতৃক সম্পত্তি হাতে আসার পর সত্যি তিনি একবার যান লেবেদিয়ানে, সেখানে নতুন ঘোড়া-জোগাড়ে অফিসারদের সঙ্গে সাতশ রুবল ফুঁকে দিয়ে নিজের জন্য অর্ডার দেন নারাঙ্গি কফ দেওয়া উলানী* পোষাক, মতলব ছিল অশ্বারোহী বাহিনীতে যোগ দেবেন। এ বাসনা তাঁর এত উগ্র ছিল যে লেবেদিয়ানে নতুন ঘোড়া-জোগাড়ে অফিসারদের সঙ্গে কাটানো সেই তিনটি সপ্তাহ তাঁর জীবনে রয়ে গেল সবচেয়ে আনন্দোজ্জ্বল, মনে মনে নিজের স্বপ্নকে প্রথমে বাস্তবে তারপর স্মৃতিতে রূপান্তরিত করে অশ্বারোহী বাহিনীতে নিজে কাজ করেছিলেন ক্রমশঃ এ বিশ্বাস দৃঢ় হল; এতে অবশ্য সততা ও অমায়িকতার দিক দিয়ে সত্যিকার ভদ্রলোক হতে কোনো বাধা হয় নি তাঁর।

'সত্যি, অশ্বারোহী বাহিনীতে যারা কাজ করে নি আরা বুঝবেই না আমাদের মত লোকের কদর।' চেয়ারে উঁচু হয়ে বসে থুতনি

* উলান — অতীত রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীতে অশ্বারোহী সেনাদের একটি বিভাগ। — সম্পাঃ

এগিয়ে দিয়ে মোটা ভারি গলায় বলে চললেন, 'এক কালে দলের আগে আগে যেতাম ঘোড়ায় চেপে, দুটো পায়ের মাঝখানে যেটা থাকত সেটা ঘোড়া তো নয়, খাঁটি শয়তান; নিজেও কম শয়তান নই, বসে থাকতাম ঘোড়ার ওপর গ্যাঁট হয়ে, দলের কমান্ডার আসতেন দেখতে। বলতেন, 'ওহে অফিসার, তোমাকে ছাড়া তো কাজ চলবে না। দয়া করে দলটাকে প্যারেড করাও দেখি।' আমি বলতাম 'যে আজ্ঞে', আর মুখের কথাটি খসতে না খসতে খেল শুরু। বনবন করে ঘুরপাক দিয়ে মোচওয়ালা বাহাদুরদের হেঁকে হুকুম দিতাম, আর সাঁ করে সবাই বেরিয়ে যেতাম। হ্যাঁ, ছিল বটে সে সব দিন!'

লালচে মুখে ভিজে চুলে গোসলখানা থেকে বেরিয়ে কাউণ্ট সটান গেলেন সাত নম্বর ঘরে, সেখানে পাইপ মুখে ড্রেসিংগাউন পরে অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার বসে বসে তখন একটু সন্ত্রস্ত আনন্দে নিজের অসীম সৌভাগ্যের কথা চিন্তা করছিলেন — বিখ্যাত তুর্বিনের সঙ্গে এক ঘরে থাকা — ভাবছিলেন, "যদি ঝোঁকের মাথায় উনি আমার কাপড়চোপড় খুলে সহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে বরফে বসিয়ে দেন, কিম্বা সারা গায়ে মাখিয়ে দেন আলকাতরা, কিম্বা শুধু... না-না, দোস্তের সঙ্গে ও রকম ব্যবহার উনি করবেন না।' এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন নিজেকে।

'সাশ্‌কা! ব্লুচারকে খেতে দে!' হেঁকে বললেন কাউণ্ট।

সাশা এসে হাজির, হোটেলে পোঁছেই এক গেলাস ভোদকা চাপাতে বেশ রঙ ধরেছে।

'তর সইল না আর! এরি মধ্যে নেশা ধরেছে দেখছি, বদমাস কোথাকার!.. ব্লুচারকে খেতে দে!'

'না খেলে ও পটল তুলবে না, দেখনে না গাটা কেমন চকচকে!' ব্লচারের গা চাপড়াতে চাপড়াতে বলল সাশা।

'বকবক রাখ! খেতে দে ওকে!'

'আপনি কেবল কুকুর নিয়ে ভাবেন, আর চাকর এক পাত্তর ভোদকা খেলে ধমকান।'

'তবে রে, এক ঘা কষাব নাকি!' কাউণ্ট যে ভাবে হাঁক দিলেন তাতে জানলার কাঁচগুলো ঝনঝন করে উঠল, আর অল্প ঘাবড়ে গেলেন অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার।

'সাশার পেটে আজ কিছু পড়েছে কিনা জিজ্ঞেস করলে তো পারেন। মানুষের চেয়ে কুকুর যদি আপনার বেশী পেয়ারের হয়, বেশ, মারুন আমাকে,' সাশা বলল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নাকে এমন একটা ঘুঁষি খেল যে পড়ে গেল মেঝেতে, পার্টিশনে ঠুকে গেল মাথা, পরমুহূর্তে হাতে নাক চেপে তড়াক করে উঠে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে ধপাস করে বসে পড়ল করিডরে একটা তোরঙ্গের ওপর।

'দাঁতের দফারফা করে দিয়েছেন,' বিড় বিড় করে বলল এক হাতে রক্তাক্ত নাক মুছে, অন্য হাতে ব্লচারের পিঠ চুলকে দিতে দিতে, কুকুরটা নিজের গা চাটছিল। 'দেখছিস ব্লচার, দাঁত ভেঙে দিয়েছেন একেবারে, কিন্তু তবু তো উনি আমার কাউণ্ট আর ওঁর জন্যে আমি আগুনেও ঝাঁপ দিতে পারি। হ্যাঁ, হক কথা, কেননা জানিস তো ব্লচার, উনি হলেন গিয়ে আমার কাউণ্ট। তোর ক্ষিধে পেয়েছে?'

কিছুক্ষণ সেখানে শুয়ে থেকে উঠে পড়ল সে, খাওয়াল কুকুরটাকে, তার নেশা প্রায় ছুটে গেছে, গেল কাউণ্টকে চা দিতে।

পার্টিশনে পা তুলে অফিসারের বিছানায় শুয়ে আছেন কাউণ্ট, সামনে দাঁড়িয়ে নম্রভাবে তাঁকে বলছেন অশ্বারোহী বাহিনীর

অফিসার, 'আমি তাহলে অপমানিত বোধ করব। আমিও তো ঘাগী সৈনিক, বলতে গেলে দোস্ত। অন্য কারো কাছ থেকে টাকা নিতে দেবার আগে বরং আমি আপনাকে সানন্দে দুশ রুবল দেব। আপাতত আমার কাছে অতটা নেই — মাত্র একশ আছে কিন্তু বাকিটা আজকেই জোগাড় করব। আমি কিন্তু সত্যি অপমানিত বোধ করব, কাউণ্ট!'

'ধন্যবাদ দোস্ত,' তাঁর পিঠ চাপড়ে বললেন কাউণ্ট। দুজনের মধ্যে কী সম্পর্কটা দাঁড়াবে সেটা তৎক্ষণাৎ আঁচ করে নিলেন তিনি। 'ধন্যবাদ। ব্যাপারটা যদি এ-ই, তাহলে বল-নাচে যাব আমরা। কিন্তু আপাতত কী করা যায়? সহরে কী কী হচ্ছে বলুন তো! দেখতে ভালো ছুঁড়ীটুঁড়ি আছে নাকি? ফুর্তি লুঠছে কারা? তাসুড়ে আছে?'

অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার বললেন, অঢেল সুন্দরী মেয়ে দেখা যাবে বল-নাচে; সহরে সবচেয়ে মজা লুঠছে নব-নির্বাচিত পুলিস ক্যাপ্টেন কল্‌কোভ; হুসারদের মতো বেপরোয়া মেজাজ তার নেই অবশ্য, তবে লোকটা ভালো; ইলিউশ্‌কার জিপসী কোরাস নির্বাচনের শুরু থেকে এখানে গাইছে, স্তেশ্‌কা সে দলে একক গায়, আর বল-নাচের পর সবাই যাবে জিপসীদের কাছে।

'আর তাস খুব চলে এখানে,' তিনি বলে চললেন। 'লুখ্‌নভ বলে পয়সাকড়িওয়ালা একটা লোক সারা দিন তাস খেলে আর আট নম্বর ঘরের ইলিন হেরে ভূত হচ্ছে, ও হল উলান রেজিমেণ্টের কর্ণেট। ওর ওখানে এরি মধ্যে খেলা শুরু হয়েছে। রোজ সন্ধ্যেয় খেলে, আর ইলিন লোকটা এত চমৎকার, বললে বিশ্বেস করবেন না, কাউণ্ট; লোকটা একেবারে কঞ্জুস নয় — পরনের সার্টটা খুলে দিয়ে দিতে পারে।'

'তাহলে যাওয়া যাক ওর কাছে। দেখি এখানে কে কে আছে,' বললেন কাউণ্ট।

'চলুন, চলুন। আপনাকে দেখে ওরা বেজায় খুশি হবে।'

২

উলান রেজিমেণ্টের কর্ণেট ইলিনের সবে ঘুম ভেঙেছে। আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় তাসের টেবিলে আটটায় বসে পরের দিন বেলা এগারোটা পর্যন্ত এক নাগাড়ে খেলেছে পোনেরো ঘণ্টা। হেরেছে বিস্তর, কিন্তু নিজেই বলতে পারবে না কতটা; তার নিজের ছিল তিন হাজার রুবল, আর রেজিমেণ্টের পোনেরো হাজার: সে টাকাটা নিজের টাকার সঙ্গে মিশে গেছে বেশ কিছু দিন, গুণতে তার ভয়, পাছে তার আশঙ্কা সত্যি হয় যে লোকসানের অঙ্ক ইতিমধ্যে চড়াও করেছে রেজিমেণ্টের টাকায়। প্রায় বারোটার সময়ে ঘুমিয়ে পড়ে সে, সেই গভীর স্বপ্নহীন ঘুম যা একমাত্র ছেলেছোকরাদের পক্ষে সম্ভব, আর তাও সম্ভব শুধু তাসে হেরে ভূত হবার পর। সন্ধ্যে ছটায় ঘুম ভাঙল, হোটেলে ঠিক কাউণ্টের আগমনের সময়টায়; মেঝেতে ছড়ানো তাস আর খড়ি, ঘরের মাঝখানে দাগ লাগা কয়েকটা টেবিল, দেখে বিভীষিকায় মনে পড়ে গেল গত রাত্রের খেলার কথা, বিশেষ করে শেষ তাসটার কথা, গোলামের তাস, যাতে তার গচ্চা যায় পাঁচশ রুবল, কিন্তু নিজের যথার্থ অবস্থাটা মেনে নিতে মন চাইল না, বালিশের তলা থেকে টাকা বের করে শুরু করলে গুণতে। 'কর্ণার' আর 'ট্রান্সপোর্টে' হাতে হাতে ঘোরা কয়েকটা চেনা নোট দেখাতে নিজের খেলার সমস্ত ধারাটা মনে পড়ে গেল।

নিজের তিন হাজার তো উবে গেছেই, আরো গেছে রেজিমেণ্টের প্রায় আড়াই হাজার।

পরপর চার রাত্রি ধরে খেলছে এই উলানী সেনা।

এসেছে মস্কো থেকে, সেখানে তার হাতে দেওয়া হয়েছিল রেজিমেণ্টের টাকা। ঘোড়া বদলানো যাবে না ছুতো করে যাত্রীবাহী ডাকগাড়ি স্টেশনের ম্যানেজার ক... সহরে আটকে রেখেছে তাকে; আসলে হোটেলের মালিকের সঙ্গে তার গোপন সড় ছিল সব যাত্রীকে এক দিনের মতো আটকে রাখার। কমবয়সী ফুর্তিবাজ ছোকরা, উলান রেজিমেণ্টে যোগ দেবার উপলক্ষে বাপমা তার হাতে দিয়েছে তিন হাজার রুবল এই সেদিন, নির্বাচনের সময়ে ক... সহরে কটা দিন কাটাতে পেরে বেজায় খুশি, আশা ছিল প্রাণ ভরে মজা লুঠে নেবে। একটি গেরস্ত গোছের জমিদারের সঙ্গে চেনা ছিল তার। গাড়ি চড়ে তার বাড়িতে গিয়ে মেয়েদের একটু খাতির করে আসার জন্য তৈরী হচ্ছে, এমন সময়ে অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার এসে আলাপ করলেন তার সঙ্গে। আর সে দিনই সন্ধ্যায়, কুমতলবে তা নয়, বৈঠকখানায় তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন বন্ধু লুখ্‌নভ ও অন্যান্য কয়েকজন তাসুড়েকে। তখন থেকে তাসের টেবিলে জমে গিয়েছে সে। পরিচিত জমিদারটির কাছে যে যায় নি শুধু তা নয়, ঘোড়া ডাকার কথাই তোলে নি আর। পরপর চার দিন ঘর ছেড়ে বেরোয় নি।

জামাকাপড় পরে চা খেয়ে ধীরেসুস্থে জানলায় গেল ইলিন। ভাবল একটু হেঁটে বেড়িয়ে এলে তাসের নাছোড়বান্দা চিন্তা মুছে যাবে মন থেকে। আর্মিকোট পরে বাইরে গেল। লাল-ছাদ শাদা বাড়িগুলোর পেছনে তখন সূর্য ঢলে পড়েছে, গোধূলি নেমেছে। দিনটা গরম। নোংরা পথেঘাটে তুলোর মতো নরম বরফ। ঘুমিয়ে

কাটিয়েছে এই শেষ হয়ে আসা দিনটা, ভেবে গভীর বিষণ্নতায় মন ভরে গেল কর্ণেটের।

"এ হারানো দিন আর কখনো ফিরে আসবে না," সে ভাবল।

"যৌবনটা ফুঁকে দিয়েছি," বলল নিজেকে, ফুঁকে দিয়েছে সত্যি ভেবে যে বলল তা নয়, বাস্তবিক পক্ষে এ বিষয়ে ভাবে নি মোটে, বলল বলবার মত কথাটা হঠাৎ মনে আসাতে।

ভাবতে লাগল, "কী করি এখন? কারো কাছে টাকা ধার করে চলে যাই?" ফুটপাথে তাকে পেরিয়ে গেল একটি মেয়ে। "কী বোকা-বোকা চেহারা মেয়েটার।" কেন জানি ভাবল। "ধার করার মত তো কেউ নেই। ফুঁকে দিয়েছি যৌবন।" গেল দোকানের একটা সারিতে। একটার দরজায় দাঁড়িয়ে একটি দোকানদার, গায়ে শেয়ালের লোম-দেওয়া কোট, খরিদ্দার ডাকাডাকি করছে। "সেই আটাটা হাতছাড়া না করলে লোকসানটা পুরিয়ে নিতে পারতাম।" পিছু পিছু একটি বুড়ী ভিখারিনী কাঁদুনি গাইতে গাইতে চলেছে। "ধার করার মতো তো কেউ নেই।" ভালুক লোমের কোট-পরা একটি ভদ্রলোক চলে গেল গাড়ি হাঁকিয়ে। পাহারাদার দাঁড়িয়ে আছে। "এদের মধ্যে হুলস্থুল লাগিয়ে দেবার মতো কী করা যায়? গুলি চালাই এদের? বড়ো একঘেয়ে হবে ব্যাপারটা। যৌবন ফুঁকে দিয়েছি। চমৎকার নক্সা-করা জোয়াল ঝুলছে! ওঃ, তিন ঘোড়ার গাড়িতে চাপলে কেমন হত! হায়রে! ফেরা যাক হোটেলে। লুখ্‌নভের আসতে দেরী নেই, তাস চালাই গে আবার।" ফিরে গিয়ে টাকাটা গুণে দেখল আবার। না, প্রথম বারে কোনো ভুল হয় নি: রেজিমেণ্টের টাকায় আড়াই হাজার রুবল ঘাটতি পড়েছে। "প্রথম তাসে ধরব পঁচিশ, পরেরটায় 'কর্ণার'... তারপর বাজির সাতগুণ... তারপর পোনেরো, তিরিশ, ষাট গুণ... তিন

হাজার র‌ুবল পর্যন্ত। তারপর জোয়ালগ‌ুলো কিনে বিদায় নেব। কিন্তু বেটা বদমাস জিততে দেবে না আমাকে! যৌবনটা ফ‌ুঁকে দিয়েছি।”

ল‌ুখ্‌নভ যখন ঘরে ঢুকল তখন এ সব কথা ভাবছিল উলানী সেনাটি।

‘অনেকক্ষণ উঠেছেন নাকি, মিখাইলো ভাসিলিচ?’ সর‌ু নাক থেকে আস্তে আস্তে সোনার চশমা খ‌ুলে লাল সিল্কের র‌ুমালে ধীরেস‌ুস্থে ম‌ুছতে ম‌ুছতে জিজ্ঞেস করল ল‌ুখ্‌নভ।

‘না, সবেমাত্র। খাসা ঘ‌ুমিয়েছি।’

‘এইমাত্র কে একজন হ‌ুসার এসেছে। আছে জাভাল্‌শেভ্‌স্কির সঙ্গে... শ‌ুনেছেন নাকি?’

‘না। আর সবাই আসে নি এখনো, কী ব্যাপার?’

‘মনে হচ্ছে ওরা গেছে প্রিয়াখিনের কাছে। এখখ‌ুনি ফিরে আসবে।’

আর সত্যি, অনতিবিলম্বে এসে জ‌ুটল অন্যেরা: ল‌ুখ্‌নভের সদা সহচর, স্থানীয় সেনাদলের অফিসার একজন; গ্রীক সওদাগর একটি, প্রকাণ্ড তামাটে রঙের বাঁকা নাক, কোটরগত কালো চোখ; মেদবহ‌ুল থলথলে একটি জমিদার, মদের ভাঁটির মালিক, সারা রাত খেলে, হামেশা আধ র‌ুবল বাজি রাখে পয়েণ্ট পিছ‌ু। সবাই খেলা শ‌ুর‌ু করতে উদগ্রীব, কিন্তু সে বিষয়ে উচ্চবাচ্য করছে না খেল‌ুড়েদের পাণ্ডারা, বিশেষ করে ল‌ুখ্‌নভ: সে অত্যন্ত ধীরেস‌ুস্থে মস্কোতে মগের ম‌ুল‌ুকের কথা বলছে।

‘ভেবে দেখ‌ুন একবার! সেরা সহর মস্কো, আমাদের রাজধানী, আর সেখানে কিনা রাত্তিরে আঁকড়া হাতে গ‌ুণ্ডারা ভূতের মতন সাজে যত্রতত্র ঘ‌ুরে বেড়ায়, নির্বোধ লোকগ‌ুলোকে ভয় পাইয়ে

দেয়, পথিকদের লুঠে নেয়, ব্যস! পুলিস কী করে বলুন তো! সেটা বোঝা ভার।'

মগের মুলুকের বিবরণ মন দিয়ে শুনল ইলিন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠে পড়ে শান্ত গলায় তাস আনতে বলল। প্রথমে মোটা জমিদারটি মনের কথা মুখে প্রকাশ করল:

'তাহলে মশাইরা, মূল্যবান সময় মিছিমিছি নষ্ট করে কী ফয়দা? কাজের কাজ শুরু করা যাক!'

'কেন চাইছেন জানা আছে, আধ রুবল বাজি ধরে ধরে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঘরে তুলেছেন কাল রাত্রে,' বলল গ্রীক।

'কিন্তু সত্যি, এবার শুরু করলে হয়,' বলল স্থানীয় সেনাদলের অফিসার।

লুখ্নভের দিকে চাইল ইলিন। সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে লুখ্নভ ভূতের পোষাক-পরা লম্বা আঁকড়াওয়ালা গুন্ডাদের কাহিনী বলে চলল ধীরেসুস্থে।

'তাস বিলি করব নাকি?' জিজ্ঞেস করল উলানী সেনা।

'বড্ডো তাড়াতাড়ি হচ্ছে না?'

'বেলভ!' কেন জানি লাল হয়ে উঠে হাঁক দিল উলানী সেপাই। 'মুখে দেবার মত কিছু নিয়ে এসো... আজ কুটোটি খাই নি, জানেন। নিয়ে এসো শ্যাম্পেন, আর তাস দাও।'

ঠিক সে সময়ে ঘরে ঢুকলেন কাউণ্ট আর জাভাল্শেভ্স্কি। দেখা গেল তুর্বিন ও ইলিন একই ডিভিশনের লোক। সঙ্গে সঙ্গে ভাব জমে গেল তাদের, গেলাস ঠুকে শ্যাম্পেন খাওয়া হল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুজনে দুজনকে 'তুমি' বলতে শুরু করল। দেখা গেল ইলিনকে অত্যন্ত ভালো লেগেছে কাউণ্টের, তিনি তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে এত কম বয়স বলে পিছনে লাগলেন।

'একেই বলে ফৌজী উলান!' তিনি বললেন। 'মোচের কী বাহার! কী দারুণ মোচ!'

ইলিনের ঠোঁটের ওপরের রোঁয়া একেবারে শাদা।

'আপনারা তাসে বসার উপক্রম করছেন বুঝি?' বললেন কাউণ্ট। 'বেশ, আশা করি তুমি জিতবে, ইলিন। তুমি তো তুখোড় খেলুড়ে, তাই না?' মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

তাসের প্যাকেট খুলতে খুলতে লুখ্‌নভ বলল, 'এই শুরু করছি আর কি। আপনি খেলবেন না, কাউণ্ট?'

'না, আজকে নয়। খেললে আপনাদের যথাসর্বস্ব খোয়াতে হবে। আমি খেলতে বসলে ব্যাঙ্ক ফেল মারে। কিন্তু না খেলার কারণ তা নয়। ভলচোকের কাছে যাত্রীবাহী ডাকগাড়ির স্টেশনে সব খুইয়েছি। আঙুলে এক সারি আংটি-পরা এক বেটা পদাতিক বাহিনীর লোক একেবারে বসিয়ে দিয়েছে। লোকটা জোচ্চোর নিশ্চয়।'

'তোমাকে বুঝি যাত্রীবাহী ডাকগাড়ির স্টেশনে অনেকক্ষণ থাকতে হয়েছিল?' ইলিন জিজ্ঞেস করল।

'পুরো বাইশ ঘণ্টা। কখনো ভুলব না হতচ্ছাড়া জায়গাটার কথা, আর ওখানকার ডাক-স্টেশন মাস্টারও ভুলবে না আমায় কখনো।'

'তার মানে?'

'গাড়ি হাঁকিয়ে পেঁাছেছি, চোর জোচ্চোরের মতো দেখতে ডাক-স্টেশন মাস্টার এক ঝটকায় এসে বলল, 'ঘোড়াটোড়া নেই।' আমি নিজের জন্যে একটা নিয়ম খাড়া করেছি, সেটা বলা দরকার: যখনি বলে ঘোড়া নেই, তখনি আমি কোট না খুলেই সটান যাই ম্যানেজারের কামরায় — বৈঠকখানার কথা বলছি না, একেবারে

তার খাস কামরায়, আর হুকুম দিই সমস্ত দরজা জানলা খুলে দিতে, যেন ধোঁয়ায় জায়গাটা ভর্তি হয়ে গেছে। এবারেও ঠিক তাই করলাম। কী ঠাণ্ডা! গেল মাসে কী দারুণ শীত পড়েছিল মনে আছে? শূন্যের নীচে বিশ। ডাক-স্টেশন মাস্টার আমার সঙ্গে তর্ক করতে এল, কিন্তু নাকে কষিয়ে দিলাম এক ঘা। একটা বুড়ী, কয়েকটা ছুঁড়ী আর কয়েকটা মাগী চেঁচামেচি করে নিজেদের ঘটিবাটি তুলে নিয়ে গাঁয়ে কেটে পড়ার জোগাড় করল... পথ জুড়ে চেঁচিয়ে বললাম, 'আমাকে ঘোড়া দাও তো দাও, তাহলে চলে যাব; না দিলে ঠাণ্ডায় জমে মরো গে, কাউকে বেরোতে দেব না এখান থেকে!''

'যেমন কুকুর তেমন মুগুর!' খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল থলথলে জমিদার। 'ঠাণ্ডায় তেলাপোকাদের ভূত ভাগানোর মতো।'

'কিন্তু ওদের নজরে রাখি নি — কোথায় যেন গিয়েছিলাম — হ্যাঁ, ডাক-স্টেশন মাস্টার আর মেয়েগুলো তো সরে পড়ল। আমার জামিনে রয়ে গেল শুধু তন্দুরের ওপর শোয়া বুড়ীটা, খালি হাঁচছে আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে। তারপর শুরু হল আপোষের কথাবার্তা: ডাক-স্টেশন মাস্টার ফিরে দূর থেকে বলল বুড়ীটাকে ছেড়ে দিতে, কিন্তু আমি লেলিয়ে দিলাম রুচারকে, ডাক-স্টেশন মাস্টার দেখলেই চটে যায় ও। কিন্তু শয়তানটা পরের দিন সকাল না হওয়া পর্যন্ত ঘোড়া দিল না। পদাতিক বাহিনীর সেই হতচ্ছাড়া অফিসারটা হাজির। পাশের ঘরে গিয়ে খেলতে শুরু করলাম তার সঙ্গে। রুচারকে দেখেছেন?.. রুচার! এদিকে আয়!'

রুচার এল। জুয়াড়িরা আগ্রহের ভাব দেখিয়ে তাকে দেখল, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল অন্য কিছুর জন্য তারা উদগ্রীব।

'কিন্তু আপনারা খেলছেন না কেন? আমার জন্যে খেলা ছেড়ে থাকবেন না যেন। আমি বুঝলেন কিনা, একটু বকুনতুড়ে লোক,' বললেন তুর্বিন। 'লভ মি, লভ মি নট — বেড়ে খেলা।'

৩

দুটো মোমবাতি সামনে টেনে লুখ্নভ টাকাভর্তি বেশ বড়ো একটা তামাটে মনিব্যাগ বের করল, অতি আস্তে মন্ত্রসাধকের মত টেবিলের ওপর তা খুলে একশ রুবলের দুটো নোট নিয়ে রাখল তাসের নীচে।

'দুশ রুবলের ব্যাঙ্ক, ঠিক কালকের মত,' বলল চশমাটা নাকে ঠিক মত বসিয়ে নতুন তাসের প্যাকেট খুলতে খুলতে।

'বহুৎ আচ্ছা,' তার দিকে না তাকিয়ে, তুর্বিনের সঙ্গে আলাপ না থামিয়ে বলল ইলিন।

খেলা শুরু হল। যন্ত্রের মত নির্ভুল খেলা লুখ্নভের, মাঝে মাঝে থেমে একটা পয়েণ্ট ধীরেসুস্থে টুকে রাখছে সে বা চশমার ওপর দিয়ে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে 'দিয়ে দিন' বলছে। সবচেয়ে বেশী শব্দ করছে মোটা জমিদারটি, হিসেব মুখে মুখে চলছে তার, তাসের কোণ ধরে মোটা আঙুলে থুথু লাগাচ্ছে তাসে; স্থানীয় সেনাদলের অফিসার চুপচাপ পরিষ্কার হাতে নিজের পয়েণ্টগুলো টুকে রাখছে, তাসের কোণ সামান্য নীচু করে রাখছে টেবিলে; ব্যাঙ্কারের পাশে বসে কোটরগত কালো চোখে গ্রীকটি খেলা দেখছে মনোযোগ সহকারে, যেন একটা কিছু ঘটার প্রতীক্ষায় আছে। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে জাভাল্শেভ্স্কি হঠাৎ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে পড়লেন: পকেট থেকে লাল বা নীল ব্যাঙ্কনোট বের

করে তার ওপরে একটা তাস চাপিয়ে সজোরে সেটা চাপড়ে কপাল খোলার জন্য চে'চালেন, 'চলে এসো হে, সাতা!' গোঁফ কামড়ে, এক পা থেকে অন্য পায়ে ভর দিয়ে লাল হয়ে উঠলেন, ভীষণ উত্তেজনা, তাস না এসে যাওয়া পর্যন্ত সে উত্তেজনা থামল না। ঘোড়ার লোমের সোফার পাশে রাখা একটা রেকাবী থেকে বাছুরের মাংস আর শশা খাচ্ছে ইলিন, ব্যস্তসমস্ত হয়ে জ্যাকেটে আঙুল মুছে নিয়ে একটার পর একটা তাস ফেলছে। শুরু থেকে সোফায় বসেছিলেন তুর্বিন, ব্যাপারটা কী তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ল তাঁর কাছে। ইলিনের দিকে একেবারে তাকাচ্ছে না লুখ্‌নভ, কোনো কথা বলছে না তাকে; মাঝে মাঝে শুধু চশমার ফাঁক দিয়ে দেখে নিচ্ছে তার দানগুলো। ইলিনের বেশীর ভাগ তাস হারে।

'ও তাসটা পেলে হত,' মোটা জমিদারের তাসের উল্লেখ করে বলল লুখ্‌নভ, জমিদারটি আধ রুবল বাজি ধরে খেলছিল।

'ইলিনেরটা মারুন না — আমার তাস নিয়ে কী লাভ?' জমিদার বলল।

আর সত্যি, অন্যদের তুলনায় ইলিনের তাস বার বার মার খাচ্ছে। প্রতিবার হারার পর অস্থিরভাবে টেবিলের নীচে লক্ষ্মীছাড়া তাসটায় টান দিয়ে কম্পিত হাতে আর একটা বেছে নিচ্ছে সে। সোফা থেকে উঠে তুর্বিন গ্রীককে বললেন ব্যাঙ্কারের পাশে তাঁকে বসতে দিতে। জায়গা বদলাল গ্রীক, আর কাউণ্ট তার চেয়ারে বসে লুখ্‌নভের হাতে নজর রাখলেন এক দৃষ্টিতে।

'ইলিন!' হঠাৎ ডেকে উঠলেন তিনি, গলার সুরটি স্বাভাবিক হলেও তাতে আপনা থেকে চাপা পড়ল অন্য সব আওয়াজ। 'কেন ও তাসটা ধরে রেখেছ? খেলতে জানো না দেখছি।'

'যাই খেলি না কেন, সব সমান।'

'ও রকম করলে হারবে নির্ঘাত। দাও, তোমার হয়ে খেলি।'

'না, ক্ষমা করো! আমার হাত কাউকে দিই না। খেলতে চাইলে নিজে খেলো।'

'বলেছি তো তোমাকে, নিজে খেলতে চাই না: শুধু তোমার হয়ে খেলতে চাই। তোমাকে এমন হারতে দেখে খারাপ লাগছে।'

'পোড়া কপাল!'

আর কিছু বললেন না কাউণ্ট, শুধু টেবিলে কনুই রেখে আবার এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন লুখ্নভের হাতদুটোর দিকে।

'অত্যন্ত খারাপ,' হঠাৎ টেনে টেনে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি।

তাঁর দিকে ফিরে তাকাল লুখ্নভ।

'অতি, অতি খারাপ,' আরো জোরে বললেন তিনি, লুখ্নভের চোখে সটান চেয়ে।

ওরা খেলে চলল।

'ভা-লো নয়,' ইলিনের আর একটা বড়ো তাস লুখ্নভ নেওয়াতে তুর্বিন বললেন।

'কিসে আপনি অসন্তুষ্ট হচ্ছেন, কাউণ্ট?' গায়ে-না-মাখা গোছের ভদ্র সুরে জিজ্ঞেস করল লুখ্নভ।

'যেভাবে ইলিনের তাসগুলো মারছেন, তাতে। সেটাই খারাপ।'

একটু নড়ে উঠল লুখ্নভের কাঁধ আর ভুরু, যেন তার বক্তব্য এই যে, নিজের অদৃষ্ট মেনে না নিলে নয়; খেলে চলল সে।

'ব্লুচার! আয় এদিকে!' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে হাঁকলেন কাউণ্ট। 'এই যে, একে!' বললেন তাড়াতাড়ি।

সোফার নীচ থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে প্রভুর দিকে ছুটে এল ব্লুচার, তার ধাক্কায় আর একটু হলে পড়ে যেত স্থানীয় সেনাদলের

অফিসারটি: প্রভুর পাশে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়াতে নাড়াতে ঘর্‌র্‌র্‌ করে দলের দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগল কুকুরটা যেন জিজ্ঞেস করছে, ‘কই, কার দোষ?’

তাস নামিয়ে রেখে চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিল লুখ্‌নভ। বলল:

‘এ অবস্থায় খেলা অসম্ভব। কুকুর আমি একেবারে সইতে পারি না। ঘর জোড়া কুকুর নিয়ে খেলা যায় কী করে?’

‘বিশেষ করে এ ধরনের কুকুর — এদের ছিনেজোঁক বলে মনে হয়,’ সুর মেলাল স্থানীয় সেনাদলের অফিসার।

‘কী বলেন, খেলা চলবে না চলবে না, মিখাইলো ভাসিলিচ?’ জিজ্ঞেস করল লুখ্‌নভ।

‘দয়া করে বাধা দিও না, কাউন্ট,’ ইলিন অনুরোধ জানাল তুর্বিনকে।

‘একবারটি এসো তো,’ ইলিনের হাত ধরে পার্টিশনের ওদিকে নিয়ে যেতে যেতে তুর্বিন বললেন।

সেখান থেকে কাউন্টের প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট শোনা গেল। গলা না নামিয়ে তাঁর কথা বলার অভ্যাস। আর তাঁর গলাটি এমন যে তিন কামরা ছাড়িয়ে শোনা যায়।

‘তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কি লোপ পেয়েছে? দেখছ না, চশমা-পরা ভদ্রলোকটি ঘোড়েল জোচ্চোর?’

‘আরে থামো! কী বলছ তুমি?’

‘না, থামব না। ছেড়ে দাও, আমি বলছি। আমার কী এসে যায়? অন্য যে কোনো সময়ে তোমার টাকা হাতিয়ে নিতাম, কিন্তু কেন জানি না তোমাকে ঠকতে দেখে খারাপ লাগছে। রেজিমেন্টের টাকা সঙ্গে আছে নাকি?’

'না। কী ভাবছ তুমি?'

'একই পথের পথিক আমি, দোস্ত, তাই জোচ্চোরদের সব কসরৎ আমার জানা; তোমাকে বলছি, চশমা-পরা লোকটা জোচ্চোর। খেলা ছেড়ে দাও। সত্যি বলছি, বন্ধুর মত বলছি কথাটা।'

'আমি শুধু আর একটা হাত খেলব, ব্যস।'

'আর একটার মানে আমার জানা। বেশ, দেখা যাক।'

ঘরে ফিরে গেল দুজনে। একটা দানে ইলিন এত বেশী বাজী রাখল আর তাসগুলো এত বেশী মার খেল যে অনেক টাকা গচ্চা গেল।

টেবিলের মাঝখানে হাত রাখলেন তুর্বিন:

'ঢের হয়েছে! চলো যাই।'

'এখন যেতে পারি না; আমাকে দয়া করে ছেড়ে দাও তো,' বিরক্ত হয়ে বলল ইলিন, তুর্বিনের দিকে না তাকিয়ে অমসৃণ তাস ভাঁজতে ভাঁজতে।

'তাহলে গোল্লায় যাও! হারতে যদি এত মজা লাগে তো হারো, আমি চললাম। জাভাল্‌শেভ্‌স্কি! চলুন আমার সঙ্গে মার্শালের ওখানে।'

দুজনে বেরিয়ে গেল। কেউ কোনো কথা বলল না, ওদের পায়ের শব্দ আর ব্লুচারের নখের আওয়াজ করিডরে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাস বিলি করল না লুখ্‌নভ।

'কী লোক রে বাবা!' হাসতে হাসতে বলল জমিদার।

'যাক গে, এখন আর বাধা দিতে পারবে না,' তাড়াতাড়ি আর ফিসফিসিয়ে বলে উঠল স্থানীয় সেনাদলের অফিসার।

খেলা চলতে লাগল।

৪

সেদিনকার উপলক্ষে সাফ-করা ভাঁড়ার ঘরটায় দাঁড়িয়ে বাজনদার, মার্শালের চাকরবাকর কোটের কফ ইতিমধ্যে তুলে দিয়ে নির্দিষ্ট একটা সংকেতে বাজাতে শুরু করেছে সাবেকী কায়দার 'আলেক্সান্দ্র, এলিজাভেতা' পলোনেজটি, আর মোমবাতির নরম উজ্জ্বল আলোয় জোড়ায় জোড়ায় লোকে বড়ো হলের পার্কেট-বসানো মেঝেতে আসতে আরম্ভ করেছে হালকা পা ফেলে: মার্শালের ক্ষীণাঙ্গী স্ত্রীর হাত ধরে প্রথমে গভর্ণর-জেনারেল, বুকে ক্যাথারিনের দরবারের তারকা চিহ্ন; তারপর গভর্ণরের স্ত্রীর হাত ধরে মার্শাল; তারপর আর সকলে, নানা দল আর উপদলে গুবের্নিয়ার শাসক শ্রেণীর পরিবারের লোকেরা; ঠিক সে সময়ে কাঁধে পাফ-বসানো প্রকাণ্ড কলারওয়ালা একটা নীল ফ্রককোট গায়ে, লম্বা মোজা আর নাচের জুতো পায়ে; গোঁফে, কোটের বুকের ভাঁজে আর রুমালে প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত যুঁইফুলের সেণ্ট ছড়িয়ে ঘরে ঢুকলেন জাভাল্‌শেভ্‌স্কি; সঙ্গে একটি সুদর্শন হুসার, পরনে আঁটোসাঁটো নীল ব্রিচেস আর ভ্লাদিমির ক্রুশ ও ১৮১২ সালের পদকে অলংকৃত সোনালি কাজ করা লাল টিউনিক। কাউণ্ট খুব লম্বা নন বটে, কিন্তু দেহের গঠন অত্যন্ত ভালো। স্বচ্ছ নীল অতি উজ্জ্বল চোখ আর গাঢ় কটা চুলের কুঞ্চিত ঘন গুচ্ছ তাঁর সুন্দর চেহারায় একটা বৈশিষ্ট্য এনেছে। বল-ঘরে তাঁর আগমন অপ্রত্যাশিত নয়: হোটেলে তাঁকে দেখে সেই সুদর্শন যুবকটি মার্শালকে তাঁর কথা জানিয়ে দিয়েছিল। খবরটা নানা লোকে নানাভাবে নেয়, মোটের ওপর প্রতিক্রিয়াটা খুব বেশী ভালো হয় নি। "আমাদের নিয়ে হয়ত হাসাহাসি করবে ছোঁড়াটা," মাঝবয়সী পুরুষ ও বয়স্কা

মহিলারা ভাবলেন। "যদি আমাকে নিয়ে পালান?" যুবতী ও কিশোরীদের কম বেশী মনে হল কথাটা।

পলোনেজ শেষ হবার পর নাচের জুড়িরা পরস্পরকে অভিবাদন করে আলাদা হয়েছে, মেয়েদের কাছে মেয়েরা গিয়েছে, ছেলেদের কাছে ছেলেরা, তখন গর্বিত ও খুশি ভাবে জাভাল্‌শেভ্‌স্কি কাউণ্টকে নিয়ে গেলেন গৃহকর্ত্রীর কাছে। মার্শালগিন্নীর মনে মনে ভয় পাছে কাউণ্ট সবায়ের সামনে তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করেন, মুখ ফিরিয়ে গর্ব মেশানো অবজ্ঞার সুরে বললেন, 'খুব খুশি হলাম। আশা করি নাচবেন।' কথাটা বলার পর তাকালেন সন্দিগ্ধভাবে, যেন বলতে চান, 'এর পরে কোনো মহিলাকে অপমান করাটা সত্যি ইতরজনোচিত ব্যবহার হবে!' কিন্তু কাউণ্ট নিজের সদয়তায়, মনোযোগীভাবে, হাসিখুশিতে ও সুষ্ঠু চেহারায় সকল সন্দেহের অবসান ঘটালেন অচিরে, আর তাঁকে নিয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে গৃহকর্ত্রীর মুখের ভাব আশেপাশের সকলকে জানিয়ে দিল, 'এ ধরনের ভদ্রলোকদের কী করে বাগ মানাতে হয় আমার জানা; কার সঙ্গে কথা বলছে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলেছে। দেখবেন, সারা সন্ধ্যে আমায় খাতির করবে।' কিন্তু ঠিক সে সময়ে গভর্ণর, যিনি এক কালে কাউণ্টের বাবাকে চিনতেন, তাঁর কাছে এসে সাদরে একপাশে নিয়ে গেলেন আলাপের জন্য; এতে স্থানীয় ভদ্রলোকদের উদ্বেগ আরো কমে গেল, কাউণ্টের কদর বেড়ে গেল তাদের কাছে। একটু পরে জাভাল্‌শেভ্‌স্কি তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন বোনের, ঘরে কাউণ্ট ঢোকার সময় থেকে নিমেষের তরে তাঁর থেকে ডাগর কালো চোখে ফেরায় নি গোলগাল নবীনা বিধবাটি। অর্কেস্ট্রা তখন বাজাচ্ছে ওয়াল্‌জ্‌, তাকে নাচতে অনুরোধ করলেন কাউণ্ট, আর তাঁকে নিয়ে যেটুকু সন্দেহ ছিল সেটা একেবারে উবে গেল তাঁর নাচের গুণে।

'সত্যি ওস্তাদ নাচিয়ে!' নীল ব্রিচেসে আচ্ছাদিত ঘরে ঘুরপাক-খাওয়া পাদুটো দেখতে দেখতে বলল একটি স্থূলকায়া জমিদার গৃহিণী আর নিজের মনে গুণতে লাগল, 'এক, দুই, তিন; এক, দুই, তিন... ওস্তাদ বটে!'

'কী দারুণ নাচিয়ে! কী দারুণ নাচিয়ে!' বলল আর একটি স্ত্রীলোক, সহরে আগতা এই মহিলাটিকে ওখানকার সমাজ ঠিক ভব্য বিবেচনা করে না। 'জুতোর কাঁটার ছোঁয়াটি পর্যন্ত কারো লাগছে না, আশ্চর্য! চমৎকার, কী হালকা পা!'

নাচের কৌশলে কাউণ্ট মুখচুন করে দিলেন গুবের্নিয়ার সেরা তিনটি নাচিয়ের: একজন হলেন গভর্ণরের শণচুলো লম্বা অ্যাডজুটাণ্ট, নাচের ক্ষিপ্রতা ও সঙ্গিনীকে ঘনিষ্ঠভাবে ধরার জন্য খ্যাতি ছিল তাঁর; দ্বিতীয়টি হলেন অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার, ওয়াল্জ্ নাচার সময়ে বিশেষ একটা পেলবভাবে দেহ দোলাতেন তিনি আর খুব হালকাভাবে তাড়াতাড়ি পা ঠুকতেন মেঝেতে; আর তৃতীয়টি একটি বেসামরিক ভদ্রজন, সবাই বলত অদ্ভুত নাচিয়ে তিনি, যে কোনো বল-নাচের প্রাণ বিশেষ, বুদ্ধিটা তাঁর খুব প্রখর না হয় নাই হল। আর সত্যি ভদ্রলোকটি বল-নাচের একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবিরাম নেচে যেতেন, পালা করে নাচে ডাকতেন প্রত্যেকটি মহিলাকে, ক্বচিৎ কখনো শুধু একবারটি দাঁড়িয়ে নিয়ে ভিজে সপসপে রুমালে মুছে নিতেন শ্রান্ত অথচ খুশিতে জ্বলজ্বলে মুখ। এঁদের তিনজনকেই কাবু করে দিয়ে সেদিনকার বলে উপস্থিত সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী তিনটি মহিলার সঙ্গে কাউণ্ট নাচলেন: তাঁদের একজন বৃহদাকার — ধনী, সুন্দরী ও নির্বোধ; আর একজন মাঝারি সাইজের — রোগা, দেখতে খুব ভালো নয়, পরিপাটি পোষাক-পরা, আর তৃতীয়টি ছোটখাটো — চেহারা অত্যন্ত সাদাসিধে

কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। অন্য মেয়েদের সঙ্গেও নাচলেন কাউণ্ট, মানে যাদের চেহারা ভালো তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে, আর সেদিন বল-নাচে সুন্দরীর অভাব ছিল না। কিন্তু সবচেয়ে তাঁর ভালো লাগল জাভাল্‌শেভ্‌স্কির বিধবা বোনটিকে। তার সঙ্গে নাচলেন কোয়াড্রিল, একোসেজ, আর মাজুর্‌কা। শুরুতেই কোয়াড্রিলের সময়ে তার রূপের প্রশংসা করলেন, তুলনা করলেন ভেনাস, ডায়না, গোলাপ এবং অন্য কী একটা ফুলের সঙ্গে। বিধবাটি এসব সৌজন্যের সাড়াতে নিজের সুন্দর শুভ্র গ্রীবা বেঁকাল, চোখ নামিয়ে নিজের শাদা মসলিনের ফ্রকের দিকে চাইল বা হাতপাখাটা এক হাত থেকে অন্য হাতে চালান করল। 'যান, আপনি ইয়ার্কি করছেন, কাউণ্ট,' এই এবং এ ধরনের দু-একটা কথা বলার সময়ে তার ঈষৎ ভাঙা গলায় এমন একটা সরল অকপট ও মজার সহজ ভাব প্রকাশ পেল যে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কাউণ্ট না ভেবে পারলেন না, সত্যি এ তো মেয়ে নয়, যেন ফুল; আর গোলাপ নয়, যেন সুদূরের কোন দেশে বরফের আদিম স্তূপে নিঃসঙ্গ বিকশিত আলোহিত-শুভ্র বুনো ফুল কোনো, যার গন্ধ নেই।

এই মেয়েটির অকৃত্রিম ভাব ও সরলতা তার সতেজ সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলে কাউণ্টের মনে এমন অদ্ভুত একটা ছাপ ফেলল যে কথাবার্তার ফাঁকে তার চোখে বা হাত আর গলার কমনীয় রেখার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করার অতি প্রবল বাসনা কয়েকবার অনেক কষ্টে দমন করলেন তিনি। কাউণ্টের মনে দাগ কাটতে পেরেছে দেখে বিধবাটি খুশি, কিন্তু কাউণ্টের হাবেভাবে এমন একটা কিছু ছিল যাতে সে বিচলিত ও ভীত বোধ করতে লাগল, যদিও এই নবীন হুসার যে শুধু তাকে প্রায় খোশামোদ করার মতো মনোযোগ দিচ্ছিলেন তা নয়, প্রচলিত আদবকায়দার

মাপকাঠিতে অতি ভক্তি দেখাচ্ছিলেন। ছুটোছুটি করে তার জন্য নিয়ে এলেন ফলের রস, কুড়িয়ে দিলেন রুমাল, বিধবার সেবায় ইচ্ছুক গলগণ্ডমার্কা একটি ছোকরা জমিদারের হাত থেকে বিধবাটির চেয়ার তাড়াহুড়ো করে নিলেন, টুকিটাকি আরো অনেক কাজ করে দিলেন।

মনমোহন হবার সবকিছু চেষ্টা মেয়েটির মনে বিশেষ দাগ কাটছে না দেখে তিনি মজার গল্পে তার মনোহরণের চেষ্টা করলেন, আশ্বাস দিলেন তার আদেশে তিনি শীর্ষাসন করতে তৈয়ার, মোরগের মতো ডাকতে রাজী, জানলা দিয়ে লাফাতে বা নদীর বরফের ফাটলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন। তাঁর চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হল। ছোটখাটো বিধবাটি ফুর্তির উচ্ছ্বাসে খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল, দেখা গেল তার সুন্দর ঝকঝকে দাঁত। রসিক নাগরটিকে ভারি পছন্দ হল মেয়েটির। আর প্রতি মিনিটে এত বেশী মোহমুগ্ধ হয়ে যেতে লাগলেন কাউণ্ট যে, কোয়াড্রিলের শেষ যখন হল তখন তিনি রীতিমত প্রেমে পড়ে গিয়েছেন।

কোয়াড্রিলের শেষে যখন সে অঞ্চলের সবচেয়ে ধনী জমিদারের আঠারো বছর বয়স্ক তার বহুদিনকার ভক্ত নিষ্কর্মা ছেলেটি, গলগণ্ডমার্কা যে ছোকরাটির হাত থেকে চেয়ার ছিনিয়ে নিয়েছিলেন কাউণ্ট, বিধবাটির কাছে এল তখন অতি নিস্পৃহ ভাব দেখাল সে, কাউণ্টের সঙ্গে তার উচ্ছল ভাবের শতাংশের একাংশও দেখা গেল না তার মধ্যে।

'বেড়ে লোক আপনি!' তাকে বলল বিধবা, চোখ জোড়া কিন্তু পড়ে আছে কাউণ্টের পিঠে, কিছু না ভেবে মনে মনে হিসেবে করছে তাঁর কোটটা বানাতে ক'গজ সোনালি জরি লেগেছে। 'বেড়ে লোক

আপনি! কথা দিয়েছিলেন আমাকে স্লেজে চাপিয়ে বেড়াতে নিয়ে যাবেন, আর কিছু চকোলেট আনবেন।'

'কিন্তু আমি তো এসেছিলাম, আন্না ফিওদরভ্‌না। আপনি বাড়ি ছিলেন না। বাজারের সেরা এক বাক্স চকোলেট রেখে গিয়েছিলাম,' বলল ছোকরাটি, লম্বা হলেও তার গলাটি মেয়েলি, তীক্ষ্ন।

'আপনি সব সময়ে ছুতো খুঁজে বের করেন। চাই না আপনার চকোলেট। দেখুন, এটা মনে করবেন না যে...'

'দেখছি আমার প্রতি আপনার সুর বদলেছে, আন্না ফিওদরভ্‌না, আর কেন তাও জানি! এটা কিন্তু আপনার খুব অন্যায়,' ছোকরাটি বলল। মনে হল আরো কিছু বলার আছে, কিন্তু উত্তেজনায় ঠোঁট এত কাঁপতে লাগল যে মুখে কথা জোগাল না।

তার কথায় কান না দিয়ে তুর্বিনকে একমনে দেখতে লাগল আন্না ফিওদরভ্‌না।

গৃহকর্তা মার্শালের চেহারাটি সম্ভ্রান্ত; দন্তহীন মোটাসোটা বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি কাউণ্টের কাছে গিয়ে হাত ধরে বললেন ইচ্ছে করলে তিনি পড়ার ঘরে গিয়ে ধূম ও মদ্য পান করতে পারেন। তুর্বিন বেরিয়ে যেতেই আন্না ফিওদরভ্‌নার মনে হল বল-ঘরটায় আর কিছু করার নেই; একটি রোগাসোগা আইবুড়ী বান্ধবীর হাত ধরে সে গেল সাজ-ঘরে।

'কী, ওকে মনে ধরেছে?' জিজ্ঞেস করল আইবুড়ীটি।

'মাগো, কী ভাবে যে পেছনে লেগে আছে!' আয়নার কাছে গিয়ে তাকিয়ে দেখতে দেখতে বলল আন্না ফিওদরভ্‌না।

তার মুখ জ্বলজ্বলে, চোখে হাসি, এমন কি আরক্ত হয়ে উঠল সে, হঠাৎ নির্বাচনের সময়ে দেখা ব্যালে-নাচিয়েদের নকল করে

পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে ঘুরপাক খেল একটা, তারপর ভরাট গলায় মিষ্টি হেসে গোড়ালি তুলে লাফ দিল একটা।

'আর জান? আমার কাছে একটা স্মৃতিচিহ্ন চেয়েছে,' বলল বান্ধবীকে। 'কিন্তু ও পাবে না এ-ক-টি জিনিসও!' কনুই পর্যন্ত লম্বা নরম চামড়ার দস্তানায় ঢাকা একটা আঙুল তুলে শেষের দুটো কথা বলল সুর করে...

যে পড়ার ঘরে তুর্বিনকে নিয়ে গেলেন মার্শাল সেখানে নানা রকমের ভোদকা, লিকিওর, শ্যাম্পেন ও রেকাবী ভর্তি আনুষঙ্গিক খাবার। তামাকের ধোঁয়ায় ঝাপসা ঘর, স্থানীয় বাবু সম্প্রদায়ের লোকেরা বসে বা এদিক-ওদিক পায়চারি করে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা চালিয়েছে।

'আমাদের উয়েজ্‌দের* অভিজাতবর্গ ওঁকে নির্বাচিত করে সম্মান দেখিয়েছে বলে,' ইতিমধ্যে সুরাপানে বেশ বিচলিত, নব-নির্বাচিত পুলিস ক্যাপ্টেন বলছিল, 'সবায়ের সামনে কাজে ফাঁকি দেবার কোনো অধিকার ছিল না ওঁর, কখনো ছিল না...'

কাউণ্টের আবির্ভাবে আলোচনায় বাধা পড়ল। আলাপ করার জন্য সবাই দাঁড়াল; পুলিস ক্যাপ্টেনটি সবিশেষ হৃদ্যতায় তাঁর করমর্দন করে বার বার সনির্বন্ধ অনুরোধ করতে লাগল যেন তিনি বল-নাচের পর নতুন হোটেলে তার দেওয়া সাপার পার্টিতে যোগ দেন, সেখানে গাইবে জিপসী কোরাস। নিশ্চয় যাবেন বলে কাউণ্ট কয়েক গেলাস শ্যাম্পেন পান করলেন তার সঙ্গে।

* উয়েজ্‌দ্‌ — রাশিয়ায় প্রশাসনিক অঞ্চলের নাম; সমতুল্য আমাদের 'জেলা'। বিপ্লবের পরেও কিছুদিন পর্যন্ত এই সব প্রশাসনিক বিভাগ বলবৎ ছিল, পরে অবশ্য সব ঢেলে সাজানো হয়। — সম্পাঃ

'কিন্তু আপনারা নাচছেন না কেন?' ঘর ছেড়ে বাইরে যেতে গিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'আমরা নাচিয়ে নই,' হেসে বলল পুলিস ক্যাপ্টেন। 'বোতলের কদর আমাদের কাছে বেশী, কাউণ্ট... ভালো কথা, ওরা সবাই, ছুঁড়ীরা সবাই আমার চোখের সামনে বড়ো হয়েছে, কাউণ্ট। আর কখনোসখনো আমি একোসেজ নাচতে পা বাড়াই, কাউণ্ট... এখনো তার ক্ষমতা ধরি, কাউণ্ট।'

'তাহলে চলুন, এখনি পা বাড়ানো যাক,' বললেন তুর্বিন। 'জিপসীদের কাছে যাবার আগে এখানে বেশ জমিয়ে নেওয়া যাক।'

'চলুন, মশাইরা! গৃহকর্তাকে খুশি করা যাক।'

খাস কামরায় বসে বল-নাচের শুরু থেকে মদ্যপান চলেছিল লালমুখো কয়েকটি জমিদারের। নরম কালো চামড়ার বা সিল্কে বোনা যার যার দস্তানা এ'টে নিয়ে কাউণ্টের সঙ্গে বল-ঘরে যাবার উপক্রম সবে তারা করেছে, এমন সময়ে বাধা দিল গলগণ্ডমার্কা ছোকরাটি, পাণ্ডুর মুখে, কোনোক্রমে অশ্রু চেপে সে এগিয়ে এল তুর্বিনের কাছে।

'ভেবেছেন কাউণ্ট বলে লোকজনকে যত্রতত্র ঠেলা মেরে যাবেন, যেন বাজার এটা,' অতি কষ্টে নিশ্বাস টেনে সে বলল। 'অভদ্র ব্যবহার আর... আর...'

আবার ঠোঁট কে'পে ওঠাতে আপনা থেকে কথার স্রোতে বাধা পড়ল।

'কী!' হঠাৎ ভ্রূকুটি করে চে'চিয়ে উঠলেন কাউণ্ট। 'কী বলছ হে ছোঁড়া!' ছোকরার দুটো হাত চেপে চে'চিয়ে বললেন তিনি, এত জোর মোচড় দিলেন যে অপমানে যতটা নয় ভয়ে টকটকে লাল হয়ে

উঠল তার মুখ। 'আমার সঙ্গে ডুয়েল লড়ার মতলব নাকি? তাই যদি হয়, আমি তৈয়ার!'

সজোরে চেপে ধরা ওর হাত তুর্বিন ছেড়ে দিতেই দুটি ভদ্রলোক ছোকরার হাত ধরে নিয়ে গেল পিছনের দরজায়।

'আপনার মাথা বিগড়ে গেছে নাকি? বেজায় টেনেছেন নিশ্চয়। বলে দেব আপনার বাবাকে। কী হয়েছে আপনার?' তারা জিজ্ঞেস করল।

'নেশা হয় নি, কিন্তু ও লোককে খালি ঠেলে সরিয়ে দেয়, মাফ পর্যন্ত চায় না। লোকটা শুয়োর, একেবারে শুয়োর!' প্রকাশ্যে কেঁদে ফেলে বলল ছোকরাটি।

কিন্তু ওর কথায় কান না দিয়ে বাড়ি নিয়ে গেল ওকে।

'যাক গে, কাউণ্ট,' তুর্বিনকে বুঝিয়ে বলল পুলিস ক্যাপ্টেন ও জাভাল্‌শেভ্‌স্কি। 'ও তো পুঁচকে ছোঁড়া, এখনো উত্তমমধ্যম খায়। বয়স মাত্র ষোলো। কী জানি কী ঢুকেছে ওর মাথায়। খেপা কুকুরে কামড়েছে নিশ্চয়। ওর বাবা অত্যন্ত মানী লোক — আমাদের ক্যান্ডিডেট।'

'অপমানের প্রতিশোধ না চায়, বেশ, গোল্লায় যাক।'

ফের বল-ঘরে গিয়ে ঠিক আগেকার মতো ফুর্তিতে কাউণ্ট সুন্দরী ছোটখাটো বিধবাটির সঙ্গে একোসেজ নাচলেন, পড়ার ঘর থেকে তাঁর সঙ্গে আসা ভদ্রলোকদের নাচ দেখে হাসলেন প্রাণ খুলে, আর নাচের জুড়িদের ভিড়ে পা হড়কে পুলিস ক্যাপ্টেন সটান পড়ে যাওয়াতে এমন একটা হুংকার দিলেন যে সারা বল-ঘরটা গমগম করে উঠল।

৫

কাউণ্ট পড়ার ঘরে গেলেন যখন তখন তাঁর প্রতি উদাসীন হবার ভান করা উচিত এই ভেবে আন্না ফিওদরভ্‌না ভাই-এর কাছে গিয়ে নিস্পৃহ স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা দাদা, আমার সঙ্গে যে হুসারটি নাচল, কে সে?' অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার যথাসাধ্য তাকে বোঝালেন কত মহান লোক হল এই হুসার, এও জানালেন যে, শুধু পথে টাকা চুরি গেছে বলে সহরে থেকে গিয়ে ও এসেছে বল-নাচে; তিনি নিজে একশ রুবল ধার দিয়েছেন বটে কাউণ্টকে, কিন্তু সেটা অত্যন্ত সামান্য, বোন কি আরো দুশ রুবল ধার দিতে পারে! সঙ্গে সঙ্গে বললেন যেন কথাটা কাউকে না বলে, বিশেষ করে কাউণ্টকে। সেদিনই টাকাটা ভাইকে পাঠিয়ে দেবার আর বিষয়টা গোপন রাখার কথা দিল আন্না ফিওদরভ্‌না, কিন্তু একোসেজটা নাচবার সময় যত দরকার তত টাকা দেবার কথাটা কাউণ্টকে নিজে বলার অদম্য ইচ্ছে হল তার। কিছু সময় গেল বলার সাহসটা আনায়, লাল হয়ে উঠে ইতস্ততঃ করে অবশেষে বহু কষ্টে কথাটি তুলল।

'দাদা বলল পথে আপনার বিপদ ঘটেছিল, কাউণ্ট; আর এখন আপনার হাতে টাকা নেই। দরকার হলে আমার কাছ থেকে নেবেন কি? নিলে অত্যন্ত সুখী হব।'

কথাগুলো বলেই কেন জানি ঘাবড়িয়ে লাল হয়ে উঠল আন্না ফিওদরভ্‌না। কাউণ্টের মুখ থেকে আনন্দের দীপ্তি দপ্‌ করে নিভে গেল।

'আপনার দাদাটি নিরেট মূর্খ!' রূঢ়ভাবে তিনি বললেন। 'জানেন তো, পুরুষ পুরুষকে অপমান করলে ডুয়েল লড়া হয়। কিন্তু কোনো মেয়ে পুরুষকে অপমান করলে কী হয়, জানেন?'

বেচারী আন্না ফিওদরভ্না অনুভব করল লজ্জায় তার গলা আর কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠেছে। চোখ নামিয়ে একটিও কথা বলল না সে।

'মেয়েটিকে চুমু খাওয়া হয় প্রকাশ্যে,' কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন কাউন্ট। 'দিন, আপনার হাতে চুমু খাই,' বেশ কিছুক্ষণ থেমে তিনি বললেন নরম গলায়, মহিলাটির বিড়ম্বনায় করুণা হল তাঁর।

'ও, কিন্তু এখন নয়,' গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল আন্না ফিওদরভ্না।

'কখন? কাল তো সকাল সকাল চলে যাব... তাছাড়া, ওটা তো আপনার কাছে পাওনা।'

'কিন্তু এই অবস্থায় পারা যায় না,' মৃদু হেসে আন্না ফিওদরভ্না বলল।

'তাহলে আজকেই আপনার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ দিন, আপনার হাতে চুমু খাব। সুযোগটা নিজে করে নেব।'

'কী করে?'

'সেটা আপনার ব্যাপার নয়। আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে সবকিছু করতে পারি। কী বলুন? ঠিক তো?'

'বেশ।'

শেষ হল একোসেজ। আর একটি মাজুর্কা নাচা হল আর রুমাল লুফে ধরে, এক হাঁটুতে বসে ওয়ারশ-র সেই বিশেষ কায়দায় দুই পায়ের জুতোর কাঁটা ঠুকে কাউণ্ট এমন অদ্ভুত সব কসরৎ দেখালেন যে তাদের টেবিল ছেড়ে বুড়োরা এল নাচ দেখতে, হার স্বীকার করলেন সেরা নাচিয়ে সেই অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারটি। সাপার খাওয়া হল। নাচা হল 'ঠাকুর্দা' নাচ, বিদায়

নিতে শুরু করল অতিথিরা। সারা সময়টা ছোটখাটো বিধবাটির মুখ থেকে একবারও চোখ সরান নি কাউণ্ট। তিনি যে বলেছিলেন বরফের ফাটলে তার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে তৈয়ার কথাটি মিছে নয়। খেয়াল হোক, প্রেম হোক, কি একগুঁয়েমী হোক তাঁর মনপ্রাণ সে সন্ধ্যায় একটিমাত্র বাসনায় সংহত — মেয়েটির সঙ্গে দেখা করা, তাকে ভালোবাসা। আন্না ফিওদরভ্না গৃহকর্ত্রীর কাছে বিদায় নিচ্ছে দেখে তিনি চাকরের ঘরে এক ছুটে গেলেন, ওভারকোট না পরে সেখান থেকে দৌড়লেন উঠোনে যেখানে গাড়ি-গুলো দাঁড়িয়ে।

'আন্না ফিওদরভ্না জাইৎসেভার গাড়ি আনো!' হাঁকলেন তিনি। অলিন্দের দিকে এগোল লণ্ঠন দেওয়া চার সীটের একটা উঁচু গাড়ি। 'থাম!' হাঁটু পর্যন্ত বরফ, গাড়ির দিকে দৌড়ে যেতে যেতে বললেন কোচম্যানকে।

'কী চাই?' ফিরে জিজ্ঞেস করল সে।

'ভেতরে ঢুকব,' চলতি গাড়ির দরজা খুলে ওঠবার চেষ্টা করতে করতে জবাব দিলেন কাউণ্ট। 'থাম বলছি, গর্দভ কোথাকার!'

সামনের ঘোড়াজোড়ার চালককে হেঁকে কোচম্যান বলল, 'থাম, ভাস্কা!' ঘোড়াগুলোর লাগাম টেনে ধরল। 'অন্য লোকের গাড়িতে ঢুকতে যাবেন কেন? এ গাড়িটা শ্রীমতী আন্না ফিওদরভ্নার, আপনার তো নয়, হুজুর।'

'চুপ, আহাম্মক কোথাকার! এই নে একটা রুবল, নেমে দরজাটা বন্ধ করে দে তো দেখি,' বললেন কাউণ্ট। কিন্তু কোচম্যান নড়ল না দেখে তিনি নিজেই পাদানিটা তুলে নিয়ে জানলা খুলে কোনক্রমে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিলেন। ভিতরে ছাতা-পড়া একটা গন্ধ পোড়া লোমের কুচির, অন্য সব পুরনো গাড়িতে যেমন, বিশেষ

করে যাদের গদি ইত্যাদিতে সোনালি জরির কাজ করা। পাতলা বুট আর ব্রিচেসে ঢাকা কাউণ্টের পাদুটো হাঁটু পর্যন্ত ভিজে বরফে সিক্ত হয়ে যাওয়াতে ঠাণ্ডায় কনকন করছে, বাস্তবিক সমস্ত শরীর ঠকঠক করে কাঁপছে। ওপরে নিজের সীটে বসে কোচম্যানের গজগজানি, মনে হল নামার উপক্রম করছে। কিন্তু কাউণ্ট যেন বধির, কোনো অনুভূতি নেই। মুখটা জ্বলছে, হাতুড়ির মতো পিটছে বুক। হলদে চামড়ার পেটিটা আঁকড়ে ধরে পাশের জানলা দিয়ে মাথা বের করে দিলেন, একটি প্রত্যাশায় সমস্ত জীবন তাঁর সংহত। বেশীক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হল না। বারান্দায় কে যেন হাঁকল, 'শ্রীমতী জাইৎসেভার গাড়ি নিয়ে এসো!' আস্তে লাগাম আছড়াল কোচম্যান, উঁচু স্প্রিং-এ দুলে উঠল গাড়িটা, আর বাড়ির আলো-ভরা জানলাগুলো একটার পর একটা পেরিয়ে গেল গাড়ির জানলা।

'দেখ বাবা, আর্দালিকে বলিস না যেন আমি এখানে, বেটা বদমাস,' কোচম্যানের দিকের জানলা দিয়ে মাথা বের করে বললেন কাউণ্ট। 'বললে চাবকাব, না বললে আরো দশ রুবল।'

জানলাটা দড়াম করে বন্ধ করতে না করতে গাড়িটা একবার টাল খেয়ে থেমে গেল। গাড়ির কোণে গুটিশুটি হয়ে বসে, নিঃশ্বাস চেপে এমন কি চোখ বুজে ফেললেন কাউণ্ট, তাঁর তীব্র প্রত্যাশা যদি ব্যাহত হয় কোনো কারণে সে ভয়টা এত প্রবল। দরজাটা খুলে গেল, পাদানির ধাপ বসানোর শব্দ একের পর এক, মেয়েলি গাউনের খসখস, ছাতার গন্ধওয়ালা গাড়িটাতে ভেসে এল যুঁইফুলের গন্ধ, সিঁড়ির ধাপে ছোট ছোট পায়ের হালকা আওয়াজ, আর আন্না ফিওদরভ্না নিজের কোটের প্রান্তে কাউণ্টের পা ঘষটে রুদ্ধশ্বাসে নিঃশব্দে বসে পড়ল তাঁর পাশের সীটটায়।

কাউণ্টকে সে দেখেছিল কিনা কেউ হলপ করে বলতে পারে না, এমন কি সে নিজেও না। কিন্তু যখন তিনি তার হাত ধরে বললেন, 'এবার তাহলে আপনার করকমলে চুমো খাই,' — তখন তার ভীতি বিশেষ দেখা গেল না, কোনো কথা বলল না সে, হাতও টেনে নিল না, আর তক্ষুণি দস্তানার বেশ ওপরে তার বাহু চুমোয় চুমোয় ভরে গেল। চলতে শুরু করল গাড়ি।

'কিছু একটা বলুন। চটেন নি তো?' কাউণ্ট জিজ্ঞেস করলেন।

উত্তরে সে কেবল বসল আরো কোণ ঘেঁষে কিন্তু হঠাৎ, কেন জানি কেঁদে উঠে মাথা গুঁজল কাউণ্টের বুকে।

৬

নব-নির্বাচিত পুলিস ক্যাপ্টেন ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ, অশ্বারোহী বাহিনীর সেই অফিসার ও অন্যান্য বাবুরা বেশ কিছুক্ষণ ধরে নতুন হোটেলে বসে জিপসীদের গান শুনেছে ও মদ্যপান করেছে, এমন সময়ে কাউণ্ট এসে যোগ দিলেন। তাঁর গায়ে ভালুক-লোমের আস্তরণ দেওয়া নীল রঙের একটি বনাতের ক্লোক; আন্না ফিওদরভ্‌নার বিগত স্বামীর সম্পত্তি ছিল জিনিসটা।

'এই যে হুজুর, আপনার আশা আমরা ছেড়ে দিয়েছিলাম বলতে গেলে!' কাউণ্টের কোট খোলার জন্য প্রবেশপথের দরজায় দৌড়ে যেতে যেতে, শাদা দাঁতের ঝলকে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বলল একটি কালো চুল টেরা চোখ জিপসী। 'লেবেদিয়ানের পর থেকে আপনার সঙ্গে আর মুলাকাত হয় নি... স্তেশা তো আপনার জন্য হেদিয়ে মরছে...'

ছুটতে ছুটতে স্তেশাও এল দেখা করার জন্য। সুঠাম কমবয়সী জিপসী মেয়েটির বাদামি গালে উষ্ণ রক্তাভা, গভীর কালো চোখের জ্বালাময়ী দীপ্তি দীর্ঘ আঁখি পল্লবের ছায়ায় স্নিগ্ধ।

'এই যে, আমাদের কাউণ্টবাহাদুর এসেছেন! পেয়ারের কাউণ্ট আমাদের! কী মজা!' খুশিতে হেসে চাপা গলায় বলল সে।

তাঁকে দেখে খুশির ভান করে এমন কি ইলিউশকা ছুটে এল দেখা করার জন্য। যত বুড়ী আর মাঝবয়সী মেয়ে আর ছুঁড়ীরা লাফিয়ে উঠে ছেঁকে ধরল তাঁকে। কারো কারো ধারণা যে তারা তাঁর বিশেষ পেয়ারের লোক, আবার কেউ কেউ ভাবে যে ক্রুশ বিনিময় করেছেন বলে তিনি তাদের দোস্ত।

সোমত্ত জিপসী মেয়েদের প্রত্যেকের ঠোঁটে চুমু খেলেন তুর্বিন, জিপসী বুড়ী আর পুরুষেরা চুমু খেল তাঁর কাঁধে আর হাতে। তিনি আসাতে জমিদারবাবুরাও অতিশয় খুশি, আরো বেশি করে খুশি এইজন্য যে চরমে পেঁৗছিয়ে এখন ভাঁটার দিকে চলেছে হৈহুল্লোড়। অতি মাত্রায় পানভোজনের পরের অরুচি বোধ করতে শুরু করেছে সবাই। স্নায়ুর উত্তেজনা ঘটাবার শক্তি আর নেই মদের, পাকস্থলীর বিড়ম্বনা ঘটাচ্ছে শুধু। ক্ষমতায় যতখানি কুলোয় ততখানি ফুর্তি করে নিয়ে অতিথিরা এখন এ-ওর কাছে একঘেয়ে হয়ে গেছে। সবকটা গান গাওয়া সারা, মাথায় তালগোল পাকিয়ে সেগুলো আনছে শুধু বিশৃংখলা আর অপচয়ের একটা ছাপ। কসরৎ যত অভিনব বা দুঃসাহসী হোক, সবাই টের পেয়েছে যে এতে আর মজা পাওয়া ভার। একটা বুড়ীর পদতলে মেঝেতে বেঢপভাবে শুয়ে আছে পুলিস ক্যাপ্টেন।

'শ্যাম্পেন!..' পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'কাউণ্ট এসেছেন!.. শ্যাম্পেন!.. উনি এসেছেন!.. লেয়াও শ্যাম্পেন!.. চৌবাচ্চা শ্যাম্পেনে

ভরে নাইব আমি... অভিজাত মহোদয়গণ! আপনাদের মতো মহোদয়দের সঙ্গ আমার কী ভালোই না লাগে!.. স্তেশা! ধরো তো 'পায়ে চলা পথ' গানটা!'

তারি মতো নেশা ধরেছে অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারের, কিন্তু তাঁর চেহারাটা অন্য রকম। সোফার একপাশে, লিউবাশা নামের একটি দীর্ঘাঙ্গী রূপসী জিপসী মেয়ের খুব কাছ ঘে'ষে বসে তিনি চোখ পিটপিট করে মাথা ঝাঁকাচ্ছেন ঘোরটা কাটানোর জন্য, আর ঘ্যানর ঘ্যানর করে বারবার তাকে ফিসফিসিয়ে সাধছেন তাঁর সঙ্গে পালিয়ে যেতে। মৃদু হেসে লিউবাশা শুনছে তাঁর কথা, যেন তিনি যা বলছেন সেটা একাধারে অত্যন্ত মজার আর একটু করুণ, মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে সামনের চেয়ারের পেছনে দাঁড়ানো তার স্বামী টেরা চোখ সাশ্‌কার দিকে। অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারের প্রেম নিবেদনের উত্তরে ঝুঁকে লিউবাশা তাঁর কানে কানে অনুরোধ জানাল যেন তিনি কিছু ফিতে আর সেণ্ট কিনে দেন, কিন্তু কেউ টের না পায় যেন।

'হুর্‌রে!' কাউণ্ট ঘরে আসাতে চে'চিয়ে উঠলেন অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার।

সেই সুদর্শন যুবাটি তখন মুখে উৎকণ্ঠার ভাব এনে অস্বাভাবিক দৃঢ় পায়ে পায়চারি করতে করতে গুনগুন করে গাইছে 'হারেমে বিদ্রোহের' একটি সুর।

বাড়ির কর্তাব্যক্তি একটি বৃদ্ধ বাবুদের সনির্বন্ধ অনুরোধে লোভে পড়ে এসেছিলেন জিপসীদের এখানে, তাঁকে ওরা বলে যে তিনি না এলে জমবে না মোটে, তাহলে ওদের বরং থেকে যাওয়া ভালো। পে'ছিনোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাত পা ছড়িয়ে সোফায় শুয়ে আছেন, আর কেউ তাঁকে নজর দিচ্ছে না একেবারে। একটি

রাজকর্মচারী ফ্রক-কোট খুলে পা টেবিলে রেখে বসে আছে, নিজে কী রকম হুল্লোড়ে সেটা দেখাবার জন্য মাথার চুল বিস্রস্ত করে দিয়েছে। কাউণ্ট ঘরে ঢুকতেই সে সার্টের কলার খুলে টেবিলে আরো একটু উঁচু হয়ে গ্যাঁট হয়ে বসল। কাউণ্ট আসার পর মোটের ওপর দলটা আগেকার চেয়ে সজীব হয়ে উঠল।

এতক্ষণ অলসভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল জিপসীরা, তারা এখন আবার গোল হয়ে বসল। একলা-গাইয়ে স্তেশাকে কোলে বসিয়ে কাউণ্ট হুকুম দিলেন আরো শ্যাম্পেনের।

ইলিউশ্‌কা গিটার হাতে স্তেশার সামনে দাঁড়িয়ে 'প্লিয়াসকা' শুরু করল, তার অর্থ হল একটা নির্দিষ্ট পালায় 'রাস্তা দিয়ে যখনি চলে', 'ওহে হুসার বাহাদুর...' আর 'কানে শোনো, মনে বোঝো...' গোছের সব জিপসী গান। চমৎকার গাইল স্তেশা। ওর গমকে আসা ভরাট মিহি নমনীয় গলা, মন ভোলানো হাসি, বাসনাতীব্র হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি, গানের তালে আপনা থেকে তাল ঠোকা ছোট পা, কোরাসের শুরুতে বন্য স্বল্প চীৎকার — সবকিছু মিলিয়ে নাড়া দিল মনের একটি তারে যেটি জমাট কিন্তু যেটি বাজে ক্বচিৎ কখনো। বোঝা যায় যে, যা কিছু ও গায় প্রাণ ঢেলে গায়। গিটারে সঙ্গত দিতে দিতে ইলিউশ্‌কা গানের সঙ্গে এক হয়ে গেছে, সেটা ধরা পড়ছে পিঠ আর পায়ের ছোট ছোট নড়াচড়ায়, মৃদু হাসিতে, তার সমস্ত সত্তায়; গানের তালে তালে মাথা নাড়তে নাড়তে স্তেশার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুনছে এত মনোযোগে আর এত উৎকণ্ঠায় যেন এর আগে কখনো শোনে নি গানটা। প্রতিবার গানের শেষ সুর মিলিয়ে যেতে খাড়া হয়ে বসে, যেন দুনিয়ার সবকিছুর ঊর্ধ্বে মনে হচ্ছে নিজেকে এমনভাবে সগর্বে ও সজোরে হাঁটু দিয়ে ধাক্কায় গিটারটা তুলে চট করে ঘুরিয়ে দিচ্ছিল

সে আর নিজে মাটিতে পা ঠুকে, চুল পেছনে ঝাঁকিয়ে ভ্রূকুটি করে তাকাচ্ছিল কোরাসের দিকে। তারপর শরীরের সমস্ত পেশীর বিস্তারে আবার নাচের শুরু... আর বেজে ওঠে বিশটি জোরালো বলিষ্ঠ গলা, প্রত্যেকের চেষ্টা সবচেয়ে অভিনব ও স্বকীয়ভাবে সুর মিলিয়ে যাবার। বুড়ীরা চেয়ারে বসে লাফাচ্ছে, রুমাল নাড়াচ্ছে, গানের তালে তালে দাঁত বের করে চেঁচিয়ে ডুবিয়ে দিচ্ছে একে অন্যের কণ্ঠস্বর। চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে, মাথা হেলিয়ে গলার শির ফুলিয়ে ভারি গলা ছেড়ে গাইছে পুরুষেরা।

কোনো সুর উঁচুর দিকে স্তেশা ধরলেই যেন তাকে সাহায্য করার জন্য ইলিউশ্‌কা গিটারটা কাছে ধরছে তার, আর স্তেশার নিচু পর্দার গমক শোনা যাচ্ছে বলে সুদর্শন যুবাটি উচ্ছ্বাসে চেঁচিয়ে উঠছে।

নাচের সুর গাইতে গাইতে দুনিয়াশা এগিয়ে এল, কাঁধ আর বুক তার কাঁপছে, কাউণ্টের সামনে ঘুরপাক দিয়ে ভেসে চলে গেল ঘরের মধ্যিখানে; তখন তুর্বিন লাফিয়ে উঠে জ্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যোগ দিলেন তার সঙ্গে, পায়ের এত কসরৎ দেখালেন যে জিপসীরা এ ওর দিকে তাকিয়ে তারিফ করে হাসতে লাগল।

তুর্কীর মতন পায়ের ওপর পা চাপিয়ে বসে পুলিস ক্যাপ্টেন বুক ঠুকে চেঁচিয়ে উঠল, 'কেয়াবাৎ!' তারপর কাউণ্টের পা চেপে ধরে গোপনে জানিয়ে দিল সে এখানে দু হাজার রুবল নিয়ে এসেছিল, এখন পড়ে আছে মাত্র পাঁচশ, আর কাউণ্ট অনুমতি দিলে তিনি যা চাইবেন তাই করবে। বাড়ির কর্তাব্যক্তিটি জেগে উঠে বললেন বাড়ি যাবেন, কিন্তু যেতে দেওয়া হল না তাঁকে। সুদর্শন যুবাটি একটি জিপসী মেয়েকে অনুনয় বিনয় করল তার

সঙ্গে ওয়াল্‌জ্‌ নাচতে। কাউণ্টের সঙ্গে দোস্তি জাহির করার জন্য উদ্‌গ্রীব অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার নিজের জায়গা থেকে উঠে এসে জড়িয়ে ধরলেন তাঁকে।

বললেন, 'প্রাণের দোস্ত, আমাদের ছেড়ে কেন চলে গিয়েছিলেন, অ্যাঁ?' উত্তর দিলেন না কাউণ্ট, বোঝা গেল তাঁর মন অন্য কিছুতে পড়ে আছে। 'কোথায় গিয়েছিলে? তুমি বাবা ঘুঘু লোক! কোথায় যাওয়া হয়েছিল জানি।'

কী কারণে যেন এই গায়ে-পড়া ভাব ভালো লাগল না কাউণ্টের। না হেসে, কিছু না বলে তিনি কটমট করে তাকিয়ে রইলেন অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারটির মুখে, তারপর হঠাৎ এমন অভদ্র আর অপমানকর খিস্তি শুরু করে দিলেন যে অফিসারটি থতমত খেয়ে ঠিক করতে পারলেন না ব্যাপারটা ইয়ার্কি হিসেবে নেবেন কিনা। শেষ পর্যন্ত ইয়ার্কি ভেবে নিয়েই হেসে তিনি তাঁর জিপসী মেয়েটির কাছে ফিরে গেলেন, আশ্বাস দিতে লাগলেন যে ইস্টারের পর তাকে নির্ঘাৎ সাদি করবেন। গাওয়া হল আর একটি গান, আরো একটি, আরো নাচ চলল, এ-ওর খাতিরে গাইল আবার, সবাই ভাবল সময় কাটছে চমৎকার। শ্যাম্পেনের স্রোত বইল। অনেক খেলেন কাউণ্ট। চোখ ঝাপসা হয়ে এল বটে, কিন্তু পা টলমল করল না, আগের চেয়ে ভালো নাচলেন তিনি, পরিষ্কার গলায় কথা বললেন, যোগ দিলেন জিপসী কোরাসে, আর স্তেশা যখন গাইল 'প্রেমের পাখায় কাঁপন লেগেছে', তখন তানলয় যোগালেন। গানের মাঝখানে হোটেলের মালিক এসে অতিথিদের বলল বিদায় নিতে হবে এবার, কেননা প্রায় ভোর তিনটে হয়ে গেছে।

তার গর্দান ধরে কাউণ্ট হুকুম দিলেন উবু হয়ে বসে আর উঠে একটা নাচ নাচতে। রাজী হল না সে। চট করে একটা

শ্যাম্পেনের বোতল তুলে নিয়ে কাউণ্ট মালিককে ডিগবাজি খাইয়ে অন্যদের তাকে সে অবস্থায় ধরে রাখতে বলে সমস্ত বোতলটা ঢেলে দিলেন তার ওপর, চারিদিকে হাসির হর্‌রা উঠল।

ফরসা হয়ে এসেছে ইতিমধ্যে। কাউণ্ট ছাড়া আর সবাই ফ্যাকাশে আর শ্রান্ত।

'এবার কিন্তু আমার মস্কো যাত্রার সময়,' উঠে পড়ে হঠাৎ তিনি বললেন। 'চলুন মশাইরা, হোটেলে গিয়ে আমাকে এগিয়ে দিন। চা খাওয়া যাবে কিছু।'

বাড়ির কর্তাব্যক্তি সেই ঘুমন্ত বৃদ্ধটি ছাড়া আর সবাই সায় দিল। তাঁকে রেখে যাওয়া হল সেখানে। দরজায় দাঁড়ানো তিনটি শ্লেজে সবাই কোনোক্রমে জায়গা করে নিয়ে চলল হোটেলে।

৭

'ঘোড়া জোতো,' অতিথি ও জিপসীদের সঙ্গে সদলবলে হোটেলের বৈঠকখানায় ঢুকে চেঁচিয়ে বললেন কাউণ্ট। 'সাশ্‌কা! জিপসী সাশ্‌কা নয়, ওহে আমার সাশ্‌কা, ডাক-স্টেশন মাস্টারকে বল যে বাজে ঘোড়া দিলে শরীরে আর ছাল চামড়া আস্ত থাকবে না। আর লেয়াও চা! জাভাল্‌শেভ্‌স্কি, চায়ের ব্যবস্থা করো, ইতিমধ্যে ইলিনের ঘরে গিয়ে দেখে আসি ওর হালৎ কেমন,' বলে করিডরে বেরিয়ে গিয়ে উলানের ঘরের দিকে চললেন তুর্বিন।

সবে খেলা শেষ করেছে ইলিন। শেষ কপর্দকটুকু পর্যন্ত হেরে ঘোড়ার লোমের ছেঁড়া সোফাটাতে উবুড় হয়ে শুয়ে একটা একটা করে লোমের কুচি টেনে বের করে মুখে দিয়ে কামড়ে থুতু করে

ফেলে দিচ্ছে। তাস ছড়ানো একটা টেবিলে দুটো মোমবাতি, একটা একেবারে জ্বলে গিয়ে পেঁাছেছে কাগজ পর্যন্ত; বাতিগুলোর শিখা অসহায়ভাবে পাল্লা দিচ্ছে জানলা থেকে আসা ভোরের আলোর সঙ্গে। উলানী সেনার মন থেকে সব চিন্তা উধাও, জুয়ার ঘোরের ঘন কুয়াশায় চাপা পড়েছে সমস্ত মানসিক বৃত্তি; এমন কি অনুশোচনার বোধ পর্যন্ত তার নেই। একবার ভেবে দেখার চেষ্টা করল — অতঃকিম, কপর্দকহীন অবস্থায় কী করে জায়গাটা ছেড়ে যাবে। রেজিমেণ্টের পোনেরো হাজার রুবল ফেরৎ দেবে কেমন করে, রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার কী বলবেন, কী বলবেন মা, বন্ধুবান্ধবেরাই বা কী বলবে — আর সঙ্গে সঙ্গে এত ভয় পেল, এত বিতৃষ্ণা হল নিজের প্রতি যে, সবকিছু মন থেকে মুছে ফেলার জন্য তড়াক করে উঠে পায়চারি শুরু করল, মেঝের তক্তার ফাটলগুলোর ওপর যাতে পা পড়ে সযত্নে সে দিকে নজর রেখে। আর একবার চুলচেরাভাবে ভেবে দেখল খেলার সমস্ত খুঁটিনাটি। স্পষ্ট মনে পড়ল একবার প্রায় জিতেছিল আর একটু হলে — হাতে এসেছিল একটা নলা আর ইস্কাপনের সাহেব, বাজি রেখেছিল দু হাজার রুবল: ডাইনে — রাণী, বাঁয়ে — টেক্কা; ডাইনে রুইতনের সাহেব, আর সব খতম। ছক্কাটা ডাইনে আর রুইতনের রাজাটা বাঁয়ে থাকলে হারের টাকা সব উশুল হত, আর সবকিছু বাজি ধরে জিতে নিত আরো পোনেরো হাজার রুবল। তাহলে রেজিমেণ্ট কমাণ্ডারের কাছ থেকে কেনা যেত একটা ভিন্ন চালের ঘোড়া, তাছাড়া আরো দুটো ঘোড়া, আর একটা ফিটন! তারপর কী? সত্যি সত্যি বেড়ে হত তাহলে!

আবার সোফায় শুয়ে পড়ে লোমের কুচি চিবোতে লাগল সে।

"সাত নম্বর ঘরে ওরা গাইছে কেন?" ভাবল। "তুর্বিনের ঘরে ফুর্তি চলেছে নিশ্চয়ই। ওখানে গিয়ে দলে ভিড়ে মাতাল হয়ে গেলে হয়।"

ঠিক সে সময়ে ঘরে ঢুকলেন কাউণ্ট।

'কী, সবকিছু সাফ করে নিয়েছে তো?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"মটকা মেরে থাকব," ইলিন ভাবল। "নইলে কথা বলতে হবে, অথচ ঘুম পাচ্ছে।"

কিন্তু তুর্বিন কাছে এসে মাথায় হাত বোলালেন।

'তাহলে, দোস্ত, সবকিছু সাফ করে নিয়েছে তো? সব গেছে? কথা বলো!' জবাব দিল না ইলিন।

হাত ধরে টানলেন কাউণ্ট।

'হ্যাঁ, হেরেছি। তাতে তোমার কী!' ঘুম-জড়ানো সুরে বিরক্তি আর উদাসীনতা প্রকাশ করে বিড়বিড় করে বলল ইলিন, পাশ ফিরল না পর্যন্ত।

'সব গেছে?'

'হ্যাঁ। তাতে হয়েছে কী? সবকিছু। তাতে তোমার কী?'

'শোনো, বন্ধুর মতো সত্যি কথাটা বলো তো আমাকে,' বললেন কাউণ্ট। মদে তাঁর মনে জেগেছে কোমল সব ভাব, ইলিনের মাথায় তিনি হাত বোলাতে লাগলেন। 'সত্যি তোমার প্রেমে পড়ে গিয়েছি। খুলে ঠিক বলো তো: রেজিমেণ্টের টাকা খুইয়ে থাকলে তোমাকে বাঁচাব, সময় থাকতে বলো রেজিমেণ্টের টাকা ছিল?'

সোফা থেকে তড়াক করে নেমে পড়ল ইলিন।

'সত্যি কথা যদি শুনতে চাও তাহলে এমনভাবে কথা বলো না, যেন আমি... যেন আমি... তাহলে দয়া করে কোনো কথাই

বলো না। আমার একমাত্র পথ হল গুলিতে মাথার খুলি উড়িয়ে দেওয়া!' হাতে মাথা গুঁজে কেঁদে ফেলে গভীর হতাশায় চেঁচিয়ে উঠল সে, যদিও মুহূর্তখানেক আগে স্বপ্ন দেখছিল ভিন্ন চালের ঘোড়ার।

'উঃ, একেবারে খুকির মতো! এরকম হালৎ কার না হয়েছে! *কিস্সু না, সবকিছু ঠিক করে দেওয়া যাবে। আমার জন্য এখানে* অপেক্ষা করো।'

বেরিয়ে গেলেন কাউন্ট।

'কোনো ঘরে জমিদার লুখ্নভ থাকেন?' জিজ্ঞেস করলেন ছোকরা-চাকরকে।

ছোকরা বলল দেখিয়ে দেবে ঘরটা। লুখ্নভের খাস চাকর আপত্তি জানিয়ে বলল কর্তা সবে ঘরে ঢুকে কাপড়চোপড় ছাড়ছেন, কিন্তু তাতে কর্ণপাত না করে কাউন্ট ভেতরে গেলেন। ড্রেসিং-গাউন পরে টেবিলের ধারে বসে লুখ্নভ সামনে গাদা-করা ব্যাংক-নোট গুনছিল। টেবিলে তার অত্যন্ত প্রিয় রাইনের মদ এক বোতল। তাসে জেতার ফলে নিজেকে তোয়াজ করার অনুমতি দিয়েছে সে। চশমার ফাঁক দিয়ে কঠিন নিস্পৃহ দৃষ্টিতে কাউণ্টের দিকে তাকাল লুখ্নভ, যেন চেনে না তাঁকে।

দৃঢ় পদক্ষেপে টেবিলের কাছে গিয়ে কাউন্ট বললেন, 'মনে হচ্ছে আমায় চিনতে পারছেন না।'

'আপনার কী সেবায় লাগতে পারি?' চিনতে পেরে জিজ্ঞেস করল লুখ্নভ।

'আপনার সঙ্গে তাস খেলতে চাই,' সোফায় বসে বললেন তুর্বিন।

'এখনি?'

'হ্যাঁ।'

'অন্য কোনো সময়ে অত্যন্ত খুশি হব কাউণ্ট, কিন্তু এখন আমি ক্লান্ত, শুতে যাচ্ছিলাম। একটু মদ খাবেন? চমৎকার মদ।'

'আমি এখনি একটু খেলতে চাই।'

'আজ আর খেলার কোনো ইচ্ছে নেই। অন্য ভদ্রলোকদের কেউ কেউ হয়ত আপনার সঙ্গে খেলবেন, আমি খেলব না কাউণ্ট। আশা করি মাফ করবেন।'

'তাহলে আপনি খেলবেন না?'

কাউণ্টের ইচ্ছেমত খেলতে পারছে না বলে দুঃখিত, সেটা বোঝাবার জন্য কাঁধ অল্প ঝাঁকাল লুখ্‌নভ।

'কোনোমতেই খেলবেন না?'

আবার কাঁধের অল্প ঝাঁকুনি।

'আপনাকে অত্যন্ত অনুরোধ করছি... খেলবেন, না খেলবেন না?'

কোনো সাড়া নেই।

'খেলবেন?' আবার বললেন কাউণ্ট। 'দেখুন!'

তবু চুপ করে রইল লুখ্‌নভ, চট করে চশমার ওপর দিয়ে তাকাল কাউণ্টের কালো হয়ে আসা মুখে।

'খেলবেন?' চেঁচিয়ে উঠে কাউণ্ট টেবিলে এত জোরে একটা ঘুঁষি লাগালেন যে রাইন মদের বোতলটা পড়ে গেল, উপছে বেরিয়ে এল মদ। 'আপনি তো ঠকিয়ে জিতেছেন। খেলবেন? বারবার তিন বারের মতো জিজ্ঞেস করছি।'

'বলেছি তো খেলব না। আপনার ব্যবহারটা অদ্ভুত, কাউণ্ট! বাড়ি চড়াও হয়ে গলা কাটার ভয় দেখানো ভদ্রতা নয়।' চোখ না তুলে মন্তব্য করল লুখ্‌নভ।

অল্প কিছুক্ষণ চুপচাপ। ক্রমশঃ শাদা হয়ে যেতে লাগল কাউণ্টের মুখ। হঠাৎ মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাতে হতভম্ব হয় গেল লুখ্‌নভ। টাকাগুলো আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে সোফায় পড়ে গিয়ে এমন বুনো ও তীক্ষ্ন সুরে চেঁচিয়ে উঠল যেটা তার মতো সদা ধীরস্থির ও ভব্য মানুষের কাছ থেকে একেবারে অপ্রত্যাশিত। টেবিলের বাকি টাকাগুলো তুলে নিলেন তুর্বিন, প্রভুর চীৎকার শুনে ছুটতে ছুটতে এসেছিল খাস চাকরটা, তাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে তুর্বিন দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

'যদি অপমানের প্রতিশোধ চান, তাহলে আমি তৈয়ার, আরো আধ ঘণ্টা ঘরে থাকব,' দরজায় ফিরে এসে বললেন কাউণ্ট।

'চোর! বদমাস!' ঘরের ভেতর থেকে কথাগুলো এল। 'আদালতে মোকাবিলা হবে এর!'

সব ঠিক করে দেবেন বলে কাউণ্ট যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাতে মনোযোগ দেয় নি ইলিন, তখনো সোফায় শুয়ে আছে সে, হতাশার কান্নায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। মনে ভিড় করে আসা নানা ধরনের অদ্ভুত ভাবকে ভেদ করে কাউণ্টের স্নিগ্ধ দরদ তার মনে জাগিয়েছিল নিজের দুরবস্থার উপলব্ধি, আর সে ভাবটা তখনো কেটে যায় নি। আশায় ভরপুর যৌবন, আত্মসম্মান, বন্ধুবান্ধবদের খাতির, প্রেম ও বন্ধুত্বের স্বপ্ন — চিরতরে বিদায় নিয়েছে সব। অশ্রুর উৎস শুকিয়ে আসছে ক্রমশঃ, অত্যন্ত ধীর একটা হতাশার বোধ ক্রমশঃ দৃঢ়ভাবে তাকে আচ্ছন্ন করছে, ক্রমশঃ নাছোড়বান্দাভাবে মনে আসছে আত্মহত্যার চিন্তা, সে চিন্তায় বিভীষিকা ও বিতৃষ্ণার বোধ আর নেই। এ সময়ে কানে এল কাউণ্টের পায়ের বলিষ্ঠ শব্দ।

তুর্বিনের মুখে তখনো ক্রোধের রেশ লেগে আছে, অল্প কাঁপছে হাত, কিন্তু চোখে সদয় মেজাজের, আত্মসন্তোষের একটা দীপ্তি।

'এই যে, জিতে আদায় করে নিয়েছি,' একতাড়া নোট টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে তিনি বললেন। 'গুনে দেখো সব আছে কিনা। আর তাড়াতাড়ি এসো বৈঠকখানায়, আমি শিগ্গিরই চলে যাচ্ছি,' আরো বললেন তিনি, ফৌজী উলানের মুখে আনন্দ আর কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস না দেখার ভান করে। একটা জিপসী সুর শিস দিতে দিতে বেরিয়ে গেলেন।

৮

কোমরবন্ধটা শক্ত করে এ'টে সাশ্কা জানিয়ে দিল ঘোড়া তৈয়ার, কিন্তু জোর করে বলল যে প্রথমে গিয়ে কাউণ্টের ওভারকোটটা নিতে হবেই, ফারের কলার দেওয়া যে কোটটার মূল্য হবে প্রায় তিনশ' রুবল, আর মার্শালের ওখানে যে নচ্ছারটা তার বদলে বিশ্রী নীল ক্লোকটা দিয়েছে সেটা ফিরিয়ে না দিলে চলবে না। তুর্বিন কিন্তু বললেন ওভারকোট সন্ধানের কোনো দরকার নেই, সাজপোষাক করতে নিজের ঘরে গেলেন।

জিপসী মেয়েটির পাশে চুপচাপ বসে ক্রমাগত হিক্কা তুলছেন অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারটি। ভোদকা আনতে বলে পুলিস ক্যাপ্টেন সমবেত সবাইকে আমন্ত্রণ করল তার বাড়িতে গিয়ে ছোট হাজরি খেতে, কথা দিল তার স্ত্রী নেমে এসে জিপসীদের সঙ্গে নাচবে ঠিক। সুদর্শন যুবাটি সাগ্রহে ইলিউশ্কাকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল যে পিয়ানোফোর্ট জিনিসটা অনেক বেশী প্রাণবন্ত, গিটারে 'এ ফ্ল্যাট' তোলা যায় না। রাজকর্মচারীটি এক কোণে বসে

চা খাচ্ছে, মনে হল ভোরের আলো হওয়াতে নিজের বেলেল্লাপনায় সে লজ্জিত। নিজেদের ভাষায় জিপসীদের মধ্যে তর্ক চলেছে, তারা জেদ ধরেছে ভদ্রলোকদের খাতির করার জন্য আর একটা গান গাইতেই হবে, কিন্তু স্তেশা আপত্তি জানিয়ে বলল যে তাহলে 'বারোরাই' (কথাটির অর্থ কাউণ্ট বা রাজকুমার, আরো সঠিক করে বলতে গেলে, বড় বাবু) চটে যাবেন। এক কথায় আমোদ আহ্লাদের শেষ রেশটুকু মিলিয়ে যাচ্ছে।

সফরের পোষাক চাপিয়ে ঘরে এসে কাউণ্ট বললেন, 'বেশ, যাবার আগে আর একটা গান হোক, তারপর যে যার বাড়ি।' তাঁকে আরো ফিটফাট, আরো সুন্দর, আরো ফুর্তিবাজ মনে হচ্ছে।

জিপসীরা সবে গুছিয়ে গোল হয়ে বসে গান ধরার উপক্রম করেছে, ইলিন একতাড়া নোট হাতে এসে কাউণ্টকে ডেকে এক পাশে নিয়ে গেল।

'আমার কাছে রেজিমেণ্টের পোনেরো হাজার রুবল ছিল শুধু, অথচ তুমি দিয়েছ ষোলো হাজার তিনশ,' সে বলল। 'ওটা তোমার।'

'চমৎকার! দাও দিকি!'

টাকা দিতে দিতে একটু সলজ্জভাবে কাউণ্টের দিকে তাকাল ইলিন, কী একটা বলার জন্য মুখ খুলল, কিন্তু কিছু না বলে টকটকে লাল হয়ে উঠল সে, চোখে জল এসে গেল, তারপর কাউণ্টের হাত ধরে সজোরে চাপ দিল।

'কেটে পড়ো! ইলিউশ্কা!.. শোনো... এই নাও টাকা, সহরের ফটক পর্যন্ত গাইতে গাইতে বিদায় দিতে হবে কিন্তু,' বলে ইলিনের দেওয়া এক হাজার তিনশ' রুবল তিনি ছুঁড়ে দিলেন জিপসীর গিটারের ওপর। কিন্তু আগের রাত্রে অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারের কাছে ধার নেওয়া একশ' রুবল ফেরত দিতে মনে রইল না।

তখন সকাল দশটা। বাড়িঘরের অনেক ওপরে সূর্য, রাস্তায় লোকের ভিড়, অনেকক্ষণ দোকানপাট খুলেছে দোকানীরা, ঘোড়ায় চেপে চলেছে বাবুরা আর সরকারী চাকুরেরা, আর্কেডে এক দোকান থেকে অন্য দোকানে মন্থর গতিতে যাচ্ছেন মহিলারা ; তখন হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে বেরিয়ে এল জিপসীর দল, পুলিস ক্যাপ্টেন, অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার, সুদর্শন যুবাটি, ইলিন আর কাউণ্ট, তাঁর গায়ে ভালুক লোমের আস্তরণ দেওয়া সেই নীল ক্লোকটা। ঝকঝকে দিন, বরফ গলছে। লেজ ছোট করে বাঁধা তিন ঘোড়ার তিনটি শ্লেজ হোটেলের সামনে এসে থামল, পুরো হুল্লোড়ে দলটি চাপল তাতে। প্রথম শ্লেজে কাউণ্ট, ইলিন, স্তেশা, ইলিউশ্‌কা আর কাউণ্টের চাকর সাশ্‌কা। ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে ব্লুচার লেজ নাড়িয়ে মাঝের ঘোড়াটাকে উদ্দেশ্য করে চেঁচাচ্ছে। বাকি ভদ্রলোকেরা এবং জিপসীরা উঠল অন্য দুটি শ্লেজে। হোটেল ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি এল শ্লেজগুলো, দল বেঁধে গান শুরু হল জিপসীদের।

আর এইভাবে গান গেয়ে, ছোট ছোট ঘণ্টার আওয়াজ তুলে তারা সারা সহরটা পার হয়ে গেল, একেবারে ফটক পর্যন্ত, সামনে পড়া আর সমস্ত গাড়িকে উঠতে হল ফুটপাথে।

প্রকাশ্য দিবালোকে সহরের রাস্তায় গান আর জিপসী মেয়ে আর মাতাল জিপসী পুরুষের সঙ্গে মান্যগণ্য এসব ভদ্রলোকদের যেতে দেখে তাক লেগে গেল দোকানী আর পথচারীদের, বিশেষ করে তাদের যারা ভদ্রলোকদের চিনত।

সহরের ফটক ছাড়িয়ে শ্লেজগুলো থামল, প্রত্যেকে বিদায় নিতে লাগল কাউণ্টের কাছে।

রওনা হবার আগে বেশ পান করেছিল ইলিন, ঘোড়া চালিয়েছে সে নিজেই, হঠাৎ অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে গিয়ে কাউণ্টকে বার বার

বলতে লাগল আর একদিন থেকে যেতে। যখন বুঝল সেটা অসম্ভব, তখন অপ্রত্যাশিতভাবে জল ভরা চোখে হঠাৎ নতুন বন্ধুটিকে চুম্বন করে শপথ করল যে, রেজিমেণ্টে ফিরে গিয়েই যে হুসার রেজিমেণ্টে তুর্বিন আছেন সেখানে বদলির দরখাস্ত করবে। কাউণ্টের বেজায় ফুর্তি তখন। সকালে অশ্বারোহী বাহিনীর যে অফিসার তাঁকে শেষবারের মতো তুমি বলে ডেকেছিলেন, তাঁকে ঠেলে দিলেন বরফের স্তূপে, ব্লুচারকে লেলিয়ে দিলেন পুলিস ক্যাপ্টেনের দিকে, স্তেশাকে ছিনিয়ে জড়িয়ে ধরে ভয় দেখালেন একেবারে মস্কোতে সঙ্গে নিয়ে যাবেন, অবশেষে শ্লেজে লাফিয়ে উঠে পাশে বসালেন ব্লুচারকে, যদিও মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকার ইচ্ছে ছিল তার। কাউণ্টের ওভারকোটটা খুঁজে বের করে পাঠিয়ে দেবার জন্য অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারকে আর একবার তাড়া দিয়ে সাশ্‌কা চালকের পাশে তড়াক করে উঠে বসল।

'চললুম তাহলে!' চেঁচিয়ে বলে কাউণ্ট টুপিটা ঝটিতি খুলে মাথার ওপর নাড়িয়ে শ্লেজ-চালকদের মতো শিস দিলেন ঘোড়াগুলোকে, আর তিনটে শ্লেজ চলল বিভিন্ন দিকে।

বরফে ঢাকা সমভূমির একঘেয়ে বিস্তার বহুদূর পর্যন্ত, তার মধ্যে এঁকেবেঁকে চলেছে পথের নোংরা হলদে ফিতেটা। গলে-আসা বরফের শক্ত আর স্বচ্ছ আবরণে উজ্জ্বল রোদের ঝিকিমিকি খেলা এবং মুখে আর পিঠে বেশ একটা মিঠে ঝাঁঝ। ঘেমে-ওঠা ঘোড়াগুলোর গা থেকে উঠছে ভাপ। ঠুনঠুন শব্দ করে চলেছে শ্লেজের ঘণ্টা। বেশী বোঝাই শ্লেজের পাশে দৌড়তে দৌড়তে একটি চাষী কাউণ্টের পথ করে দিতে গিয়ে তাড়াতাড়ি লাগামের

সামিল দড়িতে টান দিল, পথের ধারের বরফ-গলা কাদায় ভিজে গেল বাকলের জ্বতো। অন্য একটা শ্লেজে বসে লাগামের কোণ দিয়ে শাদা ছ্যাকড়া ঘোড়াটার পিঠ আছড়াচ্ছিল একটি মোটাসোটা লালমুখো কিষাণী, তার ভেড়ার লোমের কোটে গোঁজা একটি বাচ্চা। হঠাৎ আন্না ফিওদরভ্‌নাকে মনে পড়ে গেল কাউণ্টের।

'গাড়ি ঘ্বমাও!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

ব্বঝতে পারল না গাড়োয়ান।

'ঘ্বমাও! ফির সহরে! জলদি!'

আবার ফটক হয়ে সহরে ঢুকে শ্লেজটা দ্রুত গিয়ে থামল শ্রীমতী জাইৎসেভার বাড়ির কাঠের তৈরী বহির্দ্বারে। সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে উঠে কাউণ্ট পা চালিয়ে সামনের হল আর ড্রয়িং-র্বম পার হয়ে গেলেন। তখনো ঘ্বমন্ত বিধবাটিকে পেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে তুললেন, ঘ্বম-জড়ানো তার চোখে চুম্ব খেয়ে বেরিয়ে গেলেন দৌড়িয়ে। ঘ্বমে আচ্ছন্ন আন্না ফিওদরভ্‌না ঠোঁট চেটে শ্বধ্ব জিজ্ঞেস করতে পারল, 'কী হল?' কাউণ্ট লাফিয়ে শ্লেজে উঠে চেঁচিয়ে গাড়োয়ানকে চালাতে বললেন আর কালবিলম্ব না করে, ল্বখ্‌নভ বা ছোটখাটো বিধবা বা স্তেশার কথা একবারও না ভেবে চিরতরে ছেড়ে গেলেন ক... সহর, তাঁর মাথায় শ্বধ্ব মস্কোর চিন্তা।

৯

বিশ বছর কেটে গেছে। অনেক ঘাটের জল গড়িয়েছে, দেহ রেখেছে অনেক লোকে, জন্ম নিয়েছে আরো অনেকে, বড়ো হয়েছে বা ব্বড়িয়ে গেছে অপরেরা, মান্বষের চেয়ে বেশী স্বষ্টি হয়েছে

নতুন চিন্তাধারার, তারপর উধাও হয়ে গেছে। পুরনো কালের ভালো ও মন্দের অনেক কিছু অবলুপ্ত, নতুন অনেক ভালো জিনিস দানা বেঁধেছে, তাদের চেয়ে দলে ভারি দেখা দিয়েছে অনেক মন্দ জিনিস।

বেশ কয়েক বছর আগে বিগত হয়েছেন কাউণ্ট ফিওদর তুর্বিন। রাস্তায় একটি বিদেশীকে ঘোড়ার চাবুক মারাতে তার সঙ্গে ডুয়েল লড়ে তিনি মারা যান। তাঁর ছেলে, বাপের অবিকল প্রতিমূর্তি, এখন তেইশ বছরের মিষ্টি ছোকরা, অশ্বারোহী দলের অফিসার। কিন্তু স্বভাবের দিক দিয়ে নবীন কাউণ্ট তুর্বিনের ছিটেফোঁটা মিল নেই বাপের সঙ্গে। আগের পুরুষের বেপরোয়া উদ্দাম, আর সোজা কথায় বলতে গেলে, বেলেল্লা হাবভাবের নামগন্ধ নেই তার মধ্যে। বুদ্ধিবৃত্তি, সুশিক্ষা ও বংশক্রমে পাওয়া গুণী স্বভাব ছাড়া তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুণ হল ভদ্রতা ও আরামপ্রিয়তা, লোক ও অবস্থা বিচারের একটি বাস্তব মনোভাব আর জীবনের প্রতি সতর্ক বুদ্ধিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি। সৈন্যবাহিনীর কাজে খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি করেছে ছোকরা কাউণ্ট: তেইশ বছর বয়সেই লেফটেন্যাণ্ট সে...

যুদ্ধ শুরু হওয়াতে সে ভাবল জঙ্গী কাজে থাকলে উন্নতির সম্ভাবনা বেশী, তাই বদলি হল একটি হুসার রেজিমেণ্টে, ক্যাপ্টেনের পদে, আর অল্পদিনের মধ্যেই ভার পেল একটি স্কোয়াড্রনের।

১৮৪৮ সালের মে মাসে হুসারের স... রেজিমেণ্টটা ক... গুবের্নিয়া হয়ে যাচ্ছিল; নবীন কাউণ্ট তুর্বিনের স্কোয়াড্রনের রাত কাটাবার কথা আন্না ফিওদরভ্‌নার মরোজভ্‌কা গ্রামে। আন্না ফিওদরভ্‌না তখনো জীবিত, কিন্তু বয়স এত হয়েছে যে নিজেকে আর নবীনা বলে মনে করেন না, স্ত্রীলোকের পক্ষে এটা মনে না

করাটা অসাধ্যসাধন। অত্যন্ত মুটিয়ে গেছেন তিনি, লোকে বলে তাতে নাকি স্ত্রীলোকদের বয়স কম দেখায়। কিন্তু তাঁর নরম শুভ্র মেদে হানা দিয়েছে গভীর বলিরেখা। সহরে গাড়ি চেপে আর যান না, সত্যি বলতে গাড়িতে চাপা তাঁর পক্ষে বেজায় শক্ত, কিন্তু স্বভাবটা রয়ে গেছে আগেকার মতোই ভালোমানুষী আর বোকা-বোকা গোছের, সেটা এখন স্বীকার করা চলে কেননা আমাদের অন্ধ করে দেবার মতো রূপ আর তাঁর নেই। তাঁর সঙ্গে থাকে মেয়ে, তেইশ বছরের লিজা, রুশী গ্রাম্য সুন্দরী, আর থাকেন দাদাটি, আমাদের পরিচিত সেই অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার, আলসে স্বভাবের ফলে পৈতৃক সম্পত্তি সব ফুঁকে দিয়ে তিনি বৃদ্ধ বয়সে বোনের গলগ্রহ। চুল ধবধবে শাদা হয়ে গিয়েছে, ওপরের ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, কিন্তু গোঁফে সযত্নে কালো কলপ লাগানো। বলিরেখায় শুধু যে গাল আর কপাল কীর্ণ তা নয়, নাক ও গলাও, কুঁজো হয়ে গেছেন তিনি, তবু তাঁর দুর্বল বেঁকা পায়ে রয়ে গেছে অশ্বারোহী বাহিনীর পুরনো অফিসারের ছিটেফোঁটা।

সে সন্ধ্যায় পরিবারবর্গ ও পোষ্য সবাইকে নিয়ে পুরনো বাড়িটার ছোট ড্রয়িং-রুমে বসেছিলেন আন্না ফিওদরভ্না। বারান্দার দরজা জানলার সামনে, লাইম-গাছের ছায়ায় ঢাকা, তারার মতো আকৃতির পুরনো কেতার একটি বাগান। পক্ককেশ আন্না ফিওদরভ্না তুলো-ভরা ফিকে বেগুনি রঙের একটি জ্যাকেট পরে গোল মেহগনি টেবিলের সামনে সোফায় বসে টেবিলে তাস সাজাচ্ছেন। বুড়ো ভাই পরিষ্কার শাদা পেন্টেলুন আর নীল কোট পরে জানলার কাছে বসে শাদা তুলোর সুতোয় কাঁটা দিয়ে কী একটা বানাচ্ছেন; এটা ভাগ্নীর কাছে শেখা, কাজটায় ক্রমশঃ তাঁর প্রবল অনুরাগ জন্মে গেছে, কেননা সত্যিকার কাজ করার ক্ষমতা তাঁর নেই, দৃষ্টিশক্তি

এত ক্ষীণ যে তাঁর সেই সখ — সংবাদপত্র পাঠ — মেটানো আর চলে না। আন্না ফিওদরভ্‌না পোষ্য হিসেবে যাকে নিয়েছিলেন, পিমচ্‌কা নামের সেই ছোট্ট মেয়েটি বুড়োর পাশে বসে লিজার তদারকে পড়া করছে। সঙ্গে সঙ্গে লিজা মামার জন্য ছাগলের লোমের এক জোড়া মোজা বুনে চলেছে। দিনের সে সময়টায় বরাবরকার মতো আজও অস্তগামী সূর্যের শেষ আলো লাইম গাছগুলোর মধ্য দিয়ে তেরছাভাবে পড়ে রাঙিয়ে দিচ্ছে একেবারে ওদিকের জানলাটাকে আর পাশে দাঁড়ানো বই-এর স্ট্যান্ডকে। ঘর আর বাগান এত নিস্তব্ধ যে স্পষ্ট কানে আসে জানলার বাইরে সোয়ালোর পাখার দ্রুত ঝাপট, ঘরে আন্না ফিওদরভ্‌নার মৃদু দীর্ঘশ্বাস আর পায়ের ওপর পা রাখতে গিয়ে বৃদ্ধের ক্লান্তিসূচক শব্দ।

'এই তাসটা কোথায় বসবে? লিজা, দেখিয়ে দে তো, লক্ষ্মীটি, কিচ্ছু মনে থাকে না আজকাল,' খেলা থামিয়ে বললেন আন্না ফিওদরভ্‌না।

বোনা বন্ধ না করে লিজা মায়ের কাছে গিয়ে তাসের দিকে তাকাল।

'হায়রে, তুমি তো সব গুলিয়ে ফেলেছ দেখছি মা মণি,' তাসগুলো ঠিক করে গুছিয়ে দিতে দিতে বলল। 'থাকা উচিত এ রকম। তবু, হাতটা আসবে — আন্দাজটা ঠিকই করেছ,' মার অজান্তে একটা তাস চট করে সরিয়ে দিয়ে বলল লিজা।

'তুই তো সদাই আমাকে ধাপ্পা দিস, সদাই বলিস তাসটা আসবে।'

'আসবে সত্যি। এই তো এসেছে!'

'বেশ, বেশ, শেয়াল ঠাকরুণ। চা খাবার সময় হয় নি?'

'ওদের তো বলে দিয়েছি সামোভার গরম করতে। দেখছি

গিয়ে। এখানে আনাব?.. পিমচ্কা, তাড়াতাড়ি পড়া শেষ কর্, আমরা একটু বেড়িয়ে আসব।'

দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল লিজা।

'লিজা! লিজচ্কা!' কাঁটা থেকে চোখ না সরিয়ে ডাকলেন মামা। 'আবার একটা স্বতো ফেলে দিয়েছি মনে হচ্ছে। ওটা তুলে দে তো, লক্ষ্মী মেয়ে!'

'এক্ষুণি দিচ্ছি! এক্ষুণি! চিনির ডেলাটা ভাঙতে দিয়ে আসি!'

আর সত্যি, মিনিট তিনেকের মধ্যে ছুটে ফিরে এসে মামার কাছে গিয়ে সে চুল ধরল তাঁর।

'স্বতো ফেলে দেবার এই হল শাস্তি,' হেসে বলল। 'আজকের পড়াটা পর্যন্ত করেন নি দেখছি।'

'থাক, থাক; ঠিক করে দে এটা — কোথাও গাঁট পড়েছে মনে হচ্ছে।'

কাঁটাটা নিয়ে লিজা মাথার রুমালের আলপিন টেনে বের করে ফোঁড়টা পিন দিয়ে ধরে দু-তিন বার ফাঁস দিয়ে ফেরত দিল মামাকে। আলপিন খোলাতে জানলা থেকে আসা হাওয়ায় রুমালটা খুলে গেল।

'অনেক খেটেছি, চুমু দিন একটা,' বলে মাথার রুমাল পিন দিয়ে আটকে ঠিক করে নিতে নিতে গোলাপি গাল এগিয়ে দিল। 'আজকে চায়ের সঙ্গে রাম পাবেন। জানেন তো, আজ হল শুক্রবার।'

আবার চায়ের ঘরে ফিরে গেল সে।

'দেখুন, দেখুন মামা! হুসাররা আসছে,' পরিষ্কার জোরালো গলা শোনা গেল সেখান থেকে।

হুসারদের দেখতে চা-ঘরে গেলেন আন্না ফিওদরভ্না ও তাঁর ভাই। ঘরের জানলাগুলো গাঁয়ের দিকে। জানলা দিয়ে দেখা গেল

খুব কম; শুধু বুঝতে পারলেন ধুলোর মেঘে চলেছে একটা দল।

'কী আফশোসের কথা, বোন,' আন্না ফিওদরভ্‌নাকে বললেন লিজার মামা, 'আমাদের বাড়িটা এত ছোট, আর পাশের নতুন অংশটা হয় নি এখনো। নইলে কয়েকজন অফিসারকে ডাকা যেত। হুসারদের অফিসাররা হামেশাই বেশ খাসা ফুর্তিবাজ ছোকরা, ওদের একবার দেখার বড়ো ইচ্ছে আমার।'

'ওদের পেলে আমিও খুব খুশি হতাম, কিন্তু জানোই তো দাদা, ওদের রাখার মতো ঠাঁই নেই। থাকার মধ্যে আছে শুধু আমার শোবার ঘর, লিজার ঘর, ড্রয়িং-রুম আর তোমার ঘর, ব্যস। কোথায় তুলব ওদের? নিজেই ভেবে দেখো। মোড়লের বাড়িটা ওদের জন্যে তৈরী করে রেখেছে মিখাইলো মাৎভেইয়েভ। বলছে ঠিক মত ঝেড়ে সাফ করা হয়েছে।'

'ওদের মধ্য থেকে তোর জন্যে একটা বর, হুসার বাহাদুর কাউকে ঠিক করতাম, লিজচ্‌কা,' মামা বললেন।

'হুসার চাই নে আমার, আমার দরকার উলানী সেনা, আপনি তো উলানদের দলে ছিলেন, তাই না মামা?.. হুসারদের জানার কোনো সখ নেই আমার। লোকে বলে ওরা অত্যন্ত বেপরোয়া লোক।'

লিজার গাল অল্প একটু রাঙা হয়ে উঠল, কিন্তু আবার তার সেই ভরাট হাসি হাসল সে।

'এই তো, উস্তিউশ্‌কা হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে; কী দেখল ওকে জিজ্ঞেস করা যাক,' সে বলল।

উস্তিউশ্‌কাকে ডেকে পাঠালেন আন্না ফিওদরভ্‌না।

'হাতে তোর কোনো কাজ নেই যেন! পল্টনের লোক দেখতে

ছুটে যাওয়া চাই!' বললেন আম্মা ফিওদরভ্‌না। 'আচ্ছা, অফিসারদের কোথায় রাখা হচ্ছে?'

'ইয়েরেম্‌কিনদের বাড়িতে, মা। দুজন ওরা, আর কী ফুটফুটে চেহারা! একজন আবার নাকি কাউণ্ট, লোকে বলছে।'

'কী নাম?'

'কাজারভ না তুর্বিনভ — না, ঠিক মনে পড়ছে না, মাফ করবেন।'

'তুই একটা গাধা — কিচ্ছু বলতে পারিস না। অন্তত ওর নামটা জেনে নিলে তো পারতি।'

'যদি বলেন তো দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসি।'

'হ্যাঁ, ও সবে তুই তো ওস্তাদ জানি! না, দানিলো যাক; দাদা, ওকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে বলো তো অফিসাররা কোনো কিছু চায় কিনা; ওদের আপ্যায়ন করা দরকার। আর দানিলো যেন বলে ওকে কর্ত্রী পাঠিয়েছেন।'

চা-ঘরে আবার বসলেন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আর চিনি সরিয়ে রাখতে ঝিদের ঘরে গেল লিজা। উসতিউশ্‌কা সেখানে হুসারদের বিষয়ে গল্প চালিয়েছে।

'সত্যি দিদিমণি, কাউণ্ট কী সুন্দর দেখতে!' সে বলল। 'একেবারে স্বর্গের দেবতার মতো, ভুরু জোড়া কালো! যদি ওর মতো একটা বর হত আপনার! কী সুন্দর জোড় মিলত সত্যি!'

সায় দিয়ে মৃদু হাসি হাসল অন্য ঝি-চাকরেরা। জানলার ধারে বসে মোজা রিপু করতে করতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শ্বাস চেপে কী একটা প্রার্থনার মন্ত্র বিড়বিড় করে আওড়াল বুড়ী আয়া।

'তাহলে হুসারদের তোর খুব মনে ধরেছে দেখছি!' বলল লিজা। 'গল্প বলতে তুই ওস্তাদ! উসতিউশ্‌কা, ফলের সরবৎ নিয়ে আয় তো, টকটক গোছের কিছু একটা, হুসারদের আপ্যায়ন

করতে হবে তো।' চিনি-দানি হাতে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল লিজা।

ভাবতে লাগল, "হুসারটিকে একবার দেখলে হত। ওর চুল সোনালি না কালো? আমাদের সঙ্গে আলাপ হলে ও খুশি না হয়ে যায় না। কিন্তু আমি এখানে বসে ওর কথা ভাবছি সেটা না জেনেই হয়ত ও চলে যাবে। ওর মতো কত না লোক সামনে দিয়ে চলে গেছে! আমাকে আর দেখে কে! শুধু মামা আর উসতিউশ্কা। কীভাবে চুল বাঁধি, কী জামা পরি, তাতে কী এসে যায়? তারিফ করার তো কেউ নেই," মৃদু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিজের নিটোল শাদা হাতের দিকে চেয়ে ভাবল। "নিশ্চয় ও বেশ লম্বা, বড়ো বড়ো চোখ, ছোট্ট কালো গোঁফ আছে। ভেবে দেখো একবার, তেইশে পা দিয়েছি অথচ কেউ আমার প্রেমে পড়ল না, বসন্তের দাগ মুখো ইভান ইপাতিচ ছাড়া। আর চার বছর আগে আমার চেহারাটা আরো সুন্দর ছিল। কুমারীর বয়স বলতে গেলে পেরিয়েছি, অথচ এ বয়সে আনন্দের ছিটেফোঁটা পর্যন্ত পেল না কেউ। হায়রে আমার কপাল! গাঁয়ের অভাগিনী শুধু, আর কিছু না!"

মা চা ঢেলে দেওয়ার জন্য ডাকলেন, চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ল গাঁয়ের মেয়ের। মাথা একটু ঝাঁকিয়ে গেল চা-ঘরে।

দৈবাৎ যা ঘটে তাই সবচেয়ে ভালো: খুব বেশী কষ্ট করলেই কেষ্ট মেলে না। গ্রামে শিক্ষাদীক্ষায় বেশী নজর দেওয়া হয় না, তাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আপনা থেকে ফলটা চমৎকার হয়। লিজার বেলায় বিশেষ করে তাই ঘটেছে। আন্না ফিওদরভ্‌নার মনের বিস্তার ছিল না, সেজন্য আর আলসে প্রকৃতির ফলে লিজাকে কোনো শিক্ষাদীক্ষা তিনি দেন নি: না শেখানো হয় গানবাজনা না অপরিহার্য ফরাসী ভাষা, শুধু দৈবক্রমে বিগত স্বামীর ঔরসে

জন্ম নেওয়া একটি অতি সুন্দর ও গোলগাল শিশু-মেয়েটিকে ছেড়ে দেন স্তন্যদায়ী ধাত্রী ও আয়ার হাতে। তিনি তাকে খাওয়াতেন, সুতোর ফ্রক আর ছাগলের চামড়ার জুতো পরাতেন, খেলতে আর বেরী ও ব্যাঙের ছাতা কুড়োতে বাইরে পাঠাতেন, লেখাপড়া ও অংক শেখানোর জন্য একটি কমবয়সী ছাত্রকে রেখে দেন, আর ষোলো বছরের মধ্যে, নেহাৎ দৈবক্রমে, তিনি দেখলেন লিজা সঙ্গী হিসেবে বেশ খাসা; ছোটখাটো হাসিখুশি, দরাজ মনা মেয়েটি বেশ গিন্নী গোছের হয়ে দাঁড়িয়েছে। আন্না ফিওদরভ্নার নিজের মনটা এত কোমল যে তিনি সর্বদা কোন না কোন ভূমিদাসের শিশুকে বা কুড়িয়ে-পাওয়া কাউকে পুষ্যি রাখতেন। দশ বছর বয়স থেকে মায়ের পোষ্যদের ভার নিয়েছে লিজা: লেখাপড়া শেখাত তাদের, কাপড়চোপড় পরাত, নিয়ে যেত গির্জায়, আর বেশী দুষ্টুমি করলে ধমকাত। তারপর এলেন বৃদ্ধ, ভালোমানুষ গোছের মামা, তাঁকে শিশুর মতো দেখাশোনা করতে হত। আর ছিল বাড়ির ঝি-চাকর, গাঁয়ের চাষা; তাদের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার ভার নিতে হত নবীনা কর্ত্রীকে। এল্‌ডার ফুলের রস, পেপারমিণ্ট ও কর্পূরের নির্যাস দিয়ে চিকিৎসা চলত তাদের। তারপর বাড়ির দেখাশোনা করার ভার আপনা থেকেই এসে পড়ল তার ঘাড়ে। এর ওপর ছিল অপরিতৃপ্ত ভালোবাসার ব্যাকুলতা যা মুক্তি পেত শুধু প্রকৃতির প্রতি অনুরাগে আর ধর্মে। এ সব থেকে নেহাৎ ভাগ্যক্রমে লিজা হয়ে দাঁড়াল কর্মতৎপর, হাসিখুশি, অমায়িক, স্বাধীনচেতা, নিষ্পাপ আর অত্যন্ত ধর্মপ্রবণ একটি মেয়ে। সত্যি বটে, ক... সহর থেকে আনানো ফ্যাশনদুরস্ত টুপি-পরা প্রতিবেশিনীদের গির্জায় দেখলে তার হিংসে হত অল্পসল্প; খিটখিটে মায়ের নানা খেয়ালে প্রায় কান্না পেয়ে যেত; প্রেমের স্বপ্ন নিত আজগুবি, এমন কি অত্যন্ত

স্থূল রূপ — কিন্তু এ সমস্তই হটে যেত তার সত্যিকার কাজের গুণে, যে কাজ তার প্রাণ ছিল, আর তাই তেইশ বছর বয়সে শারীরিক ও মানসিক সৌন্দর্যে ধনী এই বাড়ন্ত মেয়েটির স্বচ্ছ শান্ত অন্তরে দাগ বা অনুশোচনা রেখে যাবার মতো কিছুমাত্র ছিল না। লম্বায় লিজা মাঝারি, রোগার চেয়ে বরঞ্চ গোলগাল; বাদামী বরণ চোখ খুব বড়ো নয়, চোখের পাতায় অল্প ছায়া; দীর্ঘ সোনালি বিনুনি; হাঁটার ভঙ্গিটা উদার, একটু হেলেদুলে। মনে কোনো ভাবনা না নিয়ে কাজে ব্যস্ত থাকার সময়ে তার মুখের ভাব সবাইকে জানিয়ে দিত যে জীবন জিনিসটা খাসা, জীবন জিনিসটা আনন্দের তাদের পক্ষে যাদের বিবেক নির্মল, ভালোবাসার জন আছে যাদের। এমন কি বিরক্তি, ক্রোধ, উৎকণ্ঠা বা দুঃখের মুহূর্তে জলে ভরা-যাওয়া চোখে, বাঁ দিকের কুঞ্চিত ভুরুতে, গালের টোলে, ঠোঁটের কোণে, দীপ্ত চোখে পাওয়া যেত কোমল ও অকপট হৃদয়ের উজ্জ্বল একটা আভাস, যে হৃদয় মলিন হয় নি কৃত্রিমতায়।

১০

সূর্য ডুবে গেছে, কিন্তু তখনো বেশ গরম; স্কোয়াড্রন মরোজভ্‌কায় ঢুকল। সামনে, গাঁয়ের ধূলিধূসর রাস্তায় দল ছাড়া একটা ছিটছিট দাগের গরু দৌড়চ্ছে; ভীতভাবে পেছন দিকে বার বার তাকিয়ে থেকে থেকে থেমে পড়ে ডাকছে, পথ ছেড়ে দিলেই হয় সেটা তার মাথায় ঢোকে নি। বুড়ো চাষী, গাঁয়ের বধূ, বাচ্চাকাচ্চা আর বাড়ির সব চাকরবাকর পথের দুধারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে হাঁ হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল হুসারদের, খাটো রাশ

দেওয়া কালো ঘোড়ায় চেপে তারা এগিয়ে আসছে ধুলোর ঘন মেঘে। ঘোড়াগুলো নাক দিয়ে মাঝে মাঝে আওয়াজ করছে। স্কোয়াড্রনের ডান দিকে চলেছে আলগাভাবে জিনে বসে অফিসার দুটি। একজন হল দলের কমান্ডার, কাউন্ট তুর্বিন, আর একজন হল পলজভ, বয়স খুব কম, অফিসার হয়েছে এই সেদিন।

গাঁয়ের সেরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল শাদা টিউনিক-পরা একটি হুসার, ফৌজী টুপি খুলে গেল অফিসারদের কাছে।

'আমাদের থাকার ব্যবস্থা কোথায় হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল কাউন্ট।

খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যুত্তরে বলল কোয়ার্টারমাস্টার, 'আপনার জন্যে হুজুর? এই বাড়িটা, মোড়লের বাড়িটা সাফ করা হয়েছে। জমিদারণীর কাছারি বাড়িতে ঘর চেয়েছিলাম, কিন্তু রাজী হল না। জমিদারণী বড় রাগী।'

'বেশ,' ঘোড়া থেকে নেমে পায়ের আড় ভেঙে মোড়লের বাড়ির দিকে এগোতে এগোতে কাউন্ট বলল। 'আমার গাড়িটা এসেছে?'

'এসেছে, হুজুর,' ফটকে দাঁড়ানো গাড়ির দিকে টুপি দেখিয়ে জবাব দিল কোয়ার্টারমাস্টার, তারপর আগে আগে ছুটে গেল বাড়িটার প্রবেশ ঘরে, যেখানে অফিসারদের দেখার জন্য জুটেছিল একটি চাষী পরিবার। সবে ধোয়া-মোছা বাড়িটার দরজা হটাং করে খুলে কাউন্টকে ভেতরে যাবার জন্য সরে দাঁড়াতে গিয়ে আর একটু হলে একটা বুড়ীকে ফেলে দিত ধাক্কায়।

বাড়িটা যথেষ্ট বড়ো, জায়গা আছে, কিন্তু পুরোপুরি পরিষ্কার নয়। বাবুদের মতো সাজ-পরা একটি জার্মান খাস চাকর লোহার খাট পেতে স্যুটকেশ থেকে বিছানার চাদর বের করছে।

'এঃ, কী জঘন্য বাড়ি!' বিরক্ত হয়ে বলল কাউণ্ট। 'দিয়াদেঙ্কো, জমিদারণীর ওখানে কোথাও এর চেয়ে ভালো জায়গা পাওয়া গেল না?'

'হুজুর, হুকুম দিলে কাউকে ওখানে পাঠাই,' জবাবে বলল দিয়াদেঙ্কো। 'কিন্তু কাছারি বাড়িটা বিশেষ সুবিধের নয়, এ বাড়িটার চেয়ে এমন কিছু ভালো মনে হচ্ছে না।'

'দরকার নেই এখন। থাক।'

কাউণ্ট শুয়ে পড়ল হাতে মাথা রেখে।

'ইওহান!' হেঁকে খাস চাকরকে বলল, 'আবার মাধ্যিখানটায় একটা ঢিবি করে দিয়েছ দেখছি! ঠিক মত বিছানা পাততে পার না, ব্যাপারটা কী?'

বিছানা ঠিক করতে গেল ইওহান।

'থাক, দরকার নেই। আমার ড্রেসিং-গাউনটা কোথায়?' খিটখিটিয়ে কাউণ্ট বলল।

ড্রেসিং-গাউন এনে দিল ইওহান।

পরবার আগে ঝুলটা পরীক্ষা করে দেখল কাউণ্ট।

'যা ভেবেছিলাম; দাগটা ওঠাও নি। তোমার চেয়ে খারাপ কাজ আর কেউ পারে বলে জানা নেই,' খাস চাকরের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ড্রেসিং-গাউন গায়ে চাপাতে চাপাতে বলে উঠল কাউণ্ট। 'এটা কি ইচ্ছে করে করা হয়েছে, না কি?.. চা তৈয়ার?..'

'সময় পাই নি,' ইওহান বলল।

'গাধা!'

সে উপলক্ষে আনা একটি ফরাসী নভেল টেনে নিয়ে, কোনো কথা না বলে বেশ কিছুক্ষণ পড়ল কাউণ্ট। সদরের বারান্দায় সামোভার গরম করতে গেল ইওহান। বেশ বোঝা যাচ্ছে কাউণ্টের

মেজাজটা বেগতিক — নিঃসন্দেহে তার কারণ হল ক্লান্তি, অপরিষ্কার মুখ, আঁটো পোষাক আর শূন্য পেট।

'ইওহান!' আবার হাঁকল সে। 'দশটা রুবল দিয়েছিলাম, তার হিসেব দাও। সহরে কী কিনেছ?'

হিসেবে চোখ বুলিয়ে নিয়ে কেনা জিনিসগুলোর দাম বেশী বলে কয়েকটা অসন্তোষজনক মন্তব্য কাউণ্ট করল।

'চায়ের সঙ্গে রাম দিও।'

'রাম তো কিনি নি,' বলল ইওহান।

'চমৎকার! কতবার না বলেছি সঙ্গে রাম রাখতে?'

'হাতে বেশী টাকা ছিল না।'

'পলজভ কিনল না কেন? ওর চাকরের কাছ থেকে টাকাটা নিতে তো পারতে।'

'কর্ণেট পলজভ? জানি না। উনি শুধু চা আর চিনি কিনেছেন।'

'হতচ্ছাড়া!.. নিকাল যাও হিঁয়াসে!.. তোমার মতো আর কেউ আমাকে এতো জ্বালিয়ে মারে না... তোমার তো ভালো করে জানা যে বাইরে ঘোরার সময়ে আমি হামেশা চায়ের সঙ্গে রাম খাই।'

'স্টাফ হেডকোয়ার্টার থেকে আপনার দুটো চিঠি এসেছে,' খাস চাকর বলল।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই খামদুটো ছিঁড়ে চিঠি পড়তে শুরু করল কাউণ্ট। ঠিক সে সময়ে হাসিমুখে ঘরে ঢুকল কর্ণেট, সে এতক্ষণ স্কোয়াড্রনের লোকজনদের তাদের জায়গায় নিয়ে গিয়েছে।

'কী তাহলে, তুর্বিন? জায়গাটা শেষ পর্যন্ত মন্দ নয় মনে হচ্ছে। কিন্তু ভয়ানক ক্লান্ত, সেটা বলতেই হবে। দিনটা গরম গেছে।'

'মন্দ নয় বটে! নোংরা দুর্গন্ধ ভরা বাড়ি, আর তোমার কৃপায় চায়ের সঙ্গে রাম জুটবে না। তোমার সেই বোকা বাঁদরটা কিনতে ভুলে গেছে, আমার চাকরটাও তাই। তুমি বললে পারতে।'

আবার চিঠি পড়া চলল। প্রথমটা শেষ করে দুমড়ে মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এ সময়ে সদরের বারান্দায় নিজের চাকরকে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করছিল কর্ণেট, 'রাম কেন নি কেন? টাকা তো ছিল তোমার কাছে, ছিল না?'

'কেনাকাটা সব আমরাই করব কেন? এমনিতেই সব খরচ তো আমিই দিই; আর ওঁর জার্মানটা পাইপ টানা ছাড়া আর কিছু করে না।'

দ্বিতীয় চিঠিটা বোঝা গেল অপ্রীতিকর নয়, কেননা পড়তে পড়তে কাউণ্টের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল।

'কে লিখেছে?' জিজ্ঞেস করল পলজভ, ইতিমধ্যে সে ঘরে ফিরে এসে চুল্লির পাশে কয়েকটা তক্তার ওপর নিজের বিছানা পাতছিল।

'মিনা,' চিঠিটা এগিয়ে দিয়ে খুশিতে বলল কাউণ্ট। 'পড়বে নাকি? চমৎকার মেয়ে!.. আমাদের মেয়েদের চেয়ে অনেক ভালো... চিঠিটাতে কী সরস বুদ্ধি আর আবেগ, পড়ে দেখো!.. একটা জিনিস শুধু খারাপ — টাকা চায়।'

'হ্যাঁ, সেটা খারাপ বটে,' বলল কর্ণেট।

'সত্যি বলতে, আমি কথা দিয়েছিলাম; কিন্তু তারপর তো আমাদের বাহিনীর যাত্রা শুরু হল, আর... আচ্ছা... স্কোয়াড্রনের ভার আমার হাতে আরো তিন মাস থাকলে টাকাটা পাঠিয়ে দেব।

দিতে আমার সত্যি কোনো আপত্তি নেই; চমৎকার মেয়ে, তাই না?' মৃদু হেসে চিঠি পড়ার সময়ে পলজভের মুখের ভাব দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল।

'বেজায় অশিক্ষিত, কিন্তু মিষ্টি, আর মনে হয় সত্যি তোমাকে ভালোবাসে,' বলল কর্ণেট।

'বাসে বই কি! প্রেমে পড়লে ওর মতো মেয়েরাই শুধু সত্যি ভালোবাসে।'

'অন্য চিঠিটা কে লিখেছে?' পড়া চিঠিটা ফেরত দিয়ে কর্ণেট জিজ্ঞেস করল।

'ওটা? ওটা লিখেছে একটা লোক, অত্যন্ত পাজী বেটা, তাসে ওর কাছে হেরে যাই; এই নিয়ে তিন বার তাগাদা দিয়েছে... এখন ওকে শোধ দিতে পারব না... বোকার মতো লিখেছে,' মনে পড়াতে স্পষ্টতঃ বিরক্ত হয়ে কাউণ্ট বলে উঠল।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ দুজন অফিসার চুপ করে রইল। কাউণ্টের মেজাজ খারাপ বলে নিঃশব্দে চা খেল কর্ণেট, কথা বলতে তার ভয়; তুর্বিনের সুন্দর মুখের দিকে সে থেকে থেকে তাকাল, তুর্বিন জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল এক মনে, চিন্তায় মগ্ন হয়ে।

'যাক, সবকিছু হয়ত ঠিক হয়ে যাবে,' পলজভের দিকে ফিরে ফুর্তিতে মাথা একটু ঝাঁকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল কাউণ্ট। 'এ বছরে রেজিমেণ্টে এক নাগাড়ে পদোন্নতি যদি চলতে থাকে, আর যদি আমরা খাস যুদ্ধে নামি, তাহলে রক্ষী বাহিনীতে আমার ক্যাপ্টেন বন্ধুদের হয়ত ছাড়িয়ে যাব।'

দ্বিতীয় গেলাস চা খেতে এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলেছে এমন সময়ে আন্না ফিওদরভ্‌নার বার্তা নিয়ে এল বুড়ো দানিলো।

'আর ঠাকরুণ হুজুরকে জিজ্ঞেস করতে বলেছেন তিনি কাউণ্ট ফিওদর ইভানভিচ তুর্বিনের সন্তান কিনা?' অফিসারটির নাম শুনে ক... সহরে বিগত কাউণ্টের আগমনের কথা মনে পড়ে যাওয়াতে আপনা থেকে যোগ করল দানিলো। 'আমাদের কর্ত্রীঠাকরুণ আন্না ফিওদরভ্না তাঁকে খুব ভালো করে চিনতেন।'

'হ্যাঁ, আমি তাঁরি ছেলে; তোমার কর্ত্রীঠাকরুণকে বোলো যে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, আমাদের কিছু দরকার নেই, কিন্তু পরিষ্কার একটা ঘর যদি পাই, জমিদার বাড়িতে বা অন্য কোথাও।'

'ওটা বলতে গেলে কেন?' দানিলো যাবার পর জিজ্ঞেস করল পলজভ। 'কী ফারাখ হত তাতে? মাত্র তো এক রাত এখানে কাটাব: ওঁদের অসুবিধে করে কী লাভ?'

'তাই নাকি! মুরগির খোপে যথেষ্ট ঘুমোনো হয়েছে... তোমার সাংসারিক বুদ্ধি নেই বোঝা গেল। এক রাত্তির হোক, মানুষের মতো থাকার সুযোগটা ছাড়তে যাব কেন? আর ওঁরা অত্যন্ত খুশি হবেন। একটা জিনিসে শুধু আমার আপত্তি। বাবাকে ভদ্রমহিলা কি হাড়ে হাড়ে চিনতেন,' ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে মৃদু হেসে বলে চলল কাউণ্ট। 'বাবার কথা মনে পড়লেই কেমন যেন লজ্জা হয়, হামেশা কোনো না কোনো অপযশ বা ধার। তাই তাঁর চেনা লোকেদের সঙ্গে দেখা হওয়াটা অসহ্য ঠেকে। তবে সে সময়টার ধরনই ছিল ও রকম,' গম্ভীর মুখে যোগ করল সে।

পলজভ বলল, 'তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। একবার একটি উলান ব্রিগেডের দলপতির সঙ্গে দেখা হয়। নাম তাঁর ইলিন। তোমাকে দেখার জন্যে তাঁর ভয়ানক আগ্রহ, তোমার বাবার প্রতি তাঁর প্রেমের শেষ নেই।'

'মনে হচ্ছে অত্যন্ত অপদার্থ এই ইলিন লোকটি। আর ব্যাপারটা কী জানো, বাবার সঙ্গে চেনা ছিল বলে যাঁরাই ঘনিষ্ঠতা করতে চান আমার সঙ্গে তাঁরাই বাবার বিষয়ে এমন সব গল্প বলেন যে শুনলে লজ্জা হয়, যদিও সেগুলো তাঁরা বলেন নিছক রসালো গল্প হিসেবে। অস্বীকার করতে পারি না — আমি সর্বদাই সব ব্যাপার নিস্পৃহ নিরাসক্তভাবে দেখার চেষ্টা করি — যে বাবা ছিলেন রগচটা প্রকৃতির আর মাঝে মাঝে এমন সব কান্ড করতেন যেগুলো করা উচিত হয় নি। কিন্তু সে সব ঘটে কালের গুণে। আমাদের যুগে তিনি হয়ত অত্যন্ত কৃতী লোক হতেন, কেননা সত্যি বলতে গেলে তাঁর গুণ ছিল অনেক।'

মিনিট পোনেরো পরে ফিরে এসে দানিলো জানাল যে জমিদারবাড়িতে রাত কাটানোর জন্য অফিসারদের আমন্ত্রণ করেছেন কর্ত্রীঠাকরুণ।

১১

ছোকরা হুসার অফিসারটি কাউণ্ট ফিওদর তুর্বিনের ছেলে জানতে পেরে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন আন্না ফিওদরভ্না।

'হা ভগবান! মঙ্গল হোক তোমার... দানিলো! তাড়াতাড়ি গিয়ে ওদের বলো যে কর্ত্রীঠাকরুণ এখানে আসতে বলছেন,' তড়াক করে উঠে তাড়াহুড়ো করে ঝিদের ঘরে যেতে যেতে তিনি বললেন। 'লিজচ্‌কা! উস্‌তিউশ্‌কা! তোর ঘরটা ঠিক করে রাখতে হবে লিজা। দাদার ঘরে তুই থাকিস, আর দাদা, তুমি... তোমাকে দাদা রাতটা কাটাতে হবে ড্রয়িং-রুমে। একটা রাত্তিরে তো কিছু এসে যাবে না।'

'সত্যি কিছু এসে যাবে না, বোন, আমি মেঝেতে শোব।'

'বাপের মতো দেখতে হলে নিশ্চয়ই সুন্দর। আহা, একবার দেখে নেব ওকে, মানিককে... তুই শুধু সবুর কর, লিজা! ওর বাপ কী সুপুরুষ ছিল... টেবিলটা আবার কোথায় সরাচ্ছিস? থাক ওটা এখানে,' ব্যস্তসমস্ত হয়ে এদিক-ওদিক যেতে যেতে চেঁচিয়ে বললেন আন্না ফিওদরভ্না। 'দুটো খাট নিয়ে আয় — নায়েবের কাছ থেকে একটা — আর জন্মদিনে দাদা যে স্ফটিকের মোমদানিটা দিয়েছিল সেটা নিয়ে গিয়ে চর্বির বাতিটা বসিয়ে দে।'

অবশেষে প্রস্তুতির পালা সাঙ্গ হল। মা'র কথা না শুনে আপন পছন্দ মতো অফিসার দুজনের জন্য নিজের ঘর সাজাল লিজা। সেণ্ট দেওয়া পরিষ্কার চাদর এনে বিছানা পাতল; বিছানার পাশের টেবিলে রাখল এক জগ জল আর মোমবাতি, সুগন্ধি কাগজ পোড়াল ঝিদের ঘরে, মামার ঘরে বিছানা করল নিজের। একটু শান্ত হয়ে আন্না ফিওদরভ্না নিজের জায়গায় বসে তাস তুলে নিলেন হাতে, কিন্তু সেগুলো সাজানো হল না; মেদল কনুই টেবিলে রেখে স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেলেন। "কী তাড়াতাড়ি না সময় বয়ে যায়! সত্যি কেমন তাড়াতাড়ি!" ফিসফিস করে নিজেকে বললেন। "মনে হচ্ছে এই তো কালকের ব্যাপার... এখনো ওকে দেখছি চোখের সামনে... বাবা, কী বেপরোয়াই না ছিল ও!" তাঁর চোখে জল এল। "এবার লিজচ্‌কার পালা — কিন্তু ওর বয়সে আমি যা ছিলাম তেমন নয়... খাসা মেয়ে, কিন্তু আমি যা ছিলাম সে রকম নয়..."

'লিজচ্‌কা, আজ... মসলিন ও লিনেনের পোষাকটা তোর পরা উচিত।'

'ওদের ডাকবে নাকি মা? না ডাকলেই ভালো,' অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা ভেবে নিজের উত্তেজনা চাপতে না পেরে জিজ্ঞেস করল লিজা। 'সত্যি বলছি মা, ডাকার দরকার নেই।'

বাস্তবিক ওদের দেখবার ইচ্ছের চেয়ে আতঙ্ক তার বেশী, মনে হতে লাগল গোলমেলে একটা সুখের লগ্ন তার ঘনিয়ে এসেছে।

'ওরা নিজেরাই যেচে হয়ত আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে চাইবে, লিজচ্‌কা,' আন্না ফিওদরভ্‌না বললেন মেয়ের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে সঙ্গে সঙ্গে ভাবলেন: "ওর বয়সে আমার চুল এ রকম ছিল না... সত্যি লিজচ্‌কা, তোকে নিয়ে আমার একটা আশ আছে..." সত্যি ওর জন্য আশ একটা করলেন, নবীন কাউণ্টের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের আশা তিনি করতে পারছেন না, আর বিগত কাউণ্টের সঙ্গে তাঁর মতো সম্পর্ক লিজা করুক নবীন কাউণ্টের সঙ্গে সেটা তো তিনি চাইতে পারেন না। তবু মেয়ের জন্য চাইছেন একটা কিছু, চাইছেন অত্যন্ত আগ্রহে। বিগত কাউণ্টের সঙ্গে সেই যে সময় কাটিয়েছিলেন, কন্যার হৃদয়াবেগ হলে আবার একবার সে সময় ফিরে আসবে তাঁর, এই বোধহয় তাঁর বাসনা।

কাউণ্টের আগমনে অশ্বারোহী বাহিনীর বৃদ্ধ অফিসারও অল্প উত্তেজিত। নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন তিনি। মিনিট পোনেরো পরে বেরিয়ে এলেন ফৌজী টিউনিক ও ঘোড়ায় চড়ার নীল পেণ্টুলেন পরে। বল-নাচের গাউন পরে কুমারী মেয়ের মুখে আসে যে রকম একটি খুশি-খুশি বিব্রত ভাব, সে রকম মুখে গেলেন অতিথিদের জন্য সাজানো ঘরে।

'আজকালকার হুসাররা কেমন চীজ দেখি, বোন। খাঁটি হুসার ছিলেন বিগত কাউণ্ট। দেখা যাক এদের, দেখা যাক!'

অফিসাররা তাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে গেল খিড়কি দিয়ে।

'তোমাকে বলেছিলাম না?' ধুলো-মাখা বুট পায়ে সদ্য পাতা বিছানায় যেমনি ছিল ঠিক তেমনভাবে শুয়ে পড়ে বলল কাউণ্ট। 'তেলেপোকার সেই আস্তানাটার চেয়ে এ বাড়িটা ভালো নয়?'

'তা ভালো, তবে এ'দের কাছে একটা বাধ্যবাধকতায় পড়লাম...'

'কী আবোলতাবোল বকছ! সব ব্যাপারে প্র্যাকটিকাল হওয়া দরকার। এ'রা ভয়ানক খুশি হয়েছেন কোনো সন্দেহ নেই। বোয়!' হাঁকল সে। 'জানলার ওপর কিছু একটা টাঙিয়ে দিতে বলো তো হে, নইলে রাত্তিরে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকবে।'

এ সময়ে অফিসারদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে ঘরে এলেন বৃদ্ধ। এটা অবশ্য তিনি না বলে পারলেন না, যদিও বলার সময়ে একটু লাল হয়ে উঠলেন, যে বিগত কাউণ্টের বন্ধু তিনি ছিলেন, কাউণ্ট তাঁকে দেখতেন স্নেহভরে, এমন কি তাঁর কয়েকটা উপকার করে দিয়েছিলেন বলে তিনি তাঁর কাছে ঋণী। 'উপকার' বলতে তিনি কী মনে করেছিলেন, একশ রুবল ধার করে ফিরিয়ে দেন নি কাউণ্ট সেটা, না বরফের গাদায় ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন, না খিস্তি করেছিলেন সেটা বলা কঠিন, তিনি নিজে কিছু খুলে বললেন না। অশ্বারোহী বাহিনীর বৃদ্ধ অফিসারের সঙ্গে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করল নবীন কাউণ্ট, বাড়িতে জায়গা দেবার জন্য ধন্যবাদ জানাল।

'আহামরি কিছু নেই বলে মাফ করবেন, কাউণ্ট,' (প্রায় 'হুজুর' বলে সম্বোধন করে ফেলেছিলেন আর একটু হলে, পদস্থ লোকদের সম্বোধন করার ব্যাপারে ইতিমধ্যে এত অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি) 'আমার বোনের বাড়িটা অত্যন্ত ছোট। জানলাটার ওপরে কিছু একটা টাঙিয়ে দেওয়া যাবে, তাহলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে,' বলে পর্দার খোঁজে যাওয়ার ছলে পা টেনে টেনে চলে গেলেন তিনি, তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল অফিসারদের বিষয়ে একটা বর্ণনা দেওয়া অবিলম্বে।

মিষ্টি চেহারার ছোটখাটো উসতিউশা জানলার ওপর গৃহকর্ত্রীর

শালটা টাঙিয়ে দিতে এল। তাছাড়া অফিসাররা চা খেতে চান কিনা জিজ্ঞেস করতে বলেছিলেন গৃহকর্ত্রী।

পরিপাটি ঘরবাড়িতে এসে কাউণ্টের মেজাজ খোশ হয়েছে মনে হল। হেসে এত সরসভাবে ঠাট্টা ইয়ার্কি জুড়ে দিল উসতিউশার সঙ্গে যে সে তাকে দুষ্টু বলল। কাউণ্ট জানতে চাইল তার দিদিমণিটি সুন্দরী কিনা, চা খেতে চায় কিনা উসতিউশা জিজ্ঞেস করাতে বলল, তা ঘরে নিয়ে এলেও পারে, তবে চাকর সাপার এখনো তৈরী করে নি বলে যেটা আরো দরকার সেটা হল কিছু ভোদকা, আর মুখে দেবার মতো কিছু, আর কিছুটা শেরী, অবশ্য যদি বাড়িতে থেকে থাকে।

নবীন কাউণ্টের আদবকায়দা নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছেন লিজার মামা, আজকালকার অফিসারদের শত মুখে প্রশংসা করে বললেন তারা তাদের বাপেদের চেয়ে অনেক ভালো, কোনো তুলনা হয় না।

মানতে রাজী হলেন না আন্না ফিওদরভ্‌না — কাউণ্ট ফিওদর ইভানভিচের চেয়ে ভালো হতে পারে না কেউ। শেষটায় এমন কি সত্যি চটে উঠে কঠিন গলায় বললেন, 'দাদা, তোমাকে শেষ বার যে কেউ আদর করে সেই সেরা লোক হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য লোকে আগেকার চেয়ে চালাকচতুর হয়েছে সবাই জানে, তবু কাউণ্ট ফিওদর ইভানভিচ এত অমায়িক ছিলেন, এত ভালো একোসেজ নাচতেন যে বলতে গেলে সবায়ের মাথা ঘুরে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি আমাকে ছাড়া আর কাউকে আমল দেন নি। তাহলে দেখছ তো আগেকার দিনেও ভালো লোকের অভাব ছিল না।'

ঠিক সে সময়ে ভোদকা, খাবার ও শেরী চাইবার কথাটা কানে এল।

'দেখলে তো, দাদা! ঠিক কাজটি তোমাকে দিয়ে কখনো হয় না! সাপারের কথা বলা উচিত ছিল তোমার,' বললেন আন্না ফিওদরভ্না। 'লিজা! তুই ভার নে তো এ সবের, লক্ষ্মীটি!'

জারানো ব্যাঙের ছাতা আর টাটকা মাখনের জন্য ভাঁড়ারে দৌড়ল লিজা, বাবুর্চিকে বলল মাংসের টুকরো সেঁকতে।

'তোমার কাছে শেরী কিছুটা হবে, দাদা?'

'না, বোন। শেরী কখনো থাকে না আমার কাছে।'

'তা কী করে হয়? চায়ের সঙ্গে কী একটা খাও যে?'

'সেটা রাম, আন্না ফিওদরভ্না।'

'তফাৎটা কী? ওদের তাই দাও না, ওই... ইয়ে... রাম। তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু দাদা, ওদের এখানে ডাকলে ভালো হয় না? কী করা উচিত তুমি তো ভালো জানো। ওরা চটবে না তো?'

অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার বললেন তাঁর কোনো সন্দেহ নেই, কাউণ্ট এত দরাজ প্রকৃতির যে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবেন না, তিনি ওদের নিয়ে আসবেন নির্ঘাৎ। আন্না ফিওদরভ্না গেলেন তাঁর পোষাকটা আর একটা নতুন টুপি পরে নিতে; কিন্তু লিজা এত ব্যস্ত যে পরনের চওড়া-হাত গোলাপি রঙের লিনেনের পোষাকটা বদলাবার সময় পেল না। তাছাড়া সে ভয়ানক উত্তেজিত: মনে হল বিরাট কিছু একটা ঘটতে চলেছে, মাথার উপরে কালো একটা মেঘ যেন ঘনিয়ে এসেছে। তার কাছে কাউণ্ট, সুদর্শন এই হুসারটি, অদ্ভুত একটি মানুষ, অভিনব অবোধ্য। তার হাবভাব, চালচলন, কথা বলার ঢং — তার সবকিছু নিশ্চয় এমন অসাধারণ যে সে আগে কখনো দেখে নি, শোনে নি। তার কথা, তার চিন্তা সব নিশ্চয় বুদ্ধিদীপ্ত আর সত্য; যা কিছু সে করে ভালো না হয়ে যায় না; তার চেহারার খুঁটিনাটি পর্যন্ত সুন্দর হতে বাধ্য। সে

বিষয়ে লিজার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। শুধু খাবার আর শেরী নয়, গোলাপ জলে স্নান করতে চাইলেও লিজা বিস্মিত হত না, দোষ দিত না তাকে, তার দৃঢ় বিশ্বাস হত যে সেটাই ঠিক, সঙ্গত।

আন্না ফিওদরভ্না'র আমন্ত্রণ অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারের মুখে শোনামাত্র গ্রহণ করল কাউণ্ট। চুল আঁচড়িয়ে কোট চাপিয়ে সঙ্গে নিল সিগারেট-কেস।

'চলো যাই,' বলল পলজভকে।

'যাওয়াটা উচিত হবে না মনে হচ্ছে,' জবাবে বলল কর্ণেট, 'ils feront des frais pour nous recevoir.'*

'বাজে কথা! ওঁরা আনন্দিত হবেন। খোঁজ খবর নিয়েছি এরি মধ্যে — ভদ্রমহিলার একটি সুন্দরী কন্যা আছে... চলো যাই,' ফরাসীতে বলল কাউণ্ট।

'Je vous en prie, messieurs!'** ওদের কথা ধরে ফেলেছেন, শুধু সেটা বুঝিয়ে দেবার জন্য ফরাসীতে বললেন অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার।

১২

আরক্তিম মুখে চোখ নামিয়ে লিজা চা ঢেলে দেওয়ার কাজে ব্যস্ত হবার ভান দেখাল, ঘরে অফিসাররা ঢোকাতে তাদের দিকে তাকাতে সাহস হল না। আন্না ফিওদরভ্না কিন্তু তড়াক করে দাঁড়িয়ে একটু নীচু হয়ে অভিবাদন জানালেন, কাউণ্টের মুখ থেকে চোখ না সরিয়ে

* আমাদের অভ্যর্থনা করতে গিয়ে ও'রা ফতুর হয়ে যাবেন (ফরাসী ভাষায়)।

** আপনাদের আমন্ত্রণ জানাই, মহাশয়গণ (ফরাসী ভাষায়)।

ক্রমাগত বকে চললেন, বললেন তাকে দেখতে ঠিক বাপের মতো, আলাপ করিয়ে দিলেন মেয়ের সঙ্গে, খেতে দিলেন চা, জ্যাম আর গাঁয়ে তৈরী ফলের লেই। চেহারায় কর্ণেট এত বিনীত যে তাকে কোনো নজর দিল না কেউ; তাতে সে যথার্থ কৃতজ্ঞ বোধ করল, কারণ এতে লিজার সৌন্দর্য খ‍ুটিয়ে দেখার — ভব্যভাবে যতখানি সম্ভব — স‍ুযোগ পাওয়া গেল। বোঝা গেল সে সৌন্দর্য তার মনে দাগ কেটেছে। কাউণ্টের সঙ্গে বোনের বাক্যালাপ কখন বন্ধ হবে তার আশায় বসে আছেন মামাবাব‍ু। অশ্বারোহী বাহিনীতে নিজের জীবনের কথা বলার জন্য এত অস্থির তিনি যে কোনক্রমে নিজের বক্তৃতা চেপে আছেন। কাউণ্ট সিগার ধরাল একটা, কী কড়া, অতিকণ্টে কাশি চাপল লিজা। কাউণ্ট বেশ বলিয়েকইয়ে লোক ও ভদ্র, প্রথমে আন্না ফিওদরভ্‌নার বাক্যস্রোতে মাঝে মাঝে দ‍ু-একটা কথা ছেড়ে তারপর একাই একশ'। একটা জিনিস অদ্ভুত ঠেকল শ্রোতাদের কাছে: তার বাক্য ব্যবহার নিজের দলের লোকের মধ্যে বিসদ‍ৃশ বলে বিবেচিত না হলেও এখানে একটু বেয়াড়া। তাতে অল্প শঙ্কিত হলেন আন্না ফিওদরভ্‌না আর লিজার কর্ণম‍ূল পর্যন্ত রাঙা হয়ে উঠল। এটা কিন্তু চোখে পড়ল না কাউণ্টের। আগেকার মতোই সে অবিচলিত ও অমায়িক। নিঃশব্দে গেলাস ভরে লিজা সেগ‍ুলো অতিথিদের হাতে না দিয়ে তাদের নাগালের মধ্যে নামিয়ে রাখল। তখনো ধাতস্থ হয় নি সে, গভীর আগ্রহে কাউণ্টের প্রত্যেকটি কথা শ‍ুনছে। তার গল্পের তুচ্ছতায় আর থেমে-থেমে বলার দোষে নিজের স্থৈর্য কিছ‍ুটা ফিরে পেল লিজা। যে জ্ঞানীস‍ুলভ উক্তি তার ম‍ুখে শ‍ুনবে বলে আশা করেছিল পেল না শ‍ুনতে, তার সবকিছ‍ুতে একটা মার্জিত ভাব দেখার অস্পষ্ট আশাও মিটল না। তৃতীয় গেলাস চা খাবার সময়ে

সলজ্জভাবে সে চোখ তুলে ওর দিকে তাকাতে কাউণ্ট তার দিকে চেয়ে থেকেই অবিচলিতভাবে কথা বলে চলল, চেয়ে থাকতে থাকতে মুখে এল অতিক্ষীণ হাসি; তখন তার প্রতি সামান্য একটা বিরোধিতার ভাব অনুভব করল লিজা, অল্পক্ষণের মধ্যে তার কাছে ধরা পড়ল যে তার চেনাশোনা লোকেদের সঙ্গে কোনো পার্থক্য নেই ওর, ওকে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। সত্যি বটে, ওর নখগুলো লম্বা আর সযত্নে সাফ করা, তবু ওকে এমনকি বিশেষ সুন্দর পর্যন্ত বলা চলে না। আর হঠাৎ, তার সব স্বপ্ন অলীক বুঝতে পেরে শান্ত হয়ে উঠল লিজা, মনে রয়ে গেল একটু অনুশোচনা। একটি মাত্র জিনিসে শুধু সে বিচলিত, বুঝতে পারল চুপচাপ বসে কর্ণেট একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। "হয়ত ও নয়, এই হল আসল লোক!" ভাবল সে।

১৩

চা পানের পর বৃদ্ধা অতিথিদের অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে বসলেন নিজের জায়গায়।

'আপনি হয়ত বিশ্রাম করতে চান, কাউণ্ট?' জিজ্ঞেস করলেন। কাউণ্ট 'না' বলাতে বলে চললেন, 'আপনাদের কী করে খুশি করব, প্রিয় অতিথিরা? আপনি তাস খেলেন, কাউণ্ট? দাদা দেখো তো এক হাত খেলার বাবস্থা করলে হয়।'

ভাই বললেন, 'কিন্তু তুমি তো নিজে 'প্রেফারেন্স' খেলো। তাহলে একসঙ্গে বসা যাক। খেলতে চান, কাউণ্ট? আর আপনি?'

অফিসাররা জানাল বাড়ির লোকের যা পছন্দ তাই করতে তারা রাজী।

লিজা নিজের ঘর থেকে নিয়ে এল পুরনো তাসের একটা প্যাকেট; এটা দিয়ে সে বের করার চেষ্টা করত আন্না ফিওদরভ্‌নার দাঁতের ব্যথা শিগ্‌গির কমবে কিনা, সহর থেকে সফর সেরে কখন ফিরে আসবেন মামা, প্রতিবেশীরা আসছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। দুমাস ব্যবহার করা হয়েছে তাসগুলোকে, তবু যা দিয়ে আন্না ফিওদরভ্‌না ভাগ্য গণনা করেন তার চেয়ে পরিষ্কার।

'কিন্তু হয়ত অল্প বাজী রেখে খেলা আপনাদের পছন্দ নয়?' জিজ্ঞেস করলেন মামাবাবু। 'আন্না ফিওদরভ্‌না আর আমি পয়েণ্ট পিছু আধ-কোপেক খেলি... তাহলে কী হয়, ও আমাদের পথে বসায়।'

'আজ্ঞে যা আপনাদের মর্জি তাতেই অত্যন্ত খুশি হব,' কাউণ্ট উত্তর দিল।

'তাহলে এক কোপেক করে হোক — কাগজী টাকা। প্রিয় অতিথিদের খাতিরে তা চলে, আমার মতো বুড়ী বেচারীকে দিন হারিয়ে,' চেয়ারে আরাম করে বসে লেসের শাল ঠিক করে নিয়ে বললেন আন্না ফিওদরভ্‌না।

মনে মনে বললেন, "ওদের কাছ থেকে হয়ত একটা রুবল জিতব।" বৃদ্ধ বয়সে জুয়ার নেশা একটু ধরেছে তাঁকে।

'যদি চান তাহলে 'অনার্স' নিয়ে খেলাটা আপনাকে শিখিয়ে দিই,' কাউণ্ট বলল। 'আর 'মিজারি' খেলাটা! বেশ মজার খেলা।'

খেলার নতুন সেণ্ট পিটার্সবুর্গ পদ্ধতিতে সবাই অত্যন্ত খুশি। মামাবাবু জানিয়ে দিলেন পদ্ধতিটা তিনি জানতেন এককালে, অনেকটা 'বস্টন' খেলার মতো আর কি, কিন্তু এখন সবটা মনে নেই। কিছুই মাথায় ঢুকল না আন্না ফিওদরভ্‌নার, অনেক সময় ঢুকল না বলে তিনি বরাবর মৃদু হেসে, মাথা নেড়ে 'বুঝেছি,

এখন সব বুঝেছি' বলাটা সমীচীন মনে করছিলেন। খেলার মাঝখানে আন্না ফিওদরভ্না টেক্কা ও সাহেব হাতে থাকা সত্ত্বেও 'মিজারি' ডেকে ছ' দান পেয়ে গেলেন, তখন এল খুব একচোট হাসির পালা। অত্যন্ত বিব্রত হয়ে, ক্ষীণ হাসি হেসে তাড়াতাড়ি তিনি জোর দিয়ে বললেন খেলার নতুন পদ্ধতিটা এখনো ঠিক তাঁর সড়গড় হয় নি। তবু হারের অংকটা বসানো হল তাঁর নামে, আর অংকটা হল বেশ, বিশেষ করে এইজন্য যে বড়ো বাজী রেখে খেলায় অভ্যস্ত কাউণ্ট খেলছিল সাবধানে, হিসাব রাখছিল সঠিক; টেবিলের নীচে কর্ণেটের পায়ের খোঁচা আর খেলায় তার তাজ্জব ভুলের অর্থটা ধরা পড়ল না তার কাছে।

লিজা নিয়ে এল আরো ফলের লেই, তিন রকমের জ্যাম আর রসে চোবানো আপেল। মায়ের চেয়ারের পেছন থেকে খেলা দেখতে লাগল সে: মাঝে মাঝে দেখছে অফিসারদের, বিশেষ করে তাস ফেলে দিয়ে জিতের তাস সুদক্ষ সুষ্ঠুভাবে ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তুলে নেওয়ার সময় কাউণ্টের ফর্সা হাত, হাতের সরু শাদা লালচে নখ।

আন্না ফিওদরভ্না আবার অত্যন্ত অস্থির হয়ে, অন্যদের টেক্কা দেবার বেপরোয়া চেষ্টায় বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে হারিয়ে সাত পর্যন্ত ডেকে নিলেন মাত্র চার, আর ভাইয়ের অনুরোধে হিসেবের পাতায় হিজিবিজি করে কয়েকটা সংখ্যা বসিয়ে দিলেন, অস্বস্তি বোধ করায় ভদ্রমহিলা নির্ঘাৎ তাড়াতাড়ি করছিলেন।

'দমে যেও না, মা, সব আবার জিতে নেবে,' হাস্যকর অবস্থা থেকে মাকে উদ্ধারের চেষ্টায় মৃদু হেসে লিজা বলল। 'মামার তাসগুলো নিয়ে নাও, তাহলে উনি গভীর জলে পড়বেন।'

'তুই আমাকে সাহায্য করলে পারিস, লিজচ্কা,' ভীত দৃষ্টিতে

মেয়ের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন আন্না ফিওদরভ্না। 'জানি না কী করে...'

'নতুন নিয়মে খেলতে আমিও জানি না,' মায়ের হারের হিসেব মনে করতে করতে লিজা বলল। 'কিন্তু এভাবে খেললে ফতুর হয়ে যাবে মা। পিমচ্কাকে একটা ফ্রক কিনে দেবার পয়সা পর্যন্ত থাকবে না,' বলল ঠাট্টা করে।

'সত্যি বলেছেন, এভাবে খেললে অন্তত দশটা রুপোর রুবল অনায়াসে খোয়ানো যায়,' লিজার দিকে তাকিয়ে কর্ণেট বলল, তার সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার বাসনা তার।

'কিন্তু আমরা তো কাগজী টাকা নিয়ে খেলছি, তাই না?' খেলুড়েদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আন্না ফিওদরভ্না।

'জানি না কী করে,' বলল কাউণ্ট, 'কিন্তু কাগজী টাকা কী করে হিসেব করতে হয় আমার জানা নেই। সেটা আপনি কী করে... মানে, কাগজী টাকাটা কী ব্যাপার?'

'আজকাল কাগজী টাকা দিয়ে কেউ খেলে না,' বলে উঠলেন মামাবাবু, তিনি জিতছিলেন।

বৃদ্ধা কিছু ফলের রস আনিয়ে নিজেই খেলেন দু গেলাস, মুখটা লাল হয়ে উঠল আর মনে হল হতাশায় যাকে বলে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। এমন কি টুপির নীচে থেকে বেরিয়ে আসা এক গোছা পাকা চুল আবার গুঁজে দেবার খেয়াল পর্যন্ত হল না তাঁর। লক্ষ লক্ষ টাকা হারিয়ে ফতুর হয়ে গেছেন, ভাবছিলেন নিঃসন্দেহে। বারে বারে কর্ণেট টেবিলের তলা থেকে পা দিয়ে খোঁচা মারছে কাউণ্টকে, কাউণ্ট কিন্তু বৃদ্ধার হার নিয়মিতভাবে লিখে চলল। শেষ পর্যন্ত খেলা শেষ হল। বিবেকের বালাই না রেখে নিজের ভাগে কিছু যোগ করার এবং হিসেবে ভুল করেছেন আর সাধারণত হিসেব

করতে তিনি পারেন না ভান করার বিপুল চেষ্টা, আর নিজের ভয়ঙ্কর লোকসানে বিভীষিকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত হিসেব করে দেখা গেল যে তিনি নশ বিশ পয়েন্ট হেরেছেন। 'তার মানে কাগজী টাকায় ন রুবল, তাই না?' বার কয়েক তিনি জিজ্ঞেস করলেন, নিজের হারের সম্পূর্ণ অঙ্কটা মাথায় ঢুকল না তাঁর যতক্ষণ না ভাই তাঁকে আতঙ্কগ্রস্ত করে দিয়ে বুঝিয়ে বললেন যে তিনি কাগজী টাকায় সাড়ে বত্রিশ রুবল হেরেছেন, আর টাকাটা দিতেই হবে। খেলা শেষ হতে নিজের লাভ হিসেবের পরোয়া না করে কাউন্ট উঠে পড়ে গেল জানলার কাছে, সেখানে সাপারের খাবার সাজাচ্ছিল লিজা, রেকাবীতে রাখছিল ব্যাঙের ছাতা। সারা সন্ধ্যে কর্ণেট যেটা চেষ্টা করে পারে নি, সেটা কাউন্ট করল সোজাসুজি, অত্যন্ত অনায়াসে: আবহাওয়া নিয়ে লিজার সঙ্গে কথাবার্তা জুড়ে দিল।

সে সময়ে কর্ণেটের অবস্থাটা অত্যন্ত করুণ। কাউন্ট, আর বিশেষ করে লিজা চলে যেতে বৃদ্ধা আর নিজের মনোভাব চাপতে পারলেন না। মনকে প্রবোধ দেবার জন্য লিজা নেই।

'আপনার টাকা জিতে নেওয়ায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত,' কিছু একটা বলার খাতিরে বলল কর্ণেট। 'ব্যাপারটা আমাদের তরফ থেকে খুব ভদ্র হয় নি।'

'আপনাদের এই সব 'অনার্স' আর 'মিজারির' ফিকির! ওভাবে খেলতে আমি জানি না। কাগজী টাকায় কত যেন বললেন?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'বত্রিশ রুবল, সাড়ে বত্রিশ,' পুনরাবৃত্তি করলেন অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসার, জিতেছেন বলে তিনি বেশ খোশমেজাজে। 'টাকাটা দাও তো বোন, সত্যি, আমাকে দিয়ে দাও তো।'

'সব দিচ্ছি, আপনাদের সঙ্গে আর কখনো খেলছি না, এত হার জীবনে কখনো উশ্নল করতে পারব না।'

আন্না ফিওদরভ্না দ্নলতে দ্নলতে তাড়াতাড়ি গিয়ে ন র্নবলের কাগজী টাকা নিয়ে এলেন। বৃদ্ধের নির্বন্ধে শ্নধ্ন প্নরো টাকাটা দিলেন। আবার কথা বললে আন্না ফিওদরভ্না নিন্দে করে বক্তৃতা জ্নড়ে দেবেন বলে ক্ষীণ একটা আশঙ্কা কর্ণেটের। তাই চুপচাপ কেটে পড়ে সে গেল কাউণ্ট আর লিজার ওখানে, খোলা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ওরা দ্নজন কথা বলছিল।

সাপারের জন্য পাতা টেবিলে দ্নটো মোমবাতি। মে রাত্রির ফুরফুরে উষ্ণ হাওয়ায় থেকে থেকে কে'পে উঠছে আলোর শিখা। বাগানের দিকে খোলা জানলাটায় আলো, কিন্তু ঘরের আলোয় মতো নয় একেবারে। সোনালী আভা ইতিমধ্যে হারিয়ে ফেলছে প্নর্ণিমার চাঁদ, লাইম গাছের উ'চু চুড়োর ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে, বয়ে-যাওয়া স্বচ্ছ শাদা রোঁয়া-রোঁয়া মেঘগ্নলোকে ভাসিয়ে দিচ্ছে ক্রমশঃ জোরালো জ্যোৎস্নায়। ওদিকের প্নকুরে দল বে'ধে ব্যাঙ ডাকছে, গাছের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে জ্যোৎস্নায় র্নপালী ঝকঝক জলের টুকরো। জানলার নিচে হাওয়ায় দ্নলন্ত ভিজি ফুলের গোছা নিয়ে দাঁড়ানো স্নগন্ধি লাইলাক ঝোপের মধ্যে শোনা যাচ্ছে কয়েকটা পাখির দাপাদাপি আর পাখার ঝাপট।

'কী অদ্ভুত রাত্রি!' বলে কাউণ্ট লিজার কাছে গিয়ে জানলার নীচু ধারিতে বসল। 'আপনি প্রায়ই বেড়াতে যান নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ,' বলল লিজা। কী কারণে যেন কাউণ্টের সঙ্গে কথা বলতে বিন্দ্নমাত্র অস্বস্তি লাগল না তার। 'সকাল সাতটায় বাড়ির কাজকর্ম করতে বেরোই। তাছাড়া হে'টে আসি পিমচ্কার সঙ্গে, ওই যে ছোট্ট মেয়েটাকে মা প্নষ্যি নিয়েছেন, তার সঙ্গে।'

'সত্যি গাঁয়ে থাকতে এত ভালো লাগে,' মনোকলটা চোখে বসিয়ে একবার বাগানের দিকে, একবার লিজার দিকে তাকাতে তাকাতে বলল কাউণ্ট। 'চাঁদের আলোয় কখনো কি বেড়াতে বেরোন?'

'এখন নয়। বছর তিনেক আগে মামা আর আমি চাঁদিনী রাতে নিয়ম করে বেরোতাম, তখন ওঁর একটা অদ্ভুত অসুখ হল — ঘুমোতে পারেন না। পূর্ণিমার চাঁদ হলে কিছুতে ঘুম আসে না। ওঁর ঘরটা — ওদিকের ঘরটা — একেবারে বাগানের ওপর আর জানলাটা নীচু; তাই চাঁদের আলো সোজা ওঁর ওপর পড়ে।'

'অদ্ভুত,' বলল কাউণ্ট। 'ওটা আপনার ঘর ভেবেছিলাম।'

'আজ রাত্তিরটা শুধু ওখানে থাকব। আমার ঘরে আপনারা ঘুমুবেন।'

'তাই নাকি?.. সত্যি, আপনার অসুবিধে ঘটাচ্ছি বলে নিজেকে কখনো ক্ষমা করতে পারব না।' নিজের আন্তরিকতা দেখাবার জন্য মনোকলটা চোখ থেকে খুলে ফেলল কাউণ্ট। 'আমরা আসাতে আপনাদের এত অসুবিধে হবে জানলে...'

'অসুবিধে আবার কী! বরং আমি খুব খুশি হয়েছি: মামার ঘরটা বেশ — আলো-ভরা আর ঝকঝকে, জানলাটা নীচু, ঘুম না আসা পর্যন্ত বসে থাকব জানলায়, কিম্বা হয়ত শোবার আগে জানলা বেয়ে বাগানে নেমে ঘুরে আসব।'

"কী মধুর মেয়েটি!" ভালো করে তাকে দেখার জন্য মনোকলটা আবার এ'টে নিয়ে, জানলার ধারিতে বসার ছলে পা দিয়ে তার পা ছোঁবার চেষ্টা করতে করতে ভাবল কাউণ্ট। "আর কী সেয়ানাভাবে আমাকে জানিয়ে দিল যে ইচ্ছে হলে জানলায় এসে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি।" বাস্তবিক মেয়েটিকে এত সহজে

জয় করে ফেলেছে মনে হওয়াতে তার প্রতি আগেকার আকর্ষণ অনেকটা কমে গেল। অন্ধকার বীথিকার দিকে ভাবুকের মতো তাকিয়ে বলল, 'সত্যি মনের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে বাগানে আজকের রাত্তিরটা কাটানো কী সুখের!'

কথাটায়, আর যেন দৈবাৎ কাউণ্টের পা নিজের পায়ে আর একবার ঠেকে যাওয়াতে বিব্রত বোধ করল লিজা। সেটা ঢাকার জন্য কিছু না ভেবেই যা হোক একটা কিছু তাড়াতাড়ি বলার চেষ্টা করল। বলল, 'হ্যাঁ, চাঁদের আলোয় বেড়াতে চমৎকার লাগে।' অস্বস্তি বোধ করে, ব্যাঙের ছাতার বোতল তাড়াতাড়ি বেঁধে চলে যাবার উপক্রম করছে, অমনি কর্ণেট এসে পড়ল, আর তখন লোকটা কেমন দেখে নেবার একটা ইচ্ছে হল তার।

'কী সুন্দর রাত্রি?' বলল কর্ণেট।

"এরা দেখছি আবহাওয়া ছাড়া আর কোনো বিষয়ে কথা বলে না," ভাবল লিজা।

'আর দৃশ্যটা কী মধুর!' বলে চলল কর্ণেট। 'কিন্তু মনে হচ্ছে এ সবে এরি মধ্যে আপনার অরুচি ধরে গেছে,' যোগ করল সে। যাদের খুব ভালো লাগে তাদের অপ্রীতিকর কিছু একটা বলার অদ্ভুত অভ্যেস তার বরাবর আছে।

'কেন সেটা ভাবছেন? একই খাবার বা একই ফ্রকে অরুচি ধরে যায়, কিন্তু সুন্দর বাগানে কখনো অরুচি হয় না, বিশেষ করে চাঁদ যখন আরো উঁচুতে ওঠে। মামার ঘর থেকে পুকুরের সবটা দেখা যায়। আজ রাত্তিরে দেখব।'

'আপনাদের এখানে নাইটিংগেল নেই, মনে হচ্ছে?' বলল কাউণ্ট। অসময়ে এসে পড়ে বাধা দিয়েছে পলজভ, নৈশ অভিসারের পাকাপাকি বন্দোবস্ত কিছু করা হল না, বেজায় অসন্তুষ্ট সে।

'না। এক সময়ে ছিল, কিন্তু গেল বছরে একজন শিকারী একটিকে ধরেছিল, আর এ বছরে — মানে গত সপ্তাহে — সুন্দর ডাকছিল একটা, কিন্তু একটা কনস্টেবল গাড়ির ঘণ্টা বাজিয়ে গেল, আর পাখিটা ভয় পেয়ে উড়ে গেল। গেল বছরের আগের বছরে মামা আর আমি বাগানের পথে গাছের নীচে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওদের গান শুনতাম।'

'ক্ষুদে বকুনতুড়েটি কী শোনাচ্ছে আপনাদের?' কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন মামাবাবু। 'কিছু মুখে দেবেন না আপনারা?'

সাপারের সময়ে কাউণ্ট খাবারের তারিফ করাতে আর এক পেট খাওয়াতে আন্না ফিওদরভ্‌নার মেজাজটা একটু ভালোর দিকে গেল। খাওয়ার পর অফিসাররা নমস্কার জানিয়ে গেল নিজেদের ঘরে। মামাবাবুর করমর্দন করল কাউণ্ট, আর আন্না ফিওদরভ্‌নাকে অবাক করে দিয়ে হাতে চুমু না খেয়ে তাঁরো করমর্দন করল, এমন কি লিজারও, করমর্দনের সময়ে সোজা তার চোখে চোখ রেখে হাসল তার সেই মৃদু ও মিষ্টি হাসি। তার চাউনিতে আবার বিব্রত লাগল লিজার।

"চেহারাটা ভালো," সে ভাবল, "কিন্তু বড্ডো জাঁক নিজের বিষয়ে।"

১৪

'তোমার লজ্জা করছে না?' নিজেদের ঘরে পৌঁছিয়ে জিজ্ঞেস করল পলজভ। 'হারার যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম, ক্রমাগত তোমাকে টেবিলের নীচে পা দিয়ে খোঁচা লাগিয়েছি। তোমার বিবেক বলে কিছু নেই। বৃদ্ধা ভয়ানক ব্যথিত হয়েছেন।'

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল কাউণ্ট।

'কী মজার বুড়ীটা! মনে বড়ো আঘাত পেয়েছেন!'

আর আবার হাসির গমকে ফেটে পড়ল সে, হাসিটা এত সংক্রামক যে তার সামনে দণ্ডায়মান ইওহান পর্যন্ত চোখ নামিয়ে চোরা মুচকি হাসি হাসল একটু।

'পরিবারের পুরনো বন্ধুবরের সন্তান!.. হো, হো, হো!' হেসে চলল কাউণ্ট।

'কিন্তু সত্যি ওটা ভালো করো নি, ওঁর জন্যে আমার এমন কি দুঃখ হচ্ছিল,' কর্ণেট বলল।

'কাঁচকলা! তুমি এখনো নেহাৎ বাচ্চা দেখছি! তুমি চাও আমি হারি? হারব কেন? যখন খেলা জানতাম না তখন তো হেরেছি। দশটা রুবল কাজে লাগে, ভাই। প্র্যাকটিকাল হওয়া চাই, বুঝলে? নইলে বোকা বনে যেতে হয়।'

চুপ করে গেল পলজভ। তার ইচ্ছে আত্মস্থ হয়ে লিজার কথা ভাবা, লিজাকে তার অসাধারণ নিষ্পাপ ও সুন্দর ঠেকেছে। জামাকাপড় ছেড়ে তার জন্য পাতা নরম পরিষ্কার বিছানায় সে গা ঢেলে দিল।

"ফৌজী জীবনের সম্মান আর যশ, কী বাজে কথা সব!" শালে ঢাকা জানলা দিয়ে চুপি চুপি আসা চাঁদের ক্ষীণ আলোর দিকে তাকিয়ে ভাবল সে। "এই হল সুখ — শান্ত কোনো গেহে সহজ মধুর বুদ্ধিমতী স্ত্রীর সঙ্গে থাকা! এই হল আসল আর পাকা সুখ!"

কিন্তু কী কারণে যেন মনের কথা বলল না বন্ধুকে, গাঁয়ের মেয়েটির কথা উল্লেখ পর্যন্ত করল না একবার, যদিও তার কোনো সন্দেহ ছিল না যে কাউণ্টও ভাবছে তার কথা।

'জামাকাপড় ছাড়ছ না কেন?' জিজ্ঞেস করল পদচারণারত কাউণ্টকে।

'কেন জানি না ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না। ইচ্ছে হলে আলোটা নিভিয়ে দাও, আমার দরকার নেই।'

পায়চারি থামাল না কাউণ্ট।

'ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না,' আওড়াল পলজভ। সে সন্ধ্যার সব ঘটনায় নিজের ওপর কাউণ্টের প্রভাবে তার বিরক্তি ধরে গেছে, এত বিরক্ত আগে কখনো হয় নি, আর প্রভাবটা দাবানোর মতো তার মনের অবস্থা এখন। মনে মনে তুর্বিনকে বলল, "তোমার ওই চকচকে মাথার মধ্যে কী চিন্তা পাক খাচ্ছে ঠাহর করা শক্ত নয়! কেমন মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন ওকে দেখে সেটা তো দেখলাম! কিন্তু ওর মতো সহজ ও শুচি মানুষকে বোঝার ক্ষমতা তোমার নেই। তোমার চাই মিনার মতো মেয়ে আর কর্ণেলের ভূষণ। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখি লিজাকে কেমন লেগেছে।"

কিন্তু পাশ ফিরে কাউণ্টকে সম্বোধন করতে গিয়ে সংকল্প বদলাল সে। মনে হল লিজার বিষয়ে কাউণ্টের যা ধারণা হয়েছে বলে সে ধরে নিয়েছে ঠিক যদি তাই হয় তাহলে শুধু যে আপত্তি জানাতে পারবে না তা নয়, হয়ত দেখবে তার কথায় সায় পর্যন্ত দিচ্ছে, কাউণ্টের প্রভাব মেনে নেওয়া তার এমন অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে, যদিও দিনের পর দিন সে প্রভাবটা আরো অযৌক্তিক, আরো অসহ্য হয়ে পড়ছে।

'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?' কাউণ্ট টুপি চাপিয়ে দরজার দিকে যেতে সে জিজ্ঞেস করল।

'আস্তাবলে। দেখে আসি সব ঠিক কিনা।'

"অদ্ভুত," ভাবল কর্ণেট, কিন্তু আলো নিভিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে চেষ্টা করল এই সেদিনকার বন্ধুকে নিয়ে মাথায় যে সব আজগুবি ঈর্ষা ও শত্রুতার চিন্তা আসছে সেগুলো তাড়িয়ে দিতে।

এদিকে নিয়মমত ভাই, মেয়ে ও পোষ্যকে আদর করে চুমু খেয়ে ও তাদের ওপর ক্রুশ-চিহ্ন করে আন্না ফিওদরভ্না নিজের ঘরে চলে গিয়েছেন। একদিনে এত সুতীব্র নানা অনুভূতি বহুকাল তাঁর হয় নি। এমন কি শান্তভাবে প্রার্থনা পর্যন্ত করতে পারলেন না তিনি, বিগত কাউণ্টের বিষণ্ণ ও সুস্পষ্ট স্মৃতি, আর তাঁর কাছ থেকে নির্লজ্জভাবে টাকা-কেড়ে-নেওয়া এই ছোকরা ফুলবাবুটির কথা এত বিচলিত করেছিল তাঁকে। তবু জামাকাপড় ছেড়ে, বিছানার পাশে ছোট টেবিলে তাঁর জন্য সর্বদা রাখা আধ গেলাস ক্ভাস খেয়ে তিনি বরাবরকার মতো বিছানায় ঢুকলেন। পেয়ারের বেড়ালটা গুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল। তাকে কাছে ডেকে গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে শুনতে লাগলেন তার গরগরানি, ঘুম আর আসে না চোখে।

"বেড়ালটার জন্যে ঘুম আসছে না," ভেবে ঠেলে সরিয়ে দিলেন সেটাকে। মেঝেতে টুপ করে পড়ে বেড়ালটা ফাঁপাফোলা লোমওয়ালা ল্যাজ বেঁকিয়ে চুল্লির ওপরে উঠল লাফিয়ে। ঠিক সে সময়ে কর্ত্রীর ঘরের মেঝেতে যে ঝিটি শুত সে এসে তোশক এনে বিছিয়ে বাতিটা নিভিয়ে আইকন-দীপ জ্বালাল। নাক ডাকাতে তার দেরী হল না, কিন্তু আন্না ফিওদরভ্নার বিক্ষুব্ধ মনে ঘুমের শান্তি আর আসে না। যখনি চোখ বোজেন তখনি দেখেন হুসারের মুখ, আর চোখ খুললে মনে হয় ঘরের সব কটা জিনিস বিচিত্রভাবে তারি প্রতিচ্ছবি — আইকন-দীপে অল্প উদ্ভাসিত কমোড, টেবিল,

টাঙানো শাদা ফ্রকগুলো, সবকিছু। পালকের লেপে এই মনে হল দম বন্ধ হয়ে আসছে, পরমুহূর্তে আবার ঘড়ির ঘণ্টা বা ঝির নাক ডাকাতে বিরক্তি ধরে যাচ্ছে। মেয়েটিকে জাগিয়ে হুকুম দিলেন যেন নাক না ডাকে। মনে অদ্ভুতভাবে জট পাকিয়ে যাচ্ছে মেয়ের কথা, বিগত কাউণ্ট ও নবীন কাউণ্টের কথা, 'প্রেফারেন্স' খেলার কথা। একবার দেখলেন ওয়াল্‌জ্‌ নাচছেন বিগত কাউণ্টের সঙ্গে, দেখলেন নিজের গোলগাল শুভ্র কাঁধ, তাতে যেন কার অধরের স্পর্শ, আবার দেখলেন নবীন কাউণ্টের বাহুবন্ধনে মেয়েকে। নাক ডাকাতে শুরু করল উস্তিউশ্‌কা আবার...

"না, না; লোকে আর আগেকার মতো নেই। আমার জন্যে তিনি আগুনে ঝাঁপ দেবার পরোয়া করতেন না। করতেন না যে, তার কারণ ছিল যথেষ্ট। কিন্তু এটি দেখছি গাধার মতো ঘুমোচ্ছে, জিতেছে বলে খুশি, প্রেম করার জন্যে নড়াচড়ার ইচ্ছে পর্যন্ত নেই। কিন্তু ওর বাপ হাঁটু গেড়ে বসে কী না বলতেন! 'কী করতে বলো আমাকে? নিজেকে মেরে ফেলব?' আর আমি চাইলে নিশ্চয় তাই করতেন।"

হঠাৎ হল-ঘরে শোনা গেল খালি পায়ের মৃদু শব্দ, আর লিজা বিবর্ণমুখে কম্পিত দেহে দৌড়ে ঘরে ঢুকে প্রায় পড়ে গেল মায়ের বিছানায়, তার গায়ে ড্রেসিং-জ্যাকেটের ওপর শুধু একটা শাল চাপানো...

মাকে শুভরাত্রি জানিয়ে লিজা গিয়েছিল একা মামার ঘরে। শাদা একটা ড্রেসিং-জ্যাকেট পরে, লম্বা ঘন বিনুনি রুমালে বেঁধে, বাতি নিভিয়ে জানলা খুলে পা গুটিয়ে বসেছিল একটা চেয়ারে, বিষণ্ণ চিন্তায় মগ্ন হয়ে চেয়েছিল রুপালী আলোয় ঝিকঝিকে পুকুরটার দিকে।

তার প্রতিদিনকার সমস্ত কাজ আর আগ্রহের জিনিস হঠাৎ দেখা দিল সম্পূর্ণ নতুন একটা চেহারায়: বুড়ী খামখেয়ালী মা, যার প্রতি অকপট অনুরাগ সত্তার সঙ্গে মিশে গিয়েছে; কোমলপ্রকৃতি দুর্বল মামা, নকীনাকর্ত্রীতে অনুরক্ত বাড়ির ঝিচাকর আর চাষী, গরু আর বাছুর, আর কত না হেমন্তের ক্ষয় আর কত বসন্তের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে পরিচিত তার প্রাকৃতিক পরিবেশ, যার মধ্যে ভালোবেসে ও ভালোবাসা পেয়ে সে বড়ো হয়েছে, যা থেকে পেয়েছে হালকা মধুর মনের শান্তি — সমস্ত এখন মনে হল কিছু না, মনে হল ক্লান্তিকর, অপ্রয়োজনীয়। কে যেন কানে কানে বলছে, "হায়রে, কী বোকা! সত্যিকার জীবন আর সুখ কাকে বলে না জেনে বিশটা বছর অপরের সেবায় নষ্ট করেছে!" ঝকঝকে, নিস্তব্ধ বাগানের গভীরে চেয়ে এ সব চিন্তা এখন আরো প্রবলভাবে এল মাথায়, এমন প্রবলভাবে কখনো আসে নি আগে। কে জাগাল তাদের? অনেকে ভাবতে পারেন, কাউন্টের প্রতি অকস্মাৎ অনুরাগ, কিন্তু সেটা সত্যি নয় একেবারে। বরং তাকে ভালো লাগে নি লিজার। আরো সহজে সে প্রেমে পড়তে পারত কর্ণেটের কিন্তু লোকটি সাদাসিধে, গরিব আর স্বল্পভাষী। লিজা এরিমধ্যে ভুলে গিয়েছে তাকে। কিন্তু কাউন্টের কথা মনে পড়ছে রাগে আর বিরক্তিতে। "না, ও সে লোক নয়," মনে মনে বলল সে। তার আদর্শ মানুষ হল সর্বাঙ্গসুন্দর, এমন কেউ যাকে আজকের মতো রাত্রে, আজকের মতো পরিবেশে ভালোবাসা যায় চারিদিককার সৌন্দর্য ক্ষুণ্ণ না করে, স্থূল বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য একবারও হেয় করা হয় নি সে আদর্শকে।

প্রেমের যে বিপুল শক্তি আমাদের সকলের অন্তরে সমানভাবে দিয়েছেন পরমেশ্বর, সেটি প্রথম প্রথম লিজার অন্তরে অটুট ও

অব্যাহত ছিল তার নিঃসঙ্গ জীবনের ফলে, কৌতূহল-জাগানো লোকের অভাবে। কিন্তু নিজের মধ্যে এই কিছু একটার অস্তিত্বের বিষণ্ণ আনন্দ-ভরা অনুভূতি নিয়ে সে থেকেছে অনেক দিন (মাঝে মাঝে রহস্যময় অন্তরের ঢাকনা খুলে চুপি চুপি তাকিয়ে তার রত্ন ভান্ডার উপভোগ করত) — এত দিন যে হঠাৎ-দেখা কোনো নবাগতকে সেটা উজাড় করে দেওয়া চলে না। ভগবান করুন যেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে এই সামান্য সুখ নিয়েই থাকে! এটাই যে শ্রেষ্ঠ ও বিপুলতম আনন্দ নয়, কে বলতে পারে? কে বলতে পারে যে একমাত্র এটাই আসল ও সম্ভাব্য আনন্দ নয়?

"হে ঈশ্বর," মনে মনে বলে ওঠে লিজা, "আমার যৌবন আর সুখ বয়ে গেছে, তাদের স্বাদ পাব না কখনো... এটা কি সম্ভব? সত্যি কি সেটা?" আর চোখ তুলে তাকাল ঝকঝকে আকাশে, যেখানে চাঁদের দিকে অগ্রসর তুলোর মতো শাদা মেঘ ঢেকে দিচ্ছে তারাগুলোকে। "একেবারে ওপরের মেঘটা যদি চাঁদ ছোঁয়, তাহলে এটা সত্যি," বলল নিজেকে। দীপ্ত আকাশমন্ডলের নীচের দিকে ছড়িয়ে পড়ল একটা কুয়াশা-ভরা ধোঁয়াটে ফালি, আর আস্তে আস্তে ঘাস, লাইম গাছের চুড়ো আর পুকুরের ওপরের ঝকঝকে আশ্লে ঝাপসা হয়ে এল, অস্পষ্ট হয়ে গেল গাছের কালো ছায়া। আর যেন পৃথিবীকে আঁধার করা বিষণ্ণ ছায়াগুলোতে সাড়া দিয়ে পাতার ওপর দিয়ে বইল মৃদুমন্দ হাওয়া... জানলায় বয়ে আনল শিশিরে-ভেজা পাতা, ভেজা মাটি ও লাইলাক ফুলের গন্ধ।

"না, সত্যি নয়," নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে লিজা ভাবল, "আজ রাতে যদি একটা নাইটিংগেল গান ধরে তাহলে আমার সব বিষণ্ণ চিন্তা শুধু বোকামি, হতাশ হবার কারণ নেই।" অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইল কার প্রত্যাশায়; মাঝে মাঝে মেঘের

আড়াল থেকে চাঁদ বেরিয়ে আসাতে আলো হয়ে যাচ্ছে দৃশ্যপট, আবার পৃথিবীতে ছায়া ফেলে চলে যাচ্ছে মেঘের পেছনে। ঘুমিয়ে পড়েছে প্রায়, পুকুরের ধার থেকে কানে এল একটি নাইটিংগেলের মুক্তকণ্ঠ গান। চোখ খুলল গাঁয়ের কন্যাটি। দীপ্ত ও প্রশান্তভাবে চারিদিকে প্রসারিত প্রকৃতির সঙ্গে আবার নতুন উচ্ছ্বাসে একটা রহস্যময় সাযুজ্যে উজ্জীবিত হল তার হৃদয়। কনুই-এ ভর দিয়ে বসল সে। অন্তরে মধুর বিষণ্ণতার জোয়ার, চোখ ভরে গেল জলে, বিপুল ও পূত প্রেমের সার্থকতার জন্য ব্যাকুল সে অশ্রু — শুভ ও সান্ত্বনাদায়ী। জানলার ধারিতে হাত রেখে তাতে মাথা রাখল সে। প্রিয় একটি প্রার্থনার মন্ত্র আপনা থেকে উচ্চারিত হল অন্তরে আর ঠিক যেমন ছিল তেমনভাবে তন্দ্রায় ঢলে পড়ল লিজা, চোখ তখনো অশ্রুসিক্ত।

কার হাতের স্পর্শে তন্দ্রা টুটল। জেগে উঠল লিজা। হালকা, মধুর স্পর্শ। মুঠো শক্ত হয়ে বসল হাতে। হঠাৎ স্থানকাল বুঝে অস্ফুট চীৎকার করে সে লাফিয়ে উঠল, জানলার ধারে দাঁড়ানো, জ্যোৎস্নায় চিকচিকে মানুষটি কাউণ্ট হতে পারে না, নিজেকে এই বলে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

১৫

মানুষটি কিন্তু কাউণ্টই। মেয়েটির চীৎকার ও বেড়ার অন্যধার থেকে রাত্রির পাহারাদারের গলা খাঁকারি কানে আসাতে সে চকিতে শিশির-সিক্ত ঘাসের ওপর দৌড়িয়ে ঢুকল বাগানের গভীরে, ভাবটা হাতেনাতে ধরা-পড়া চোরের মতো। নিজেকে বলল, "কী বোকা

আমি! ওকে ভয় পাইয়ে দিলাম। আরো সাবধান হওয়া উচিত ছিল। উচিত ছিল কথা বলে ওকে জাগানো। কী গাধা আমি!" থেমে কান পেতে রইল: ফটক হয়ে বাগানে ঢুকে পাহারাদার কাঁকরের পথে লাঠি ঘষটে আসছে। না লুকোলে নয়। পুকুর পারে নেমে গেল সে। একেবারে পায়ের তলা থেকে ভয়ে লাফ দিয়ে ঝপাস্ করে জলে ঝাঁপিয়ে ব্যাঙগুলো চমকে দিল তাকে। পা ভিজে গেছে, তবু উবু হয়ে বসে নিজের কীর্তি মনে তোলাপাড়া করে দেখতে লাগল: বেড়া ডিঙিয়ে কী করে ওর জানলাটা খুঁজে বের করে শেষে দেখলে ওর অস্পষ্ট ছায়া; পাছে সামান্য খসখস আওয়াজটুকুও হয়, কয়েক বার কাছে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে; একবার নিশ্চিত মনে হয়েছে ও তারি অপেক্ষায় আছে, এমন কি এত দেরী করাতে বেশ চটেছে, পরমুহূর্তে আবার নিশ্চিত মনে হয়েছে, গোপন মিলনে এত চট করে রাজী হতে সে কখনো পারে না; গাঁয়ের মেয়েসুলভ সরমে পড়ে ঘুমের ভান করছে, অবশেষে এই ধরে নিয়ে কাছে গিয়ে দেখেছে সত্যি সত্যি ও ঘুমিয়ে পড়েছে; কেন জানি না তক্ষুণি ফিরে এসেছে তাড়াতাড়ি, কিন্তু নিজের কাপুরুষতায় লজ্জা বোধ করে আবার গিয়ে সাহস ভরে হাত রেখেছে তার হাতে। গলা খাঁকারি দিল আবার রাতের পাহারাদার, বাগান থেকে বেরিয়ে যাওয়াতে কিঁচকিঁচ করে উঠল ফটকটা। মেয়েটির ঘরের জানলা দড়াম করে বন্ধ হল, ভেতরের খড়খড়ি টানা। এতে বেজায় বিরক্ত বোধ করল কাউণ্ট। সবকিছু নতুনভাবে শুরু করার জন্য সে কী না দিতে পারে! সত্যি, দ্বিতীয় বার এ রকম বোকামি সে কখনো করত না!.. "কী মধুর মেয়েটি! এত সরস! সত্যি সুন্দর! আর আমি কিনা হাত ফসকে যেতে দিলাম

ওকে... কী গাধা আমি!" এতক্ষণে ঘুম তার মাথায় উঠেছে, অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলে লোকে যেমন দৃঢ় পায়ে হাঁটে তেমনিভাবে সে চলল লাইম গাছের মধ্যেকার পথ ধরে।

কিন্তু আজকের রাত্রি এমন কি তারো মনে শান্তির দান হিসেবে আনল প্রশান্ত একটি বিষণ্ণতা ও প্রেমের জন্য ব্যাকুলতা। লাইম গাছের ঘন ডালপালা ভেদ করে সোজা এসে চাঁদের ক্ষীণ আলো ফুটফুট দাগ ফেলেছে মাটির পথে, এখানে সেখানে ঘাসের টুকরো আর শুকনো ডাঁটা ঠেলে বেরিয়েছে যে পথটায়। থেকে থেকে এক একটা বাঁকাচোরা ডালের এক দিকে আলো পড়াতে মনে হচ্ছে সেটা যেন শাদা শেওলায় আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে একসঙ্গে ফিসফিসিয়ে উঠছে রুপালী পাতা। বাড়ির আলো নিভোনো, সব শব্দ থেমে গেল; নাইটিংগেলের গানে শুধু ভরে উঠল এই উজ্জ্বল, নিস্তব্ধ, অবারিত স্থানকাল। "কী রাত্রি! কী অপরূপ রাত্রি!" বাগানের তাজা সুগন্ধি হাওয়া বুক ভরে নিতে নিতে ভাবল কাউণ্ট। "কিন্তু কিছু একটা গড়বড় হয়েছে। মনে হচ্ছে নিজেকে বা অপরকে নিয়ে আমি আর খুশি নই, এমন কি জীবনকে নিয়েও নয়। কী সুন্দর মধুর মেয়েটি! হয়ত ও সত্যিই দুঃখিত..." ওর ভাবনাচিন্তা অন্য মোড় নিল এখন। বাগানে গাঁয়ের মেয়েটির সঙ্গে নিজেকে দেখল অত্যন্ত আজগুবি ও বিভিন্ন নানা অবস্থায়, তারপর গাঁয়ের মেয়েটির জায়গা নিল মিনা। "কী বোকামি না করেছি! উচিত ছিল শুধু ওর কোমর জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়া!" আর মনে এই অনুশোচনা নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেল কাউণ্ট।

কর্নেট তখনো ঘুমোয় নি। তখুনি পাশ ফিরে কাউণ্টের মুখের দিকে চাইল।

'এখনো জেগে?' জিজ্ঞেস করল কাউণ্ট।

'হ্যাঁ।'

'কী হয়েছিল বলব নাকি?'

'কী?'

'বলা হয়ত উচিত হবে না তবু বলি। ওহে, একটু সরে শোও ত।'

আর ভণ্ডুল হয়ে যাওয়া সুযোগের চিন্তা কাঁধের ঝাঁকুনিতে ঝেড়ে ফেলে বন্ধুর বিছানায় সে বসল বেশ সজীব একটা হাসি মুখে টেনে।

'বিশ্বাস হবে কথাটা? গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হয়েছিল মেয়েটি।'

'কী বলছ তুমি?' লাফিয়ে উঠে উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল পলজভ।

'শোনো না, বলছি।'

'কেমন করে? কখন! বিশ্বাস করি না আমি!'

'তোমরা তখন 'প্রেফারেন্স'-এর জিতের হিসেব করছিলে, ও বলল আজ রাতে জানলার কাছে বসে থাকবে আর জানলা হয়ে ঘরে যাওয়া যায়। প্র্যাকটিকাল লোক, এই সুবিধে, বুঝলে কিনা! তোমরা বুড়ীর সঙ্গে হিসেবে ব্যস্ত, আর আমি নিজের ব্যাপার গুছিয়ে নিচ্ছিলাম। কেন, তুমি নিজেই তো ওকে বলতে শুনলে যে আজ রাতে জানলার কাছে বসে পুকুরের দিকে তাকিয়ে থাকার ইচ্ছে ওর।'

'হ্যাঁ, কিন্তু অমনি বলেছিল।'

'সেটাই তো সমস্যা; কথাটা ও এমনি বলেছিল না অন্যভাবে, এখনো ঠিক করে উঠতে পারছি না। হয়ত সত্যিই কিছু হঠাৎ চায় নি, শুধু মনে হয়েছিল অন্য রকম। সমস্তটার শেষ হল

বিদঘুটে। আমি একেবারে গাধার মতো একটা কাণ্ড করলাম,' ঘৃণার হাসি হেসে কাউণ্ট যোগ করল।

'কী হল? কোথায় গিয়েছিলে তুমি?'

যা ঘটেছিল কাউণ্ট বলল তাকে, বাদসাদ না দিয়ে, শুধু জানলায় যাবার আগে নিজের ইতস্ততঃ একাধিক প্রয়াসের কথা চেপে গেল।

'আমার দোষে ভেস্তে গেল। আরো সাহসী হওয়া উচিত ছিল। ও চেঁচিয়ে পালিয়ে গেল জানলা থেকে।'

'তাহলে ও চেঁচিয়ে পালিয়ে গেল,' পুনরুক্তি করল কর্ণেট, কাউণ্টের হাসিতে অস্বস্তি ভরে হেসে সাড়া দিয়ে; সেই কাউণ্ট যার প্রভাব তার ওপর এত প্রবল ছিল আর ছিল এতদিন ধরে।

'হ্যাঁ। যাকগে, এবার ঘুমোলে হয়।'

আবার দরজার দিকে পেছন ফিরে মিনিট দশেক চুপচাপ শুয়ে রইল কর্ণেট। সে সময়ে তার অন্তরের গভীরে কী চলেছিল ভগবান জানেন, কিন্তু আবার যখন পাশ ফিরল তখন তার মুখে যন্ত্রণা ও দৃঢ় সিদ্ধান্তের একটা ছাপ।

'কাউণ্ট তুর্বিন!' হঠাৎ হাঁকল সে।

'প্রলাপ বকছ নাকি?' শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কাউণ্ট। 'কী চাই, কর্ণেট পলজভ?'

'কাউণ্ট তুর্বিন, আপনি একটা বদমাস!' বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে চেঁচিয়ে উঠল পলজভ।

১৬

স্কোয়াড্রন পরের দিন রওনা হল। বাড়ির লোকের সঙ্গে দেখা করল না, বিদায় নিল না অফিসাররা। কোনো কথাবার্তা হল না

নিজেদের মধ্যে। স্কোয়াড্রন যেখানে প্রথম থামবে সেখানে তাদের ডুয়েল লড়া ঠিক, কিন্তু কাউণ্ট যাকে নিজের সেকেণ্ড হিসেবে বেছে নিয়েছিল সেই হিতৈষী বন্ধু, বাহাদুর ঘোড়সওয়ার ও হুসারদের প্রিয় ক্যাপ্টেন শুল্‌ৎসের ব্যবস্থার গুণে ডুয়েলটা যে হল না শুধু তা নয়, রেজিমেণ্টের কেউ ঘুণাক্ষরে টের পেল না কথাটা। তুর্বিন ও পলজভের সেই পুরনো ঘনিষ্ঠতা আর ফিরে এল না বটে, কিন্তু পরস্পরকে তারা তখনো 'তুমি' বলত, ডিনারে ও তাসের টেবিলে দেখা হত দুজনের।

১৮৫৬

সুখের সংসার



প্রথম খণ্ড

১

মা মারা গেলেন হেমন্তে, সারা শীতটা নিজেদের গ্রামে শোকে কাটালাম আমরা তিনজন — কাতিয়া, সোনিয়া আর আমি।

কাতিয়া আমাদের পরিবারের পুরোনো বন্ধু; সেই গভর্নেস হিসেবে আমাদের মানুষ করেছে, ছেলেবেলা থেকে, জ্ঞান হওয়া থেকে তাকে ভালোবেসেছি। সোনিয়া আমার ছোট বোন। পক্রোভ্‌স্কয়েতে আমাদের পুরোনো বাড়িতে সে শীতটা কাটল বিষণ্ণ বিরসভাবে। বেশ ঠাণ্ডা, হাওয়ার দমক, জানলা ছাড়িয়ে উঠেছে বরফের স্তূপ, বেশীর ভাগ সময়ে জানলাগুলো বরফে জমা ঝাপসা। সারা শীত বাড়ি ছেড়ে বেরোই নি বলতে গেলে, লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে যাই নি। আমাদের বাড়িতে লোক আসত ক্বচিৎ কখনো, আর এলেও আনন্দের সাড়া জাগত না। সবাই আসত বিষণ্ণ মুখে, কথা বলত নিচু গলায়, যেন কে জেগে উঠবে এই ভয়; কখনো হাসত না তারা, শুধু দীর্ঘশ্বাসের পালা, আমার দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে কেঁদে উঠত, কান্নাটা আরো ঘন ঘন হত কালো ফ্রক পরা ছোট্ট সোনিয়াকে দেখলে। মনে হত মৃত্যু তখনো বাড়ির মায়া কাটায় নি, পরিবেশে মৃত্যুর বিষাদ আর থমথমে ভাব। মায়ের ঘর তালাচাবি দেওয়া; শুতে যাবার সময়ে যখন ঘরটার পাশ দিয়ে যেতাম তখন ঠাণ্ডা ফাঁকা ঘরটা আমাকে টানত, মনে আসত ভয়।

আমার বয়স তখন সতেরো। মারা যাবার বছরে মা ঠিক করেছিলেন আমাকে উচ্চ সমাজে নিয়ে যাবার জন্য সহরে যাবেন। তাঁর মৃত্যুতে ভয়ানক শোক পেয়েছিলাম, কিন্তু একটা জিনিস স্বীকার করা ভালো: শোকের তলায় ছিল আর একটি অনুভূতি — আমার বয়স কম, লোকে বলে আমার চেহারাটা মিষ্টি, আর তবু কিনা গ্রামের নিঃসঙ্গতায় আর একটা শীত আমাকে কাটাতে হবে মিছিমিছি। শীতের শেষের দিকে নিঃসঙ্গতার দরুন আমার ব্যাকুলতা ও স্রেফ একঘেয়েমির বিরক্তি এত বেড়ে গেল যে ঘর ছেড়ে বেরোতাম না একেবারে, পিয়ানো কিম্বা বইতে হাত দিতাম না কখনো। কোন কিছুতে মন দেবার জন্যে কাতিয়া পীড়াপীড়ি করলে বলতাম চাই না, বলতাম পারি না, কিন্তু মনে মনে শুধাতাম নিজেকে: "কেন করব? জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি খামোকা কাটছে, কিছু করার দরকার কী? করব কেন?" অশ্রুজল ছাড়া এ প্রশ্নের আর কোন জবাব ছিল না।

লোকে বলত আমি রোগা হয়ে গিয়েছি, দেখতে কেমন যেন সাদাসিধে, কিন্তু তাতে আমার ঔদাসীন্য কাটত না। হলাম বা তাই, কী এসে যায়? কার জন্যে মাথাব্যথা? মনে হত এই সুদূর পাড়াগাঁয়ে আমার সমস্ত জীবনটা কাটবে, কাটবে আশাহীন একঘেয়েমিতে, সেটা কাটিয়ে ওঠার শক্তি বা ইচ্ছে একা আমার নেই। শীতের শেষের দিকটায় আমার স্বাস্থ্য নিয়ে কাতিয়া উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, ঠিক করল যেমন করে হোক আমাকে বিদেশে নিয়ে যাবে। কিন্তু তার জন্যে টাকা দরকার, মা টাকাকড়ি কী রেখে গিয়েছেন আমরা জানতাম না। আমাদের অভিভাবকের বিষয়সম্পত্তির বন্দোবস্ত করার কথা, তাঁর আসার অপেক্ষায় দিন গুণছিলাম।

তিনি এলেন মার্চ মাসে।

ছায়ার মতো বাড়ির এদিক-সেদিক ঘুরছি একদিন, কোন কাজ নেই, মনে নেই কোন বাসনা বা চিন্তা, হঠাৎ কাতিয়া বলে উঠল, 'বাঁচলাম বাবা! সের্গেই মিখাইলিচ এসেছেন। আমাদের খোঁজ করে পাঠিয়েছেন, ডিনারে আসবেন বলেছেন। মাশা, গোমড়া ভাবটা ঝেড়ে ফেল তো। তোমাকে দেখলে কী ভাববেন উনি? তোমাদের সবাইকে এত স্নেহ করেন।'

সের্গেই মিখাইলিচ আমাদের নিকট প্রতিবেশী, বাবার চেয়ে বয়সে অনেক কম হলেও তাঁর বন্ধু ছিলেন উনি। ওঁর আসাতে খুশি হলাম, এবারে তাহলে আমাদের পরিকল্পনার অদলবদল ঘটবে, পারব গ্রাম ছেড়ে যেতে। তাছাড়া, ছেলেবেলা থেকে ওঁকে ভালোবাসতাম, ভক্তিশ্রদ্ধা করতাম। আমাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সের্গেই মিখাইলিচ যদি আমার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করেন তাহলে সবচেয়ে খারাপ লাগবে আমার, সেটা ঠিকই আঁচ করে কাতিয়া আমাকে সামলিয়ে উঠতে বলেছিল। ওঁকে ভালো লাগত আমার, বাড়ির সবাই ওঁকে ভালোবাসত, কাতিয়া আর সোনিয়া থেকে আরম্ভ করে চাকরবাকরগুলো পর্যন্ত। সোনিয়া আবার ওঁর ধর্ম-মেয়ে। তাছাড়া, আমার সামনে মা একবার একটা কথা বলেছিলেন বলে আমার অন্তরে ওঁর জন্যে বিশেষ একটি স্থান ছিল। মা বলেছিলেন তাঁর ইচ্ছে এমন ধরনের মানুষের সঙ্গে যেন আমার বিয়ে হয়। সে সময়ে কথাটা শুনে অবাক হয়েছিলাম, খারাপ লেগেছিল এমন কি; আমার আদর্শ নায়ক ছিল একেবারে অন্য ধরনের। আমার মনের মানুষ পাতলা ছিমছাম চেহারার, মুখ তার পাণ্ডুর বিষণ্ণ। আর সের্গেই মিখাইলিচ তখনি যৌবন পেরিয়ে গিয়েছেন। দীর্ঘাকৃতি তিনি, শরীরের গঠন ভারি, সর্বদাই

হাসিখুশি মানুষ, অন্ততঃ আমার তাই মনে হত। তবু মা'র কথাটা আমার মনে গেঁথে বসেছিল। ছ বছর আগে, আমার বয়স তখন এগারো, উনি আমাকে তুমি বলে ডাকতেন, আমার সঙ্গে খেলতেন, আমার নাম দিয়েছিলেন 'ছোট্ট ভায়োলেট', তখনি প্রায় আতঙ্কে মাঝে মাঝে নিজেকে শুধাতাম, হঠাৎ যদি উনি আমাকে বিয়ে করতে চেয়ে বসেন তাহলে কী করব?

ডিনারের আগে এসে পৌঁছলেন সের্গেই মিখাইলিচ। ডিনারের অন্যান্য পদের সঙ্গে কাতিয়া যোগ করেছিল স্পিনিজের চাটনি আর ক্রীম-কেক। জানলা দিয়ে দেখলাম একটা ছোট শ্লেজে তিনি আসছেন, বাড়ির মোড় ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুটে বৈঠকখানায় পালিয়ে গেলাম, ভাবলাম ভান করব যেন মোটেই ওঁর অপেক্ষায় ছিলাম না। কিন্তু সামনের হলে ওঁর পায়ের ভারি শব্দ, ওঁর দরাজ গলা আর কাতিয়ার পদধ্বনি শোনা মাত্র নিজেকে সামলাতে পারলাম না, দৌড়ে গেলাম হলে। কাতিয়ার হাত ধরে তিনি দাঁড়িয়ে, চড়া সদয় গলায় কথা বলছেন, তাঁর মুখে হাসি। আমাকে দেখে কথা বন্ধ করলেন, প্রীতি-সম্ভাষণ না করে কয়েক মুহূর্ত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। অস্বস্তি লাগল, বুঝতে পারলাম লাল হয়ে উঠেছি।

'আরে! আপনি?' স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ় সরল গলায় বলে হাত বাড়িয়ে এলেন আমার কাছে। 'কত বদলে গেছেন আপনি! কত বড়ো হয়ে গেছেন! আমার ভায়োলেট দেখছি এখন গোলাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

বড়ো হাতের মুঠোয় আমার হাত নিয়ে গভীর অন্তরঙ্গতায় চাপ দিলেন, তবু ব্যথা পেলাম না। মনে হল আমার হাতে চুমো খাবেন, ওঁর দিকে একটু ঝুঁকে পড়তে যাচ্ছি, কিন্তু উনি

শুধু আমার হাতে আর একবার চাপ দিয়ে ওঁর স্থির হাসি-ভরা চোখ রাখলেন আমার চোখে।

ছ বছর দেখি নি ওঁকে, অনেক বদলে গেছেন: বয়সের ছাপ বেড়েছে, রংটা আরো ময়লা, জুলপি রেখেছেন, সেটা একেবারে বেমানান। কিন্তু ওঁর সহজ সরল ধরনটা বদলায় নি, বদলায় নি ওঁর আন্তরিকতায় ভরা অকপট মুখ, মুখের ধাঁচটা প্রশস্ত, চোখদুটি উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত, হাসিটা স্নিগ্ধ, প্রায় শিশুর মতো।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তিনি আর অতিথি রইলেন না, আমাদের সবায়ের সঙ্গে, এমন কি চাকরবাকরের সঙ্গে বাড়ির লোকের মতো ব্যবহার করতে লাগলেন। ওঁকে দেখে চাকরবাকররা বিশেষ করে খুশি, সেটা বোঝা গেল ওঁকে খুশি করার জন্যে ওদের চেষ্টা থেকে।

মা'র মৃত্যুর পর প্রতিবেশীরা এসে যে রকমটা করতেন, সে রকমটা মোটেই তিনি করলেন না। প্রতিবেশীরা ভাবতেন এখানে এসে আমাদের পাশে বসে কথাবার্তা না বলে কান্নাকাটি করা উচিত। উনি কিন্তু বেশ কথা চালিয়ে গেলেন, ভাবটা হাসিখুশি, মাতৃবিয়োগের কথা একবারও উল্লেখ করলেন না। ওঁর ঔদাসীন্যে প্রথম প্রথম অবাক লাগল আমার, এমন কি অশোভন মনে হল সেটা, পরিবারের এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু উনি। কিন্তু পরে বুঝলাম ওটা ঔদাসীন্য নয়, আন্তরিকতা, আর সেজন্যে কৃতজ্ঞ বোধ করলাম।

সন্ধ্যেবেলায় বৈঠকখানার পুরোনো জায়গায় বসে কাতিয়া চা ঢেলে দিল, ঠিক মায়ের আমলে যেমন। ওর পাশে বসলাম আমি আর সোনিয়া। বাবার একটা পাইপ পেয়েছিল বুড়ো গ্রিগরি, ও সেটা সেগেই মিখাইলিচকে এনে দিল। আগেকার দিনের মতো পাইপ টানতে টানতে তিনি ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন।

একটু থেমে বললেন, 'কত না দুঃখের জিনিস ঘটেছে বাড়িটায়!'

'হ্যাঁ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল কাতিয়া। সামোভারে ঢাকনাটা চাপিয়ে তাকাল ওঁর দিকে, চোখে প্রায় জল এসে পড়ল।

'বাবাকে আপনার মনে আছে তো?' আমাকে জিজ্ঞেস করলেন সের্গেই মিখাইলিচ।

'সামান্য,' স্বীকার করলাম।

'এখন তিনি আপনাদের সঙ্গে থাকলে কী ভালোটাই না হত,' মৃদু কণ্ঠে বললেন তিনি, আমার মাথা পেরিয়ে গেল ওঁর চিন্তাকুল দৃষ্টি। গলা আরো নামিয়ে বললেন, 'আপনার বাবাকে অত্যন্ত ভালোবাসতাম।' মনে হল, ওঁর চোখদুটো আগের চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

'আর এখন ওর মা-ও স্বর্গে গিয়েছেন,' অস্ফুট কণ্ঠে বলে কাতিয়া চায়ের পাত্রের উপরে তাড়াতাড়ি ন্যাপকিন চাপা দিয়ে চোখের জল মোছার জন্যে রুমাল বের করল।

'হ্যাঁ, অনেক দুঃখের জিনিস ঘটেছে বাড়িটায়,' মুখ ঘুরিয়ে তিনি আবার বললেন। যোগ করলেন, 'তোমার খেলনাগুলো দেখাও তো, সোনিয়া,' তারপর ড্রয়িং-রুমে চলে গেলেন। জল-ভরা চোখে কাতিয়ার দিকে তাকালাম আমি।

'ওঁর মতো বন্ধু লোক আর হয় না!' বলল কাতিয়া।

আর সত্যি, আমাদের অনাত্মীয় এই ভালো লোকটির সহানুভূতিতে উষ্ণ ও প্রীতিকর একটা ভাব এল মনে।

কানে এল ড্রয়িং-রুমে সের্গেই মিখাইলিচ সোনিয়ার সঙ্গে নেচে কুঁদে খেলছেন, সোনিয়া গলা ফাটিয়ে হাসছে। ওঁর জন্যে চা পাঠিয়ে দিলাম; তারপর শুনলাম উনি পিয়ানোতে বসে সোনিয়ার ছোট্ট আঙুল দিয়ে চাবিতে টোকা দিচ্ছেন।

ডাক দিয়ে বললেন, 'মারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্না, আসুন তো, আমাদের জন্যে একটা কিছু বাজান।'

ঘরোয়াভাবে, বন্ধুর মতো আমার সঙ্গে ব্যবহার করছেন, বেশ ভালো লাগল। ওঁর কাছে গেলাম।

বীঠোফেনের 'quasi una fantasia'* সোনাটার আডাজিও অংশটি খুলে বললেন, 'এই নিন, দেখি কেমন বাজান।' চায়ের গেলাস হাতে পিয়ানো ছেড়ে একটা কোণে চলে গেলেন।

কেন জানি মনে হল, ওঁকে 'না' বলা, খারাপ বাজাই ভণিতা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই কোন কথা না বলে ওঁর আদেশ মেনে নিয়ে সাধ্যমত বাজাতে শুরু করলাম; ওঁর বিচার শক্তিকে ডরাতাম, জানতাম উনি গানবাজনা বোঝেন আর ভালোবাসেন। চায়ের সময় আমাদের কথাবার্তায় যে পূর্বস্মৃতির মেজাজ এসেছিল, আডাজিওটি সে মেজাজের; আমার মনে হল ভালোই বাজিয়েছি। কিন্তু স্কার্‌ত্‌সোটি শেষ করতে আমাকে দিলেন না উনি। 'না, এটা আপনি ভালো বাজাচ্ছেন না,' কাছে এসে বললেন। 'ওটা রেখে দিন; প্রথমটা মন্দ বাজান নি। গানবাজনা বোঝেন মনে হচ্ছে।' আহামরি প্রশংসা নয়, তবু খুশিতে লাল হয়ে উঠলাম। বাবার বন্ধু উনি, বাবার সমকক্ষ, আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছেন যেন আমি বড়ো হয়ে গিয়েছি, আর ছেলেমানুষটি নেই, ব্যাপারটা আমার কাছে এত অভিনব আর এত প্রীতিকর! সোনিয়াকে ঘুম পাড়াতে কাতিয়া দোতলায় গেল, ড্রয়িং-রুমে রইলাম উনি আর আমি।

* স্বপ্নলোকের সোনাটা।

বাবার কথা বলতে শুরু করলেন উনি — কীভাবে তাঁর সঙ্গে চেনাপরিচয় হয়েছিল; যখন আমি শুধু বই আর খেলনা নিয়ে ব্যস্ত সে সব পুরোনো দিনে কী চমৎকার থেকেছিলেন ওঁরা দুজনে, সেই সব কথা। ওঁর গল্প থেকে বাবার সম্বন্ধে এই প্রথম জানলাম যে, সহজ সরল মানুষ ছিলেন তিনি, লোকে তাঁকে ভালোবাসত, তাঁর সম্বন্ধে আগে এমন ভাবি নি কখনো। তারপর উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কী করে সময় কাটাতে আমি ভালোবাসি, কী বই পড়ি, কী করব ঠিক করেছি, উপদেশ দিলেন আমাকে। এখন আর তিনি সেই হাসিখুশি খেলার সাথী নন যিনি আমার পিছনে লাগতেন, খেলনা বানাতেন আমার জন্যে; এখন তিনি গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, স্নেহপ্রবণ, স্পষ্টবক্তা। আপনা থেকেই ওঁকে আমার ভালো লাগল, ভক্তিশ্রদ্ধা বোধ করলাম ওঁর প্রতি। ওঁর সঙ্গে কথা বলতে বেশ লাগছিল, কিন্তু তবু একটা ক্লেশ ও ভীরু ভাবের হাত কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। মেপে মেপে প্রত্যেকটি কথা সাবধানে বললাম, ওঁর স্নেহ পাবার জন্যে এত ব্যাকুল ছিলাম। এতদিন তো বন্ধুর মেয়ে বলে শুধু আমাকে উনি স্নেহের চোখে দেখেছেন।

সোনিয়াকে শুইয়ে কাতিয়া ফিরে এল। আমার মন-মরা ভাবের কথা তুলে নালিশ করল ওঁর কাছে, ওটার বিষয়ে আমি কিছুই বলি নি।

'তাহলে সবচেয়ে বড়ো কথাটা উনি আমার কাছে চেপে গিয়েছেন,' হেসে ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন সেগেই মিখাইলিচ।

'বলার কী আর আছে?' উত্তর দিলাম। 'ব্যাপারটা অত্যন্ত বিরক্তিকর, কেটে যাবে শিগগিরই।' (সে মুহূর্তে সত্যি মনে

হল আমার বিষণ্ণতা শুধু যে কেটে যাবে তা নয়, কেটে গিয়েছে এরি মধ্যে, আর তার অস্তিত্ব ছিল না কোথাও।)

'নিঃসঙ্গতা সইতে না পারাটা খারাপ,' উনি বললেন। 'আপনি কি সত্যি সত্যি মিসি বাবা?'

'তা নয়ত আর কী,' হেসে বললাম।

'না, মিসি বাবা ভালো নয়। সবায়ের তারিফ পাবার জন্যে ব্যাকুল, আর একলা থাকলেই শুকিয়ে যায় একেবারে, জীবনের স্বাদ আর থাকে না। সবকিছু লোক দেখানোর জন্যে, নিজের জন্যে কিছু না।'

'আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণাটি তো বেশ দেখছি,' বললাম, কিছু একটা বলতে হবে বলে।

'না,' বলে উঠলেন উনি, তারপর একটু থেমে বললেন, 'বাপের মেয়ে তো মিছিমিছি নন, আপনার মধ্যে কিছু একটা আছে।' আর ওঁর সদয় মনোযোগী দৃষ্টিতে গর্ব হল, বিব্রত খুশির ভাবে আবার মনটা ভরে গেল।

শুধু তখনি লক্ষ্য করলাম ওঁর মুখে হাসিখুশির ছাপের নিচে একটা কিছু আছে যেটা শুধু বিশেষ করে ওঁর; তা হল দৃষ্টিটা — প্রথমে স্বচ্ছ, কিন্তু ক্রমশঃ তাতে আসে একটা অবহিত ভাব, এমন কি একটু বিষণ্ণতাও।

'একঘেয়ে লাগার কোন ছুতো নেই, ওটা আপনাকে এড়াতেই হবে,' উনি বললেন। 'আপনার তো আছে গানবাজনা, আপনি তা ভালোও বাসেন, তাছাড়া বই আর পড়াশুনোও আছে। সামনে পড়ে রয়েছে সমস্ত জীবন, তার জন্যে তৈরী হবার সময় এখনি, তাহলে পরে আর অনুশোচনা করতে হবে না। বছরখানেক পরে বড্ডো দেরী হয়ে যাবে।'

বাপ-খুড়োর মতো উনি আমার সঙ্গে কথা চালালেন। মনে হল আমার পর্যায়ে নিজেকে রাখার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করছেন। আমাকে নিজের চেয়ে নিচু স্তরের ভাবছেন বলে রাগ হল, তবু শুধু আমারি খাতিরে আলাদাভাবে কথা বলার চেষ্টা করছেন তো, সেটা ভালো লাগল।

বাকি সন্ধ্যাটা কাতিয়ার সঙ্গে জমিদারীর ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করলেন তিনি।

'আসি তাহলে,' দাঁড়িয়ে উঠে বললেন। আমার কাছে এসে হাত ধরলেন।

'আবার কবে আপনার সঙ্গে দেখা হবে?' কাতিয়া জিজ্ঞেস করল।

'বসন্তকালে,' বললেন তিনি, আমার হাত তখনো ছাড়েন নি। 'এখন যাচ্ছি দানিলভ্‌কাতে' (আমাদের অন্য গ্রাম), 'ওখানকার ব্যাপার কী দেখব, বন্দোবস্ত যা করার করব, তারপর নিজের কাজে যাব মস্কোয়। গ্রীষ্মকালে আমাদের দেখাশোনা হবে।'

'এত দিনের জন্যে যাচ্ছেন কেন?' অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে বললাম। আশা ছিল রোজ দেখা হবে ওঁর সঙ্গে; খারাপ লাগল, ভয় হল যে বিষণ্ণতা আবার আমাকে পেয়ে বসবে। আমার চাউনি আর গলার স্বর থেকে সেটা স্পষ্ট বোঝা গেল নিশ্চয়ই।

'পড়াশুনায় ব্যস্ত থাকবেন, মন-মরা হতে দেবেন না নিজেকে, বুঝলেন।' গলাটা মনে হল অত্যন্ত ভাবলেশহীন, সাধারণ। 'বসন্তকালে আপনার পরীক্ষা নেব,' আরো বললেন উনি, তারপর আমার দিকে না তাকিয়ে হাতটা ছেড়ে দিলেন।

সদর ঘরে ওঁকে বিদায় জানাচ্ছি, উনি তাড়াহুড়ো করে ওভারকোটটা চাপিয়ে নিলেন, আমার দিকে একবার চাইলেন না

পর্যন্ত। "অত চেষ্টার কী দরকার ওঁর?" ভাবলাম। "উনি তাকালে আনন্দে গলে যাব, সত্যি কি তাই ভাবেন? লোক ভালো উনি, খুব ভালো লোক... ব্যস এই পর্যন্ত।"

তবু সে রাত্রে কাতিয়ার আর আমার চোখে অনেকক্ষণ ঘুম এল না। দুজনের গল্প চলল, ওঁর বিষয়ে নয়, কী করে গ্রীষ্ম আর পরের শীতটা কাটাব তাই নিয়ে। ভয়াবহ সেই প্রশ্ন 'কেন?' আর আমাকে ভোগাল না। মনে হল এটা তো সহজ স্পষ্ট কথা যে, সুখী হবার জন্যে বাঁচা দরকার। আর মনে মনে আশা হল ভবিষ্যতে অসীম সুখী হব আমি। পক্রোভ্স্কয়েতে আমাদের পুরোনো নিরানন্দ বাড়িটা হঠাৎ আলোয় আর প্রাণে ভরে গেল যেন।

২

বসন্তকাল এল। আমার পুরোনো বিষণ্ণতার জায়গা নিল নিরুদ্দেশ আশা আর আকাঙ্ক্ষার জট-পাকানো স্বপ্নালু বিষণ্ণতা, যেটা বসন্তকালের সঙ্গী। শীতের শুরুতে যেমনভাবে থাকতাম তেমনভাবে আর রইলাম না; সোনিয়াকে নিয়ে ব্যস্ত, গানবাজনা আর পড়াশুনো নিয়ে সময় কাটে। মাঝে মাঝে বাগানে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক নাগাড়ে ঘুরে বেড়াই, কিম্বা বেঞ্চে বসে ভাবি আর ভাবি। কী যে চাই, কিসের আশায় আছি, ভগবান জানেন শুধু। মাঝে মাঝে সমস্ত রাত, বিশেষ করে জ্যোৎস্না রাত, জানলার ধারে কাটে। কখনো কখনো কাতিয়ার অজান্তে, গায়ে কোট না চাপিয়ে বাগানে গোপনে চলে যাই, শিশিরে-ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে দৌড়ে যাই পুকুর পারে; একবার বাইরের মাঠে গিয়ে একলা নিশীথ রাতে বাগানের চার পাশে ঘুরে এলাম।

কী সব স্বপ্ন সে সব দিনে আমার কল্পনা ভরে রাখত এখন তা মনে করা বা বুঝে ওঠা কঠিন। আর যখন সত্যি সত্যি সেগুলোকে মনে করি তখন আমার নিজের বলে বিশ্বাস হয় না, এত অদ্ভুত তারা, জীবন থেকে এত দূরে।

মে-র শেষে কথামত সফর থেকে ফিরে এলেন সের্গেই মিখাইলিচ।

প্রথম যখন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন তখন সন্ধ্যে, মোটেই আশা করি নি তিনি আসছেন। বারান্দায় বসে চা খাবার উপক্রম করছি। বাগানে ইতিমধ্যে সবুজের বাহার, আ-ছাঁটা ঝোপঝাড়ে আশ্রয় নিয়েছে নাইটিংগেলগুলো, অর্ধেক গ্রীষ্মকালটা সেখানে কাটাবে ওরা। এখানে-সেখানে লাইলাকের ঘন ঝোপে লালচে-বেগুনী বা শাদা শাদা ছোপ। কুঁড়ি ফোটার আয়োজন সম্পূর্ণ। পথে সারি বাঁধা বার্চের পাতা সন্ধ্যালোকে স্বচ্ছ। ঢাকা বারান্দায় একটা তাজা ঠান্ডা ভাব। সন্ধ্যার ভারি শিশিরবিন্দু ঘাসে জমার কথা। বাগানের ওপারের আঙিনা থেকে আসছে দিনশেষের নানা শব্দ, ঘরে-তাড়ানো গরুমোষের ডাক। জলের পিপে নিয়ে বাড়ির সামনের পথে গাড়ি হাঁকিয়ে আসছে পাগলা নিকন। ডালিয়ায় জল দিচ্ছে সে, গুঁড়ি আর খুঁটির চারধারে মাটিতে কালো কালো বৃত্ত ফুটে উঠেছে জলের পিপে থেকে পড়া ঠান্ডা ধারায়। বারান্দায় বসে আছি, টেবিলে পাতা ধবধবে চাদর। সদ্য পালিশ-করা সামোভারটা ঝকঝক করছে, বাষ্প বেরোচ্ছে মুখ থেকে। টেবিলে রেকাবী ভর্তি ক্রেন্দেল্‌কি*, বিস্কুট, এক জগ ক্রীম। গোলগাল হাতে ভালো করে কাপ ধুচ্ছে কাতিয়া।

* আটার তৈরী মিষ্টি। — সম্পাঃ

স্নানের পর বেজায় ক্ষিধে পেয়েছে আমার, চায়ের অপেক্ষা না করে ঘন ক্রীমে ভিজিয়ে রুটি খেতে শুরু করেছি। কোরা লিনেনের খোলা-হাতা ব্লাউজ গায়ে, ভিজে চুল রুমাল দিয়ে বাঁধা। সের্গেই মিখাইলিচকে প্রথমে দেখতে পেল কাতিয়া।

বলে উঠল, 'সের্গেই মিখাইলিচ! এইমাত্র আপনার কথা হচ্ছিল।'

জামাকাপড় বদলাবার জন্যে উঠে পড়েছি, কিন্তু দোরগোড়ায় আমাকে আটকালেন উনি।

'পাড়াগাঁয়ে আমার এত ভদ্রতার কী দরকার?' রুমালে বাঁধা আমার মাথার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন উনি। 'বুড়ো গ্রিগরির কাছে এভাবে বেরোতে তো আপনার লজ্জা করে না, আর আপনার কাছে ও যা আমিও তাই।'

কিন্তু মনে হল গ্রিগরির মতো নয়, সম্পূর্ণ অন্যভাবে উনি দেখছেন আমাকে; লজ্জা পেলাম।

'এক্ষুণি আসছি,' চলে যেতে যেতে বললাম।

পিছন ডেকে উনি বললেন, 'ব্লাউজটা কী দোষ করল? ওটা পরে একেবারে কিষাণ কন্যার মতো দেখাচ্ছে।'

দোতলায় তাড়াহুড়ো করে জামাকাপড় বদলাতে বদলাতে ভাবলাম, "কী অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন উনি। যাক, উনি এসেছেন, বাঁচা গেল, বেশ মজা হবে এখন।" আয়নায় চেহারাটা একবার দেখে নিয়ে খুশিতে তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামলাম, নিজের তাড়াটা লুকোবার চেষ্টা করলাম না, বারান্দায় যখন পৌঁছলাম তখন হাঁফ ধরে গিয়েছে। টেবিলের পাশে বসে উনি কাতিয়াকে জমিদারীর কথা বলছিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে একবার হেসে কথা বলে চললেন। ওঁর মতে, আমাদের জমিদারীর

অবস্থা চমৎকার। শুধু এই গ্রীষ্মকালটা আমাদের কাটাতে হবে গ্রামে; তারপর সোনিয়ার লেখাপড়ার জন্যে পিটার্সবুর্গে বা বিদেশে যাবার কথা।

'আপনি আমাদের সঙ্গে বিদেশে এলে চমৎকার হয়!' কাতিয়া বলল। 'আপনাকে ছাড়া একেবারে অসহায় লাগবে।'

'আপনাদের সঙ্গে সারা পৃথিবী ঘুরলে বেড়ে হত,' উনি বললেন আধো-ঠাট্টা, আধো-গম্ভীর সুরে।

'তাহলে চলুন, সারা পৃথিবী একসাথে চক্কর দিই,' আমি বললাম।

হেসে মাথা নাড়লেন উনি।

'আর আমার মা'র কী হবে? আমার নিজের কাজকর্ম?' জিজ্ঞেস করলেন। 'যাক, ওটা অপ্রাসঙ্গিক — এবার বলুন তো কেমন ছিলেন। আশা করি আবার মন-মরা হয়ে পড়েন নি?'

বললাম উনি চলে যাবার পর থেকে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলাম, বিষণ্ণ ভাব আর ছিল না; আমার কথায় সায় দিল কাতিয়া। উনি তখন প্রশংসা করলেন আমাকে, কথা আর চোখ দিয়ে শিশুর মতো আদর করলেন, যেন তেমনটা করার বিশেষ অধিকার আছে ওঁর। আর মনে হল ওঁর সঙ্গে একেবারে অকপট আন্তরিকভাবে বলা উচিত আমার, ভালো যা করেছি সব বলতে হবে ওঁকে, খারাপ লাগবে এমন কিছু যদি করে থাকি তা ঢাকলে চলবে না, স্বীকার করতে হবে। উনি যেন আমার পাদ্রিমশাই। সন্ধ্যেটা সুন্দর, চায়ের জিনিসপত্র সরিয়ে নেবার পরও আমরা বারান্দায় বসে রইলাম। কথাবার্তায় মন বসে গিয়েছিল, কখন যে বাড়ি আর বাইরে মানুষের সব শব্দ আস্তে আস্তে থেমে গেল লক্ষ্য করি নি। ফুলের গন্ধ আরো জোরালো হয়ে উঠল, ঘাস শিশিরে ভেজা। কাছের

লাইলাক ঝোপে একটা নাইটিংগেল সুর ভাঁজতে শুরু ক'রে আমাদের গলা শুনে থেমে গেল। মনে হল নক্ষত্রখচিত আকাশ আমাদের কাছে নেমে এসেছে।

নিঃশব্দে একটা বাদুড় বারান্দায় উড়ে এসে আমার মাথায় বাঁধা শাদা রুমালটার ওপর ঝটপট করাতে তখনি শুধু বুঝতে পারলাম অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। দেয়ালের গায়ে শিঁটিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলাম আর একটু হলে, কিন্তু বাদুড়টা এসেছিল যেমন, ঠিক তেমনি নিঃশব্দে, ক্ষিপ্র গতিতে ফলের বাগানের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কথাবার্তার ফাঁকে সের্গেই মিখাইলিচ বলে উঠলেন, 'আপনাদের পক্রোভ্স্কয়ে আমার এত ভালো লাগে! সারা জীবনটা যদি এই বারান্দায় বসে কাটত!'

'তাহলে বসে থাকুন,' বলল কাতিয়া।

'বসলে ভালো হয়,' অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন উনি। 'কিন্তু জীবন তো আর বসে থাকে না।'

'বিয়ে করেন না কেন?' জিজ্ঞেস করল কাতিয়া। 'স্বামী হিসেবে আপনি তো খাসা হবেন।'

হেসে বললেন উনি, 'করি না, বসে থাকতে চাই বলে। না, কাতেরিনা কার্লভ্না, আপনার আর আমার বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেছে। পাত্র হিসেবে আমাকে লোকে দেখে না অনেক দিন। আমিও মোটে দেখি না, আর তাই খাসা আছি, সত্যি বলছি।'

আমার মনে হল কথাটা বললেন অস্বাভাবিক জোর দিয়ে।

'তা আর নয়!' বলল কাতিয়া। 'বয়স তো মাত্র ছত্রিশ, এরি মধ্যে জীবন শেষ!'

'সব শেষ,' সায় দিয়ে উনি বললেন। 'আমি শুধু বসে থাকতে চাই, কিন্তু বিয়ে করতে হলে আরো কিছু করা দরকার। বরং ওঁকে জিজ্ঞেস করুন,' আমার দিকে মাথা নেড়ে যোগ করলেন। 'ওঁর মতো লোকের বিয়ে করা উচিত, আর আপনি আর আমি, ওঁদের বিয়ে দেখে আমাদের আনন্দ।'

ওঁর গলায় বিষণ্ণতা ও ক্লেশের একটা সুর ধরা পড়ল আমার কাছে। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন উনি; কাতিয়া আর আমিও কোন কথা বললাম না।

'আচ্ছা, ধরুন,' চেয়ারে ঘুরে বসে উনি বলে চললেন, 'একটি সপ্তদশীকে না হয় হঠাৎ বিয়ে করেই ফেললাম ঘটনার ফেরে, যেমন মাশাকে — মানে মারিয়া আলেক্সান্দ্রভ্‌নাকে। দৃষ্টান্তটা চমৎকার। এভাবে কথাটা উঠেছে বলে আমি বেজায় খুশি... এর চেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত আর হতে পারে না।'

হাসতে শুরু করলাম আমি; কেন যে উনি খুশি, 'এভাবে উঠেছে' সেটা কী আমার মাথায় ঢুকল না...

'আচ্ছা, বুকে হাত দিয়ে সত্যি বলুন তো,' পরিহাস করে উনি বললেন, 'দিনকাল গিয়েছে এমন একটা বুড়োর সঙ্গে বাঁধা পড়লে আপনার খারাপ লাগবে না? যে শুধু বসে থাকতে চায়, অথচ আপনার মনে কত না ব্যাকুলতা, কত না ইচ্ছা।'

বিব্রত লাগল; কী বলব ভেবে না পাওয়াতে চুপ করে রইলাম।

হেসে উনি বললেন, 'অবশ্য বিয়ের প্রস্তাব করছি না আপনাকে। কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় একলা বাগানে ঘোরার সময় যে ধরনের বরের স্বপ্ন দেখেন আমি তো তা নই, সত্যি না? আর সেটা দুর্ভাগ্য হবে, তাই না?'

'দুর্ভাগ্য নয়...' আমি শুরু করলাম।

'কিন্তু সুখের নয়,' কথাটা উনি সম্পূর্ণ করলেন।

'না, কিন্তু হয়ত আমাকে ভুল...'

বাধা দিয়ে উনি আবার বললেন, 'তাহলে দেখলেন তো। ঠিক কথাই বলেছেন উনি। খোলাখুলিভাবে বলার জন্যে ওঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ কথাটা আজ উঠল বলে আমি খুশি। আমার পক্ষেও ব্যাপারটা বেজায় করুণ হত,' যোগ করলেন উনি।

'অদ্ভুত মানুষ আপনি — ঠিক আগেকার মতো,' বলল কাতিয়া। রাত্রের খাবার দিতে বলার জন্যে বাড়ির ভিতরে গেল।

কাতিয়া যাবার পর আমরা দুজনে চুপচাপ বসে রইলাম; চারিদিক নিঃশব্দ। গাইতে শুরু করল একটি নাইটিংগেল, আবেগ-ভরা থামা-থামা পূরবী নয় এবার, রাত্রির গান, প্রশান্ত, কোন তাড়াহুড়ো নেই। সমস্ত বাগান ভরে গেল সে গানে, দূরের খাদ থেকে জবাব দিল আর একটি নাইটিংগেল — সে সন্ধ্যায় খাদে প্রথম গান ধরেছিল সে-ই। বাগানের পাখিটা যেন শোনার জন্যে মুহূর্তকাল চুপ করল, তারপর আরো জোরে, আরো তীব্রভাবে গান ধরল। নৈশ পৃথিবী তাদের গানের প্রশান্ত মহিমায় ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল, সে পৃথিবীকে আমরা কতটুকু চিনি। আমাদের পেরিয়ে ফুলের ঘরে শুতে চলে গেল মালী, পথে ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে এল তার ভারি বুটের শব্দ। পাহাড়ের তলা থেকে তীক্ষ্ন শিস শোনা গেল দুবার, তারপর সব চুপচাপ। পাতাগুলোর সামান্য খসখস শব্দ, আমাদের ওপর ফেটে পড়ল গন্ধে-ভরা এক ঝলক হাওয়া, নড়ে উঠল বারান্দার চাঁদোয়াটা। যা কথা হয়েছে তারপর চুপ করে থাকা আমার পক্ষে অস্বস্তিকর, কিন্তু কী বলব ভেবে পেলাম না। ওঁর দিকে তাকালাম — অস্পষ্ট আলোয় দীপ্ত চোখে উনি তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

'বেঁচে থাকাটা চমৎকার জিনিস,' মৃদু কণ্ঠে উনি বললেন।

কী কারণে জানি না আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

'কী?' উনি বললেন।

'হ্যাঁ, বেঁচে থাকাটা চমৎকার জিনিস,' কথাটার পুনরুক্তি করলাম।

দুজনে চুপ করে গেলাম, আবার অস্বস্তি লাগল আমার। মনে হল ওঁর বয়স হয়েছে সে কথায় সায় দিয়ে ব্যথা দিয়েছি ওঁকে। সান্ত্বনা দিতে চাইলাম, কিন্তু কী করে ভেবে পেলাম না।

'আচ্ছা, তাহলে আসি,' উঠতে উঠতে উনি বললেন। 'রাত্তিরে বাড়িতে খাব বলে মা বসে আছেন। ওঁর সঙ্গে বলতে গেলে আজ দেখাসাক্ষাৎ হয় নি।'

'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম নতুন সোনাটাটা আপনাকে শোনাব,' আমি বললাম।

'আর একদিন হবে,' জবাবটা নিরাসক্ত শোনাল। 'আসি তাহলে।'

এবার কোন সন্দেহ রইল না উনি চটেছেন, খারাপ লাগল। ওঁর সঙ্গে কাতিয়া আর আমি গাড়িবারান্দা পর্যন্ত গেলাম, পথে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন উনি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। খুরের শব্দ মিলিয়ে যেতে বারান্দায় ফিরে চেয়ে রইলাম বাগানের দিকে, রাত্রির শব্দ-ভরা জোলো শাদা কুয়াশার দিকে। অনেকক্ষণ বসে বসে স্বপ্ন দেখলাম, আর স্বপ্নটা মনে হল সত্যি। যা দেখতে চাই, যা শুনতে চাই দেখলাম আর শুনলাম।

সের্গেই মিখাইলিচ আবার এলেন, তারপর আবার, আর আমাদের বিচিত্র আলোচনার ফলে যে অস্বস্তির ভাবটা হয়েছিল সেটা কেটে গেল একেবারে। সারা গ্রীষ্মকালটা সপ্তাহে দু-তিন বার উনি আমাদের কাছে আসতেন। ওঁর আসায় এত অভ্যস্ত হয়ে গেলাম যে কিছুদিন না এলে ভয়ানক খারাপ লাগত। ভাবতাম



আমাকে ত্যাগ করেছেন, দুর্ব্যবহার করছেন, খুব রাগ হত। কমবয়সী প্রিয় বন্ধু যেন আমি, এভাবে আমার সঙ্গে চলতেন উনি। নানা কথা জিজ্ঞেস করতেন আমাকে, তাঁর আন্তরিকতার জন্যে গোপন কথা বলতাম তাঁকে, উনি উপদেশ দিতেন, উৎসাহ দিতেন, মাঝে মাঝে বকে আমার অনুচিত ঝোঁক শোধরাতেন। আমি ওঁর সমান, এইভাবে চলার প্রাণপণ চেষ্টা করতেন বটে উনি, কিন্তু ওঁকে যতটা জানি তার পিছনে অচেনা একটি সম্পূর্ণ জগৎ ওঁর আছে মনে হত — সে জগতে আমার প্রবেশের দরকার নেই তিনি ভাবতেন। ওঁর এই ভাবটাই সবচেয়ে বেশী করে আমাকে টানত, এরি জন্যে শ্রদ্ধা করতাম ওঁকে। কাতিয়া ও প্রতিবেশীদের কাছে শুনেছিলাম যে বুড়ী মার সেবাযত্ন, নিজের জমিদারীর দেখাশোনা, আর আমাদের অভিভাবকত্ব করা ছাড়াও ওঁর সামাজিক কাজকর্ম কী যেন ছিল, সেটা ওঁকে বেশ ভোগাত। তবু এ সবের বিষয়ে উনি কী ভাবেন, ওঁর ধ্যানধারণা, পরিকল্পনা বা আশা আনন্দ কী কী কখনো বের করতে পারি নি ওঁর কাছ থেকে। ওঁর কাজকর্মের সম্বন্ধে কথা তুললেই উনি নিজস্ব একটি ভঙ্গিতে ভুরু কোঁচকাতেন, মনে হত বলছেন, "থাক, থাক, ও সব নিয়ে আপনার আবার মাথাব্যথা কেন?" আর তৎক্ষণাৎ কথা ঘুরিয়ে নিতেন। প্রথম প্রথম চটতাম বটে কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমার নিজের বিষয় নিয়ে আমাদের আলাপ-আলোচনায় এত অভ্যস্ত হয়ে গেলাম যে সেটা স্বাভাবিক বলে ধরে নিলাম।

আর একটা জিনিস প্রথম প্রথম আমার খারাপ লাগত, পরে সেটা অবশ্য ভালো লাগল। সেটা হল আমার চেহারার বিষয়ে ওঁর সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, এমনকি বাহ্য অবজ্ঞার ভাব। আমার চেহারা যে ভালো, সেটার আভাস পর্যন্ত কথায় বা ইঙ্গিতে কখনো উনি

দিতেন না, বরং ওঁর সামনে কেউ আমাকে সুন্দর বললে নাক কুঁচকিয়ে হেসে উঠতেন। এমন কি আমার চেহারার খুঁত বের করে তা নিয়ে পেছনে লাগতেন। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে কায়দাদুরস্ত ফ্রকে আমাকে সাজিয়ে আনন্দ পেত কাতিয়া, নতুন নতুন কায়দায় চুল বেঁধে দিত, সে সব হত ওঁর উপহাসের বস্তু। এতে ব্যথা পেত কাতিয়া বেচারী, গোড়াতে ভয়ানক বিব্রত লাগত আমার। আমাকে ওঁর পছন্দ ধরে নিয়েছিল কাতিয়া, ও কিছুতেই বুঝতে পারত না ভালোবাসার পাত্রীকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে না দেখতে চাওয়াটা কী করে সম্ভব। আর আমি — উনি কী চান বেশীদিন যেতে না যেতে বুঝে ফেললাম — উনি বিশ্বাস করতে চান যে আমি মন-ভোলানো গোছের মেয়ে নই। বুঝলাম সেটা, আর অল্পদিনের মধ্যে আমার জামাকাপড়ে, চুল বাঁধার ধরনে, আমার আচরণে মন-ভোলানোর ছিটেফোঁটা পর্যন্ত রইল না। তার বদলে এল সারল্যের একটা বাহ্য মন-ভোলানো ভাব, কেননা তখন পর্যন্ত সত্যি সরল হওয়া আমার ক্ষমতার বাইরে। জানতাম উনি ভালোবাসেন আমাকে, কিশোরী হিসেবে না নারী হিসেবে, সেটা তখনো শুধাই নি নিজেকে, তবু সে ভালোবাসার কদর করতাম। দুনিয়ার সেরা মেয়ে বলে আমাকে ভাবেন জানতাম, আর এ মিথ্যে ধারণা তাঁর থেকে যাক, এ ইচ্ছা না করে পারি নি। তাই আপনা থেকেই তাঁকে ঠকাতাম। কিন্তু ওঁকে ঠকাতে গিয়ে নিজের উন্নতি হল। অনুভব করলাম দেহের নয়, মনের সৌন্দর্য ওঁকে দেখানো আরো অনেক ভালো, অনেক বেশী যোগ্য কাজ। আমার কেশ, আমার মুখ, বাহু, আমার ধরণধারণ ভালো হোক মন্দ হোক, সে সব তো উনি জানেন, একবার তাকালেই বুঝতে পারেন — এত ভালোভাবে পারেন যে ওঁর তারিফ বাড়ানোর জন্যে আর কিছু করার ক্ষমতা

আমার নেই, ঠকাবার ইচ্ছেটা ছাড়া। আমার অন্তরও ওঁর কাছে অজানা, আমাকে ভালোবাসেন বলে, অন্তরের বিকাশ ও বৃদ্ধি তখনো ঘটছে বলে, এ ক্ষেত্রে ঠকাতে পারি ওঁকে, ঠকাতামও। এটা বুঝতে পেরে ওঁর সাহচর্যে থাকাটা কত সহজ হয়ে এল! আমার অকারণ বিব্রত ভাব, আমার কষ্টকৃত ধরণধারণ উধাও হয়ে গেল একেবারে। বুঝলাম, যেভাবেই উনি আমাকে দেখুন না কেন সবটাই দেখেন, সামনে হোক বা পাশ থেকে হোক, সে আমি দাঁড়িয়ে থাকি বা বসে থাকি, চুলটা উঁচু করে বাঁধা হোক বা নিচু করে, সবটা দেখেন উনি, আর আমি যা তাই নিয়ে উনি সন্তুষ্ট। মনে হয়, নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে যদি উনি অন্যদের মতো হঠাৎ বলে বসতেন যে আমার মুখটা বেশ মিষ্টি, তাহলে মোটেই খুশি হতাম না। কিন্তু কী খুশি আর হালকা লাগত যখন আমার কোন মন্তব্যের পর এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে সহৃদয় গলায়, একটু পরিহাসের আমেজ তাতে লাগাবার চেষ্টা করে উনি বলতেন:

'সত্যি, আপনার মধ্যে একটা কিছু আছে। চমৎকার মেয়ে আপনি, না বলে পারছি না।'

গর্বে আর আনন্দে হৃদয় যেত ভরে। প্রশংসার উপলক্ষটা কী? হয়ত আমি বলেছি বুড়ো গ্রিগরি নাতনীকে ভয়ানক ভালোবাসে, সেটা আমার মনকে নাড়া দেয়; কিম্বা হয়ত কোন কবিতা বা উপন্যাস পড়ে আবেগে কেঁদে ফেলেছি; কিম্বা শুল্‌হফের চেয়ে মোট্‌সার্টকে আমার বেশী পছন্দ। যা কিছু ভালো, যা কিছু ভালোবাসার যোগ্য তা আঁচ করে নেবার তখনকার ক্ষমতাটা অসাধারণ মনে হত; অবশ্য কী ভালো, কী বা ভালোবাসার যোগ্য, সে বিষয়ে সত্যি ছিটেফোঁটা জ্ঞান ছিল না আমার। আমাব আগেকার নানা

রুচি ও অভ্যেসের বেশীর ভাগ অপছন্দ ছিল সের্গেই মিখাইলিচের। কিছু একটা বলতে যাচ্ছি, ওঁর চাউনিতে বা ভ্রূভঙ্গিতে টের পেতাম সেটা তিনি পছন্দ করেন না, ওঁর মুখে আসত সেই একটা বিষণ্ণ ও অল্প অবজ্ঞার ভাব, ব্যস, তাই যথেষ্ট, আমি ভেবে নিতাম কথাটা সত্যি আমার ভালো লাগে না, যদিও বরাবর সেটা ভালো লেগে এসেছে। মাঝে মাঝে উনি উপদেশ দিতে যাচ্ছেন, কী বলতে চান আঁচ করে ফেলেছি মনে হত। আমার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা জিজ্ঞেস করলেন হয়ত, কী চান উনি বুঝে ফেলতাম ওঁর দৃষ্টি থেকে। সে সব সময়ে আমার সব ধারণা, আমার সব অনুভূতি আমার নিজের ছিল না, ওঁর ধারণা, ওঁর অনুভূতিই হঠাৎ আমার হয়ে যেত, আমার জীবনে প্রবেশ করে আলোয় আলো করে দিত। নিজের অজ্ঞাতসারে সবকিছুকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করলাম, কাতিয়াকে, চাকরবাকরদের, সোনিয়াকে, নিজেকে, নিজের কাজকর্মকে। আগে বই পড়তাম একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে, এখন বই হয়ে দাঁড়াল আমার সবচেয়ে বেশী আনন্দের একটা উৎস, আর সেটা হল এইজন্যে যে, উনি আর আমি একসঙ্গে পড়তাম, আলোচনা করতাম, নতুন নতুন বই উনি এনে দিতেন আমাকে।

আগে সোনিয়াকে দেখাশোনা, ওকে পড়ানো বেশ কঠিন মনে হত, শুধু কর্তব্যবোধের তাগিদে জোর করে করতাম। পড়ানোর সময়ে উনি উপস্থিত ছিলেন, তারপর থেকে সোনিয়ার উন্নতিতে আমার খুশি লাগতে শুরু করল। এর আগে একটা গোটা রচনা পিয়ানোয় রপ্ত করে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব মনে হত, কিন্তু এখন উনি শুনবেন, হয়ত তারিফ করবেন, এই ভেবে একই গৎ বার বার বাজাতাম। বেচারী কাতিয়াকে কানে তুলো গুঁজে রাখতে

হত অবশ্য, কিন্তু আমার একঘেয়ে লাগত না। পুরোনো সোনাটাগুলোয় একেবারে আলাদা সুর লেগেছে মনে হত — অনেক ভালোভাবে বাজত তারা। যে কাতিয়াকে নিজের মতো করে জানতাম, ভালোবাসতাম, সে পর্যন্ত আমার চোখে আলাদাভাবে ধরা পড়ল। এখনি শুধু হৃদয়ঙ্গম হল যে একাধারে আমাদের মা, বান্ধবী ও দাসী হবার কোন বাধ্যবাধকতা ওর নেই। বুঝতে পারলাম এই মধুর মানুষটি কত নিঃস্বার্থ, অনুগত ও স্নেহশীলা — বুঝতে পারলাম ওর কাছে কতটা ঋণী আমি আর আরো বেশী করে ভালোবাসতে লাগলাম ওকে। আমাদের চাষীদের, বাড়ির ঝি-চাকরদের একেবারে অন্যভাবে দেখতে শেখালেন সের্গেই মিখাইলিচ। শুনলে হাসি পাবে হয়ত, সতেরো বছর পর্যন্ত যাদের সঙ্গে থেকেছি তারা ছিল আমার কাছে অচেনা, অদেখা মানুষরা আরো বেশী চেনা ছিল ওদের তুলনায়। কখনো ভাবি নি যে ওদেরো অনুরাগ আছে আমারি মতো, আছে বাসনা আর ব্যথা। এতদিন চেনা আমাদের বাগান, কুঞ্জ আর মাঠঘাট হঠাৎ আমার কাছে নতুন আর সুন্দর হয়ে উঠল। সের্গেই মিখাইলিচ ঠিকই বলেছিলেন, জীবনে সত্যিকারের আনন্দ মাত্র একটি — অপরের জন্যে বাঁচা। কথাটা তখন বিচিত্র ঠেকেছিল, মাথায় ঢোকে নি; কিন্তু ধারণাটি অজান্তে দানা বাঁধতে শুরু করল আমার হৃদয়ে। আমার জীবনযাত্রায় কিছু অদলবদল না করে, কোন কিছুতে শুধু নিজের ছাপ ছাড়া অন্য কিছু যোগ না করে চারিদিকে একটি আনন্দময় জগৎ খুলে ধরলেন তিনি। শৈশব থেকে সে জগতের সবকিছু আমাকে ঘিরে রেখেছিল, কিন্তু মুখ খোলে নি কখনো; উনি এলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ওরা মুখর হয়ে উঠল, চাইল আমার অন্তরে প্রবেশ করতে, আনন্দে ভরপুর করে দিতে।

সেবারের গ্রীষ্মে প্রায়ই নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তাম। বসন্তের সেই সব পুরোনো আকাঙ্ক্ষার ব্যাকুলতা ও ভবিষ্যতের আশার বদলে আমাকে ভরিয়ে দিত বর্তমান সুখের একটা উত্তেজনা। ঘুম আসত না চোখে, কাতিয়ার বিছানায় উঠে গিয়ে বলতাম আমার সুখের সীমা নেই। এখন সে কথা ভাবলে মনে হয় ওটা না বললেও চলত, ও নিজেই জানত আমি কত সুখী। আর ও বলত, ও যা চায় তাই পেয়েছে, নিজে অত্যন্ত সুখী ও, চুমো খেত আমাকে। বিশ্বাস করতাম ওকে; মনে হত সবাই সুখী হবে — সেটা তো স্বাভাবিক, সে রকমটা হওয়াই তো উচিত। কিন্তু আরো একটা জিনিস দরকার ছিল কাতিয়ার — ঘুমের। মাঝে মাঝে ও এমন কি রাগের ভান করে, বিছানা থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ত। আর আমি যে সব জিনিস সুখী করেছে আমাকে অনেকক্ষণ ধরে তা নিয়ে ভাবতাম। মাঝে মাঝে উঠে বসে দ্বিতীয়বার প্রার্থনা করতাম... নিজের ভাষায় প্রার্থনা চলত, অসীম সুখী আমি, সেজন্যে ধন্যবাদ জানাতাম ভগবানকে।

ছোট্ট ঘরটা নিঃশব্দ, শুধু কাতিয়ার নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের একটানা শব্দ, আর ওর পাশের ঘড়িটার টিক টিক। এপাশ-ওপাশ করতাম, ফিসফিস করে প্রার্থনামন্ত্র চলত, বুকে ক্রুশচিহ্ন করতাম, গলার ক্রুশে চুমো খেতাম। দরজা বন্ধ, জানলাগুলোর খড়খড়ি টানা, একই জায়গায় ঘুরে ঘুরে একটা মাছি না মশা গুন গুন করছে। আর ইচ্ছে হত ঘর ছেড়ে বাইরে যাব না কখনো, ভোর যেন কখনো না হয়, আমাকে ঘেরা মনোময় নিঃসঙ্গতার এই আবহাওয়া যেন কখনো টুটে না যায়। মনে হত আমার স্বপ্ন, আমার ধ্যানধারণা, আমার প্রার্থনা এই অন্ধকারে জীবন্ত প্রাণীর মতো আমার সঙ্গে রয়েছে, উড়ছে বিছানার কাছাকাছি, দাঁড়িয়ে আছে আমার ওপর।

আর আমার সমস্ত ধ্যানধারণা ওঁর ধ্যানধারণা, সমস্ত অনুভূতি ওঁর অনুভূতি। এটা যে পূর্বরাগ তখনো বুঝি নি। মনে হত আপনা থেকে যে কোন সময়ে এ ধরনের অনুভূতি আসতে পারে।

৩

ফসল কাটার সময়ে একদিন দুপুরের খাবারের পর কাতিয়া ও আমি সোনিয়াকে সঙ্গে করে বাগানে গেলাম। খাদের ওপর লাইম গাছের ছায়ার নিচে আমাদের প্রিয় বেঞ্চিটাতে বসা গেল। ওখান থেকে দূরের বন, মাঠঘাট নজরে পড়ে। তিনদিন সের্গেই মিখাইলিচ আসেন নি; সেদিন ওঁর প্রতীক্ষায় ছিলাম; উপরন্তু নায়েবের কাছে শুনেছিলাম উনি কথা দিয়েছেন আমাদের ক্ষেত দেখতে আসবেন। একটার অল্পক্ষণ পরে দেখলাম ঘোড়ার পিঠে যব-ক্ষেত হয়ে উনি আসছেন। ওঁর প্রিয় পীচ ও চেরি কিছু আনিয়ে নিল কাতিয়া। তারপর হেসে আমার দিকে একবার চেয়ে বেঞ্চে শুয়ে পড়ে ঝিমোতে লাগল। সরস পাতাভরা লাইম গাছের একটা চেপ্টা বাঁকা ডাল ভেঙে নিতেই রসে আমার হাত ভিজে গেল; ডালটি নিয়ে আমি কাতিয়াকে হাওয়া করতে লাগলাম, সঙ্গে সঙ্গে পড়া চলল। মাঝে মাঝে মেঠো রাস্তার দিকে তাকাচ্ছি, ওটা হয়ে তো ওঁর আসার কথা। পুরোনো একটা লাইম গাছের শিকড়ের গায়ে পুতুলের ঘর বানাচ্ছে সোনিয়া। তপ্ত গুমোট দিন, হাওয়া নেই। মেঘ ক্রমশঃ ঘন, আরো কালো হয়ে আসছে, সকাল থেকে ঝড়বিদ্যুতের আভাস। অস্থির লেগেছিল আমার, ঝড়বিদ্যুতের আগে যেমনটা আমার বরাবর হয়। কিন্তু দুপুরের পর মেঘগুলো সরে গেল ঈশান কোণে, পরিষ্কার আকাশে বেরিয়ে এল সূর্য।

শুধু মাঝে মাঝে একদিকে বজ্রের গুরুগুরু ধ্বনি, দিগন্তে ক্ষেতের ধুলোর সঙ্গে মিশেছে জগদ্দল মেঘ, মেঘ চিরে বেরিয়ে আসছে বিদ্যুতের আঁকাবাঁকা ক্ষীণ ঝলক। স্পষ্ট বোঝা গেল আজ আর ঝড় আসবে না, অন্ততঃ আশেপাশে কোথাও নয়। বাগানের ওধারে চোখে পড়ে রাস্তায় শস্যের আঁটি উ'চু করে বোঝাই ক্যাঁচকে'চে গাড়িগুলো ঢিমেতালে ঘরে ফিরছে, ক্রমাগত তাদের সাড়া, উল্টো দিকে ফাঁকা সব গাড়ি চলেছে ঘড়ঘড়িয়ে, লোকগুলো বসে আছে পা ঝুলিয়ে, সার্ট উড়ছে। ভারি ধুলো কেটে যাচ্ছে না, মাটিতে বসছেও না, কঞ্চির বেড়ার ওদিকে আর ফলের বাগানের পাতার মধ্যে ভাসছে। আরো দূরে, শস্যের মাড়াই স্থানে একই গলার আওয়াজ, গাড়ির চাকার সেই ক্যাঁচক্যাঁচ, দেখা যাচ্ছে শস্যের সেই একই হলদে আঁটি, প্রথমে কঞ্চির বেড়া বরাবর মন্থর তাদের গতি, তারপর হঠাৎ ওপরে উঠছে ঝটকায়, আমার চোখের সামনে আঁটিগুলো ডিমের আকারের বাড়ির মতো রূপ নিচ্ছে, ছাতগুলো চোখা, ওপরে ভিড় করে আছে চাষীরা। সামনের দিকটায় ধুলোভরা ক্ষেতে গাড়িগুলোর এদিক-সেদিক যাতায়াত, আবার নজরে পড়ছে হলদে আঁটি, কানে আসছে গাড়ির, গলার, গানের শব্দ। একদিকে ফসল-কাটা মাঠের ক্রমশঃ বিস্তৃত প্রসার, ক্ষেতের মাঝে মাঝে সীমারেখার মতো সোমরাজের ফালি। নিচে, ডান দিকে রঙচঙে জামাকাপড় পরা কিষাণীরা ফসল-কাটা এবড়োথেবড়ো ক্ষেতে শস্যের আঁটি বে'ধে রাখছে; ঝুঁকে পড়ে সামনে পিছনে সমানে হাত ঘোরাচ্ছে ওরা, যত এগোচ্ছে তত নিয়মিত সারিতে রাখা শস্যের আঁটিতে ছিমছাম দেখাচ্ছে ক্ষেতটাকে। মনে হল হঠাৎ আমার চোখের সামনে গ্রীষ্ম পরিণত হচ্ছে হেমন্তে। চারিদিকে গরম আর ধুলো, বাগানে আমাদের প্রিয় জায়গাটা ছাড়া। চারিদিকে

ধুলো আর গরম, আর সবকিছু ছাপিয়ে কাঠফাটা রোদে কর্মরত চাষীদের হৈচৈ, কথাবার্তা, অঙ্গসঞ্চালন।

শাদা স্বচ্ছ রুমালে মুখ ঢেকে ঠাণ্ডা বেঞ্চে শুয়ে কেমন সুন্দর নাক ডাকাচ্ছে কাতিয়া! রেকাবীতে চেরিগুলো কী টুসটুসে, কী ঝকঝকে কালো! কী তাজা আর পরিষ্কার আমাদের ফ্রকগুলো! জগের জল সূর্যালোকে কী উজ্জ্বল আর উৎফুল্ল! কী সুখী লাগছে নিজেকে! "কী আর করা যায়?" ভাবলাম। "এত সুখী লাগছে সেটা কি আমার দোষ? কিন্তু সুখের ভাগ অন্যকে দেব কী করে? কাকে দেব নিজেকে উজাড় করে, দেব আমার সমস্ত সুখ?"

পথের ধারে বার্চ গাছের চূড়ার নিচে সূর্য ইতিমধ্যে অস্ত গিয়েছে; দূরের জিনিস সূর্যের তেরছা আলোয় উজ্জ্বল আর প্রখর; মাটিতে বসছে ধুলো; একেবারে ছত্রভঙ্গ মেঘগুলো; গাছের ফাঁকে গ্রামের প্রান্তে শস্যের তিনটে নতুন গাদা চোখে পড়ল, চাষীরা সেগুলো থেকে নেমে এসেছে; ঘড়ঘড়িয়ে চলে গিয়েছে গাড়িগুলো, শেষবারের মতো নিশ্চয়, গাড়িতে বসা লোকের চেঁচানি; গলা ফাটিয়ে গাইতে গাইতে ঘরে ফিরেছে মেয়েরা, কাঁধে উকনঠেঙ্গা, কটিবন্ধে খড় বাঁধার দড়ি; কিন্তু সের্গেই মিখাইলিচ তো এলেন না এখনো, অনেকক্ষণ আগে তো একটা টিলা থেকে ঘোড়ায় চেপে নামতে দেখেছি ওঁকে। তারপর হঠাৎ দেখলাম ওঁকে, যেদিক থেকে এলেন একেবারে আশা করি নি সেদিক থেকে আসবেন (উনি এসেছেন খাদ হয়ে)। দীর্ঘ পদক্ষেপে আসছেন আমাদের কাছে, মুখে হাসি আর খুশির ছাপ, টুপিটা হাতে। দেখলেন কাতিয়া ঘুমিয়ে পড়েছে, ঠোঁট চেপে চোখ কোঁচকালেন, তারপর এলেন পা টিপে টিপে। বুঝলাম উনি সেই অকারণ প্রাণবন্ত মেজাজে আছেন যেটা আমার

ভালো লাগত খুব, যেটাকে আমরা বলতাম 'বুনো উচ্ছ্বাস'। ঠিক স্কুল পালানো ছেলের মতো; সমস্ত চেহারায় আনন্দের, সুখের, বালকসুলভ দুষ্টুমির ছাপ।

'কী খবর, ছোট্ট ভায়োলেট, কেমন আছেন? খাসা আছেন তো?' হাতে চাপ দিয়ে ফিসফিসিয়ে শুধালেন। 'আমি চমৎকার আছি,' প্রশ্নের জবাবে বললেন। 'আজ তেরোয় পড়লাম যে, মনে হচ্ছে খেলনা ঘোড়ায় চাপি বা গাছে চড়ি।'

''বুনো উচ্ছ্বাস' বুঝি?' ওঁর হাসি-ভরা চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলাম, বুঝতে পারলাম ওঁর মেজাজের ছোঁয়াচ লাগছে আমায়।

'হ্যাঁ,' চোখ ঠেরে, না হাসার চেষ্টা করে জবাব দিলেন উনি। 'কিন্তু কাতেরিনা কার্লভ্‌নার নাকে ঘা দিয়ে লাভটা কী?'

ওঁর দিকে তাকিয়ে লাইমের ডালটা দুলিয়ে গিয়েছি, খেয়াল করি নি কাতিয়ার রুমালটা ডালের ঘায়ে খসে পড়েছে, পাতা লাগছে ওর মুখে। হেসে উঠলাম।

'ও বলবে ও ঘুমোয় নি,' ফিসফিসিয়ে বললাম, যেন ওর ঘুম না ভাঙে; কিন্তু আসলে তা নয় — ফিসফিসিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছিল বলে।

আমার নকল করে ঠোঁট নড়ালেন উনি, যেন আমি এত আস্তে কথা বলেছি যে ওঁর কানে কিছু যায় নি। তারপর চেরির প্লেটটা চোখে পড়াতে চোরের মতো সেটা তুলে নিয়ে গেলেন লাইম গাছের নিচে সোনিয়ার কাছে, সেখানে ওর পুতুলগুলোর ওপর বসে পড়লেন। সোনিয়া চটে গেল প্রথমে, কিন্তু উনি খেলতে লাগলেন ওর সঙ্গে, মিটমাট হতে তাই দেরী হল না। খেলাটা হল কে আগেভাগে চেরিগুলো সাবাড় করে ফেলতে পারে।

'ওদের বলি আরো চেরি আনতে,' বললাম। 'কিম্বা আমরা তিনজনে গিয়ে নিয়ে আসি।'

রেকাবীটা নিয়ে তার ওপর পুতুলগুলো বসালেন উনি, আমরা চললাম ফলের চালার দিকে, পিছু পিছু দৌড়চ্ছে সোনিয়া হেসে হেসে, পুতুলগুলো ফিরে পাবার জন্যে ওঁর কোট ধরে টানছে। পুতুলগুলো দিয়ে উনি গম্ভীরভাবে আমার দিকে ফিরে তাকালেন।

বললেন, 'সত্যি আপনি ভায়োলেট,' গলার স্বর তখনো মৃদু, যদিও কারো ঘুম ভাঙবার আশঙ্কা আর ছিল না। 'ধুলো আর গরম আর কাজের 'পর এলাম আপনার কাছে, মনে হল ভায়োলেটের গন্ধ পেলাম — বাগানের ভায়োলেটের গন্ধ নয়, ঋতুর প্রথম কালচে ছোট্ট ভায়োলেট, তাতে গলন্ত বরফ আর বাসন্তী ঘাসের গন্ধ।'

'ফসল কাটা কেমন চলেছে?' ওঁর কথায় আমার আনন্দ ও বিব্রত ভাব ঢাকা দেবার জন্যে জিজ্ঞেস করলাম।

'চমৎকার! চমৎকার লোক এরা সবাই! ওদের যত বেশী চেনা যায় তত ভালো লাগে।'

'হ্যাঁ,' আমি বললাম। 'আপনি আসার আগে বাগানে বসে ওদের কাজ দেখছিলাম, আর হঠাৎ এমন লজ্জা করল, ওরা কাজ করছে আর আমি... এত সুখী যে...'

'আদিখ্যেতা করবেন না,' বাধা দিয়ে বললেন উনি, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে আমার দিকে তাকালেন, ওঁর চাউনিটা কিন্তু কোমল। 'ওটা পবিত্র জিনিস। এ ধরনের অনুভূতি নিয়ে কখনো জাঁক করা উচিত নয়।'

'কিন্তু কথাটা তো শুধু আপনাকে বলেছি।'

'তা জানি। যাক গে, চেরিগুলোর কী হল?'

ফলের বাগানের গেট তালাবন্ধ, মালীদের কাউকে দেখা গেল না (ফসল তোলায় হাত লাগাতে সবাইকে পাঠিয়েছিলেন উনি)। চাবি আনতে দৌড়ল সোনিয়া, কিন্তু ওর জন্যে না দাঁড়িয়ে উনি দেয়ালের ওপর উঠে জালটা তুলে লাফিয়ে পড়লেন ওদিকে।

'চেরি চাই না কি?' ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। 'রেকাবীটা দিন তো।'

'না, আমি নিজের হাতে তুলতে চাই — চাবিটা নিয়ে আসি। সোনিয়া খুঁজে পাবে না...'

কিন্তু ওখানে উনি কী করছেন দেখার ইচ্ছে হল; যখন নিজেকে একেবারে একলা ভাবেন তখন ওঁকে কী রকম দেখায়, ওঁর হাবভাবটা কেমন, দেখতে ইচ্ছে হল। সত্যি কথা বলতে, নিমেষের জন্যেও ওঁকে চোখ ছাড়া করতে আমার অনিচ্ছা। বিছুটির ওপর দিয়ে দেয়াল ঘুরে পা টিপে দৌড়িয়ে অন্য দিকটায় গেলাম, ওখানটা আরো নিচু। একটা খালি পিপের ওপর দাঁড়ালাম, দেয়ালের ওপর দিকটা আমার বুক পর্যন্ত নয়, ঝুঁকে পড়ে দেখলাম গাঁটওয়ালা বুড়ো বুড়ো গাছ, চওড়া, দাঁতওয়ালা পাতার নিচে সরস কালো চেরি ভারি হয়ে ঝুলছে, দেখে নিলাম একবার। জালের নিচে দিয়ে মাথা গলিয়ে একটি গ্রন্থিল ডালের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম সের্গেই মিখাইলিচকে। উনি ধরে নিয়েছিলেন আমি চলে গিয়েছি, কেউ ওঁকে দেখতে পাবে না। টুপি খুলে একটি গাছের ফেঁকড়ায় বসে আছেন, চোখ বোজা, এঁটেল একটা চেরি দলা পাকিয়ে গোল করছেন। হঠাৎ কাঁধ ঝাঁকিয়ে চোখ খুললেন, অল্প হেসে অস্ফুট কণ্ঠে কী যেন বললেন। হাসিটা, কথাটা ওঁর পক্ষে এত অস্বাভাবিক যে আড়ি পাততে লজ্জা হল। মনে হল উনি বলেছেন, 'মাশা'। ভাবলাম, "না, তা হতে পারে না।" আবার

বললেন উনি, 'মাশা, লক্ষ্মীটি আমার' — এবার আরো আস্তে, আরো কোমলভাবে। এবারে কথাগুলো স্পষ্টভাবে কানে এল। বুক এত ঢিপঢিপ করতে লাগল, এমন একটা তীব্র, প্রায় নিষিদ্ধ আনন্দ আমাকে অভিভূত করে ফেলল যে দেয়ালটা আঁকড়ে ধরলাম দুহাতে, যাতে পড়ে গিয়ে ধরা না পড়ি। শুনতে পেলেন উনি, চমকে উঠে চারিদিক দেখে নিয়ে চোখ বুজলেন, মুখটা ছোট ছেলের মতো টকটকে লাল হয়ে উঠল। কী একটা বলতে চাইলেন আমাকে, কিন্তু পারলেন না, আরক্তিম মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু। তবুও একবার আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আমিও হাসলাম। সুখে ওঁর সারা মুখ দীপ্ত হয়ে উঠল। পরিবারের প্রবীণ বন্ধু উনি আর নন, এমন একজন নন যিনি আদর করেন আমাকে, আমাকে শেখান। এখন তিনি আমার সমান — এমন একজন মানুষ যিনি ভালোবাসেন আমাকে আর ভয় করেন, যাঁকে ভালোবাসি আর ভয় করি আমি। কোন কথা বললাম না দুজনে, শুধু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর হঠাৎ উনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন, হাসি আর চোখের উজ্জ্বল দীপ্তি মিলিয়ে গেল, পুরোনো, পিতৃসুলভ গলায়, নিরাসক্তভাবে তাকালেন আমার দিকে আবার, যেন অসমীচীন কিছু একটা আমরা করেছি, এখন সামলে নিয়েছেন নিজেকে, আমাকেও বলছেন সামলে নিতে।

'নেমে পড়ুন, নইলে পড়ে যাবেন,' বললেন উনি। 'আর চুলটা ঠিক করে নিন, চেহারাটা কেমন হয়েছে দেখুন দিকি।'

বিরক্ত হয়ে ভাবলাম, "উনি ভান করছেন কেন? আমাকে ব্যথা দিতে চান কেন?" সে মুহূর্তে ওঁকে আবার বিব্রত করার, ওঁর ওপর আমার শক্তি পরখ করার দুর্দম বাসনা একটা পেয়ে বসল আমাকে।

'না, আমি নিজে হাতে চেরি তুলতে চাই,' বলে একেবারে কাছের ডালটা ধরে দেয়ালে উঠলাম। উনি হাত বাড়াতে না বাড়াতে লাফিয়ে নামলাম ফলের বাগানে।

'কী বোকামী!' বলে আবার লাল হয়ে উঠলেন, আর নিজের বিব্রত ভাবটা লুকোবার জন্য বিরক্তির ভান করলেন। 'লাগত যদি? আর এখান থেকে বেরোবেন কী করে?'

আগের চেয়ে বিব্রত উনি, কিন্তু এবার তাতে আনন্দ হল না, ভয় হল। এবার আমার বিব্রত হবার পালা। লাল হয়ে উঠলাম, তাকালাম না ওঁর দিকে। কী বলা উচিত ভেবে না পেয়ে রাখার মতো কিছু না থাকলেও চেরি তুলতে শুরু করে দিলাম। ধিক্কার দিলাম নিজেকে, যা করেছি অনুশোচনা হল তার জন্যে। ভয় হল আজকের ছেলেমানুষি কাণ্ডটার জন্যে ওঁর কাছে চিরকালের জন্যে খেলো হয়ে যাব। দুজনেই চুপচাপ, দুজনেরি খারাপ লাগছে। চাবি নিয়ে সোনিয়া দৌড়ে আসাতে অস্বস্তির হাত থেকে রেহাই পেলাম। এরপর অনেকক্ষণ দুজনে কথা বললাম না, সোনিয়াকে নিয়ে দুজনেই ব্যস্ত। কাতিয়ার কাছে ফিরে যাওয়াতে ও বলল যে ও ঘুমোয় নি মোটেই, সব কথা ওর কানে গিয়েছে। আমি অনেকটা টাল সামলে নিলাম, আর উনি আবার ওঁর পিতৃসুলভ খবরদারীর ভাবটা আনার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেটাতে বিশেষ ফল হল না, আমি ভুললাম না তাতে।

কিছুদিন আগেকার কথাবার্তা স্পষ্ট মনে পড়ে গেল। কাতিয়া বলেছিল মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের ভালোবাসা আর সে ভালোবাসা প্রকাশ করা আরো সহজ।

ও বলেছিল, 'পুরুষে বলতে পারে ভালোবাসি, মেয়েরা পারে না।'

'আমার তো মনে হয়, 'ভালোবাসি' কথাটা পুরুষে বলতে পারে না, বলা উচিত নয়,' উনি বলেছিলেন।

'কেন?' আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

'কেননা, সেটা মিথ্যে বলা হবে। ভালোবাসার কথা বলাটা মানুষের পক্ষে বিদ্যে প্রকাশের সামিল না কি? যেন 'ভালোবাসি' বলার সঙ্গে সঙ্গে চিচিংফাঁক গোছের কিছু একটা হবে, আর লোকে ভালোবেসে ফেলবে। যেন কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে অবাক কান্ড কিছু একটা ঘটা চাই, কোন ভেলকি, হাজারটা তোপ একসঙ্গে গর্জে উঠবে। আমার মনে হয়,' উনি বললেন, 'ভালোবাসার কথাটা যারা গম্ভীরভাবে ঘোষণা করে তারা হয় নিজেদের ঠকায় নয় অন্যদের, সেটা আরো খারাপ।'

'কিন্তু পুরুষে না বললে মেয়েটি কী করে বুঝবে যে তাকে ভালোবাসে?' জিজ্ঞেস করেছিল কাতিয়া।

'জানি না,' উনি জবাবে বলেছিলেন। 'প্রত্যেক মানুষের নিজের ভাষা আছে। অনুভূতি যদি থাকে, সেটা প্রকাশ পাবে। উপন্যাস পড়ার সময়ে খালি কল্পনা করি, লেফটেন্যাণ্ট স্ত্রেল্‌স্কি বা আলফ্রেড বলে উঠল 'তোমায় ভালোবাসি, এলিওনরা,' আর সে সময় তাদের মুখে কী রকম বুঝি হতবুদ্ধি ভাব আসে। ওরা তো ভাবে যে বলার সঙ্গে সঙ্গে অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটবে, কিন্তু তাদের বা প্রেমিকার কিস্‌সু ঘটে না, নাক চোখ সবকিছু তো থাকে অবিকল আগেকার মতো।'

তখন মনে হয়েছিল ওঁর ঠাট্টার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা আছে — আমাকে নিয়ে কিছু একটা — কিন্তু উপন্যাসের নায়কনায়িকাদের তাচ্ছিল্য করতে কাতিয়া দেবে না কাউকে।

'হামেশা বেঁকিয়ে কথা বলেন আপনি,' কাতিয়া বলেছিল।

‘আচ্ছা, ঠিক বলুন তো, আপনি কখনো কোন মেয়েকে ‘ভালোবাসি’ বলেন নি?’

‘কখখনো না, আর এক পায়ে হাঁটু গেড়ে বসি নি কখখনো,’ হেসে জবাব দিয়েছিলেন উনি, ‘আর সেটা করব না এ জন্মে।’

সে কথাবার্তা স্পষ্ট মনে পড়ল; ভাবলাম, “আমাকে ভালোবাসেন বলার দরকার নেই ওঁর। উনি ভালোবাসেন আমাকে সেটা জানি। আর নির্বিকার ভাব যতই করুন না কেন, আমি ভোলবার নই।”

সেদিন সারা সন্ধ্যে আমার সঙ্গে খুব কম কথা বললেন উনি, কিন্তু কাতিয়া আর সোনিয়াকে বলা প্রতিটি কথায়, ওঁর প্রতিটি অঙ্গসঞ্চালনে, দৃষ্টিপাতে অনুরাগের চিহ্ন দেখলাম, দেখলাম নিঃসন্দেহে। শুধু বিরক্ত লাগল, দুঃখ হল ওঁর জন্যে: কেন উনি ভাবছেন যে মনের ভাব গোপন রাখতে হবে, উদাসীনতার ভান করে যেতে হবে? এখন তো সবকিছু পরিষ্কার, এখন অবিশ্বাস্য রকমের সুখ পাওয়া কত সহজ, কত স্বাভাবিক। কিন্তু ফলের বাগানে আমার লাফিয়ে নামার কথাটা পীড়া দিতে লাগল আমাকে, যেন মহা অপরাধ করে ফেলেছি। মনে হল উনি আমার খাতির আর করেন না, চটে গিয়েছেন আমার ওপর।

চা খাবার পর পিয়ানোর কাছে গেলাম, উনি এলেন পিছন পিছন।

বৈঠকখানায় আমাকে ধরে ফেলে বললেন, ‘একটা কিছু বাজান তো। অনেক দিন আপনার বাজনা শুনি নি।’

‘সের্গেই মিখাইলিচ, আমি...’ হঠাৎ ওঁর চোখে চোখ রেখে বললাম, ‘আপনি আমার ওপর চটেন নি তো?’

‘চটব কেন?’

'দুপুরের খাবার পর আপনার কথা শুনি নি বলে,' আরক্তিম মুখে বললাম।

কথাটা বুঝলেন উনি, হেসে মাথা নাড়লেন। ওঁর চাউনিটার মানে, আমাকে বকা উচিত, কিন্তু বকার মতো মনের জোর ওঁর নেই।

'যাক, তাহলে কিছু হয় নি, আমাদের আবার ভাব হয়ে গিয়েছে,' পিয়ানোয় বসতে বসতে বললাম।

'তাই তো মনে হচ্ছে!' বললেন উনি।

বড়ো, উঁচু ছাতওয়ালা হলে পিয়ানোর ওপরে দুটো মোমবাতি শুধু, বাকি ঘরটা আধো-অন্ধকার। খোলা জানলা দিয়ে স্বচ্ছ গ্রীষ্ম রাত্রির উঁকিঝুঁকি। সব নিস্তব্ধ, শুধু কাতিয়ার পায়ের চাপে অন্ধকার বৈঠকখানার মেঝের পাটাতনের কিঁচকিঁচ আর জানলার নিচে বাঁধা সের্গেই মিখাইলিচের ঘোড়া বার্ডকে পা ঠুকছে আর নাক দিয়ে আওয়াজ করছে। আমার পেছন দিকে উনি বসেছিলেন বলে ওঁকে দেখতে পাচ্ছিলাম না, কিন্তু ছায়াচ্ছন্ন ঘরের সবখানে, আমার সঙ্গীতে, আমার অন্তরে ওঁর উপস্থিতির অনুভূতি। ওঁর প্রতিটি দৃষ্টি, প্রতিটি অঙ্গসঞ্চালন দেখতে পাচ্ছিলাম না বটে, কিন্তু ওঁর সবকিছুতে সাড়া দিচ্ছিল আমার হৃদয়। মোট্সার্টের সোনাটা-ফান্টাজিয়াটা উনি এনেছিলেন, উনি ফিরে আসার পর সেটা শিখেছিলাম ওঁরি জন্যে, সেটা বাজালাম। কী বাজালাম মোটে ভাবি নি, কিন্তু মনে হল বাজিয়েছি ভালোই, অনুভব করলাম ওঁর ভালো লেগেছে। উনি যে আনন্দ পাচ্ছেন বুঝলাম সেটা, ওঁর দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারলাম আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। কিছু না ভেবে, আঙুলগুলো আপনা থেকে তখনো বাজিয়ে চলেছে, ফিরে তাকালাম ওঁর দিকে। জ্যোৎস্না

রাত্রির পটভূমিতে ওঁর মাথাটা স্পষ্ট দেখা গেল। হাতে চিবুক রেখে উনি বসে আছেন, দীপ্ত চোখ আমাতে নিবদ্ধ। ওঁর সে দৃষ্টি দেখে অল্প হেসে বাজানো থামিয়ে দিলাম। উনিও অল্প হাসলেন, তারপর স্বরলিপির দিকে তাকিয়ে তিরস্কারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন যাতে আমি বাজিয়ে চলি। বাজনা শেষ হল, চাঁদ তখন অনেক উঁচুতে, ঘরে মোমবাতির ক্ষীণ শিখা ছাড়া জানলা দিয়ে অন্য ধরনের রুপালী আলো এসে পড়েছে মেঝেতে। কাতিয়া বলল সবচেয়ে ভালো জায়গাতে থেমে যাওয়াটা কেমন ধারা কাণ্ড, খারাপ বাজিয়েছি আমি। উনি বললেন বরং এত ভালো কখনো বাজাই নি আগে, তারপর এ ঘর ও ঘরে পায়চারি শুরু করলেন, অন্ধকার বৈঠকখানা আর হলে আসা আর যাওয়া, মাঝে মাঝে থেমে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। আমারো মুখে মৃদু হাসি, বাস্তবিক, ইচ্ছে হচ্ছিল বিনা কারণে জোরে হাসি, একটা কিছু ঘটেছে বলে এত সুখ মনে, সেটা ঘটেছে আজ, এইমাত্র, এই মুহূর্তে। ঘর ছেড়ে উনি বেরিয়ে যাচ্ছেন আর আমি কাতিয়ার গলা জড়িয়ে (আমরা দুজনে পিয়ানোর কাছে দাঁড়িয়েছিলাম) ওর নরম চিবুকের নিচে আমার আদরের জায়গাটিতে চুমু খাচ্ছি। যেই উনি ফিরে আসছেন, মুখে ভারিক্কি ভাব আনার চেষ্টা করছি, অতি কষ্টে হাসি চেপে রাখছি।

'ওর কী হয়েছে আজ?' কাতিয়া জিজ্ঞেস করল ওঁকে।

উত্তর না দিয়ে আমার দিকে চেয়ে শুধু হাসলেন উনি — কী ঘটেছে উনি তো জানেন।

'রাত্তিরটা কেমন দেখুন একবার!' বাগানের দিকে বারান্দার খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বৈঠকখানা থেকে ডেকে বললেন উনি।

কাছে গেলাম আমরা। ও রকম রাত্রি সত্যি আর কখনো দেখি নি পরে। বাড়ির পিছনে, দৃষ্টির বাইরে, পূর্ণিমার চাঁদ, আলোয় ছাতের আর থামগুলোর আর চাঁদোয়ার ছায়া তেরছাভাবে পড়েছে বালু পথে আর ফুলের কেয়ারিতে। বাকি সবকিছুতে আলোর বান ডেকেছে, সবকিছু শিশিরে আর চন্দ্রালোকে রূপালী। ফুলের মধ্য দিয়ে চওড়া পথ, একদিকে আড়াআড়ি পড়েছে ডালিয়া ফুল ও কাঠিগুলোর ছায়া, ঠাণ্ডা ঝকঝকে কাঁকর বিছানো পথটা সটান চলে গিয়েছে কুয়াশাচ্ছন্ন সুদূরে। পথটায় চাঁদের চিকচিকে আলো। গাছের মাঝখানে ফুলের ঘরের চকচকে চালের আভাস, খাদ থেকে উঠছে ক্রমশঃ ঘন কুয়াশা। লাইলাক ঝোপের পাতা তখুনি ঝরতে শুরু করেছে, প্রত্যেকটি ডাল উদ্ভাসিত। বাগানে শিশিরে ভেজা প্রত্যেকটি ফুল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বীথিকাগুলোয় আলো ও ছায়া মিশেছে এমনভাবে যে গাছগুলোকে দেখাচ্ছে দুলন্ত স্বচ্ছ অলৌকিক বাড়ির মতো। ডান দিকে বাড়িটার ছায়ায় সবকিছু কালো, খাপছাড়া, ভয়াবহ। সে ছায়া থেকে খামখেয়ালে ঠেলে ওঠা পপলারের ঝোপড়া মাথাটা আরো উজ্জ্বল, কী বিচিত্র কারণে যেন বাড়ির একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে ঝকঝকে আলোয়, উচিত ছিল তো আকাশের দূর নীলে ভেসে যাওয়া।

'একটু বেড়িয়ে আসা যাক,' বললাম আমি।

রাজী হয়ে গেল কাতিয়া, শুধু বলল আমার গালোশ পরা উচিত।

'লাগবে না,' বললাম। 'সেগেই মিখাইলিচের হাত ধরে যাব।'

উনি হাত ধরলে যেন পা ভিজবে না! কিন্তু তখন আমাদের তিনজনেরি কথাটা ঠিক মনে হল, অদ্ভুত ঠেকল না। এর আগে কখনো আমার হাত ধরে উনি হাঁটেন নি, সেদিন নিজে আমি ওঁর

হাতটা নিলাম, সেটা বিচিত্র লাগল না ওঁর। বারান্দা থেকে নামলাম তিনজনে, আর সমস্ত পৃথিবী, আকাশ, বাগান আর হাওয়া মনে হল সম্পূর্ণ নতুন, আমার অচেনা।

বীথিকা হয়ে হাঁটছি, সামনে তাকিয়ে মনে হচ্ছে ও দিকে আর এগোনো অসম্ভব একেবারে, ওখানে সম্ভাব্য পৃথিবীর সমাপ্তি, ওখানে যা আছে তা নিজের সৌন্দর্যলোকে চিরকালের জন্যে আবদ্ধ। কিন্তু আরো এগোচ্ছি আর সেই সৌন্দর্যলোকের রহস্যদ্বার খুলে যাচ্ছে আমাদের জন্যে, সেখানেও মনে হচ্ছে আমাদের অতি পরিচিত সেই বাগান, সেই গাছ আর পথ আর শুকনো পাতা। আমরা সত্যিই ও রকম পথ হয়ে হাঁটছিলাম: আলোছায়ার বৃত্তে পা দিচ্ছি, আর পায়ের নিচে শুকনো পাতার খসখস শব্দ, মুখে লাগল তাজা ডাল একটা। আর আমার হাত সাবধানে নিয়ে কোমল নিয়মিত পদক্ষেপে তিনি হাঁটছেন পাশে পাশে, বালুতে শব্দ তুলে পাশে যে হাঁটছে সত্যি সে কাতিয়া। নিস্পন্দ শাখার মধ্য দিয়ে আমাদের মুখে আলো এসে পড়েছে, সেটা চাঁদের আলো না হয়ে যায় না।

প্রতি পদক্ষেপে পিছনে আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে রহস্যদ্বার, বিশ্বাস হচ্ছে না আরো এগিয়ে যেতে পারি আমরা, ধরা-ছোঁয়ার জগতে বিশ্বাস লুপ্ত হল আমার।

'এঃ! কোলা ব্যাঙ একটা!' কাতিয়া বলে উঠল।

"কে বলল কথাটা, বলল কেন?" অবাক হয়ে ভাবলাম। তারপর মনে পড়ল — ও, কাতিয়ার গলা ওটা, কোলা ব্যাঙে ওর আতঙ্ক, নিচে চেয়ে দেখলাম। সামনে ছোট্ট একটা কোলা ব্যাঙ একবার লাফিয়ে নড়ল না ওখান থেকে, পথের চকচকে ভিজে মাটিতে পড়ল ওর অতি ক্ষীণ কালো ছায়া।

'ভয় করছেন নাকি?' উনি শুধালেন।

ওঁর দিকে তাকালাম, ওখানটায় গাছগুলো একটু ফাঁক, ওঁর মুখটা স্পষ্ট দেখা গেল। কী সুন্দর সে মুখ, কী সুখী!

বললেন, 'ভয় করছেন নাকি?' কিন্তু আমি শুনলাম উনি বলছেন, 'তোমায় ভালোবাসি, লক্ষ্মী সোনামণি।' ওঁর চাউনি, ওঁর স্পর্শ ঝঙ্কার তুলল, 'ভালোবাসি, ভালোবাসি!' আর সে কথাটা বলল আলো আর ছায়া আর বাতাস, সবকিছু।

বাগানটা পুরো চক্কর দিলাম আমরা। খুটখুট করে পাশে পাশে হাঁটছে কাতিয়া, হাঁপাচ্ছে। ক্লান্ত ও, বলল ফেরার সময় হয়েছে এবার। দুঃখ হল বেচারীর জন্যে। ভাবলাম, "আমাদের মতো অনুভূতি নেই কেন কাতিয়ার? সবাই কেন আজকের রাত্তিরটার মতো, আমাদের দুজনের মতো সুখী আর নবীন নয়?"

বাড়িতে ফিরে গেলাম, কিন্তু উনি অনেকক্ষণ রয়ে গেলেন — মোরগ ডাকছে, সবাই শুতে চলে গিয়েছে, জানলার নিচে ওঁর ঘোড়াটা মাটিতে পা ঠুকছে আর অস্থির শব্দ করছে নাক দিয়ে, তবু উনি গেলেন না। অনেক রাত হয়েছে সেটা আমাদের মনে করিয়ে দিল না কাতিয়া, আমরা আজেবাজে গল্প করে চললাম, বুঝতে পারি নি কখন তিনটে বাজল। তৃতীয় বার মোরগ ডাকল, ভোর হয় হয়, তখন উনি গেলেন। সচরাচরকার মতো বিদায় জানালেন, কথায় অসাধারণ কিছু ছিল না, কিন্তু আমি জানলাম সেদিন থেকে উনি আমার, কখনো হারাব না ওঁকে। ওঁকে ভালোবাসি, সেটা নিজের কাছে স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে কাতিয়াকেও সবকিছু বললাম। খুশি হল ও, ওকে যে খুলে বলেছি তাতে ওর মনে নাড়া লেগেছে; সে রাত্রে কাতিয়া বেচারীর ঘুমের অভাব হল না অবশ্য, কিন্তু আমি অনেকক্ষণ বারান্দায় পায়চারি করে শেষে

বাগানে গিয়ে দুজনের চলা পথে আবার হাঁটলাম, ওঁর প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি অঙ্গসঞ্চালন আবার মনে করলাম। সারা রাত ঘুম এল না, আর জীবনে সেই প্রথম অত ভোরে সূর্যোদয় দেখলাম। সে রকম রাত্রি আর প্রভাত পরে আর কখনো দেখি নি। "উনি কেন সোজাসুজি বলেন না যে আমায় ভালোবাসেন?" ভাবলাম আমি। "কেন তোলেন বাধাবিঘ্নের কথা, বুড়ো বলেন নিজেকে? সবকিছু তো এত সহজ আর সুন্দর এখন। এই সোনালী দিন কেন বৃথায় যেতে দিচ্ছেন, এ দিন আর কখনো ফিরে আসবে না হয়ত। বলুন উনি, 'তোমায় ভালোবাসি,' মুখ ফুটে বলুন। আমার হাত হাতে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে বলুন, 'তোমায় ভালোবাসি।' লজ্জায় লাল হয়ে উঠুন উনি, চোখ বুজে যাক, আর তখন সব কথা জানাব ওঁকে। কিম্বা কিছু বলব না হয়ত, ওঁকে জড়িয়ে কাছ ঘেঁষে শুধু কাঁদব। তারপর হঠাৎ মনে হল: যদি ভুল করে থাকি, যদি উনি আমাকে না ভালোবাসেন!"

ভেবে ভয় হল। তাহলে আমার দুর্দশার সীমা আর থাকবে না। ফলের বাগানের দেয়াল টপকে ওঁর কাছে যাওয়াতে ওঁর আর আমার বিব্রত ভাবটার কথা মনে পড়ল। ভারি হয়ে উঠল আমার বুক, জল ছাপিয়ে এল চোখে, প্রার্থনা করতে লাগলাম। তারপর আমার ভাবনাচিন্তা ও আশাকে জড়িয়ে একটা কথা এল মাথায়। ঠিক করলাম আজকের দিন থেকে উপোস করব, আমার জন্মদিনে ইউকারিষ্ট গ্রহণ করে বাগদত্তা হব ওঁর।

কেন সে রকমটা হবে জানি না, কিন্তু সেই মুহূর্ত থেকে আমার বিশ্বাস হল ওটা না হয়ে যায় না। ঘরে ফিরে গেলাম যখন তখন ভোর হয়েছে, চাকর-বাকররা উঠে পড়ছে।

৪

উসপেনস্কির পর্ব তখন, তাই আমার উপোস করার সিদ্ধান্তে কেউ অবাক হল না।

সারা সপ্তাহে একবারও এলেন না উনি, কিন্তু তাতে অবাক হলাম না, উৎকণ্ঠা বা রাগ হল না। না আসাতে বরং খুশি হলাম, আমার জন্মদিনে উনি আসবেন তার প্রতীক্ষায় রইলাম। সে সপ্তাহে প্রত্যেকদিন খুব ভোরে উঠতাম, ঘোড়াকে ওরা সাজাত, বাগানে ঘুরে বেড়াতাম একলা, আগের দিনে কৃত নিজের দোষের কথা ভাবতাম, বিনা দোষে নতুন দিনটা কী করে কাটাব, কী করে আমাকে ভরিয়ে দেবে দিনটা, তা নিয়ে জল্পনা চলত। একেবারে দোষ পাপ না করে থাকাটা সহজ মনে হত সে সব দিনে। ভাবতাম, তার জন্যে শুধু অল্প চেষ্টা করা চাই, আর কিছু না। ঘোড়ার গাড়িটা আসত, কাতিয়া বা কোনো পরিচারিকাকে নিয়ে তিন ভার্স্ট দূরের গির্জাতে যেতাম। প্রবেশ করার আগে প্রতিবার নিজেকে বলতাম, "ধর্মভয় নিয়ে যারা প্রবেশ করে ধন্য তারা," আর সেই অনুভূতি সঙ্গে করে গির্জার প্রবেশ-দ্বারে ঘাসে-ভরা দুটো ধাপ ওঠবার চেষ্টা করতাম। সে সময়ে গির্জায় বেশী লোক থাকত না — গুটি দশেক উপবাসব্রতী চাষী আর ঝি-চাকর শুধু। ওদের নমস্কারের উত্তরে প্রতিনমস্কার জানাবার চেষ্টা করতাম সবিনয়ে। নিজে মোমবাতির বাক্সের কাছে গিয়ে (সে রকম করাটা প্রশংসনীয় মনে হত) বাতি নিতাম গির্জার মাতব্বর বুড়ো সৈনিকটির কাছ থেকে, রাখতাম আইকনগুলোর সামনে। পূত দ্বারের মধ্য দিয়ে চোখে পড়ত বেদীর পর্দা, আমার মায়ের তৈরী। সেখানে আইকনস্থানের উপর সেই দুটি কাঠের দেবদূত দাঁড়িয়ে, ছোটবেলায়

যাদের মনে হত প্রকাণ্ড, আর পীতাভ জ্যোতির্ময় কপোতটি, বরাবর আমাকে আকর্ষণ করত যেটি। গায়কদের স্থানের ওধারে চোখে পড়ত এবড়োখেবড়ো জলাধারটি, আমাদের চাকর-বাকরের কত বাচ্ছার দীক্ষা দিয়েছি ওখানে, আমার নিজেরো দীক্ষা হয়েছে ওখানে। বুড়ো পাদ্রী বেরিয়ে আসতেন, তাঁর গায়ের আলখাল্লাটি আমার বাবার শবাধারের কাপড়ে তৈরী; তিনি মন্ত্রপাঠ করতেন, আমার জ্ঞান হওয়া অবধি তাঁকে যেমনভাবে আমাদের বাড়িতে মন্ত্রপাঠ করতে শুনেছি — সোনিয়ার নামকরণে, বাবার আত্মার শান্তি প্রার্থনায়, মায়ের অন্ত্যেষ্টিতে। গায়কদলের মধ্য থেকে ভেসে আসত পাদ্রীর সহকারীর সেই কম্পিত গলার সুর; আর সেই বক্রদেহা বৃদ্ধাটি, আমার মনে পড়ে, গির্জার কোনো প্রার্থনা যার বাদ যেত না, দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে থাকত, অশ্রুরুদ্ধ চোখ আইকনে নিবদ্ধ, ক্রুশ-চিহ্ন করার সময় মলিন হয়ে আসা রুমালে তিনটি আঙুল চাপা; দন্তহীন মুখ নড়ে চলেছে অবিরাম। এ সবকিছু আমার কাছে আর বিচিত্র নয়, স্মৃতি জাগাত বলে শুধু যে এ সব ভালো লাগত তা নয়। আমার চোখে এরা এখন মহান ও পূত, অতল তাৎপর্যে ভরা। প্রার্থনার প্রত্যেকটি কথা মন দিয়ে শুনতাম, চেষ্টা করতাম অন্তর দিয়ে সাড়া দেবার। কিছু না বুঝলে অনুরোধ জানাতাম ভগবানকে, যেন জ্ঞানের আলো দেন, কিছু শুনতে না পেলে নিজের কথায় প্রার্থনা করতাম। অনুশোচনা স্তবের নির্দোষ সময় মনে পড়ত অতীতের কথা, আত্মার সহজভাবের তুলনায় আমার ছেলেবেলাকার সহজ সরল দিনগুলো এত মিশকালো ঠেকত যে আতঙ্ক হত, নিজের প্রতি, করুণায় চোখে জল এসে যেত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করতাম যে সবকিছুর মার্জনা মিলবে, পাপ আরো বেশী করে থাকলে অনুশোচনা হত আরো মধুর।

প্রার্থনাশেষে পাদ্রী বলতেন, 'ভগবান তোমাদের আশীর্বাদ করুন,' তখন কথাটা সঙ্গে সঙ্গে আনত শারীরিক মঙ্গলের একটা অনুভূতি। যেন অন্তরে আসত আলো আর উত্তাপ। উপাসনার শেষে পাদ্রী কাছে এসে জিজ্ঞেস করতেন সন্ধ্যার আরাধনার জন্যে আমাদের বাড়িতে আসবেন কিনা, এলে কখন আসবেন। আমার জন্যে আসতে চান বলে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে বলতাম, না, আমি নিজে আসব।

'তাহলে নিজে কষ্ট করে আসবেন?' জিজ্ঞেস করতেন তিনি।

কী বলব ভেবে পেতাম না, অহঙ্কারের পাপ যদি হয়।

উপাসনার পর, কাতিয়া সঙ্গে না থাকলে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে একলা হেঁটে বাড়ি ফিরতাম, পথে-দেখা-হওয়া সবাইকে সবিনয়ে নমস্কার জানাতাম। সাহায্য করার, উপদেশ দেবার, কারো জন্যে আত্মত্যাগের জন্যে এত ব্যাকুল আমি যে হয়ত কোনো বোঝা তুলতে হাত লাগাতাম, দোলাতাম কোন বাচ্ছাকে, কিম্বা অন্যদের পথ ছেড়ে দেবার জন্যে নাবতাম কাদায়। একদিন সন্ধ্যেয় শুনলাম নায়েব কাতিয়াকে বলছে আমাদের একজন চাষী, সেমিওন, মেয়ের শবাধারের জন্যে কিছু কাঠের তক্তা আর অন্ত্যেষ্টির ভোজের জন্যে এক রুবল চাইতে এসেছিল, তাকে কাঠ ও টাকা দিয়ে দিয়েছে নায়েব। 'সত্যি ওরা এত গরীব?' জিজ্ঞেস করলাম। 'হ্যাঁ, দিদিমণি, ভয়ানক গরীব, এমন কি নুন কেনার পয়সা পর্যন্ত নেই ওদের,' বলল নায়েব। বুকটা আমার মুচড়িয়ে উঠল, কিন্তু আনন্দও হল এক ধরনের। কাতিয়াকে ধাপ্পা দেবার জন্যে বললাম বেড়িয়ে আসতে যাচ্ছি, তারপর দৌড়িয়ে দোতলায় গিয়ে আমার সমস্ত টাকা সঙ্গে নিলাম (বিশেষ কিছু ছিল না, কিন্তু যা ছিল সবটা নিলাম)। ক্রুশ-চিহ্ন করে গেলাম বারান্দায়, তারপর বাগান হয়ে গ্রামে। গ্রামের প্রান্তে সেমিওনের কুঁড়েঘর। সবায়ের অলক্ষিতে জানলায় গিয়ে সেখানে

টাকা রেখে শার্সিতে দিলাম টোকা। কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে এসে কে যেন সাড়া দিল, দরজায় ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ। ভয়ে শিউরে উঠে দৌড়ে বাড়ি ফিরলাম, যেন মহা অপরাধ করে ফেলেছি। কাতিয়া জিজ্ঞেস করল কোথায় গিয়েছিলাম, কী হয়েছে আমার, কিন্তু কী বলছে ও বোধগম্য হল না আমার, জবাব দিলাম না। সবকিছু হঠাৎ মনে হল তুচ্ছ আর নীচ। দরজা বন্ধ করে ঘরে পায়চারি করলাম অনেকক্ষণ, কিছু করার সামর্থ্য নেই, গুছিয়ে ভাবতে পারছি না, নিজের অনুভূতি পর্যন্ত বোঝার ক্ষমতা নেই। ভাবলাম সেমিওনের পরিবার কী খুশিটাই না হবে, টাকা যে রেখে গিয়েছে তার প্রতি অপার কৃতজ্ঞতা হবে ওদের; নিজের হাতে টাকাটা দিই নি বলে আফসোস হল। আমার কীর্তিটা জানতে পারলে সের্গেই মিখাইলিচ কী বলতেন ভাবলাম, কেউ জানতে পারবে না ভেবে আনন্দ হল। আনন্দের বান ডেকেছে অন্তরে, সবাইকে, এমন কি নিজেকে এত ক্ষুদ্র মনে হল, সবায়ের দিকে, নিজের দিকেও এমন বিনম্র আমার দৃষ্টিভঙ্গি যে মৃত্যুচিন্তা আমার কাছে এল সুখস্বপ্নের মতো। হাসলাম, কাঁদলাম, প্রার্থনা করলাম। সে মুহূর্তে পৃথিবীর সবাইকে, নিজেকে সুদ্ধ ভালোবাসলাম গভীর আবেগে, তীব্রভাবে। প্রার্থনার ফাঁকে ফাঁকে যীশুর জীবনবৃত্তান্ত পড়তাম, আমার কাছে সে বৃত্তান্ত তখন আরো বোধগম্য। সেই স্বর্গীয় জীবনকাহিনী আরো সহজ, আরো মর্মস্পর্শী হয়ে উঠল, যীশুর শিক্ষাবলীর গভীর প্রেম আর ভাবসম্ভার আরো অতল হয়ে উঠল, বেশী করে ভয়ভক্তি জাগাল মনে। বাইবেল রেখে দিয়ে আশেপাশের জীবন যখন খুঁটিয়ে দেখতাম আর ভাবতাম তখন সবকিছু লাগত ভয়ানক স্বচ্ছ আর সহজ। মনে হত অসৎভাবে থাকা অতি কঠিন, সবাই যে সবাইকে ভালোবাসবে কত সহজ সেটা। সবাই আমার প্রতি এত সদয়, এত

ভালো ব্যবহার করে! এমন কি সোনিয়া পর্যন্ত। তাকে তখনো পড়াই; আমি যা বলি তা বোঝার আর করার চেষ্টা করে ও, আর জ্বালায় না আমাকে। সবায়ের প্রতি আমার যে রকম ব্যবহার, আমার প্রতি তাদেরো ব্যবহার সে রকম। পাদ্রীর কাছে স্বীকারোক্তির আগে শত্রুদের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করা চাই; শত্রুর কথা ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল শুধু একজন মেয়ের কথা — বাড়ির লোক নন তিনি, প্রতিবেশিনী, অন্যান্য অতিথিদের সামনে বছরখানেক আগে প্রকাশ্যে তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করেছিলাম বলে তিনি আমাদের এখানে আসা বন্ধ করে দেন। নিজের দোষ স্বীকার করে, ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখলাম তাঁকে। জবাব দিলেন তিনি, লিখলেন আমাকে ক্ষমা করেছেন, আমিও যেন ক্ষমা করি তাঁকে। সহজ সরল ছত্রগুলি পড়ে আনন্দে চোখে জল এসে গেল, সে সময় ছত্রগুলি মনে হয়েছিল গম্ভীর ও মর্মস্পর্শী। বুড়ী আয়ার কাছে ক্ষমা চাওয়াতে কেঁদে ফেলল সে। "এরা সবাই আমার সঙ্গে এত ভালো ব্যবহার করে কেন?" শুধালাম নিজেকে। "এত ভালোবাসা পাবার মতো কী করেছি?" আপনা থেকে মনে পড়ত সের্গেই মিখাইলিচকে, অনেকক্ষণ ভাবতাম তাঁর কথা। না ভেবে পারতাম না, ভাবাটা পাপ বলে মনে হত না। কিন্তু ওঁকে ভালোবাসি, সে কথাটা যে রাত্রে টের পাই সে রকম ভাবে নয়, নিজের কথা যেমনভাবে চিন্তা করতাম তেমনিভাবে ওঁর কথা ভাবতাম, আমার ভবিষ্যতের প্রতিটি চিন্তায় আপনা থেকে উনি জড়িত হতেন। উনি কাছে থাকলে আমার সেই বাধো-বাধো ভাবটা একেবারে মিলিয়ে যেত। মনে হত আমি ওঁর সমকক্ষ, আমার আধ্যাত্মিক উচ্ছ্বাসের উচ্চ চূড়া থেকে সম্পূর্ণ বুঝতাম ওঁকে। আগে অদ্ভুত-ঠেকা সব জিনিস পরিষ্কার হয়ে উঠল। অপরের জন্যে বাঁচা একমাত্র আনন্দ, কথাটা কেন উনি বলেছিলেন হৃদয়ঙ্গম হল,

সম্পূর্ণ মেনে নিলাম কথাটি। দুজনে বরাবর সুখে শান্তিতে থাকব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না। বিদেশ যাত্রার, উচ্চ সমাজের চাকচিক্যের স্বপ্ন নয়, একেবারে বিভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রার স্বপ্ন দেখতাম — গ্রামে সুখে শান্তিতে ভরা সংসার, সে জীবনে আত্মবিসর্জনের, পরস্পরের প্রতি অনুরাগের বিরাম হবে না, সে জীবনে থাকবে একটা অনুভূতি যে পরমেশ্বর মমতা-ভরা সহায়তায় দৃষ্টি রেখেছেন সবকিছুর ওপর।

পরিকল্পনামত জন্মদিনে ইউকাবিষ্ট গ্রহণ করলাম। সেদিন গির্জা থেকে ফিরে অন্তরে এত অখন্ড আনন্দ যে ভয় হল জীবনে, ভয় হল পাছে কিছুতে আমার আনন্দের হানি হয়। গাড়ি থেকে প্রবেশ-দ্বারে নেমেছি, পুলের ওপরে পরিচিত একটি গাড়ির খটখট শব্দ, দেখলাম সের্গেই মিখাইলিচকে। জন্মদিনের জন্যে অভিনন্দন জানালেন আমাকে, দুজনে গেলাম বৈঠকখানায়। সে সকালটায় ওঁর সামনে এত ধীর ও আত্মস্থ লাগল, ওঁকে জানার পর সে রকমটা লাগে নি কখনো। মনে হল আমার ভিতরে এখন সম্পূর্ণ নতুন একটি পৃথিবী, সেটা জানেন না উনি, ওঁর পৃথিবীর চেয়ে মহান সেটা। ওঁর সান্নিধ্যে একটুও বিব্রত লাগল না। কারণটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন উনি, কেনন৷ আমার সঙ্গে অত্যন্ত কোমল ও সম্ভ্রম-ভরা ব্যবহার করলেন। পিয়ানোর কাছে গেলাম, উনি কিন্তু পিয়ানোটা বন্ধ করে পকেটে রাখলেন চাবিটা।

বললেন, 'মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে আপনার অন্তরের সঙ্গীত পৃথিবীর যে কোন সঙ্গীতের চেয়ে ভালো।'

কৃতজ্ঞ বোধ করলাম, সঙ্গে সঙ্গে একটু বিরক্ত লাগল; আমার অন্তরের সব কথা কেন জেনে ফেললেন এত সহজে, এত সঠিকভাবে; সেগুলো কারো কাছে ধরা পড়া উচিত নয়। খাবার খেতে খেতে উনি

বললেন আমাকে শুভ জন্মদিন জানাতে এসেছেন, আর এসেছেন বিদায় নিতে, পরের দিন মস্কো চলে যাবেন। কথাটা বললেন কাতিয়ার দিকে চেয়ে, তারপর তাকালেন আমার দিকে, আমার মুখে উত্তেজনার ছাপ আসবে এই ও'র ভয়, বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমার অবাক বা বিচলিত লাগল না, এমন কি জিজ্ঞেস পর্যন্ত করলাম না কতদিনের জন্যে যাচ্ছেন। জানতাম চলে যাবার কথা বলবেন উনি, আর জানতাম উনি যাবেন না। কী করে জানলাম? কেন, এখনো সেটা নিজেকে বোঝাতে পারি না, কিন্তু সেদিন আমি অনুভব করেছিলাম যে সবকিছু আমি জানি, যা ঘটেছে, যা ঘটবে, সবকিছু। অপরূপ একটি স্বপ্নের মধ্যে আছি যেন, মনে হয় যা *ঘটেছে, ঘটেছে অনেকদিন আগে, সব আমার জানা বহুদিন আগে;* সবকিছু ঘটবে আবার, ঘটবে যে আমি জানি।

খাবারের পর তক্ষুণি চলে যেতে চাইলেন উনি; কিন্তু প্রার্থনার পর ক্লান্ত হয়ে কাতিয়া শুয়ে পড়েছে, ও জাগা না পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ও'কে, বিদায় জানিয়ে যেতে হবে তো। হলে বড্ডো বেশী আলো, দুজনে গেলাম বারান্দায়। বসার সঙ্গে সঙ্গে আমি শান্তভাবে এমন সব জিনিসের বিষয়ে কথা বলতে শুরু করলাম যার ওপর আমার প্রেমের পরিণাম নির্ভর করছে। শুরু করলাম ঠিক বসার সঙ্গে সঙ্গে, এক মুহূর্ত আগে বা পরে নয়, তার আগে এমন কোন কথা হয় নি, এমন কোন বলার ঢং আমরা নিই নি, এমন কোন বিষয়ের অবতারণা করি নি যাতে ও'কে আমার বক্তব্য বাধা পেতে পারে। জানি না কোথা থেকে এল এত স্থৈর্য, এত দৃঢ় সংকল্প, শব্দের এত সঠিক ব্যবহার। যেন বক্তা আমি নই, আমার ভিতরে আর একজন কে, আমার ইচ্ছাধীন সে নয়। রেলিং-এ হেলান দিয়ে আমার উল্টো দিকে বসেছিলেন উনি, লাইলাকের একটা ডাল

টেনে নিয়ে পাতা ছিঁড়ছিলেন। আমি কথা শুরু করাতে ডালটা ছেড়ে দিয়ে এক হাতে মাথা রাখলেন। যেভাবে বসেছেন সেটা সম্পূর্ণ স্থৈর্যের চিহ্ন হতে পারে, হতে পারে প্রবল উত্তেজনার।

'কেন আপনি চলে যাচ্ছেন?' আস্তে আস্তে, কথা মেপে, সোজা ওঁর দিকে তাকিয়ে শুধালাম।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না উনি।

একটু পরে চোখ নামিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'কাজ আছে।'

বুঝলাম আমার কাছে মিথ্যে বলাটা কত কঠিন ওঁর কাছে, বিশেষ করে যখন এত খোলাখুলিভাবে প্রশ্ন করেছি।

'আজকের দিনটা আমার কাছে কতখানি জানেন তো,' আমি বললাম। 'কয়েকটি কারণে দিনটা আমার কাছে দামী। আপনি কেন যাচ্ছেন জিজ্ঞেস করাটা শুধু লোক-দেখানো ব্যাপার নয়। আপনি তো জানেন, আপনাকে দেখা আমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে, ভালোবাসি আপনাকে। আমি জিজ্ঞেস করছি, কেননা আমাকে জানতেই হবে। কেন চলে যাচ্ছেন আপনি?'

'যাবার সত্যিকার কারণটা আপনাকে বলা আমার পক্ষে শক্ত,' উনি জবাব দিলেন। 'এ সপ্তাহটা আপনাকে আর আমাকে নিয়ে বিস্তর ভেবেছি, আর ঠিক করেছি আমাকে যেতেই হবে। কেন জানেন? আর যদি আমাকে ভালোবেসে থাকেন তাহলে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।' হাত দিয়ে কপাল রগড়ে ক্লান্তিতে দু' চোখ টিপে ধরলেন উনি। 'আমার পক্ষে এটা কঠিন... আর আপনি বোঝেন।'

বুক ঢিপঢিপ করতে শুরু করল।

'না, বুঝি না,' বললাম, 'বুঝি না আমি, তাই বলুন আপনি... ভগবানের দোহাই বলুন, এ দিনটা আমার কাছে কত বড়ো, এ দিনটার খাতিরে বলুন, সবকিছু শান্তভাবে শুনব।'

নড়েচড়ে বসে উনি তাকালেন আমার দিকে, ডালটা তুলে নিলেন আবার।

'বেশ,' বলে মুহূর্তকাল ইতস্তত করে শুরু করলেন, গলাটা দৃঢ় শোনানোর বৃথা চেষ্টা তাঁর। 'ভাষায় বলা বোকামি, বলা অসম্ভব, আর আমার পক্ষে কষ্টকর, তবু বোঝাবার চেষ্টা করব।' শারীরিক যন্ত্রণায় যেন ভ্রূ কুঞ্চিত হল।

'বলুন,' আমি বললাম।

'আচ্ছা ধরুন,' উনি বললেন, 'একটি লোক আছে, 'ক' বলে ডাকা যাক তাকে, লোকটার অনেক বয়স হয়েছে, নিজের কালো দেখেছে শুনেছে সে। আর আছে একটি মেয়ে, 'খ' বলে ডাকা যাক তাকে, মেয়েটির বয়স কম, হাসিখুশি মেয়েটি লোকজন বা সংসার সম্বন্ধে কিছু জানে না। পারিবারিক ঘটনাচক্রে লোকটি তাকে মেয়ের মতো ভালোবাসত, অন্যভাবে ভালোবাসবে সে আশঙ্কা হয় নি।'

থামলেন উনি। ও'কে বাধা দিলাম না।

'কিন্তু 'ক' ভুলে গিয়েছিল যে 'খ'র বয়স কম — জীবনটা তার কাছে তখনো খেলার সামিল।' এবার উনি বলে চললেন তাড়াতাড়ি, দৃঢ়ভাবে, আমার দিকে না তাকিয়ে। 'ভুলে গিয়েছিল ওকে অন্যভাবে ভালোবাসাটা সহজ ব্যাপার, কিন্তু সেটা ওর কাছে হবে খেলার সামিল। ভুল করল 'ক', হঠাৎ বুঝল অন্য ধরনের অনুভূতি এসেছে মনে, অনুশোচনার মতো ব্যথা-ভরা সেটা, ভয় পেল সে। ভয় হল দুজনের আগেকার বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যাবে, সেটা ঘটার আগেই চলে যেতে মনস্থ করল।' কথাটা বলে উনি চোখ রগড়ালেন এমনি যেন, তারপর চোখ বুজলেন আবার।

'অন্যভাবে ভালোবাসতে ভয় পেল কেন?' জিজ্ঞেস করলাম মৃদু স্বরে, উত্তেজনা চেপে রেখে শান্ত গলায়।

প্রশ্নটা বিদ্রূপের মতো শোনাল নিশ্চয়, কেননা ওঁর উত্তরে ব্যথার একটা আভাস যেন এল।

'আপনার বয়স কম, আমার বয়স হয়েছে। আপনি খেলতে চান, আমি চাই অন্য কিছু। খেলে যান আপনি, কিন্তু আমার সঙ্গে নয়, কেননা খেলাটা সত্যিকার বলে আমার ধারণা হতে পারে; তাতে ব্যথা পাব, আপনারো লজ্জা হবে... এটা হল 'ক'র কথা,' যোগ করলেন উনি, 'বাজে কথা সমস্ত অবশ্য, কিন্তু আমি কেন চলে যাচ্ছি বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়। এ নিয়ে আর কিছু বলার দরকার নেই, দোহাই আপনার!'

'না, না! আরো কিছু বলা দরকার,' আমি বলে উঠলাম, কান্নার কেঁপে উঠল গলা। 'সে ওকে ভালোবাসত, না বাসত না?'

জবাব দিলেন না উনি।

'ভালো না বাসলে কেন ওর সঙ্গে মিছিমিছি খেলা করেছিল, যেন ও কচি মেয়ে, এমনভাবে?'

'হ্যাঁ, দোষ করেছিল 'ক',' বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বললেন উনি, 'কিন্তু সমাপ্তি হল সবকিছুর, ওদের ছাড়াছাড়ি হল... বন্ধুভাবে।'

'কী ভয়ংকর! আর কোনো সমাপ্তি নেই বুঝি?' প্রায় শোনা যায় না এমনভাবে বললাম, ভয় পেলাম নিজের কথায়।

মুখ নড়ছিল ওঁর, মুখ থেকে হাত সরিয়ে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে উনি বললেন, 'অন্য সমাপ্তি আছে অবশ্য। দুরকমের আছে। কিন্তু বাধা দেবেন না দোহাই আপনার, শান্ত হয়ে শুনুন।' দাঁড়িয়ে উঠে ক্লিষ্ট হাসি হেসে আবার শুরু করলেন, 'কেউ কেউ বলে 'ক'র মাথা খারাপ হয়ে গেল, পাগলের মতো প্রেমে পড়ল 'খ'র, আর

সেটা জানাল ওকে... আর 'খ' শুধু হেসে উঠল। ব্যাপারটা ওর কাছে নিতান্ত মজার, কিন্তু 'ক'র কাছে জীবনমরণের সামিল।'

চমকে উঠে বাধা দিয়ে বলতে যাচ্ছিলাম, আমার হয়ে কথা বলার কী অধিকার ও'র, উনি আমার হাতে হাত রেখে বাধা দিলেন।

'দাঁড়ান,' গলা ওঁর কাঁপছে। 'আবার কেউ কেউ বলে মেয়েটির দয়া হল ওর ওপর। সংসার চেনে না, বেচারী ভাবল সত্যি বুঝি ওকে ভালোবাসা যায়, রাজী হল ওকে বিয়ে করতে। আর লোকটাও পাগল বলে বিশ্বাস করল, সত্যি বিশ্বাস করল যে ওর জীবন আবার শুরু হবে নতুনভাবে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে মেয়েটি বুঝল লোকটিকে ঠকিয়েছে, আর সেও ঠকিয়েছে তাকে... যাক, এ নিয়ে আর কথা বলব না,' উপসংহারে বললেন উনি; বোঝা গেল আর বলার ক্ষমতা নেই ওঁর, নিঃশব্দে পায়চারি শুরু করলেন আমার সামনে।

বললেন বটে, 'আর কথা বলব না,' কিন্তু বুঝলাম আমি কী বলি শোনার জন্যে তীব্র উৎকণ্ঠায় আছেন। কিছু একটা বলতে গেলাম, কিন্তু ঢোঁক গিলতে কষ্ট হল। ওঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন, নিচের ঠোঁটটা কাঁপছে। দুঃখ হল ওঁর ওপর। কষ্ট করে, হঠাৎ স্তব্ধতার ডোর ভেঙে কথা বলতে শুরু করলাম আবেগ-ভরা গলায়, ভয় হল যে কোনো মুহূর্তে গলা ধরে যাবে।

'আর তৃতীয় সমাপ্তিটা...' বলে থেমে গেলাম, উনি কিন্তু নির্বাক। 'তৃতীয় সমাপ্তিটা হল... লোকটি ভালোবাসত না ওকে, গভীর ব্যথা দিল ওর মনে, আর ঠিক করেছি ভেবে চলে গেল, কী কারণে যেন গর্ব ওর মনে। ব্যাপারটা আপনার কাছে মজার, আমার কাছে নয়; প্রথম থেকে ভালোবেসেছি আপনাকে, সত্যি ভালোবেসেছি,'

আবার বললাম আমি, বলতে গিয়ে আমার আবেগ-ভরা মৃদু কণ্ঠে এল চিৎকার, এত তীব্র চিৎকার যে নিজেরি ভয় হল।

আমার সামনে বিবর্ণ মুখে উনি দাঁড়িয়ে রইলেন; ঠোঁট আরো কাঁপছে, দু ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে এল গালে।

'অত্যন্ত খারাপ করেছেন আপনি!' প্রায় চিৎকার করে রাগে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললাম। 'কেন করলেন?' চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম।

আমাকে যেতে দিলেন না উনি। কোলে মাথা রেখে আমার কম্পিত হাতে চুমু খেতে লাগলেন, হাত ভিজে গেল ওঁর চোখের জলে।

'হে ভগবান! যদি আগে জানতাম,' বললেন অস্ফুট কণ্ঠে।

'কেন করলেন? কেন?' জোরে বললাম বটে আবার, কিন্তু আমার বুক তখন সুখে ভরে গিয়েছে। চিরতরে বিদায় নিয়েছে সে সুখ, কখনো ফিরবে না আর।

মিনিট পাঁচেক পর সোনিয়া দোতলায় ছুটে গেল কাতিয়ার কাছে, চিৎকার করে সমস্ত বাড়িকে জানিয়ে দিল যে মাশা সের্গেই মিখাইলিচকে বিয়ে করতে চায়।

৫

বিয়ে পিছিয়ে দেবার কোনো কারণ ছিল না, উনি বা আমি কেউ চাই না সেটা। কাতিয়ার অবশ্য ইচ্ছে যে মস্কোয় গিয়ে আমার জন্যে গয়নাগাঁটি আর বধূর সজ্জার ফরমায়েস করা, আর ওঁর মায়ের সাধ যে সের্গেই মিখাইলিচ নতুন একটা গাড়ি আর আসবাবপত্র

কিন্তু বিয়ের আগে, বাড়ির দেয়ালে নতুন করে ওয়ালপেপার লাগানো হোক; কিন্তু আমরা দুজনে জোর করে বললাম যদি ও সব করা আবশ্যক মনে করেন তাহলে পরে করলে চলবে; আমার জন্মদিনের দু সপ্তাহ পরে বিয়েটা হয়ে যাক, হৈচৈ-র দরকার নেই, দরকার নেই গয়নাগাঁটি আর বধূর সজ্জার, কনের সখি বা মিতবরের, বিবাহ ভোজ বা শ্যাম্পেনের, কিম্বা বিয়ের গতানুগতিক অনুষ্ঠানের অন্য সব। বিয়েতে না হবে গানবাজনা, স্তূপাকারে থাকবে না তোরঙ্গ, না হবে বাড়ির ভোল ফেরানো, মা তাই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, সের্গেই মিখাইলিচ বললেন আমাকে — ব্যাপারটা মোটেই তাঁর বিয়ের মতো হচ্ছে না, তিরিশ হাজার রুবল খরচা হয়েছিল সে বিয়েতে। সের্গেই মিখাইলিচ আরো জানালেন, গুদামঘরে রাখা বাক্সপেঁটরা ঘাঁটাঘাঁটি করছেন ওঁর মা, গালিচা, পর্দা আর ট্রে নিয়ে গোপন মন্ত্রণা চলেছে মারিয়ুশ্‌কার সঙ্গে, ও সব জিনিস তো আমাদের সুখের জন্যে অপরিহার্য। আমাদের বাড়িতে একই ব্যাপার চলেছে কাতিয়া আর আমাদের বুড়ী আয়া কুজ্‌মিনিশ্‌নার মধ্যে। এ নিয়ে কাতিয়ার সঙ্গে ইয়ার্কি করা অসম্ভব। ওর বদ্ধ ধারণা, ভবিষ্যতের বিষয়ে আমাদের দুজনের আলাপ শুধু সোহাগপনা, তুচ্ছ সব জিনিস নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা — আমাদের অবস্থার লোকের কাছে আর কী বা আশা করা যায়: আমাদের সত্যিকারের সুখ তো নির্ভর করে সেমিজের সঠিক কাট আর সেলাই-এর ওপর, টেবিলের চাদরে আর ন্যাপকিনে ঠিক পাড় বসানোর ওপর। বিয়ের উদ্যোগ নিয়ে এ বাড়ি ও বাড়িতে দিনে কয়েকবার গুপ্ত কথার আদানপ্রদান চলল; বাইরে থেকে কাতিয়া আর ওঁর মা-র সম্পর্কটা অত্যন্ত মধুর, কিন্তু তখনি কিছুটা শত্রুতা আর সূক্ষ্ম কূটনীতির আভাস ধরা পড়েছে। আরো ভালো করে চিনলাম তাতিয়ানা সেমিওনভ্‌নাকে, পরিপাটি

কড়া গৃহিণী — যে যুগের মহিলা তিনি সে যুগ বিগত। সের্গেই মিখাইলিচ ভালোবাসতেন তাঁকে, সন্তানের কর্তব্যবোধের তাগিদে শুধু নয়, উনি ভাবতেন ওঁর মা পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে সহৃদয়, সবচেয়ে বুদ্ধিমতী ও স্নেহপ্রবণ মহিলা। তিনি বরাবর আমাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেছেন, বিশেষ করে আমার সঙ্গে, ছেলে বিয়ে করছে বলে তিনি খুশি। তবু ছেলের বাগদত্তা হিসেবে ওঁর সঙ্গে দেখা করে মনে হল উনি আমাকে বোঝাতে চান যে ছেলে ইচ্ছে করলে আরো ভালো পাত্রী জুটত, সে কথাটা আমার ভুলে যাওয়া অনুচিত হবে। পুরোপুরি বুঝলাম ওঁকে, ওঁর সঙ্গে একমত হলাম।

সেই দুটো সপ্তাহে রোজ দেখা হত সের্গেই মিখাইলিচের সঙ্গে। দুপুরবেলায় আসতেন উনি, থাকতেন মাঝরাত পর্যন্ত। বলতেন বটে আমাকে ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব ওঁর পক্ষে (সত্যি বলছেন সেটা জানতাম), তবু আমার সঙ্গে কখনো সারা দিন কাটাতেন না, আগেকার মতো নিজের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করতেন। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত বাইরে থেকে কোনো পরিবর্তন এল না আমাদের সম্পর্কে; 'আপনি' বলে সম্বোধন করতাম পরস্পরকে, হাতে চুমো খেতেন না উনি কখনো, আমার সঙ্গে নিরালায় থাকার সুযোগ খোঁজা দূরের কথা সে সব সুযোগ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতেন। যে স্নেহের উচ্ছ্বাস ওঁর অন্তরে, তার হাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়াতে যেন ওঁর ভয়, সেটাকে যেন খারাপ মনে করেন উনি। জানি না, কে বদলে গিয়েছিল, উনি না আমি, কিন্তু এখন নিজেকে মনে হল একেবারে ওঁর সমকক্ষ। ওঁর মধ্যে সেই সারল্যের ভান, যেটাকে কষ্টকৃত মনে হত আমার, চোখে আর পড়ত না; সামনের লোকটি সুখে বিভোর শিশুর মতো;

ভয়ভক্তি আর সমীহ উদ্রেক করা পুরুষ নন, দেখে মাঝে মাঝে ভয়ানক ভালো লাগে। "তাহলে সত্যিকারের উনি হচ্ছেন এই," ভাবলাম আমি। "ঠিক আমার মতো মানুষ, বেশী কিছু নন।" মনে হল ওঁকে চেনার কিছু বাকি নেই, তন্নতন্ন করে চিনেছি ওঁকে। আর ওঁর যা কিছু জানলাম সব সুন্দর, আমার মনের মতো। এমন কি আমাদের সংসারযাত্রার বিষয়ে ওঁর জল্পনাকল্পনাগুলো অবিকল আমার মতো, শুধু সেগুলো আরো স্পষ্ট, সেগুলোকে আরো গুছিয়ে প্রকাশ করেন উনি।

আবহাওয়া খারাপ, বেশীর ভাগ সময় কাটত ঘরে বসে। আমাদের সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আলোচনা হত ড্রয়িং-রুমে, পিয়ানো আর জানলার মধ্যেকার জায়গাটায় বসে। জানলার কালো শার্সিতে প্রদীপশিখার আলো, কখনোসখনো বৃষ্টিবিন্দু চকচকে কাঁচে ঘা খেয়ে গড়িয়ে পড়ত। ছাতে বৃষ্টিধারার শব্দ, নালির নিচে জলের কলকল ধ্বনি, শার্সি চুঁইয়ে আসত স্যাঁৎসেঁতে ভাব; আর এ সবকিছুর জন্যে মনে হত আমাদের জায়গাটা আরো আরামের, আরো উজ্জ্বল, আরো হাসিখুশি।

একদিন সন্ধ্যে শেষ হতে চলেছে, আমাদের কোণটায় বসে আছি দুজনে, উনি শুরু করলেন, 'অনেকদিন ধরে একটা কথা আপনাকে বলব ভাবছি। আপনি বাজাচ্ছিলেন, আর কথাটা খালি ভাবছিলাম।'

'থাক, কিছু বলার দরকার নেই, আপনি না বললেও সব জানি,' আমি জবাব দিলাম।

স্মিত হেসে উনি বললেন, 'তা ঠিক। বলব না তাহলে।'

'না, বলুন, কথাটা কী?'

'বেশ, তাহলে বলি। 'ক' আর 'খ'র কথাটা বলেছিলাম, মনে আছে?'

'ও রকম ডাহা বোকামি কী করে ভুলব বলুন? ব্যাপারটা যে এইভাবে শেষ হয়েছে, ভালোয় ভালোয়...'

'হ্যাঁ, আর একটু ওদিক হলে নিজের সুখ নিজে নষ্ট করে ফেলতাম একেবারে। আপনি বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু বাস্তবিক তখন সত্যি কথা বলি নি, আর তাই আমার অস্বস্তি। শেষ পর্যন্ত বলি, শুনুন।'

'থাক, থাক দরকার নেই।'

হেসে উনি বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই। শুধু কথাটা খুলে বলতে চাই। বলতে শুরু করে সবকিছু যুক্তিতর্ক করে দেখতে চেয়েছিলাম।'

'যুক্তিতর্কে লাভটা কী?' জিজ্ঞেস করলাম। 'ওর কোন দরকার নেই কখনো।'

'তা বটে। যুক্তিটাও ঠিক মতো করি নি। জীবনে অনেক ভুল, অনেক হতাশার পর গ্রীষ্মকালে যখন এখানে এলাম, নিজেকে বুঝিয়েছিলাম যে আমার পক্ষে ভালোবাসা অসম্ভব, সব ফুরিয়ে গেছে আমার, শুধু আছে বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা; এত দৃঢ়ভাবে নিজেকে বুঝিয়েছিলাম যে অনেকদিন পর্যন্ত আপনার সম্বন্ধে আমার মনের গতিকটা খেয়াল করি নি, বুঝতে পারি নি পরিণামটা কী দাঁড়াবে। আশা-নিরাশায় দুলেছি, এক-একবার ভাবতাম আপনি বুঝি মন ভোলাতে চাইছেন; আবার বিশ্বাস হত আপনার আন্তরিকতায়, ভেবে পেতাম না কী করব। কিন্তু সে রাত্তিরটার পর, ওই যেদিন দুজনে বাগানে বেড়িয়েছিলাম, ভয় হল। সুখের সম্ভারটা মনে হল আশার অতীত, সত্যি বলতে অসম্ভব। আশা করে থাকি যদি, আর নিরাশ হই, তাহলে কী হবে? শুধু নিজের

কথাটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলাম, অত্যন্ত স্বার্থপর লোক তো বটে।'

আমার দিকে তাকিয়ে থামলেন উনি।

'তবু তখন যা বলেছিলাম তার সবটাই বাজে নয়। ভয়ের কারণ ছিল, ভয় পাওয়া উচিত ছিল আমার। আপনার কাছ থেকে কত না আদায় করি, প্রতিদানের ক্ষমতা কতটুকু আমার। আপনি এখনো ছেলেমানুষ, সদ্য ফুটন্ত ফুলের কুঁড়ির মতো। এই প্রথম আপনি ভালোবেসেছেন, আর আমি...'

'সত্যি বলুন তো, আপনি কি...' কথাটা শুরু করে ভয় হল উত্তরে কী বললেন উনি। 'না থাক, কিছু বলতে হবে না,' যোগ করলাম।

'আগে কখনো প্রেমে পড়েছি কি না? এই তো?' চট করে আঁচ করে নিলেন উনি। 'সে কথা আপনাকে বলতে পারি। না, ভালোবাসি নি। এখনকার মতো অনুভূতি আগে কখনো হয় নি...' হঠাৎ কী একটা ব্যথা-ভরা স্মৃতি ঝলকিয়ে উঠল মুখভাবে। 'আপনাকে ভালোবাসার অধিকার পাবার আগে জানা দরকার ছিল যে আপনার হৃদয় আমার,' বললেন বিষণ্ণভাবে। 'তাই আপনাকে ভালোবাসি বলার আগে ভেবেচিন্তে নেওয়াটা আবশ্যক ছিল, নয় কি? কী দিতে পারি আপনাকে? ভালোবাসা শুধু।'

'সেটা কি সামান্য জিনিস?' ওঁর চোখে চোখ রেখে শুধালাম।

জবাবে উনি বললেন, 'সেটা সব নয়, আপনার পক্ষে সব নয়। আপনার রূপ আছে, আছে যৌবন। মাঝে মাঝে আজকাল রাত্তিরে ঘুমোতে পারি না, এত সুখী আমি; দুজনের জীবনযাত্রার কথা শুয়ে শুয়ে ভাবি। অনেকদিন বেঁচেছি আমি, মনে হয় সুখী হতে হলে যা চাই তা পেয়েছি — গ্রামের শান্ত বিজনে জীবনযাপন, অন্যদের ভালো করার সুযোগ — যারা ভালোর স্বাদ পায় নি

তাদের ভালো করা কত না সহজ; তাছাড়া কাজ, কাজের মতো কাজ, অবসর, প্রকৃতি, বই, গানবাজনা, আপন জনের প্রতি অনুরাগ — এই তো হল সুখ, এর চেয়ে বেশী কিছু আমার কল্পনার বাইরে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, আপনার মতো সঙ্গী; ছেলেপুলে হবে হয়ত — ব্যস, এর বেশী মানুষে আর কী আশা করতে পারে।'

'তা ঠিক,' সায় দিয়ে বললাম।

'আমার পক্ষে, আমার তো যৌবন পেরিয়ে গিয়েছে,' বলে চললেন উনি। 'কিন্তু আপনার পক্ষে নয়। আপনি এখনো জীবন দেখেন নি। অন্য কিছুতে সুখের সন্ধান আপনি হয়ত করবেন, তাতে সুখ মিলবে হয়ত। আমাকে ভালোবাসেন বলে এখন আপনার মনে হচ্ছে এটাই সুখ।'

'না, শান্ত পারিবারিক জীবন বরাবর আমার পছন্দ, বরাবর তাই চেয়েছি,' আমি বললাম। 'আপনি শুধু আমার মনের কথা বলছেন।'

অল্প হাসলেন উনি।

'সেটা আপনার মনে হচ্ছে শুধু। এটা আপনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আপনার রূপ আছে, আছে যৌবন,' কী যেন ভাবতে ভাবতে আবার বললেন উনি।

আমাকে বিশ্বাস করছেন না, রূপ আর যৌবন আছে বলে ভর্ৎসনা করছেন যেন, বিরক্ত লাগল।

রেগে বললাম, 'তাহলে আমাকে ভালোবাসেন কেন? যৌবনের জন্যে, না আমি যা তাই বলে?'

'জানি না কেন, কিন্তু ভালোবাসি,' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, একাগ্র, বশ-মানানো সে দৃষ্টি।

উত্তরে কিছু বললাম না আমি, শুধু ওঁর চোখে চোখ রাখলাম। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হল হঠাৎ — প্রথমে চারপাশের জিনিস আর

পড়ল না দৃষ্টিপটে, তারপর ওঁর মুখ মিলিয়ে গেল, শুধু দেখা গেল দীপ্ত চোখদুটো, আমার ভিতরে প্রবেশ করল, আর সবকিছু কালো হয়ে গেল, আর কিছু চোখে পড়ছে না, — ওঁর চাউনিতে যে আনন্দ, যে ভয় মনে জাগছে সেটা কাটাবার জন্যে শক্ত করে চোখ বুজতে হল আমাকে...

বিয়ের আগের দিন আকাশ পরিষ্কার হল। গ্রীষ্মের বৃষ্টির জায়গায় এল হেমন্তের প্রথম হিম ঝকঝক সন্ধ্যা। সবকিছু ভিজে ঠাণ্ডা আর স্বচ্ছ, বাগানে হেমন্তের প্রথম ছাপ — উদার রঙবেরঙ আর রিক্ত সে রূপ। আকাশ পরিষ্কার, ঠাণ্ডা আর পাণ্ডুর। কালকে, আমাদের বিয়ের দিনে আবহাওয়াটা সুন্দর হবে, এই ভেবে খুশি মনে ঘুমোতে গেলাম।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙল, আজই বিয়ে ভেবে অবাক লাগল, ভয় হল। বাগানে গেলাম। সবেমাত্র সূর্য উঠেছে, লাইম গাছগুলোর পাতলা হয়ে আসা পীতাভ ডালের মধ্য দিয়ে ইতস্তুতঃ বিক্ষিপ্ত আলোর জোয়ার। খসখসে পাতায় পথটা ঢাকা। রোয়ান ঝোপের শাখায় শাখায় কুঞ্চিত ফলগুলির আরক্তিম ঝলক, অবশিষ্ট পাতাগুলো হিমে মৃত, বেঁকে গিয়েছে। শুকিয়ে কালো হয়ে ঝুলছে ডালিয়াগুলো। ফিকে সবুজ ঘাস আর বাড়ির কাছের পায়ে-দলা বার্ডকে এই প্রথম ঘনীভূত শিশিরের রূপালী আভাস। স্বচ্ছ হিম আকাশে মেঘ নেই একটাও, থাকবে কেমন করে?

"তাহলে সত্যি আজ?" শুধালাম নিজেকে, নিজের সুখে বিশ্বাস হল না। "তাহলে কাল আমার ঘুম ভাঙবে না এখানে, ঘুম ভাঙবে নিকোল্‌স্কয়ের ওই থামওয়ালা অদ্ভুত বাড়িটাতে? আর

কখনো ওঁর অপেক্ষায় থাকব না, দেখা করতে যাব না ওঁর সঙ্গে, রাত্রে ও'কে নিয়ে কাতিয়ার সঙ্গে কথা আর হবে না? আমাদের ড্রয়িং-র‍ুমে ও'কে পাশে নিয়ে পিয়ানোয় বসব না কখনো? তারপর ও'কে এগিয়ে দেওয়া, অন্ধকার রাত্রে কী করে যাবেন তা নিয়ে উৎকণ্ঠা?" তারপর মনে পড়ল কাল উনি বলেছিলেন শেষবারের মতো এসেছেন এখানে, কাতিয়া বিয়ের সাজটা আমাকে পরিয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'কালকের জন্যে এ-ই'; বিশ্বাস ফিরে এল নিমেষের জন্যে, তারপর সন্দেহ হল আবার। "সত্যি কি আজ থেকে শাশ‍ুড়ীর সঙ্গে থাকব, সঙ্গে থাকবে না নাদেজা, ব‍ুড়ো গ্রিগরি, কাতিয়া? ব‍ুড়ী আয়াকে রাত্রে চুমো খাব না আর, আমার ওপরে ক্রুশ-চিহ্ন করতে করতে বরাবরকার মতো ওর কথা — 'তাহলে আসি দিদিমণি,' কানে আসবে না? পড়াব না সোনিয়াকে, খেলব না ওর সঙ্গে, সকালে দেয়ালে টোকা দিয়ে শ‍ুনব না ওর খিলখিল হাসি? সত্যি কি নিজের কাছে আজ থেকে অচেনা হয়ে যাব, শ‍ুর‍ু হবে নতুন জীবন, সার্থক হবে আমার সমস্ত আশা আর স্বপ্ন? নতুন জীবন কি বরাবর টিকবে?" অস্থিরভাবে প্রতীক্ষা করলাম, কখন সের্গেই মিখাইলিচ আসবেন; নিজের ভাবনা নিয়ে একলা থাকা দ‍ুঃসহ। ওঁর আসতে দেরী হল না, আর তখ‍ুনি সম্প‍ূর্ণ বিশ্বাস হল যে আজ থেকে ওঁর স্ত্রী হব আমি; শ‍ুধ‍ু তখ‍ুনি চিন্তাটায় ভীতি কেটে গেল আমার।

দ‍ুপ‍ুরের খাবারের আগে বাবার উপলক্ষে প্রার্থনার জন্যে গির্জায় গেলাম আমরা।

"বাবা যদি আজ বে'চে থাকতেন!" ওঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধ‍ু ছিলেন যিনি তাঁর হাতে শান্তভাবে হাত রেখে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবলাম। প্রার্থনার সময়ে এত নিচুতে মাথা ন‍ুইয়েছিলাম যে

গির্জার মেঝের ঠাণ্ডা পাথর লেগেছিল কপালে, এত স্পষ্টভাবে বাবাকে দেখেছিলাম, এত দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে ওঁর আত্মা বুঝেছে আমার অন্তরকে আর আমার পছন্দকে আশীর্বাদ করেছেন উনি, মনে হল আমাদের ওপরে ওঁর আত্মা তখনো বিদ্যমান, মনে হল কানে আসছে ওঁর আশীর্বাদবাণী। স্মৃতি আর আশা, আনন্দ আর বিষাদ মিশে একটি গম্ভীর প্রীতিকর একান্ত ভাবাবেগ হল, সে আবেগ এক সুরে বাঁধা আজকের নিস্পন্দ, ঝরঝরে আবহাওয়ার সঙ্গে, আজকের এই নিঃশব্দতা, রিক্ত মাঠ আর পাণ্ডুর আকাশের সঙ্গে ; আকাশ থেকে দীপ্ত আলো ঝরছে সবকিছুর উপর, রোদ কিন্তু কড়া নয়, মুখে জ্বালা ধরিয়ে দেয় না। মনে হল পাশের মানুষটি বুঝেছে আমার ভাবাবেগ, সাড়া দিচ্ছে তাতে। কোনো কথা না বলে উনি শান্তভাবে হাঁটছেন, মাঝে মাঝে তাকাচ্ছি ওঁর দিকে, মুখে সেই একই আনন্দ-বিষাদ মেশানো গম্ভীর আবেগের ছাপ, যে আবেগ আমার অন্তরে আর বহিঃপ্রকৃতিতে।

হঠাৎ উনি ঘুরলেন আমার দিকে, বুঝলাম কিছু একটা বলতে যাচ্ছেন। হঠাৎ মনে হল, "আমি যা ভাবছি যদি সে কথা না বলে বলেন অন্য কিছু?" কিন্তু বাবার নামোল্লেখ না করে তাঁরি কথা বললেন :

'একবার উনি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'আমার মাশাকে বিয়ে কোরো!' '

'বেঁচে থাকলে ওঁর কত না আনন্দ হত!' ওঁর হাতে চাপ দিয়ে বললাম।

'হ্যাঁ, আপনি তখন নেহাৎ ছেলেমানুষ ছিলেন,' আমার চোখে চোখ রেখে উনি বলে চললেন। 'তখন আপনার চোখে চুমো খেতাম, চোখদুটো ঠিক ওঁর মতো ছিল বলে ভালো লাগত শুধু ; কখনো

ভাবি নি নিজের গুণে চোখদুটো আমার এত আদরের হয়ে উঠবে। তখনি আপনাকে মাশা বলে ডাকতাম।'

'এখন 'তুমি' বলে ডাকুন।'

'ডাকতে যাচ্ছিলাম তাই বলে; শুধু এখনি মনে হচ্ছে তুমি সম্পূর্ণভাবে আমার,' উনি বললেন, সুখে-ভরা ওঁর প্রশান্ত আপন-করা দৃষ্টি আমাতে নিবদ্ধ।

দলিত ফসল-কাটা ক্ষেত হয়ে পায়ে-না-চলা পথ দিয়ে দুজনে চললাম, শুধু আমাদের পদধ্বনি আর কণ্ঠস্বর, আর কোনো শব্দ নেই। এক দিকে, খাদ হয়ে বাদামি ফসল-কাটা ক্ষেত দূরের একটা রিক্ত কুঞ্জে গিয়ে পড়েছে, কাঠের লাঙল দিয়ে একটি চাষী নিঃশব্দে মাঠে কালো ফালি আঁকছে, ফালিটার আয়তন বাড়ছে ক্রমশঃ। পাহাড়ের নিচে এদিকে-সেদিকে চরা ঘোড়ার পালকে মনে হচ্ছে খুব কাছে। অন্য দিকটায় মাঠ চষা হয়েছে বাগান আর আমাদের বাড়ি পর্যন্ত, বীজ বোনা হয়েছে, বাগান পেরিয়ে বাড়িটা চোখে পড়ে। বরফ-গলা মাটি কালো, কিন্তু এখানে-সেখানে শীতের গমের সবজে চারা দেখা দিতে শুরু করেছে। সবকিছুর ওপরে ঠাণ্ডা সূর্যের উজ্জ্বল দীপ্তি, সবকিছুর ওপর মাকড়সা জাল বিছিয়েছে। আমাদের চারিদিকে হাওয়ায় ভাসছে ঊর্ণনাভ, এসে লাগছে ঠাণ্ডায় ইতিমধ্যে শুকিয়ে যাওয়া শস্যের নাড়ায়। চুলে আর চোখে লাগছে, আটকে যাচ্ছে জামাকাপড়ে। কথা বললে সে শব্দ হাওয়ায় নিস্পন্দ হয়ে রইছে, যেন সারা পৃথিবীতে শুধু আমরা দুজনে — আমরা একা নীল আকাশমণ্ডলের নিচে, সেখানে স্পন্দমান দীপ্ত সূর্য হিম তাপ ছড়াচ্ছে।

ইচ্ছে হল ওঁকে 'তুমি' বলে ডাকি, কিন্তু লজ্জা পেলাম।

'এত তাড়াতাড়ি কেন হাঁটছ?' তাড়াতাড়ি প্রায় ফিসফিসিয়ে বললাম, আপনা থেকে মুখ লাল হয়ে উঠল।

গতিবেগ কমিয়ে আরো স্নেহে তাকালেন আমার দিকে, মুখে আরো সুখের আর আনন্দের ছাপ।

বাড়ি ফিরে দেখলাম সের্গেই মিখাইলিচের মা ও যাঁদের নিমন্ত্রণ না করে পারি নি তাঁরা আমাদের অপেক্ষায় বসে আছেন। তাই গির্জা ছেড়ে নিকোল্‌স্কয়েতে যাবার জন্যে গাড়িতে না চাপা পর্যন্ত আর একলা পাই নি ওঁকে।

গির্জা প্রায় ফাঁকা। চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম ওঁর মা গায়কদের জায়গার কাছে পাতা একটা কম্বলের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন খাড়া হয়ে, লালচে-বেগুনি রিবন লাগানো টুপি মাথায় কাতিয়া, গালদুটো অশ্রুসিক্ত, দু-তিনজন চাকর কৌতূহল ভরে তাকাচ্ছে আমার দিকে। ওঁর দিকে চাইলাম না, আমার পাশে ওঁর উপস্থিতি অনুভব করলাম। প্রার্থনার বাক্যগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনে আবৃত্তি করলাম, কিন্তু অন্তরে কোন সাড়া জাগল না। প্রার্থনা এল না, বিরস চোখে আইকন, মোমবাতি, পাদ্রীর আলখাল্লার পিঠে আঁকা ক্রুশ, আইকনস্থান আর জানলাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম, মাথায় ঢুকল না কিছু। শুধু মনে হল আমাকে ঘিরে কী একটা অনুষ্ঠান চলেছে, সেটা মামুলি নয়। তারপর ক্রুশ হাতে পাদ্রী ঘুরে দাঁড়ালেন আমাদের দিকে। অভিনন্দন করলেন আমাদের, মনে পড়িয়ে দিলেন যে আমার নামকরণ হয়েছিল তাঁরি দ্বারা, আর এখন ঈশ্বরের কৃপায় বিয়েটা হল তাঁরি হাতে। আমাকে চুমো খেল কাতিয়া আর সের্গেই মিখাইলিচের মা, শুনলাম গ্রিগরি গাড়ি ডাকছে। অবাক লাগল, ভয় হল, সবকিছু তাহলে শেষ অথচ আমাকে নিয়ে যে অদ্ভুত অনুষ্ঠানটা হল তাতে আমার অন্তরে অসাধারণ কোন

সাড়া জাগে নি। উনি আমাকে চুমো খেলেন, আর আমি ওঁকে; চুম্বনটা কী অদ্ভুত, আমাদের কাছে কত বিজাতীয়! "তাহলে এ-ই সব," মনে মনে বললাম। প্রবেশ-দ্বারে আমরা গেলাম, গির্জার খিলানের নিচে গাড়ির চাকার মুখর ধ্বনি, মুখে লাগল তাজা হাওয়ার ঝলক। টুপিটা পরে উনি আমার হাত ধরে গাড়িতে তুললেন। জানলা থেকে চোখে পড়ল হিম চাঁদ, চারিদিকে জ্যোতির্মণ্ডল। পাশে বসে দরজাটা উনি বন্ধ করে দিলেন। কেন জানি না আমার বুক মুচড়িয়ে উঠল। যে রকম স্থিরভাবে দরজা উনি বন্ধ করলেন সেটা প্রায় অপমানকর লাগল। কানে এল কাতিয়া ডেকে বলছে মাথা ঢাকা দিতে, পাথরের ওপর চাকার ঘর্ঘর, তারপর কাঁচা রাস্তা, আমাদের যাত্রা হল শুরু। একটা কোণে আড়ষ্ট হয়ে সরে বসে জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলাম দূরের দীপ্ত মাঠঘাটের দিকে, ঠাণ্ডা জ্যোৎস্নালোকে ক্রমশঃ দূরে সরে-যাওয়া পথটির দিকে। ওঁর দিকে চাইলাম না, কিন্তু পাশে ওঁর সান্নিধ্য অনুভব করলাম। "তাহলে যে মুহূর্তটি নিয়ে আমার এত প্রত্যাশা সে মুহূর্তে শুধু এই পেলাম," ভাবলাম আমি, আর ওঁর এত কাছে একা বসে থাকাটা কেন যেন লজ্জাকর, অপমানকর মনে হল। ওঁর দিকে ঘুরে কিছু একটা বলতে চাইলাম, কিন্তু কথা এল না মুখে; যেন ওঁর প্রতি আমার আগেকার কোমল সব অনুভূতি বিদায় নিয়েছে, তার জায়গায় এসেছে অপমান আর ভীতির বোধ।

'এ যে সম্ভব, এ মুহূর্তটির আগে পর্যন্ত ভাবতে পারি নি,' আমার দৃষ্টিতে সাড়া দিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললেন উনি।

'হ্যাঁ, কিন্তু কেন জানি না আমার ভয় করছে,' আমি বললাম।

'আমাকে ভয় করছে নাকি, মণি?' জিজ্ঞেস করলেন উনি, হাতটা নিয়ে সেদিকে মাথা নোওয়ালেন।

হাতটা অসাড় পড়ে রইল ওঁর হাতে, অন্তরে কোনো অনুভূতি নেই।

অস্ফুট কণ্ঠে বললাম, 'হ্যাঁ।'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল, কেঁপে উঠল হাতটা, আঁকড়ে ধরলাম ওঁর হাত। গরম লাগছে, আবছা আলোয় তাকালাম ওঁর চোখে। তখুনি বুঝলাম যে ওঁকে ভয় পাই নি — এ ভয়টা হল ভালোবাসা — সে ভালোবাসা নতুন, আগেকার চেয়ে কোমল আর প্রবল। মনে হল আমার সর্বস্ব ওঁর, আমার ওপর ওঁর প্রভুত্বে সুখী লাগল।

দ্বিতীয় খণ্ড

৬

দিনের পর দিন কাটল, সপ্তাহের পর সপ্তাহ; গ্রামের শান্তিতে কেটে গেল দুটো মাস, কাটল অলক্ষিতে, তখন মনে হয়েছিল তাই। আর সে দুটো মাসের অনুরাগ উত্তেজনা আর আনন্দ সারা জীবনের পক্ষে যথেষ্ট হতে পারত। গ্রামে আমাদের জীবনযাত্রার বিষয়ে দুজনের নানা স্বপ্ন অন্যভাবে রূপ নিল, যা ভেবেছিলাম সেভাবে মোটেই নয় বটে কিন্তু স্বপ্নের তুলনায় খারাপভাবে নয়। সত্যি বটে, বাগদত্তা হিসেবে যেমনটা ধরে নিয়েছিলাম তেমন কঠোর পরিশ্রমের, আত্মত্যাগের আর পরার্থে জীবন নয়। বরং পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার, আর ভালোবাসা পাবার একটা স্বার্থপর বোধ ছিল — অকারণ, অবিরাম সুখের উচ্ছ্বাস, পৃথিবীর আর সবকিছু খালি ভুলে যাওয়া। পড়ার ঘরে অবশ্য মাঝে মাঝে গিয়ে উনি কিছু

একটা নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। কখনোসখনো কাজে যেতেন সহরে, জমিদারীতে ঘুরতেন। কিন্তু আমাকে ছেড়ে যাওয়া কত কঠিন ওঁর কাছে জানতে বাকি রইত না। আর উনি নিজে স্বীকার করতেন আমাকে ছাড়া পৃথিবী কত অর্থহীন ঠেকে ওঁর কাছে, ও সব কাজে ব্যস্ত হওয়া কী করে সম্ভব ভেবে পান না। আমারো তাই লাগত। পড়তাম বটে, গানবাজনা, শাশুড়ি আর স্কুলে যথাবিধি সময় দিতাম, কিন্তু এ সবকিছু করতাম তাদের সঙ্গে ওঁর কিছু যোগসূত্র আছে বলে, ওঁর তারিফ পাবার জন্যে। ওঁর কথা মনে হয় না এমন কোনো কাজে হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ একেবারে লোপ পেত, ওঁকে ছাড়া পৃথিবীতে যে আর কিছু থাকতে পারে সেটা মজার ব্যাপার। তুচ্ছ, স্বার্থপর অনুভূতি হয়ত, কিন্তু সুখী লাগত নিজেকে, মনে হত গোটা পৃথিবীকে ছাড়িয়ে উঠেছি। আমার কাছে উনি ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব ছিল না, ওঁর মতো সুন্দর অভ্রান্ত মানুষ পৃথিবীতে আর নেই। আমি যে বেঁচে আছি তা ওঁরি জন্যে, আমাকে যে ধরনের মানুষ ভাবেন ঠিক তাই হবার জন্যে। উনি ভাবতেন জগতের সবচেয়ে সুন্দর আর ভালো মেয়ে আমি, আমার গুণের আর অন্ত নেই, আর জগতের সবচেয়ে সুন্দর আর ভালো লোকটির খাতিরে ঠিক তেমনটি হবার চেষ্টা করতাম।

প্রার্থনা করছি একদিন, উনি ঘরে ঢুকলেন। একবার ওঁর দিকে চেয়ে প্রার্থনা করে চললাম। টেবিলে বসে একটা বই খুললেন, যাতে আমার বাধা না পড়ে। কিন্তু বুঝলাম উনি চেয়ে আছেন আমার দিকে, ফিরে তাকালাম। অল্প হাসলেন উনি, আর আমি জোরে হেসে উঠলাম। আর প্রার্থনা করা চলল না।

'তোমার প্রার্থনা শেষ হয়ে গিয়েছে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ। তোমাকে বাধা দিতে চাই না। চলে যাচ্ছি।'

'তুমি কি প্রার্থনা কর না?'

উত্তর দিলেন না উনি, বেরিয়ে যেতেন হয়ত, কিন্তু আমি বাধা দিলাম।

'দাঁড়াও তো লক্ষ্মীটি, আমার খাতিরে না হয় একসঙ্গে প্রার্থনা করলে।'

আমার পাশে দাঁড়িয়ে, হাতদুটো কেমন বিদঘুটেভাবে জুড়ে শুরু করলেন উনি। মুখখানা গম্ভীর, কথাগুলো আটকে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে অনুমোদন ও সাহায্যের প্রত্যাশায় ঘুরে তাকাচ্ছেন আমার দিকে। ওঁর শেষ হলে হেসে ওঁকে জড়িয়ে ধরলাম।

লাল হয়ে উঠলেন উনি, হাতে চুমো খেয়ে বললেন, 'নাঃ, তুমি আর বদলাবে না দেখছি! তোমাকে দেখলেই নিজের বয়স বছর দশেক কমে যায়।'

পরস্পরকে ভালোবেসে, সমীহ করে কয়েক পুরুষ থেকেছে, আমাদের গাঁয়ের পুরনো বাড়িটা হল সে রকম। সবকিছুতে পারিবারিক স্মৃতির সুন্দর শুদ্ধ ছাপ, ওখানে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো যেন আমার নিজের স্মৃতি হয়ে গেল। বাড়িটা সাজিয়েছিলেন তাতিয়ানা সেমিওনভ্না, সেকেলে রীতিতে তিনি চালাতেন সংসার। সমস্তটা যে সুন্দর আর সুষ্ঠু সেটা বলা অবশ্য শক্ত, কিন্তু সমস্ত কিছুর ছড়াছড়ি — চাকর-বাকর, আসবাবপত্র, খাবারদাবার, আর সবকিছু টেকসই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সঠিক, দেখলে সম্ভ্রম হয়। বৈঠকখানার আসবাবপত্র সুসমঞ্জসভাবে সাজানো, দেয়ালে মানুষের ছবি, মেঝেতে বাড়ির তৈরী গালিচা আর কম্বল। হলে পুরোনো একটা পিয়ানো, আলাদা ধরনের আলমারি, সোফা, আর গিলটি আর কারুকার্য করা টেবিল। সবচেয়ে ভালো আসবাবপত্র

আমার ঘরে, সেটা নিজে কষ্ট করে সাজিয়েছিলেন তাতিয়ানা সেমিওনভ্না। ভিন্ন ভিন্ন যুগের, ভিন্ন ভিন্ন রীতির আসবাব, বড় ফ্রেমের পুরোনো একটা আয়না; প্রথম প্রথম তাতে মুখ দেখতে লজ্জা হত, পরে সেটা আমার খুব প্রিয় হয়ে দাঁড়ায়, পুরনো বন্ধুর মতো। কখনো চড়া গলায় কথা বলতেন না তাতিয়ানা সেমিওনভ্না, তবু চাকর-বাকরের ছড়াছড়ি সত্ত্বেও বাড়ির সবকিছু চলত ঘড়ির কাঁটার মতো। নরম, হিলবিহীন জুতো-পরা সব লোকজন (জুতোর মচমচ আর হিলের খটখট তাতিয়ানা সেমিওনভ্নার মতে দুনিয়ার সবচেয়ে অপ্রীতিকর জিনিস), তাদের দেখলে মনে হত নিজেদের কাজ নিয়ে সবাই গর্বিত। বৃদ্ধা কর্ত্রীর সামনে তাদের থরহরি কম্প, কিন্তু আমার স্বামী আর আমার প্রতি তাদের একটা মুরুব্বীয়ানা মেশানো স্নেহের ভাব, মনে হত অসাধারণ খুশিতে কাজকর্ম করে তারা। শনিবার শনিবার নিয়ম করে মেঝে ধোয়াপোঁছা হত, ঝাড়া হত গালিচা; মাসের প্রথম দিনে প্রার্থনা, আর জল পূত করে নেওয়া। তাতিয়ানা সেমিওনভ্না আর তাঁর ছেলের নামকরণের দিনে (আর সেবার হেমন্তে আমার নামকরণের* দিনে সেই প্রথম) খেতে ডাকা হত পাড়াপ্রতিবেশী

* প্রাক্‌বৈপ্লবিক রাশিয়ায় যে কোনো শিশুর নামকরণ করা হত ধর্মীয় কোনো-না-কোনো পবিত্র দিন দেখে। তার পর থেকে প্রতি বৎসরই ঐ দিনে 'নামকরণ দিবস' উদ্‌যাপন করা সামাজিক রেওয়াজ ছিল। 'জন্মদিনে'র চেয়ে এই 'নামকরণ দিবস'কে পারিবারিক জীবনে মূল্য দেয়া হত বেশি, উৎসবের ঘটাও হত জন্মদিনের চেয়ে বেশি। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে এই সামাজিক প্রথা পরিবর্তিত হয়ে গেছে, এখন 'জন্মদিন'ই মুখ্য উৎসবদিবস ব্যক্তিজীবনে। — সম্পাঃ

সবাইকে। যতদিনকার কথা মনে আছে তাতিয়ানা সেমিওনভ্‌নার ততদিন থেকে চলে আসছে এ সব রেওয়াজ।

সংসারের কাজে হস্তক্ষেপ করতেন না আমার স্বামী; জমিজমার কাজ আর চাষীদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, খাটুনি কম ছিল না। এমন কি শীতকালেও অতি ভোরে উনি উঠতেন, জেগে উঠে দেখতাম উনি চলে গিয়েছেন। সাধারণতঃ চায়ের সময়ে ফিরে আসতেন, আমরা দুজনে খেতাম, জমিদারী সংক্রান্ত নানা উৎকণ্ঠা আর পরিশ্রমের পর এ সময়টা প্রায় সর্বদাই সেই বিশেষ হাসিখুশি মেজাজে তিনি থাকতেন, যেটাকে আমরা বলতাম 'বুনো উচ্ছ্বাস', সারা সকালটা কী করেছেন জানতে চাইতাম আমি প্রায়ই, আর এমন সব উদ্ভট কথা তিনি বলতেন যে হেসে দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। মাঝে মাঝে জোর দিয়ে বলতাম সত্যি কী করেছ বলো, বলতেন উনি, কষ্টে হাসি চেপে রেখে। চেয়ে থাকতাম ওঁর চোখ আর নড়ন্ত ঠোঁটের দিকে, কিছু ঢুকত না মাথায় — ওঁকে দেখতে পাচ্ছি, কানে আসছে ওঁর গলা, তাতেই আনন্দ।

'কী বলেছি বলো তো?' জিজ্ঞেস করতেন উনি। 'শুনি একবার।' কিন্তু এক অক্ষর বলতে পারতাম না। নিজের আর আমার বিষয়ে কথা বলছেন না, সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস নিয়ে বলছেন, অদ্ভুত লাগত সেটা। বাইরের পৃথিবীতে যা ঘটছে তাতে যেন কিছু এসে যায়। অনেক পরে শুধু ওঁর কাজকর্ম একটু বুঝতে শুরু করি, আগ্রহ জন্মায় তাতে। ডিনারের আগে ঘর ছেড়ে বেরোতেন না তাতিয়ানা সেমিওনভ্‌না; চা খেতেন একলা, দূতের মাধ্যমে চলত সকালের শুভেচ্ছার বিনিময়। ওঁর পরিচারিকা এসে বুকে হাত জুড়ে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে জানাত তাতিয়ানা সেমিওনভ্‌না ওকে

আদেশ করেছেন আমাদের জিজ্ঞেস করতে কাল বেড়িয়ে আসার পর সুনিদ্রা হয়েছে কিনা; উনি নিজে সারা রাত গায়ের ব্যথায় কষ্ট পেয়েছেন, গ্রামের একটা হতচ্ছাড়া কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে — আমাদের পাগল করা সুখের পৃথিবীতে ওঁর গম্ভীর সুশৃঙ্খল ঘর থেকে আসা বার্তা এত খাপছাড়া ঠেকত যে মাঝে মাঝে গলা ছেড়ে হেসে ফেলতাম, সামলাতে পারতাম না নিজেকে। তাতিয়ানা সেমিওনভ্‌না আর একটি কথা জানার আদেশ করেছেন পরিচারিকাকে — আজকের বিস্কুটগুলো কেমন লেগেছে; আর আমাদের জানা উচিত যে ওগুলো তারাস সেঁকে নি, সেঁকেছে নিকলাশা, এই প্রথম সে কাজটা করেছে, ওকে পরখ করে দেখা হয়েছে; ওঁর মতে কাজটা ভালোই করেছে, বিশেষ করে ক্রেন্দেলকিটা, অবশ্য টোস্টটা প্রায় পুড়িয়ে ফেলেছে। দুপুরের খাবারের আগে স্বামীর সঙ্গে দেখা হত খুব কম। আমি হয় পিয়ানো বাজাতাম নয় পড়তাম, উনি লিখতেন বা আবার বেরিয়ে যেতেন। চারটের সময়ে সবাই যেতাম ড্রয়িং-রুমে, মা বেরিয়ে আসতেন নিজের ঘর থেকে, বাড়িতে সর্বদাই বিত্তহীন অভিজাত কন্যা ও তীর্থযাত্রিনী দু-তিনজন থাকত, আবির্ভাব হত তাদের। প্রত্যেক দিন দুপুরের খাবারে নিয়ে যাবার জন্যে উনি পুরনো অভ্যাসবশে মায়ের হাত ধরতেন, মা বলতেন আর একটা হাত আমাকে দিতে, ফলে প্রত্যেক দিন একসঙ্গে ভিড় করে ঘরে ঢোকার সময় এর ওর পায়ে পা বেধে যেত। খাবার টেবিলে সম্মানের আসন ছিল মায়ের, কথাবার্তা চলত সুষ্ঠু ধীরস্থিরভাবে, এমন কি গাম্ভীর্যের অভাব ছিল না। আমার আর ওঁর আটপৌরে কথাবার্তায় ভোজন-অধিবেশনের গাম্ভীর্যের ভাবটা কেটে যেত। মাঝে মাঝে আবার মায়ে-ছেলেতে শুরু হত তর্কাতর্কি, হয়ত দুজনে দুজনকে নিয়ে হাসিঠাট্টা

করতেন। ওঁদের তর্কাতর্কি, হাসিঠাট্টা শুনতে বেশ লাগত আমার, কেননা দুজনকার গভীর স্নেহ ও অনুরাগ সবচেয়ে ভালো করে তখন ধরা পড়ত তাতে। ভোজন-পর্বের পর ড্রয়িং-রুমে মা জাঁকিয়ে বসতেন একটা বড়ো কেদারায়, তামাক পিষে নস্যি বানাতেন কিম্বা হয়ত নতুন কোনো বই-এর পাতা কাটতেন। আর আমরা হয় পড়ে শোনাতাম নয় পিয়ানো বাজাতে চলে যেতাম হলে। সে সময় দুজনে একসঙ্গে পড়তাম অনেক, তবে আমাদের অবসরযাপনের সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে বড়ো উপকরণ ছিল সঙ্গীত। নতুন নানা ঝঙ্কার জাগত দুজনের অন্তরে, মনে হত পরস্পরকে আরো ভালো করে চিনছি। ওঁর প্রিয় গৎগুলো যখন বাজাতাম উনি দূরের সোফাটায় বসে থাকতেন, প্রায় আমার চোখের বাইরে; সঙ্গীতে ওঁর ভাবান্তরটা পাছে দেখে ফেলি এই তাঁর সংকোচ, চেপে যাবার চেষ্টা করতেন সেটা। মাঝে মাঝে, হয়ত উনি টের পাচ্ছেন না, পিয়ানো ছেড়ে যেতাম ওঁর কাছে, দেখতে চাইতাম ওঁর মুখে ভাবাবেগের সেই ছাপ, ওঁর চোখের সেই উজ্জ্বলতর দীপ্তি আর সজলতা, যেটা আমার কাছে গোপন করার বৃথা চেষ্টা উনি করেন। হলে উঁকি মেরে আমাদের একবারটি দেখে নেবার ইচ্ছে হত মায়ের, কিন্তু হয়ত আমাদের বিব্রত করবার ভয়ে মাঝে মাঝে গম্ভীর উদাসীন একটা ভাব করে ঘর হয়ে চলে যেতেন তিনি, কিন্তু নিজের ঘরে গিয়ে একটুক্ষণ যেতে না যেতে আবার বেরিয়ে আসার যে কোন কারণ নেই সেটা টের পেতাম। সন্ধ্যেবেলায় ড্রয়িং-রুমে বসে চা ঢালার কাজটা ছিল আমার। বাড়ির সবাই আবার সেখানে জড়ো হত তখন। চকচকে সামোভার ঘিরে গম্ভীর সমাবেশ, কাপ আর গেলাস এগিয়ে দেওয়া, প্রথম প্রথম অনেক দিন বেজায় অস্বস্তি হত। মনে হত এ সম্মানের যোগ্য আমি নই, সামোভারটা

এত বড়ো, তার নল ঘোরাচ্ছে কিনা আমার মতো পুঁচকে আর ফচকে একটা মেয়ে, নিকিতার ট্রে-তে গেলাস রেখে বলছে, 'এটা পিওতর ইভানিচের, ওটা মারিয়া মিনিচ্নার', তারপর জিজ্ঞেস করছে, 'আরো চিনি লাগবে?' তারপর আয়া এবং চাকর-বাকরদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত পদস্থ তাদের জন্যে চিনির ডেলা রেখে দিতে হত।

'চমৎকার, চমৎকার!' প্রায় বলতেন উনি। 'একেবারে পাকা গিন্নী!' এতে আরো বিব্রত হয়ে উঠতাম।

চায়ের পর মা 'পেশেন্স' খেলার জন্যে তাস সাজাতেন, কিম্বা মারিয়া মিনিচ্নাকে দিয়ে নিজের ভাগ্য গণনা করাতেন। তারপর আমাদের দুজনকে চুমু খেয়ে আমাদের উপরে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকার পালা, তখন নিজেদের ঘরে চলে যেতাম আমরা। সাধারণতঃ মাঝ রাত পর্যন্ত জেগে থাকতাম, সারা দিনের মধ্যে সে সময়টা সবচেয়ে ভালো আর মধুর। উনি নিজের আগেকার দিনের কথা বলতেন, দুজনে হয়ত নানা রকম জল্পনাকল্পনা করতাম, কখনো কখনো আবার দার্শনিক আলাপ-আলোচনা চলত, চেষ্টা করতাম আস্তে কথা বলার, যাতে ওপর থেকে শোনা না যায় — তাতিয়ানা সেমিওনভ্নার আদেশ আমরা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ি। মাঝে মাঝে ক্ষিধের জ্বালায় চুপিচুপি যেতাম ভাঁড়ার ঘরে, নিকিতার পৃষ্ঠপোষকতায় ঠাণ্ডা খাবার নিয়ে আমার ঘরে গিয়ে খেতাম একটি মাত্র মোমবাতির আলোয়। পুরনো বড়ো বাড়িটায় অতীতের আর তাতিয়ানা সেমিওনভ্নার প্রভাবের কড়া আধিপত্য, সেখানে আমাদের দুজনের জীবনযাত্রা ছিল বিদেশীর মতো। শুধু তাতিয়ানা সেমিওনভ্না নয়, পুরনো চাকর-বাকর, আসবাবপত্র, এমন কি ছবিগুলো পর্যন্ত দেখে আমার ভয় ভক্তি হত — মনে হত এটা ঠিক আমাদের থাকার জায়গা নয়, এখানে

থাকার সময়ে আমাদের খুব সাবধানে, অবহিতভাবে চলা উচিত। এখন সে সব দিনের কথা ভাবলে মনে হয় বাড়িটার অনেক কিছু — সবাইকে সংযত করে রাখা সেই অপরিবর্তনীয় শৃঙ্খলা, অলস কৌতূহলী সেই চাকর-বাকরের বাহিনী — অনেক কিছু ছিল অসুবিধের, হাঁফ ধরিয়ে দেবার মতো। কিন্তু তখনকার সেই সংযমই আরো গভীর করেছিল আমাদের প্রেমকে। কিছু ভালো লাগে না সেটা কখনো দেখাতেন না উনি, আমিও না। বরং যা কিছু অপ্রীতিকর সেটা লক্ষ্য না করার চেষ্টা ছিল ওঁর। মায়ের চাকর দ্মিত্রি সিদরভের বেজায় আসক্তি ছিল ধূমপানে, প্রতিদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমরা হলে গেলে ও যেত আমার স্বামীর পড়ার ঘরে, দেরাজ থেকে নিত তামাক। পা টিপে, চোখ ঠেরে, আঙুল উঁচিয়ে আতঙ্কের ভান করে যেভাবে সের্গেই মিখাইলিচ আমার কাছে এসে দ্মিত্রি সিদরভ্‌কে দেখিয়ে দিতেন তাতে বেজায় মজা লাগত। দ্মিত্রি সিদরভের অবশ্য কখনো হুঁশ হত না যে তার কার্যকলাপ আমাদের দৃষ্টিগোচর। আমাদের খেয়াল না করে, সবকিছু ভালোয় ভালোয় হয়ে গিয়েছে এই আনন্দে ও চলে গেলে আমার স্বামী বলতেন চমৎকার মেয়ে আমি, চুমো খেতেন আমাকে, চুমো খাওয়াটার বিশেষ কোন সুযোগ উনি ছাড়তেন না। মাঝে মাঝে সবকিছুতে ওঁর নির্বিকার সহিষ্ণু উদাসীন ভাবটা খারাপ লাগত আমার। সেটা ওঁর দুর্বলতা বলে ধরে নিতাম, একবারও মনে হত না উনি যেমনটি আমিও ঠিক তাই। ভাবতাম, "নিজের ইচ্ছাশক্তি দেখাবার সাহস ও'র নেই, একেবারে ছেলেমানুষ।"

একবার ওঁকে বলেছিলাম ওঁর দুর্বলতায় আমার অবাক লাগে। উনি জবাব দিলেন, 'তাই বুঝি? কিন্তু আমার এত সুখ, চটার মতো

কিছু একটা থাকে কী করে? অন্যদের ওপর জোর করার চেয়ে মেনে নেওয়া ভালো, অনেক দিন ধরে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস। এমন কোনো অবস্থা নেই যেখানে সুখী হওয়া অসম্ভব। আর আমরা দুজনে কত সুখী! চটতে আমি পারি না বাপু; কোন কিছু এখন খারাপ ঠেকে না আমার, শুধু করুণা হয় আর মজা লাগে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা হল le mieux est l'ennemi du bien*। জানো, ঘণ্টা বেজে উঠল, হয়ত বা চিঠি এল একটা, এমন কি সকালে ঘুম ভেঙে গেল, তখন আমার ভয় করে — ভয় করে এইজন্যে যে বাঁচা দরকার, কিছু একটা হয়ত বদলে যাবে, আর এখন যা তার চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে।'

বিশ্বাস হল, কিন্তু বুঝলাম না উনি কী বলছেন। সুখী আমি, মনে হল সবকিছু যথোচিত, সবায়ের যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনটি সবকিছু; তবু কোথাও যেন আর একটা সুখ আছে, এর চেয়ে বড়ো না হতে পারে, তবে আলাদা ধরনের।

দু মাস কেটে গেল এভাবে, শীতকাল এল, এল ঠাণ্ডা আর তুষার-ঝড়; আর স্বামীর সাহচর্য সত্ত্বেও নিজেকে নিঃসঙ্গ লাগতে শুরু করল। মনে হতে লাগল জীবনে কোনো বৈচিত্র্য নেই, নতুন কিছু নেই ওঁর আর আমার মধ্যে, আমরা শুধু ফিরে যাচ্ছি পুরনো দিনে। আমাকে বাদ দিয়ে আগের চেয়ে বেশী করে নিজের কাজকর্মে মন দিলেন উনি, আবার মনে হল ওঁর মধ্যে আছে বিশেষ একটা জগৎ, সেখানে আমি ঢুকি উনি চান না। ওঁর সেই সদা ধীরস্থির ভাব জ্বালা ধরিয়ে দিল আমার মনে। আগের চেয়ে ওঁর কম ভালোবাসি তা নয়, ওঁর ভালোবাসায় আমার সুখ আগেকার মতনই,

* যা শ্রেষ্ঠ তা ভালোর শত্রু (ফরাসী ভাষায়)।

কিন্তু ভালোবাসাটা থমকে দাঁড়িয়েছে, বাড়ছে না আর; প্রেম ছাড়া নতুন একটা অস্থিরতা গোপনে এল আমার অন্তরে। ওঁকে ভালোবাসার তীব্র সুখের পর শুধু ভালোবেসে যাওয়াটা যথেষ্ট নয়। জীবনের প্রশান্ত প্রবাহ চাই না, আরো বেশী গতি চাই। আমার চাই বিপদ আর উত্তেজনা, নিজের প্রেমের জন্যে আত্মত্যাগ করতে চাই আমি। আমার অতিরিক্ত শক্তির স্থান নেই আমাদের এই শান্ত জীবনে। মাঝে মাঝে বিষণ্ণতার আক্ষেপ আচ্ছন্ন করত আমাকে, চেষ্টা করতাম যাতে উনি সেটা টের না পান, জিনিসটা যেন খারাপ; মাঝে মাঝে আমার অসংযত স্নেহ আর আনন্দের উচ্ছ্বাসে ঘাবড়ে যেতেন উনি। আমার আগেই আমার অবস্থাটা লক্ষ্য করে উনি বলেছিলেন সহরে যাওয়া যাক, কিন্তু আমি বলেছিলাম, না, আমাদের জীবনযাত্রার ধরন বদলাবার দরকার নেই, দরকার নেই আমাদের সুখের ব্যাঘাত করার। আর সত্যি সত্যি সুখী ছিলাম আমি, শুধু একটা জিনিস যন্ত্রণা দিত আমাকে — আমার সুখটা মাগনা, তার জন্যে কোনো কিছু ত্যাগ করতে হয় না; কাজের আর ত্যাগের বাসনা যন্ত্রণা দিত আমাকে। ওঁকে ভালোবাসতাম, জানতাম আমি ওঁর চোখের মণি, কিন্তু আমি চাইতাম আমাদের ভালোবাসা সবাই দেখুক; বাধা দিক আমার ভালোবাসায়, তবু ভালোবেসে যাব ওঁকে। আমার মন আর আমার অনুরাগ ভরাট, তবু ছিল একটা নতুন অনুভূতি — যৌবনের একটা অনুভূতি, উত্তেজনার একটা চাহিদা, আমাদের শান্ত জীবনযাত্রায় সে চাহিদা অতৃপ্ত রয়ে গেল। চাইলে যখন খুশি সহরে যেতে পারি, কথাটা কেন বলেছিলেন উনি? সেটা না বললে হয়ত বুঝতে পারতাম আমার যন্ত্রণাকর অনুভূতিটা দোষের, সেটা ক্ষতিকর। বুঝতে পারতাম ত্যাগের সুযোগের জন্যে আমার উতলা অনুভূতিটা দমন করতে পারাটাই ত্যাগ। বারবার মনে হতে লাগল

সহরে গেলেই বিরক্তির হাত থেকে রেহাই মিলবে, তবু শুধু নিজের স্বার্থে যা কিছু ওঁর প্রিয় তা থেকে ওঁকে ছিনিয়ে নিতে দুঃখ পেতাম, হত লজ্জা। দিন কাটতে লাগল; বাড়ির চারদিকে ক্রমশঃ উঁচু হয়ে জমল বরফের স্তূপ; আমরা দুজনে সর্বদা একসঙ্গে থাকি, চোখের আড়াল হই না কখনো। আর কোথায় যেন আলোর ছটায় আর সোরগোলে অনেক অনেক লোক স্বাদ পাচ্ছে উত্তেজনার, দুঃখের, আনন্দের; আমাদের কথা নিয়ে, আমাদের একঘেয়ে অস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামায় না তারা। সবচেয়ে কষ্ট হত এই ভেবে যে আমাদের সব অভ্যেস প্রতিদিন বাঁধা ছকে ফেলছে আমাদের জীবনযাত্রাকে; আমাদের প্রেম স্বাধীন নয়, কালের যাত্রার নির্বিকার নিরাসক্ত স্রোতের মুখে ভেসে চলেছে। সকালে আমরা হাসিখুশি, দুপুরের খাবারের সময় সমীহ করে চলি, সন্ধ্যেবেলায় আমরা স্নেহে কোমল। নিজেকে বলতাম, "অন্যের ভালো করো! অন্যের ভালো করা, সৎভাবে থাকা চমৎকার জিনিস, উনি তো তাই বলেন। সেটা করার সময় তো আছে। কিন্তু এমন সব জিনিস আছে যেগুলো করার শক্তি শুধু এখনি আছে আমার।" ও সবের দিকে মন ছিল না আমার, আমি চাইতাম সংগ্রাম। চাইতাম অনুভূতি আর আবেগ আমাদের জীবনকে চালাক, জীবন আমাদের আবেগকে নয়। গভীর খাদের ঠিক ওপরে ওঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে বলার ইচ্ছে হত, 'আর এক পা, ব্যস, তারপর খাদ; আর একটি মুহূর্ত শুধু, তারপর আমি নেই,' তখন মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখে বলিষ্ঠ হাতে আমাকে তুলে মুহূর্তকাল খাদের ওপরে ধরবেন উনি, হৃৎস্পন্দন থেমে যাবে আমার, তারপর সেখান থেকে নিয়ে যাবেন আমাকে কোথাও যেন।

মনের এই অবস্থার ফলে স্বাস্থ্য খারাপ হল, এল স্নায়বিক অস্থিরতা। একদিন সকালে অন্য দিনের চেয়ে খারাপ লাগছিল,

উনিও অফিস থেকে ফিরলেন খারাপ মেজাজে, সেটা হত কদাচিৎ। তক্ষুণি টের পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম কী হয়েছে, কিন্তু কিছু জানালেন না উনি, বললেন বলার মতো কিছু নয়। পরে কানে এল স্বামীকে জব্দ করার জন্যে জেলার দারোগা আমাদের কয়েকটি চাষীকে তলব করে নানা বেআইনী দাবী করেছে, শাসিয়েছে ওদের। দারোগাটি আমার স্বামীর ওপর চটা ছিল। ব্যাপারটা তখনো হাস্যকর বলে হেসে উড়িয়ে দিতে পারেন নি বলে ওঁর মেজাজটা বিগড়েছে, সেজন্যে কথা বলতে চান নি আমার সঙ্গে। কিন্তু আমার মনে হল আমাকে নেহাৎ বাচ্ছা ভাবেন উনি, ভাবেন ওঁর ভাবনাচিন্তা বোঝার শক্তি আমার নেই, তাই কিছু বলেন নি। মুখ ফিরিয়ে নিলাম, কোনো কথা বললাম না। মারিয়া মিনিচ্না আমাদের অতিথি ছিলেন, তাঁকে চায়ে ডাকতে বললাম। চা-পর্ব বেশ তাড়াতাড়ি শেষ করে মারিয়া মিনিচ্নাকে হলে নিয়ে গিয়ে জোর গলায় তুচ্ছ কী একটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে শুরু করলাম; ব্যাপারটায় বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না আমার। উনি পায়চারি করতে লাগলেন, মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। তাঁর তাকানোতে আরো বেশী কথা বলার ইচ্ছে হল, এমন কি মনে হল হেসে উঠি। যা কিছু বললাম, মারিয়া মিনিচ্না যা বললেন — সব মনে হল মজার। শেষ পর্যন্ত উনি একটিও কথা না বলে পড়ার ঘরে চলে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার ফূর্তি উবে গেল, এত চট করে যে অবাক হয়ে মারিয়া মিনিচ্না শুধালেন কী হয়েছে আমার। জবাব না দিয়ে সোফায় বসে পড়লাম, প্রায় কান্না পেয়ে গেল। "কী নিয়ে উনি মাথা ঘামাচ্ছেন? ছাইপাঁশ কিছু, ওঁর কাছে মনে হচ্ছে ভয়ানক জরুরী ব্যাপার, কিন্তু আমাকে বললে দেখিয়ে দিতাম ব্যাপারটা সামান্য। কিন্তু উনি ভাবেন আমি কিছু

বুঝি না, নিজের মর্যাদা আর শ্রেষ্ঠত্বের ভারে আমাকে খেলো করেন, আমার সঙ্গে যা করেন সবই যেন ঠিক। কিন্তু আমিও কিছু অন্যায় করি না, যদি একঘেয়ে লাগে, জীবনটা ফাঁকা মনে হয়, বাঁচতে, এগিয়ে যেতে চাই, ঠিক করি। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে সময় কেটে যাচ্ছে দেখার সখ আমার নেই। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে নতুন কিছু আমার চাই, কিন্তু উনি চান এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে, চান ওঁর সঙ্গে আমিও যেন দাঁড়িয়ে থাকি। ওঁর পক্ষে সেটা কত না সহজ! তার জন্যে আমাকে সহরে নিয়ে যেতে হবে না, হতে হবে ঠিক আমার মতো — সহজ, অকপট, বাধাবন্ধনহীন। আমাকে সহজ সরল হতে উনি বলেন, কিন্তু নিজে উনি সহজ সরল নন। ব্যাপারটা হল এই!" ভাবতে থাকি আমি।

মনে হল অশ্রুজলে হাঁফ ধরে গিয়েছে, ওঁর ওপর চটেছি। আর এতে ভয় পেয়ে গেলাম ওঁর কাছে। পড়ার ঘরে বসে উনি লিখছিলেন। আমার পায়ের শব্দ শুনে চোখ তুলে নিরাসক্ত শান্তভাবে একবার শুধু তাকালেন, তারপর লিখে চললেন। ওঁর চাউনিটা ভালো লাগল না, তাই কাছে না গিয়ে ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটা বই খুলে পাতা ওলটাতে শুরু করলাম। আবার উনি ফিরে তাকালেন আমার দিকে।

'মেজাজটা ঠিক নেই বুঝি, মাশা?' জিজ্ঞেস করলেন।

ঠাণ্ডা চোখে একবার তাকালাম, ভাবটা যেন, "জিজ্ঞেস করে কী লাভ? এত ভদ্রতা কেন?" মাথা নাড়লেন উনি, মুখে এল লাজুক, স্নিগ্ধ হাসি। আর এই প্রথম ওঁর হাসিতে হেসে সাড়া আমি দিলাম না।

'কী হয়েছিল আজ?' জিজ্ঞেস করলাম। 'আমাকে বললে না কেন শুনি?'

'এমন কিছু নয়। অল্প অপ্রীতিকর একটা ব্যাপার,' জবাবে উনি বললেন, 'কিন্তু এখন তোমাকে বলতে পারি। আমাদের দুজন চাষী সহরে গিয়েছিল...'

কথাটা শেষ করতে দিলাম না।

'চায়ের সময় যখন জিজ্ঞেস করলাম তখন বললে না কেন?'

'হয়ত বোকার মতো কিছু বলে বসতাম। তখনো খুব রেগে ছিলাম।'

'তখনি জানা দরকার ছিল আমার।'

'কেন?'

'তোমার কোনো কাজে আমি কখনো লাগব না, কেন ভাব এটা?'

'তাই ভাবি বুঝি?' কলমটা ফেলে দিয়ে বললেন উনি। 'আমি ভাবি যে তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না। তুমি সবকিছুতে আমাকে সাহায্য কর, সবকিছুতে। শুধু সাহায্য কর না, সবকিছু তুমি করে দাও। কী বোকা তুমি!' হেসে উঠলেন উনি। 'তুমি আমার সর্বস্ব। তুমি এখানে আছ বলে, তোমাকে আমার দরকার বলে সবকিছু ভালো লাগে আমার।'

'তা জানি — আমি আদুরে খুকি তো, আমাকে বুঝিয়ে পাড়িয়ে শান্ত করা দরকার,' যে সুরে কথাটা বললাম তাতে উনি অবাক হয়ে তাকালেন, যেন এই প্রথম আমাকে দেখছেন। 'শান্ত হতে আমি চাই না। তুমি নিজে যথেষ্ট শান্ত। বড্ডো বেশী শান্ত,' যোগ করলাম।

'শোনো, ব্যাপারটা হয়েছিল কি,' বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি শুরু করলেন উনি, আমাকে শেষ করতে দিতে ওঁর ভয়, সেটা স্পষ্ট। 'তুমি হলে ব্যাপারটার মীমাংসা কীভাবে করতে?'

'এখন আর শুনতে চাই না,' বললাম। শুনতে অবশ্য চেয়েছিলাম, কিন্তু ওঁর ধীরস্থির ভাবের ব্যাঘাত করতে বেশ লাগছিল। 'আমি বাঁচার অভিনয় চাই না — আমি বাঁচতে চাই, ঠিক তোমার মতো।'

ব্যথার, প্রখর মনোযোগের একটা ভাব এল ওঁর মুখে। সে মুখে সবকিছুর ছাপ পড়ত তাড়াতাড়ি, স্পষ্টভাবে।

'আমি চাই তোমার সমান হয়ে থাকতে, তোমার সমান হয়ে...'

ওঁর মুখে এল বিষণ্ণ ভাব, এত গভীর বিষণ্ণ ভাব যে কথাটা শেষ করতে পারলাম না। মুহূর্তকাল চুপ করে রইলেন উনি।

'আমার সমান নয় কী ব্যাপারে বলো তো?' জিজ্ঞেস করলেন। 'দারোগা আর মাতাল চাষীদের নিয়ে কারবার আমাকে করতে হয়, তোমাকে নয়, সেজন্যে বুঝি?'

'না, শুধু তা নয়।'

'দোহাই তোমার, আমাকে বোঝার চেষ্টা করো লক্ষ্মীটি,' বলে চললেন উনি। 'উৎকণ্ঠা সব সময়েই কষ্টের ব্যাপার। অনেকদিন বেঁচেছি বলে সেটা জানি। তোমাকে ভালোবাসি বলে উৎকণ্ঠার হাত থেকে যাতে রেহাই পাও তার চেষ্টা না করে পারি না। তোমাকে ভালোবাসি, সেটা আমার জীবনের সর্বস্ব। সে জীবন থেকে আমাকে বঞ্চিত কোরো না।'

'তোমার ভুল তো কখনো হয় না!' ওঁর দিকে না তাকিয়ে বললাম।

ওঁর হৃদয়ে সবকিছু আবার স্বচ্ছ আর শান্ত, অথচ আমার অন্তরে বিরক্তি আর অনুশোচনার মতো একটা ভাব, তাই বিরক্ত লাগল।

'মাশা! তোমার কী হয়েছে বলো তো?' উনি বললেন। 'কে ঠিক, কে ঠিক নয়, তুমি না আমি, কথাটা তা নয়। কথাটা একেবারে

অন্য। আমার ওপর রাগ করেছ কেন? না ভেবেচিন্তে কিছু বোলো না, সব ভেবে নিয়ে আমাকে খুলে বলো। আমাকে নিয়ে তুমি অসন্তুষ্ট, হয়ত তার ন্যায্য কারণ আছে, কিন্তু কোনখানটায় আমার দোষ সেটা জানতে দাও।'

কিন্তু ওঁর কাছে মন খুলে সব কথা বলি কী করে? উনি আমাকে চট করে বুঝেছেন, আবার ওঁর কাছে আমি বাচ্চা মেয়ের মতো, এমন কিছু আমি করতে পারি না যেটা উনি চট করে ধরে ফেলবেন না বা আগে থেকে আঁচ করেন নি; এই অবস্থাটা আরো উত্তেজিত করে তুলল আমাকে।

'তোমার ওপর চটি নি,' বললাম আমি। 'আমার শুধু একঘেয়ে লাগছে, আর সেটা আমি চাই না। কিন্তু তোমার মতে ও রকমটাই হওয়া উচিত, আর তোমার কথাটা তো ঠিক না হয়ে যায় না।'

কথাটা বলে ওঁর দিকে তাকালাম। যা চেয়েছিলাম তাই হয়েছে — ওঁর ধীরস্থির ভাব আর নেই; মুখে ব্যথা আর উৎকণ্ঠার ছাপ।

'মাশা,' নিচু, উত্তেজিত গলায় উনি শুরু করলেন। 'এখন আমরা যা করছি সেটা ঠাট্টার জিনিস নয় — আমাদের ভাগ্য নির্ভর করছে তার ওপর। অনুগ্রহ করে জবাব দিও না, যা বলছি শোনো। আমাকে কেন যন্ত্রণা দিতে চাও?'

কিন্তু বাধা দিলাম ওঁকে।

'তুমি যা বলবে ঠিক না হয়ে যায় না। তোমার কিছু না বললেও চলে, তুমিই ঠিক,' অত্যন্ত কঠিন সুরে জবাব দিলাম, যেন আমি কথা বলছি না, আমাকে কথা বলাচ্ছে কোন অশুভ প্রেতাত্মা।

'কী বলছ সেটা শুধু যদি জানতে!' বললেন কম্পিত গলায়।

কেঁদে ফেললাম, তাতে হালকা লাগল। আমার পাশে চুপচাপ বসে রইলেন উনি। দুঃখ হচ্ছিল ওঁর জন্যে, যা করেছি তার জন্যে

লজ্জিত আর বিরক্ত লাগল। ওঁর দিকে তাকালাম না। মনে হল উনি আমার দিকে যে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সে দৃষ্টি হয় কঠোর নয় তো হতবুদ্ধি। মুখ তুলে চাইলাম: স্নিগ্ধ কোমল দৃষ্টি আমাতে নিবদ্ধ, সে দৃষ্টি যেন ক্ষমা চাইছে। ওঁর একটা হাত ধরে বললাম:

'কিছু মনে কোরো না। কী যে বলছিলাম নিজেই জানতাম না।'

'আমি কিন্তু বুঝেছি; ঠিকই বলছিলে তুমি।'

'কী?' জিজ্ঞেস করলাম।

'আমাদের সেণ্ট পিটার্সবুর্গে যাওয়া দরকার। এখানে আমাদের করবার কিছু নেই।'

'তোমার যা ইচ্ছে,' বললাম।

আমাকে জড়িয়ে চুমো খেলেন উনি।

'আমায় মাফ করো,' উনি বললেন। 'তোমার কাছে আমি অপরাধী।'

সেদিন সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ পিয়ানো বাজিয়ে শোনালাম ওঁকে, ঘরে উনি পায়চারি করতে লাগলেন, আপন মনে ফিসফিস করে কী যেন বলছিলেন। আপন মনে ফিসফিস করাটা ওঁর অভ্যেস, মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতাম কী বলছেন। একটু ভাবতেন, তারপর জবাব দিতেন — সাধারণতঃ কোনো কবিতা আওড়াচ্ছেন বা ছাইপাঁশ কিছু বলছেন, কিন্তু ছাইপাঁশটা থেকে ওঁর মেজাজটা টের পেতাম।

'আজ ফিসফিস করে কী বলা হচ্ছে?' শুধালাম।

মুহূর্তকাল থাকলেন উনি, তারপর হেসে লের্মন্তভ্ থেকে দু ছত্র আবৃত্তি করলেন:

...বিদ্রোহী সে চায় ঝড়দুর্যোগ,
যেন শান্তি পাবে ঝড়ে!

"উনি মানুষ নন, মানুষের চেয়ে বড়ো, সব জানেন উনি!" মনে মনে ভাবলাম। "ওঁকে না ভালোবেসে কী করে থাকি?"

উঠে পড়ে ওঁর হাত ধরে ওঁর পায়ের সঙ্গে পা ফেলবার চেষ্টা করে পায়চারি করতে লাগলাম।

'সত্যি না?' হেসে আমার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলেন উনি।

'সত্যি,' মৃদু কণ্ঠে বললাম। আর একটা ফুর্তির ভাব দুজনকে পেয়ে বসল। আমাদের চোখ হাসিতে উজ্জ্বল, ক্রমশঃ লম্বা লম্বা পা ফেলছি দুজনে, পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে হাঁটা শুরু হল। সবকটা ঘর হয়ে এভাবে চললাম খাবার ঘরে, গ্রিগরি গেল ভয়ানক চটে, মা একেবারে অবাক, ড্রয়িং-রুমে বসে 'পেশেন্স' খেলছিলেন তিনি। সেখানে গিয়ে দুজনে থামলাম, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললাম উচ্চ কণ্ঠে।

দু সপ্তাহ পরে, ঠিক ছুটির আগে, পেঁছিলাম সেণ্ট পিটার্সবুর্গে।

৭

সেণ্ট পিটার্সবুর্গে যাত্রা, পথে এক সপ্তাহ মস্কোয় — রাস্তাঘাট, নতুন নতুন সহর, ওঁর আর আমার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ, নতুন বাড়িতে গুছিয়ে বসা — সব কেটে গেল স্বপ্নের মতো।

সবকিছু এত বিচিত্র, এত নতুন আর আনন্দ-ভরা, ওঁর উপস্থিতি আর প্রেম এত উষ্ণ ও উজ্জ্বল যে গ্রামের শান্ত জীবনযাত্রাকে মনে হল তুচ্ছ ও সুদূর। ভেবেছিলাম উচ্চ সমাজের লোকদের মধ্যে দেখব গর্ব আর ঔদাসীন্য, কিন্তু অত্যন্ত অবাক হয়ে দেখলাম সবাই, আত্মীয় অনাত্মীয় সবাই আন্তরিক সৌজন্যতায়, সদয়ভাবে ব্যবহার করলেন আমার সঙ্গে, মনে হল ওঁরা সবাই শুধু আমার কথা ভাবছিলেন, পথ চেয়ে বসেছিলেন শুধু আমারি জন্যে, আমি এলে সুখী হবেন বলে। সমাজের উঁচু স্তরকে তখন আমার মনে হয়েছিল শ্রেষ্ঠ স্তর — এত জনকে আমার স্বামী চেনেন, আমার কাছে অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার সেটা, এঁদের নাম কখনো তিনি করেন নি আমার কাছে। তাঁদের কয়েক জনের তীক্ষ্ন সমালোচনা মাঝে মাঝে তিনি করতেন, সেটা আমার বিচিত্র ও অপ্রীতিকর ঠেকত, তাঁদের তো অত্যন্ত সদয় বলে আমার মনে হত। কেন যে তাঁদের প্রতি উনি অত উদাসীন, কেন এমন অনেককে উনি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন যাঁদের সঙ্গে আলাপ করাটা সৌভাগ্যের ব্যাপার, আমার মাথায় ঢুকত না। আমার মনে হত যত বেশী ভালো লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয় ততই ভালো, আর ওঁরা সবাই তো সহৃদয় লোক।

গ্রাম ছাড়ার আগে উনি বলেছিলেন, 'কীভাবে চলতে হবে বলি। এখানে বুঝলে আমরা ছোটখাটো বাদশা গোছের লোক, কিন্তু সহরে আমাদের ধনী বলা মোটেই চলবে না, তাই ইস্টার পর্যন্ত শুধু থাকতে পারব সেখানে; উঁচু সমাজে বেশী ঘোরাফেরা করা চলবে না, সেটা করলে ধার হয়ে যাবে। তাছাড়া, আমি চাই না যে তোমার...'

'উঁচু সমাজে ঘুরব কেন?' জবাব দিয়েছিলাম। 'আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে শুধু দেখা করব, থিয়েটারে যাব আর ভালো গানবাজনা শুনব। তারপর ইস্টারের আগে গ্রামে ফিরে আসব।'

কিন্তু সেণ্ট পিটার্সবুর্গে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে সব সংকল্প উবে গেল। হঠাৎ গিয়ে পড়লাম একটা নতুন সুখের জগতে, আনন্দের বন্যায় ভেসে গেলাম, নতুন নানা ঝোঁক দেখা দিল; সঙ্গে সঙ্গে, অবশ্য আমার অজ্ঞাতসারে, আমার অতীতকে আর অতীতের সমস্ত পরিকল্পনাকে দিলাম বাতিল করে। "ও সব কিছু নয় — কিছু শুরু হয় নি তখনো — এটাই হল আসল জীবন। আর সামনে কত কী না পড়ে রয়েছে!" আমি ভাবলাম। গ্রামে আমার সেই অস্থির অবসাদের ভাব ইন্দ্রজালের মতো হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। স্বামীর প্রতি অনুরাগ অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়ে এল; আমাকে উনি আগের চেয়ে কম ভালোবাসেন কিনা, তা নিয়ে একেবারে ভাবি নি। ওঁর প্রেমে সন্দেহ করি কী করে, আমার সমস্ত চিন্তা সঙ্গে সঙ্গে উনি বুঝে ফেলেন, আমার সব অনুভূতির সোদর উনি, আমার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করেন। ওঁর সেই ধীরস্থির ভাব হয় চলে গিয়েছিল নয় তাতে আমি আর বিরক্ত হতাম না। তারপর মনে হল আমার প্রতি ওঁর পুরনো অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে নতুন একটা প্রশংসার ভাব। হয়ত কারো বাড়িতে গিয়েছি, আলাপ হয়েছে নতুন কারো সঙ্গে, কিম্বা হয়ত বাড়িতে সন্ধ্যেবেলায় নেমন্তন্ন করা হয়েছে লোকজনকে, গৃহিণীর কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়েছে আমাকে, বুকের ভেতর কাঁপুনি যদি কোনো ভুল করে ফেলি, উনি বলতেন, 'মেয়ে বটে! চমৎকার! ঘাবড়িও না। ঠিক করেছ, চমৎকার!' শুনে খুব ভালো লাগত। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে পেঁছবার কিছুদিন পরে মাকে একটা চিঠি লিখে আমাকে কিছু যোগ করতে বললেন, ওঁর

ইচ্ছে ছিল না ওঁর লেখা অংশটা আমি পড়ি, আমি জেদ করে কিন্তু চিঠিটা পড়ি। উনি লিখেছিলেন, 'মাশাকে আপনি চিনতেন না। আমি নিজেও চিনি না। কোত্থেকে ও এ রকম মধুর সুন্দর আত্মবিশ্বাস, এ রকম লাবণ্য, এমন সামাজিক রসবোধ আর কমনীয়তা পেল! আর এ সবকিছু কত সরল, কত অনুরাগের, কত ভব্য। সবাই ওকে নিয়ে মুগ্ধ, আমিও। এখনকার চেয়ে ওকে বেশী ভালোবাসা যদি সম্ভব হত তাহলে তাই ভালোবাসতাম।'

"তাহলে আমি মানুষটা এ রকম!" ভাবলাম, ভেবে এত সুখী লাগল, এত আনন্দ হল! মনে হল ওঁর ওপর আমার ভালোবাসা বেড়ে গিয়েছে। চেনাশোনা লোকেদের মধ্যে আমার সাফল্য আমার কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল। সব জায়গায় শুনি লোকে আমাকে অত্যন্ত পছন্দ করে। একটা বাড়িতে আমাদের একজন কাকা বিশেষ খুশি আমাকে নিয়ে; অন্য বাড়িতে একটি কাকিমা তো আমাকে নিয়ে পাগল; একজন ভদ্রলোক বললেন সারা সেণ্ট পিটার্সবুর্গে আমার জুড়ি মেলা ভার; একটি ভদ্রমহিলা বললেন ইচ্ছে করলেই সমাজের সবচেয়ে শালীন মহিলা হতে পারি। বিশেষ করে আমার স্বামীর খুড়তুতো বোন, কায়দাদুরস্তা প্রবীণা প্রিন্সেস 'দ' আমার প্রেমে পড়ে গেলেন হঠাৎ, সবায়ের চেয়ে বেশী আমার গুণগান তিনি করতেন, এত বেশী করতেন যে আমার মাথাটা ঘুরে গেল একেবারে। একটা বল-নাচে যাবার জন্যে প্রথম বার আমাকে নেমন্তন্ন করে তিনি আমার স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর কোন আপত্তি আছে কিনা। উনি আমার দিকে তাকালেন, মুখের ধূর্ত হাসিটা চাপা পড়ে নি, জিজ্ঞেস করলেন আমি যেতে চাই কিনা। যেতে চাই জানিয়ে মাথা নাড়লাম, বুঝতে পারলাম লাল হয়ে উঠেছি।

ভালোভাবে হেসে উনি বললেন, 'যেতে চাও সেটা মুখ ফুটে বলাটা যেন মহা পাপ!'

হেসে, অনুরোধ-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম, 'কিন্তু তুমি তো বলেছিলে উ'চু সমাজে যাওয়া আমাদের চলবে না। তাছাড়া ও সব তো তোমার ভালো লাগে না।'

'যাবার এত ইচ্ছে যখন তোমার, যাব,' উনি বললেন।

'কিন্তু না গেলেই ভালো বোধ হয়।'

'যেতে খুব ইচ্ছে করছে?' আবার শুধালেন উনি।

উত্তর দিলাম না।

'উ'চু সমাজ জিনিসটা খারাপ নয়, কিন্তু উ'চু সমাজের অতৃপ্ত বাসনা খারাপ, কুৎসিত। আমরা যাব, নিশ্চয় যাব,' দৃঢ় কণ্ঠে উনি বললেন।

স্বীকার করলাম, 'সত্যি বলতে, এই বল-নাচে যেতে যেমন চেয়েছি পৃথিবীতে আর কিছু তেমন চাই নি।'

গেলাম সেখানে, আমার আহ্লাদ প্রত্যাশার মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। বলে আগের চেয়ে অনেক বেশী করে মনে হল আমাকে কেন্দ্র করে সবকিছু ঘুরছে — প্রকাণ্ড হলটা আলোয় আলো করা হয়েছে আমার খাতিরে, গানবাজনা চলেছে, এত লোক একত্র হয়েছে, সব আমারি জন্যে। কেশকার আর অনুচারিকা থেকে শুরু করে হলে ঘুরে-বেড়ানো সব যুবক আর বুড়োরা পর্যন্ত আমাকে যেন বলল কিম্বা বুঝিয়ে দিল যে তারা আমাকে ভালোবাসে। আমার সম্বন্ধে আসরের লোকদের সাধারণ মতটা আমাকে জানিয়েছিলেন স্বামীর খুড়তুতো বোন, মতটা হল এই যে অন্য মেয়েদের সঙ্গে আমার কোনো মিল নেই, আমার অসাধারণ কিছু একটা আছে, গ্রাম্য, সহজ সরল, মোহিনী কিছু একটা। সাফল্যে এত আত্মপ্রসাদ অনুভব

করলাম যে স্বামীকে খোলাখুলি বললাম যে সে বছরে আরো দু-তিনটে বলে যেতে চাই আমি। 'গিয়ে অরুচি হয়ে যায় যাতে,' যোগ করলাম, মনের ভাব চেপে রেখে।

সাগ্রহে রাজী হলেন উনি। প্রথম প্রথম বাহ্যত বেশ খুশি হয়ে আমার সঙ্গে যেতেন, আমার সাফল্যে ওঁর আনন্দ, আগে যা বলেছিলেন তা যেন মনে নেই একেবারে, কিম্বা ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

পরে ওঁর একঘেয়ে লাগত, আমাদের জীবনযাত্রায় ক্লান্ত লাগতে শুরু করল ওঁর। কিন্তু সেটা আমার কাছে কিছু না: ওঁর গম্ভীর, চিন্তাকুল দৃষ্টি জিজ্ঞাসুভাবে আমার মুখে নিবদ্ধ, মাঝে মাঝে সেটা চোখে পড়ত বটে, কিন্তু চাউনিটার অর্থ বুঝতাম না। আমাকে নিয়ে অচেনা লোকজনের সাড়া, যেটা অনুরাগ বলে ঠেকত আমার কাছে, এই মার্জিত রুচি, প্রীতি ও বৈচিত্র্যের আবহাওয়ায় আমি এত চমৎকৃত যে এই প্রথম যেন বাঁচলাম সহজভাবে; ওঁর নৈতিক প্রভাবের আধিপত্য থেকে মুক্তি পেলাম হঠাৎ, এরা সবাই আমাকে ওঁর শুধু সমকক্ষ নয়, শ্রেষ্ঠ বলে ভাবে তাতে আমি এত প্রীত যে ওঁকে আমার প্রেম স্বেচ্ছায়, আরো মুক্ত হস্তে উজাড় করে দেওয়া সম্ভব হল: উচ্চ সমাজের জীবনে আমার পক্ষে অপ্রীতিকর কী উনি দেখেন বুঝতে পারলাম না। বল-ঘরে ঢুকলে সবাই তাকাত আমার দিকে, তাতে গর্ব আর আত্মপ্রসাদের নতুন একটা অনুভূতি আমার হত। আর আমি যে ওঁর সেটা জানাতে যেন লজ্জা পেয়ে উনি তাড়াতাড়ি আমাকে ছেড়ে ইভনিং-জ্যাকেট-পরা লোকের ভিড়ে মিলিয়ে যেতেন। হলের এক প্রান্তে উনি হয়ত একলা দাঁড়িয়ে আছেন, কেউ পাত্তা দিচ্ছে না ওঁকে, মাঝে মাঝে ওঁর চেহারায় একঘেয়েমির ছাপ — ওঁকে দেখে ভাবতাম, "আর একটু সবুর করো, বাড়ি ফেরা পর্যন্ত সবুর করো, তখন বুঝতে পারবে —

কার জন্যে সুন্দর আর চোখ-ধাঁধানো হবার আমার এই চেষ্টা, আজকের সন্ধ্যায় আমার চারিদিকে ভিড়-করা লোকজনকে নয়, কাকে সবায়ের চেয়ে বেশী ভালোবাসি।" আর সত্যি মনে হত ওঁরি খাতিরে নিজের সাফল্যে আমি এত আনন্দ পাই, সে সাফল্য ওঁর পায়ে উজাড় করে দিতে পারব বলে। ভাবলাম, উচ্চ সমাজে শুধু একটা জিনিস আমার পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে — সেটা হল যদি সেখানকার কারোর প্রতি আমার টান হয়, তাহলে আমার স্বামী হিংসেয় ভুগবেন। কিন্তু আমাতে ওঁর এত বিশ্বাস, ওঁকে এত ধীরস্থির ও নির্বিকার মনে হয়; ওঁর তুলনায় তরুণদের সবাইকে এত অকিঞ্চিৎকর ঠেকে যে উচ্চ সমাজের এই একমাত্র বিপদটায় আমার কোন ভয় হল না। অবশ্য সমাজের এত লোকের মনোযোগের বস্তু আমি, বেশ খুশি লাগত, আত্মগর্বে সাড়া জাগত, মনে হল স্বামীকে যে ভালোবাসি সেটা কিছুটা গুণের কথা বলতে হবে; ওঁর প্রতি আমার হাবভাবে এল একটা আত্মপ্রত্যয়ের অনবহিত ভাব।

বল থেকে বাড়ি ফেরার পথে একদিন রাত্রে ওঁর দিকে তর্জনী উঁচিয়ে বললাম, 'তুমি তো 'ন. ন.'র সঙ্গে খাসা কথা চালিয়েছিলে দেখলাম।' যে মহিলাটির উল্লেখ করলাম তিনি সেণ্ট পিটার্সবুর্গে সুপরিচিতা, আর সেদিন সন্ধ্যায় উনি সত্যিই কথা বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে। কথাটা তুললাম ওঁকে একটু নাড়া দেবার জন্যে, অন্যান্য দিনের তুলনায় উনি আরো চুপচাপ ছিলেন, আরো একঘেয়েমির ছাপ ওঁর মুখে ছিল বলে।

'কী বলছ! তোমার মুখে এ কথা, মাশা?' উনি বললেন, দাঁত চেপে, শারীরিক ব্যথায় যেন ভ্রূ কুঞ্চিত হল। 'কথাটা তোমাকে বা আমাকে মোটেই মানায় না। এ সব বলুক অন্য লোকে। এ ধরনের

কৃত্রিমতায় আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যেতে পারে, আর আমার এখনো আশা আছে যে সম্পর্কটা ফিরে আসবে।'

লজ্জা পেয়ে চুপ করে রইলাম।

'সম্পর্কটা ফিরে আসবে আবার, কী বলো মাশা? কী মনে হয় তোমার?' জিজ্ঞেস করলেন উনি।

'সম্পর্কটা নষ্ট হয় নি কখনো, নষ্ট হবে না কখনো,' বললাম। সে সময় সত্যি তাই মনে হয়েছিল।

'ভগবান তাই করুন,' উনি বললেন। 'এবার গ্রামে ফেরার সময় হয়েছে।'

একবারই শুধু আমার সঙ্গে এ রকম ভাবে কথা বলেছিলেন উনি। বাকি সময়টা মনে হত উনি আমারি মতো সুখী। আর আমি কত না উচ্ছল আর সুখী ছিলাম! মাঝে মাঝে ওঁর একঘেয়ে লাগে হয়ত, নিজেকে বোঝাতাম যে ওঁর খাতিরে গ্রামে তো আমি একঘেয়েমি সহ্য করেছি; আমাদের দুজনের সম্পর্ক হয়ত একটু বদলেছে, কিন্তু নিকোল্‌স্কয়েতে তাতিয়ানা সেমিওনভ্‌নার কাছে গ্রীষ্মকালে ফিরে গেলেই সবকিছু আবার আগেকার মতো হয়ে যাবে।

এভাবে শীতকালটা আমার অলক্ষিতে কেটে গেল। আগেকার পরিকল্পনা গেল চুলোয়, এমন কি ইস্টার কাটল সেণ্ট পিটার্সবুর্গে। সেণ্ট টিমোথি সপ্তাহের শুরুতে আমরা বিদায়ের জন্যে প্রস্তুত, সব গোছগাছ হয়ে গেছে, বাড়ির জন্যে উপহার কিনেছেন আমার স্বামী, গ্রামের জীবন আরো পরিপাটি করার জন্যে নানা জিনিস ও ফুল কেনা হয়েছে, ওঁর মেজাজটা বিশেষ করে প্রসন্ন ও কোমল, হঠাৎ ওঁর খুড়তুতো বোন এসে অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন যেন আমরা শনিবার পর্যন্ত যাত্রা স্থগিত রাখি। কাউণ্টেস 'র'এর

ওখানে একটা বড়ো পার্টিতে তাহলে যাওয়া যাবে। ভদ্রমহিলা বললেন কাউণ্টেস 'র'এর বিশেষ ইচ্ছে আমি যাই — প্রিন্স 'ম' তখন সেণ্ট পিটার্সবুর্গে, শেষ বলের পর থেকে তিনি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছেন, একমাত্র সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাই পার্টিতে যাবেন; তাঁর মতে সারা রাশিয়ায় আমার মতো রূপসী আর নেই। গোটা সহরটা জড়ো হবে পার্টিতে — এক কথায়, আমার না গেলে চলবে না।

ড্রয়িং-রুমের অন্য দিকে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন আমার স্বামী।

'তাহলে আপনি আসছেন তো, মারি?'* ওঁর খুড়তুতো বোন জিজ্ঞেস করলেন।

'পরশুদিন আমাদের গ্রামে রওনা হবার ইচ্ছে।' অনিশ্চিতভাবে স্বামীর দিকে একবার তাকিয়ে বললাম। দুজনের চোখোচোখি হল, তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়ালেন উনি।

'ওকে থাকতে আমি রাজী করাব,' ভদ্রমহিলা বললেন, 'আর শনিবার ওখানে গিয়ে সবায়ের মাথা ঘুরিয়ে দেব একেবারে। তাই ঠিক তো?'

'আমাদের সব প্ল্যান তাহলে উলটে যাবে, আমরা তো গোছগাছ করে বসে আছি,' জবাবে বললাম, তখনি কিন্তু দোমনা ভাব এসে গেছে।

'আজ রাত্তিরে তাহলে ও গিয়ে প্রিন্সকে সেলাম জানিয়ে আসুক, সেই ভালো,' হলের অন্য প্রান্ত থেকে বললেন আমার স্বামী, চাপা বিরক্তির সে সুর ওঁর গলায় তার আগে শুনি নি কখনো।

---

* এখানে মাশা-র কথা বলা হচ্ছে। সম্বোধনটা এখানে ফরাসী কায়দায় করা হয়েছে। — সম্পাঃ

'হে ভগবান? হিংসে হয়েছে, দেখছি। আগে তো কখনো দেখি নি,' হেসে উঠলেন ওঁর খুড়তুতো বোন। 'কিন্তু শুধু প্রিন্সের জন্যে নয়, আমাদের সবায়ের জন্যে ওকে থেকে যেতে বলছি, সের্গেই মিখাইলভিচ। কাউন্টেস 'র' ওকে বিশেষ করে আসতে বলেছেন।'

'ওর মর্জি',' কঠিন সুরে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন উনি।

দেখলাম উনি অন্যান্য বারের চেয়ে বিচলিত, দেখে ব্যথা পেলাম, কোনো কথা দিলাম না ওঁর খুড়তুতো বোনকে। ভদ্রমহিলা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম ওঁর কাছে। চিন্তান্বিত মুখে উনি পায়চারি করছিলেন, আমার পা টিপে আসার শব্দ কানে গেল না।

ওঁকে দেখে দেখে ভাবলাম, "ওঁর মন এরি মধ্যে চলে গেছে নিকোল্‌স্কয়েতে আমাদের পুরনো প্রিয় বাড়িটাতে; আলো হাওয়ায় দীপ্ত বৈঠকখানায় বসে সকালে সেই কফি খাওয়া, ওঁর সেই ক্ষেত আর চাষী, ড্রয়িং-রুমে সন্ধ্যা কাটানো আর মাঝ রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়া।" ভাবলাম, "না, ওঁর আনন্দ বিহ্বলতা ও মধুর সব সখের জিনিসের জন্যে পৃথিবীর সমস্ত বল-নাচ ছেড়ে দেব, গুচ্ছির প্রিন্সের তোষামোদে কাজ নেই।" পার্টিতে যাব না, যেতে চাই না ওঁকে বলি ভাবলাম; ঠিক সে সময়ে হঠাৎ উনি মুখ তুললেন, দেখতে পেলেন আমাকে। ভ্রূ কুঞ্চিত হল, চলে গেল মুখের সেই কোমল বিষণ্ণ ভাবটা। চাউনিটা অন্তর্ভেদী, বিজ্ঞ, তাতে একটা মুরুব্বী গোছের ধীরস্থির ছাপ। আমার কাছে সহজ সরল মানুষ হতে চান না উনি, হতে চান দেবতা-বিশেষ — চান একটা বেদীর ওপর খাড়া হয়ে থাকতে।

শান্তভাবে আমার দিকে ঘুরে অবহেলা ভরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে, লক্ষ্মী, বলো তো?'

চুপ করে রইলাম। নিজেকে গোপন রাখছেন, যেমনটা ওঁকে দেখতে ভালোবাসি তেমনভাবে ধরা দিতে চান না — বিরক্ত লাগল।

'শনিবার পার্টিতে যেতে চাও?' জিজ্ঞেস করলেন।

'চেয়েছিলাম কিন্তু তোমার ও সব ভালো লাগে না; আর তাছাড়া গোছগাছ হয়ে গেছে,' বললাম।

'মঙ্গলবার পর্যন্ত থেকে যাব; ওদের বলব জিনিসপত্র খুলে ফেলতে, ইচ্ছে হলে তুমি যেতে পারো। তোমার মর্জি। আমি যাব না।' আমার দিকে তাকালেন, এত কঠিনভাবে কখনো তাকান নি, এত কঠিন সুরে আমার সঙ্গে কথা বলেন নি কখনো আগে। উত্তেজিত হলে বরাবর যেমন, তাড়াতাড়ি পায়চারি করতে শুরু করলেন, আমার দিকে আর তাকালেন না।

যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে নড়লাম না, ওঁকে দেখতে দেখতে বললাম, 'তোমাকে সত্যি বোঝা দায়। মুখে তো বল তোমার কখনো অস্থির লাগে না' (কথাটা কখনো বলেন নি উনি)। 'তবে আমার সঙ্গে এমন অদ্ভুতভাবে কথা বলছ কেন? তোমার জন্যে পার্টিতে যাবার সুখটা ত্যাগ করতে আমি রাজী, আর তুমি কিনা আমাকে যেতে জোর করছ — বিদ্রূপের সুরে কথা বলছ, আমার সঙ্গে কখনো এমনভাবে কথা তুমি বল নি।'

'বটে! তুমি... তুমি তো আত্মত্যাগ করছ (কথাটায় বেশ জোর দিলেন), আমিও তাই করছি। এর চেয়ে মধুর আর কী হতে পারে? দিলদরাজ হওয়া নিয়ে প্রতিযোগিতা। আহা কী সুখের সংসার আমাদের, তাই না!'

এ রকম তিক্ত বিদ্রূপ এই প্রথম ওঁর মুখে শুনলাম। বিদ্রূপে আমার লজ্জা হল না — অপমানিত লাগল, ওঁর তিক্ততায় ভয়

পেলাম না, সে তিক্ততা সঞ্চারিত হল আমার মধ্যে। এই মানুষটি কি সত্যি উনি? আমাদের দুজনের সম্পর্কে যাতে কোনো রকম কৃত্রিমতা না আসে তা নিয়ে এত ভাবিত ছিলেন যিনি, যিনি সর্বদাই এত সহজ সরল ও আন্তরিক, সেই তিনি কি এটা বলছেন? আর বলছেন কেন? ওঁর খাতিরে আমার এই সুখটা সত্যি ত্যাগ করতে চাই বলে? সে সুখে কোনো ক্ষতি তো দেখছি না। এক মিনিট আগে এত ভালো করে ওঁকে বুঝতে পেরেছিলাম, ভালোবেসেছিলাম এত তীব্রভাবে, সেজন্যে? দুজনের ভূমিকা বদলে গিয়েছে — এখন উনি সরাসরি সহজ কথা বলতে চান না, বলতে চাইছি আমি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'কত বদলে গিয়েছ তুমি। তোমার কাছে কী অপরাধ করেছি? পার্টিটা আসল ব্যাপার নয় — আমার বিরুদ্ধে তোমার মনে নিশ্চয়ই অন্য কোনো অভিযোগ আছে। কপটতা করে কী হবে? আগে তো সেটাকে তুমি ডরাতে। আমার বিরুদ্ধে তোমার যা বলার আছে খুলে বলো।' ভাবলাম, "এবার একটা কিছু বলতে হবে ওঁকে।" উনি বকতে পারেন এমন কিছু করি নি সারা শীতকাল, ভেবে আমার আত্মপ্রসাদ হল।

ঘরের মাঝখানে গেলাম, যাতে পায়চারির সময় কাছ ঘেঁষে যেতে হয় ওঁকে, তাকালাম ওঁর দিকে। মনে হল কাছে এসে উনি আমাকে জড়িয়ে ধরবেন, ব্যস, তাহলে সব মিটমাট হয়ে যাবে; উনি কত ভুল করেছেন দেখিয়ে দেবার সুযোগ হারাব ভেবে এমন কি দুঃখ হল। কিন্তু উনি ঘরের অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকালেন।

জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কিছু বোঝ নি?'

'না।'

'তাহলে খুলে বলি। জীবনে এই প্রথম আমার একটা বোধ হচ্ছে, বোধটা জানি ঘৃণাকর, কিন্তু বোধ না করে পারছি না...' থামলেন উনি, নিজের কণ্ঠস্বরের রূঢ়তায় স্পষ্টতঃ ভয় পেয়েছেন নিজে।

'তার মানে?' শুধালাম, রাগে চোখে জল এসে গিয়েছে।

'প্রিন্স তোমাকে খাসা চেহারার মেয়ে ভাবেন সেটা ঘৃণাকর, আর সেটা ভাবেন বলে তুমি উতলা হয়ে দৌড়চ্ছ তাঁর কাছে, স্বামীর কথা, নিজের কথা, নারী হিসেবে নিজের মর্যাদা কিছু তোমার মনে নেই, সেটা ঘৃণাকর: তোমার আত্মমর্যাদা না থাকলে তোমাকে নিয়ে স্বামীর মনের অবস্থাটা বোঝ না, সেটা ঘৃণাকর। বোঝা দূরের কথা, তুমি এসে আমাকে বললে কিনা ত্যাগ স্বীকার করছ, অর্থাৎ 'হুজুরকে নিজের রূপটা দেখাতে পারলে বেজায় খুশি হতাম, কিন্তু তোমার খাতিরে সে সুখটা ত্যাগ করছি'।'

যত বলছেন তত নিজের কণ্ঠস্বরে বাড়ছে ওঁর ক্রোধ, আর সে কণ্ঠস্বর বিষাক্ত নিষ্ঠুর কর্কশ। এ রকম অবস্থায় আগে কখনো দেখি নি ওঁকে, দেখবার প্রত্যাশা কখনো করি নি। আমার মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল। ভয় পেলাম বটে, কিন্তু অন্যায় অবমাননা ও লাঞ্ছিত গর্বের একটা অনুভূতি আচ্ছন্ন করল আমাকে, শোধ তুলতে চাইলাম ওঁর ওপর।

'এ রকমটা হবে অনেকদিন জানতাম,' বললাম। 'বলো, বলে যাও।'

'তুমি কী জানতে আমি জানি না,' উনি বলে চললেন। 'এই নির্বোধ সমাজের যত নোংরামি, আলস্য আর বিলাসের মধ্যে তোমাকে দিনের পর দিন দেখে সবচেয়ে খারাপটা ঘটবে আমার ধরে নেওয়া উচিত ছিল, আর এখন সেটা ঘটেছে। এতদিন কোনো বাধা দিই নি, কিন্তু আজকের মতো অপমানিত ও আহত আর কখনো

বোধ করি নি; আহত হয়েছিলাম তখন যখন তোমার বান্ধবী ইতরভাবে ঈর্ষার কথা বলতে শুরু করলেন — আমার ঈর্ষার কথা — আর সেটা কাকে নিয়ে? এমন একটা লোককে নিয়ে যাকে আমি চিনি না, তুমি চেন না। আর তুমি ইচ্ছে করে আমাকে বোঝ না, আমার জন্যে আত্মত্যাগ করতে চাও তুমি — আর কী করে?.. তোমার জন্যে লজ্জা হয়, যেভাবে নিজেকে খেলো করছ তাতে লজ্জা হয়। আত্মত্যাগ বটে!' কথাটার পুনরুক্তি করলেন উনি।

"স্বামীর অধিকার তাহলে এই!" আমি ভাবলাম। "যে মেয়ে কোনো দোষ করে নি তাকে অপমান করা, তাকে খেলো করা! এই হল স্বামীর অধিকার। কিন্তু আমি সইব না সেটা!"

বললাম, 'না, তোমার জন্যে কিছু ত্যাগ করব না,' টের পেলাম নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হল অস্বাভাবিকভাবে, ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখ। 'শনিবার পার্টিতে যাব — যাবই যাব।'

'প্রাণ খুলে উপভোগ করে নিও, কিন্তু তোমার আমার মধ্যে এই শেষ,' ক্রোধের অসংযত আবেগে চেঁচিয়ে উঠলেন উনি! 'তুমি আমাকে আর যন্ত্রণা দিতে পারবে না। আমি নির্বোধের মতো এতদিন...' আবার বলতে শুরু করলেন, কিন্তু ওঁর ঠোঁট কাঁপতে লাগল, যা বলতে চেয়েছিলেন সেটা শেষ করলেন না, নিজেকে স্পষ্টতঃ অনেক চেষ্টা করে সামলালেন।

সে মুহূর্তটিতে ওঁকে ভয় পেলাম, ঘৃণা করলাম। ওঁর নানা অপমানের শোধ তোলার জন্যে অনেক কিছু বলার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু মুখ খুললে কেঁদে ফেলতাম, তাতে ওঁর চোখে হেয় হয়ে যেতাম। কোনো কথা না বলে ঘর থেকে চলে গেলাম। কিন্তু যেই ওঁর পদধ্বনি আর কানে এল না, আমাদের মধ্যে যা ঘটেছে তার

জন্যে ভয়ার্ত লাগল। আমার সমস্ত সুখের ডোর যদি চিরকালের জন্যে ছিন্ন হয়ে যায়, ভেবে ভীষণ শঙ্কিত হলাম। মনে হল ফিরে যাই ওঁর কাছে। "কিন্তু ওঁর কাছে গিয়ে নিঃশব্দে যদি হাত বাড়িয়ে দিই, চোখে চোখ রাখি, তাহলে উনি কি শান্ত হয়ে গিয়ে আমাকে বুঝবেন? বুঝতে পারবেন আমার উদারতা? আমার দুঃখকে ভন্ডামি যদি বলেন? কিম্বা উনি নিজে ঠিক, এই বিশ্বাসে আমার অনুশোচনাকে গ্রহণ করেন, যেন অনুগ্রহ করছেন এমন গর্বিতভাবে আমাকে মাপ করেন? যাঁকে এত ভালোবাসি সেই মানুষ কী করে এমন নিষ্ঠুর অপমান আমাকে করতে পারলেন?..'

ওঁর কাছে গেলাম না। নিজের ঘরে গিয়ে একলা অনেকক্ষণ কাঁদলাম। আমাদের মধ্যে যা কথাবার্তা হয়েছে তার প্রতিটি শব্দ আবার মনে করলাম গভীর বিভীষিকায়, সে সব কথার বদলে বসালাম, যোগ করলাম অন্যান্য শব্দ, ভালো ভালো সব কথা — আবার যা ঘটেছিল তা বিভীষিকায়, অপমানে মনে ফিরে এল। সেদিন সন্ধ্যায় ঘর ছেড়ে যখন চা খেতে গেলাম তখন 'স'এর উপস্থিতিতে স্বামীর সঙ্গে দেখা হল, 'স' আমাদের কাছে এসেছিলেন; মনে হল আজ থেকে আমাদের দুজনের মধ্যে বিস্তীর্ণ ব্যবধান এসেছে। কবে যাচ্ছি 'স' জিজ্ঞেস করলেন আমাকে।

'মঙ্গলবার,' আমাকে উত্তর দেবার সময় না দিয়ে বলে উঠলেন আমার স্বামী। 'আমরা কাউন্টেস 'র'এর পার্টিতে যাচ্ছি। তুমি যাচ্ছ তো?' আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন।

ওঁর বলার ধরনটা এত নিরাসক্ত যে ভয় পেয়ে ওঁর দিকে ভীরু দৃষ্টিতে তাকালাম। ওঁর দৃষ্টি আমার মুখে নিবদ্ধ, চাউনিটা ক্রুদ্ধ, বিদ্রূপে ভরা, গলাটা অবিচলিত, কঠিন।

'হ্যাঁ,' বললাম জবাবে।

সন্ধ্যেবেলায় আমরা দুজন যখন একলা, উনি আমার কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

'তোমাকে যা বলেছি তা ভুলে যেও,' বললেন অস্ফুট কণ্ঠে।

হাতটা হাতে নিলাম। ঠোঁটে এল থরথর মৃদু হাসি, চোখ ছাপিয়ে জল আসছে, কিন্তু হাতটা টেনে নিলেন উনি, যেন ভাবের আতিশয্যে ওঁর আতঙ্ক; বেশ দূরের একটা কেদারায় বসে পড়লেন। তাহলে উনি যা করেছেন এখনো ঠিক বলে ভাবেন? পার্টি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা, ওখানে না যাবার অনুরোধটা মুখে এসেছিল, সেটা আর বলা হল না।

'যাওয়া পিছিয়ে দিয়েছি মাকে লিখতে হবে, না হলে উনি উদ্বিগ্ন বোধ করবেন,' উনি বললেন।

'কবে যাব ভাবছ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'মঙ্গলবার, পার্টির পর।'

'সেটা আশা করি আমার খাতিরে করছ না,' ওঁর চোখে চোখ রেখে বললাম, কিন্তু উনি শুধু তাকালেন, সে চোখে কোনো জবাব নেই, যেন একটা পর্দায় ঢাকা পড়েছে ওঁর চোখ। হঠাৎ ওঁর মুখটা বুড়োটে, অপ্রীতিকর মনে হল।

পার্টিতে গেলাম দুজন, দুজনের সম্পর্কটা আবার যেন হৃদ্য, কিন্তু আগেকার থেকে একেবারে আলাদা।

পার্টিতে দুজন মহিলার মাঝখানটায় বসে আছি, প্রিন্স এলেন, তাই কথা বলার জন্যে উঠে দাঁড়াতে হল। দাঁড়িয়ে কিছু না ভেবেই আমার স্বামীর দিকে চোখ গেল, দেখলাম হলের অন্য প্রান্ত থেকে আমার দিকে একবার তাকিয়ে উনি ঘুরে দাঁড়ালেন। হঠাৎ ভীষণ লজ্জা আর ব্যথা পেলাম, ভয়ানক বিব্রত লাগল, প্রিন্সের চোখের সামনে আমার মুখ আর গলা আরক্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু তাঁর কথা শুনতেই হল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, মাথার লম্বা প্রিন্স, তাঁর দিকে ঘাড় উঁচু করে কথা শুনতে হল। কথাবার্তা বেশীক্ষণ হয় নি অবশ্য; আমার পাশে বসার জায়গা ছিল না, তাছাড়া তাঁর সান্নিধ্যে আমার অস্বস্তিটা হয়ত তিনি টের পেয়েছিলেন। কথা হল আগের বলের সম্বন্ধে, গ্রীষ্মকালে আমি কোথায় থাকি, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে উনি জানালেন যে আমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করতে চান, দেখলাম হলের ওদিকে দুজনের দেখা হল, দুজনে কথা বলছেন। আমার সম্বন্ধে নিশ্চয় কিছু বলে থাকবেন প্রিন্স, কেননা কথাবার্তার মধ্যে আমার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে একবার হাসলেন তিনি।

হঠাৎ আমার স্বামী লাল হয়ে উঠলেন, নিচু হয়ে অভিবাদন জানিয়ে প্রিন্সের কাছ থেকে চলে গেলেন। আমারো মুখ লাল হয়ে উঠল; আমার বিষয়ে, বিশেষ করে আমার স্বামীর বিষয়ে কী ধারণা হল প্রিন্সের ভেবে লজ্জা পেলাম। মনে হল প্রিন্সের সঙ্গে আলাপের সময় আমার অস্বস্তি আর লজ্জা-লজ্জা ভাবটা, আর আমার স্বামীর বিচিত্র ব্যবহার সবাই লক্ষ্য করেছে। ভগবান জানেন, কারণটা কী করে বুঝবে ওরা। স্বামীর সঙ্গে আমার কী কথা হয়েছিল ওরা কি জানে?

ওঁর খুড়তুতো বোন বাড়ি পৌঁছিয়ে দিলেন আমাকে, পথে ওঁর বিষয়ে দুজনের মধ্যে কথা হল। পারলাম না নিজেকে আর চেপে রাখতে, এই অলক্ষুণে পার্টিটা নিয়ে ওঁর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল, সব বলে দিলাম। আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বললেন মনোমালিন্যটা অতি সাধারণ একটা ব্যাপার, কোন চিহ্ন রেখে যাবে না। আমার স্বামীর স্বভাব তিনি যেমনটা বুঝেছিলেন তেমনভাবে ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর মতে, উনি ভয়ানক দাম্ভিক আর অমিশুক হয়ে

উঠেছেন। আমিও সায় দিলাম, মনে হল ওঁকে আরো ভালো করে, নিরাসক্তভাবে নিজে বুঝতে শুরু করেছি।

কিন্তু যখন শুধু উনি আর আমি, আর কেউ নেই, তখন ওঁর বিষয়ে আমার এই বিচার বিবেকে পাপের বোঝার মতো হয়ে রইল, অনুভব করলাম দুজনের মধ্যেকার ব্যবধান আরো বেড়ে গিয়েছে।

৮

সেদিন থেকে আমাদের জীবনে, আমাদের দুজনের সম্পর্কে সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটল। পরস্পরের সান্নিধ্যে আগেকার সেই প্রীতি আর নেই। অনেক বিষয়ে কথা এড়িয়ে চলতাম দুজনে, তৃতীয় কেউ থাকলে কথাবার্তাটা সহজতর হত, দুজনে থাকলে নয়। গ্রামের জীবন বা বল-নাচের বিষয়ে কথা উঠলেই মনে হত ক্ষুদে ক্ষুদে শয়তান উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে, চোখে চোখ পড়াটা তখন অস্বস্তিকর। দুজনের মধ্যেকার ব্যবধানটা কোথায় জানতে দুজনের যেন বাকি নেই, সেটার কাছে আসতে ভয়। উনি যে দাম্ভিক, রগচটা তাতে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না, যাতে না চটেন সাবধানে থাকতে হবে। আর উনি নিঃসন্দেহ যে উঁচু সমাজ বাদ দিয়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব, গ্রামের জীবনে আমার অরুচি, তাই আমার নিচু রুচি মানিয়ে চলতে হবে ওঁকে। তাই এ সব বিষয়ে মনের কথা খুলে বলতে দুজনেই এড়িয়ে চলতাম, পরস্পরকে নিয়ে মিথ্যা বিচার চলত। পৃথিবীতে আমাদের মতো নিখুঁত লোক আর নেই, বহুদিনই সে ভাবটা কেটে গেছে। অন্যদের সঙ্গে পরস্পরের তুলনা করি, গোপনে বিচার করি পরস্পরকে। সেণ্ট পিটার্সবুর্গ ছাড়ার

আগে অসুস্থ হয়ে পড়লাম আমি; নিকোল্‌স্কয়েতে না গিয়ে সহরের বাইরে একটি বাড়ি ভাড়া নেওয়া হল। সেখান থেকে আমার স্বামী একা মায়ের কাছে চলে গেলেন। যখন গেলেন তখন ওঁর সঙ্গে যাবার মতো শরীর ভালো হয়েছিল, কিন্তু উনি আমাকে বলে কয়ে রেখে গেলেন, যেন আমার শরীর নিয়ে উনি চিন্তিত। মনে হল আমার শরীর নিয়ে চিন্তাটা নয়, উনি ভেবেছিলেন গ্রামে আমাদের ঠিক সুবিধে হবে না; বেশী জোর করলাম না, রয়ে গেলাম। উনি নেই, একলা লাগত, জীবনটা ফাঁকা-ফাঁকা, কিন্তু উনি যখন ফিরে এলেন অবাক হয়ে দেখলাম ফিরে-আসাটায় আমার জীবনে আগেকার মতো কোনো পরিবর্তন এল না। তখনকার দিনগুলিতে কোন ভাব বা ধারণায় ওঁকে ভাগ না দিলে মন-মরা হয়ে যেতাম, যেন অপরাধ করেছি; ওঁর প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কথা মনে হত সমগ্র সুন্দর, চোখে চোখ রাখলে হাসিতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত দুজনার, সেই সব দিন আর নেই। আমাদের সম্পর্কটা এত অলক্ষিতে বদলে গেল যে তার অন্তর্ধানটা কেউ টের পেলাম না। আমাদের দুজনের আলাদা আলাদা আগ্রহ আর ঝোঁক দেখা দিল, বিনিময়ের চেষ্টা আর নেই। দুজনের পৃথিবী একেবারে আলাদা, সম্পর্করহিত, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামালাম না। অবস্থাটা গা-সওয়া হয়ে গেল, বছরখানেকের মধ্যে বিনা কুণ্ঠায় তাকাতে পারতাম পরস্পরের দিকে। আমার সান্নিধ্যে ওঁর সেই উচ্ছল ফূর্তি আর রইল না, রইল না সেই ছেলেমানুষি, সবকিছু মেনে নেবার সেই মনোভাব, সেই ঔদাসীন্য যেটা এককালে আমার অত্যন্ত বিরক্তিকর ঠেকত। আমাকে বিব্রত ও খুশি-করা ওঁর সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টিক্ষেপ আর নেই। দুজনে একসঙ্গে প্রার্থনা আর করি না, বুনো উচ্ছ্বাসের সে আক্ষেপ আর নেই; দুজনের দেখা হত খুব কম, কাজে

প্রায় চলে যেতেন উনি, আমাকে একলা রেখে যেতে ওঁর কোনো দুঃখ বা ভয় নেই। আমি উচ্চ সমাজে বারবার যেতাম, সেখানে ওঁকে আমার দরকার নেই।

দুজনের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি মনোমালিন্য আর হয় না। ওঁকে খুশি করার চেষ্টা করতাম, আমার সব ইচ্ছে পূরণ করতেন উনি; মনে হত দুজনে দুজনকে ভালোবাসি।

দুজনে যখন একলা, তেমনটা ঘটত কম, তখন আনন্দ, বিক্ষোভ বা বিভ্রমের কোনো অনুভূতি আমার হত না; যেন আমি নিজে শুধু আছি, উনি নেই। উনি যে আমার স্বামী, অচেনা লোক নন, উনি যে ভালো লোক, নিজের মতো করে চিনি ওঁকে, সেটা বিলক্ষণ জানতাম। উনি কী করবেন বা বলবেন, কী করে আমার দিকে চাইবেন, সব আমার জানা, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। যদি অন্য কিছু একটা করতেন, অন্যভাবে তাকাতেন আমার দিকে, আমি যেভাবে ভেবেছিলাম তেমন করে নয়, মনে হত উনি একটা ভুল করেছেন। ওঁর কাছ থেকে কিছুই আশা করতাম না। এক কথায়, উনি আমার স্বামী, আর কিছু নন। ভাবতাম এ রকমটা হওয়াই তো উচিত, স্বামীস্ত্রীরা সর্বদাই এ রকম, আমাদের দুজনের সম্পর্ক বরাবর এ রকমটাই ছিল। উনি চলে গেলে বিশেষ করে প্রথমে নিঃসঙ্গ লাগত, ভয় পেতাম, তখন ওঁর সাহায্যের দরকারটা বেশী করে বোধ করতাম। ফিরে এলে মহাখুশি হয়ে জড়িয়ে ধরতাম ওঁকে, কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক বাদে খুশির কথাটা মনে থাকত না একেবারে, ওঁর সঙ্গে কথা বলার মতো কিছু থাকত না। শুধু অনুরাগের শান্ত সংযত মুহূর্তগুলিতে মনে হত কী যেন বেঠিক হয়ে গিয়েছে; বুকটা ভারি হয়ে উঠত, মনে হত ওঁর দৃষ্টি একই কথা বলছে। জানতাম আমাদের অনুরাগের একটা

সীমা আছে, সেটা উনি ছাড়িয়ে যেতে চান না, আর আমি পারি না। মাঝে মাঝে সেজন্যে মনটা মুষড়ে যেত, কিন্তু ও নিয়ে ভাবার সময় কোথায়; পরিবর্তন যে ঘটেছে সেই উপলব্ধির বিষণ্ণতা ভুলে যেতে চেষ্টা করতাম আমোদপ্রমোদে, আমোদপ্রমোদের দুয়ার তো অবারিত। উচ্চ সমাজের চাকচিক্য আর তোষামোদ প্রথমে আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল, বেশীদিন যেতে না যেতে সে সমাজ আচ্ছন্ন করে দিল আমাকে, আভ্যাসিক হয়ে দাঁড়াল। দৃঢ় নিগড়ে আমাকে বাঁধল সে সমাজ, জুড়ে বসল আমার অন্তরে, যে অন্তর আবেগের জন্যে উন্মুখ ছিল এককালে। একা নিজে কখনো থাকতাম না, নিজের অবস্থার কথা ভাবতে সাহস হত না। সকালে দেরী করে উঠে অনেক রাত্তির পর্যন্ত সর্বক্ষণ ব্যস্ত, সে সময় আমার নিজের নয়, বাড়ির বাইরে না গেলেও তাই। এ সবে না পেতাম মজা, না লাগত একঘেয়ে। ধরে নিয়েছিলাম এই ঠিক, সারা জীবন এভাবে কাটানো ছাড়া গত্যন্তর নেই।

তিন বছর কেটে গেল, আমাদের সম্পর্কে কোনো পরিবর্তন এল না। যেন ছাঁচে বাঁধা, জমে গিয়েছে, সে সম্পর্ক খারাপ হতে পারে না, ভালো হতে পারে না। এই তিন বছরের মধ্যে আমাদের সংসারে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল, কিন্তু তাতে আমার জীবনে কোনো অদলবদল এল না। ঘটনা দুটি হল আমার প্রথম সন্তানের জন্ম ও তাতিয়ানা সেমিওনভ্‌নার মৃত্যু। মায়ের ভালোবাসা প্রথমে আমাকে এমনভাবে পেয়ে বসল, আনল এমন অপ্রত্যাশিত আনন্দের উচ্ছ্বাস যে ভাবলাম নতুন জীবন শুরু হবে। দু মাসের মধ্যে আবার উচ্চ সমাজে যাতায়াত শুরু হল, তখন অনুভূতিটা ফিকে হয়ে এল, শেষে দাঁড়াল অভ্যাসে, নিছক কর্তব্য সম্পাদনে। আমার ছেলে হবার পর স্বামী কিন্তু আগেকার মতো শান্ত, তৃপ্ত ঘরকুনো হয়ে

পড়লেন, ওঁর আগেকার স্নেহ আর আনন্দের লক্ষ্যবস্তু হল বাচ্ছাটি। *বল-গাউন গায়ে বাচ্ছার ঘরে গিয়েছি ক্রুশ-চিহ্ন করার জন্যে, প্রায় দেখতাম আমার স্বামী সেখানে বসে আছেন, যেভাবে তাকাতেন* আমার দিকে মনে হত তাতে ভর্ৎসনার, কঠিন জিজ্ঞাসার একটা ছাপ, আর লজ্জা হত। ছেলের প্রতি আমার উদাসীনতায় হঠাৎ বিবেকটা মুচড়ে উঠত, শুধাতাম নিজেকে, "আমি তাহলে সত্যি সত্যি অন্য মেয়েদের চেয়ে খারাপ? কিন্তু কী আর করা যায়? ছেলেকে ভালোবাসি কিন্তু তা বলে তো সারাদিন ওর পাশে বসে কাটাতে পারি না — একঘেয়ে লাগবে। তাছাড়া, ভান আমি করব না, কিছুতেই করব না।" মায়ের মৃত্যুতে উনি ভয়ানক শোক পেয়েছিলেন। বললেন মা নেই, নিকোল্‌স্কয়েতে থাকা ওঁর পক্ষে এখন কঠিন। আমার কিন্তু মা নেই বলে গ্রামের জীবনযাত্রা আরো প্রীতিকর, আরো শান্তিপূর্ণ মনে হল, অবশ্য তাঁর মৃত্যুতে দুঃখ হয়েছিল, স্বামীর শোকে মায়া হত। সেই তিন বছরের বেশীর ভাগ সময়টা সহরে কাটল। একবার দু মাসের জন্যে দেশে গিয়েছিলাম, তৃতীয় বছরে গেলাম বিদেশে।

গ্রীষ্ম কাটল একটা স্পা-তে।

আমার বয়স তখন একুশ। মনে হল আমাদের অবস্থা অত্যন্ত চমৎকার। পারিবারিক জীবন থেকে যতটা পাই তার বেশী আমার চাই না। মনে হল আমার চেনা-পরিচিতরা সবাই আমাকে ভালোবাসে; শরীরস্বাস্থ্য ঠিক; স্পা-তে আমার চেয়ে ভালো সাজ কারুর নেই; নিজের চেহারাটা ভালো জানি; আবহাওয়া চমৎকার, চারিদিকে সৌন্দর্য আর সৌষ্ঠবের আমেজ; নিজেকে খুব উপভোগ করছিলাম। নিকোল্‌স্কয়েতে এককালে আমার মনে যেমন আনন্দ ছিল তেমনটি আর নেই; তখন নিজে যা শুধু তাই হতে পেরে সুখী লাগত,

মনে হত সুখে আমার অধিকার, সুখ যতখানি হোক না কেন, আরো বেশী হওয়া উচিত; সুখ, আরো সুখের জন্যে উতলা ছিলাম তখন। তখন ছিল অন্য রকম, কিন্তু এখনও বেশ। কিছু চাই না আমার, প্রত্যাশা করি না কিছুর, ভয় নেই কোনো, জীবনটা মনে হল ভরাট, বিবেকে শান্তি। সে মরশুমটায় নবীনদের ভিড়ে বিশেষ করে চোখে পড়তে পারে এমন কাউকে দেখলাম না, এমন কি আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী আমাদের রাষ্ট্রদূত সেই প্রবীণ প্রিন্স 'ক'ও নয়। কারুর বয়স কম, কারুর বা বেশী; একজন সোনালি-চুল ইংরেজ, আর একজন ফরাসী, ছোট্ট দাড়ি তাঁর। তাঁরা সবাই আমার কাছে সমান আর সবাইকে আমার দরকার। সবায়ের এক ধরনের নির্বিকার ভাব, আমার জীবনযাত্রায় আনন্দের উপাদান জোগাত তাঁরা। শুধু একজন আমাকে অন্যদের তুলনায় বেশী আকর্ষণ করতেন, অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে আমার প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ করতেন বলে। তিনি হলেন মার্কিস 'দ', ইতালীয়। নাচছি বা ঘোড়ায় চেপে বেরিয়েছি, হয়ত বা কাসিনোয় গিয়েছি, তিনি আমার সঙ্গ পাবার আর আমার চেহারাটা যে কত ভালো জানাবার কোনো সুযোগ হারাতেন না। জানলা থেকে কয়েকবার দেখেছি আমাদের বাড়ির সামনেটায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, চকচকে চোখের অপ্রীতিকর একাগ্র চাউনিটায় রক্তিম হয়ে উঠে মুখ ঘুরিয়ে নিতাম। ভদ্রলোকের বয়স কম, চেহারাটা ভালো, বেশ সুষ্ঠু লোক, কিন্তু সবচেয়ে বড়ো জিনিস হল, তাঁর হাসি আর কপাল আমার স্বামীর কথা মনে করিয়ে দিত। তাঁর চেয়ে সুন্দর বটে, তবু সাদৃশ্যটা অবাক করে দিয়েছিল আমাকে, যদিও আমার স্বামীর সহৃদয় ধীরস্থির মধুর মুখভাবের জায়গায় ভদ্রলোকের চেহারায় ঠোঁট, চাউনি, লম্বাটে চিবুক, সব মিলিয়ে স্থূল ও পাশবিক কিছু একটা ছিল। তখন

বিশ্বাস হয়েছিল তিনি আমাকে গভীর আবেগে ভালোবাসেন, সেটা টের পেয়ে জাঁক আর অনুকম্পার সঙ্গে মাঝে মাঝে ভাবতাম তাঁর কথা।

সান্ত্বনা দিয়ে বুঝিয়েসুঝিয়ে আধা-বন্ধুত্বের একটা সংযত মনোভাবের অবস্থায় তাঁকে আনতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু যতবার সে চেষ্টা করেছি ততবার আমাকে ব্যাহত করে নিজের অব্যক্ত আবেগে বিশ্রীভাবে বিব্রত করে দিতেন, — সে কামনা যে কোন মুহূর্তে তাঁর মুখ ফুটে বেরিয়ে আসার জন্যে উদ্‌গ্রীব। মনে মনে ভয় করতাম মানুষটিকে, অবশ্য সেটা নিজের কাছে মানতাম না, তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রায়ই ভাবতাম তাঁর কথা। তাঁর সঙ্গে আমার স্বামীর পরিচয় ছিল, চেনা-পরিচিতদের মধ্যে তাঁর সঙ্গে ওঁর ব্যবহারটা ছিল বিশেষ করে উদাসীন ও উদ্ধত; চেনা-পরিচিতরা অবশ্য ওঁকে দেখত শুধু আমার স্বামী হিসেবে। মরশুমের শেষের দিকে আমার অসুখ হল, বাড়িতে বন্দী রইলাম দু সপ্তাহ। সেরে ওঠার পর সন্ধ্যায় প্রথম বার একটি সঙ্গীতের আসরে গিয়েছি, শুনলাম লেডি 'স' এসেছেন; এই নামজাদা সুন্দরীটির আসার অপেক্ষায় সবাই ছিল বহুদিন। আমাকে অনেকে ঘিরে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাল, কিন্তু আরো বড়ো একটি দলের কেন্দ্র হলেন নতুন রূপসীটি, আশেপাশের সবায়ের মুখে তাঁর রূপের কথা ছাড়া আর কিছু নেই। তাঁকে দেখিয়ে দিল আমাকে, দেখলাম সত্যি সত্যি তিনি মোহিনী, কিন্তু তাঁর আত্মপ্রসাদের ভাবটা আমার অপ্রীতিকর মনে হল, বললামও তাই। সেদিন সন্ধ্যায় সবকিছু একঘেয়ে ঠেকল, যে সবকিছু আগে ছিল ফূর্তিতে ভরা। পরদিন দুর্গ-প্রাসাদে যাবার আয়োজন করলেন লেডি 'স', আমি যেতে রাজী হলাম না। বলতে গেলে কেউই আমার সঙ্গে থেকে গেল না, আমার

চোখে সবকিছুর চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেল। সবকিছু, সবাইকে মনে হল বোকা-বোকা, বিরক্তিকর। মনে হল কাঁদি, চিকিৎসা তাড়াতাড়ি শেষ করে দেশে ফিরে যাই। অন্তরে একটা অপ্রীতিকর অনুভূতি, অবশ্য নিজের কাছে সেটা তখনো স্বীকার করলাম না। দুর্বল শরীরের দোহাই দিয়ে উচ্চ সমাজে যাওয়া ছেড়ে দিলাম; শুধু সকালে মাঝে মাঝে যেতাম খনিজ জল খেতে কিম্বা হয়ত আমার পরিচিত একটি রুশী মহিলা, 'ল. ম.'র সাথে গাড়ি চেপে আশেপাশের গ্রামে বেড়াতাম। আমার স্বামী তখন হাইদেলবের্গে গিয়েছেন কয়েক দিনের জন্যে; আমার চিকিৎসার শেষে রাশিয়ায় ফিরে যাবার অপেক্ষায় ছিলেন। উনি মাঝে মাঝে আমাকে দেখতে আসতেন।

একদিন লেডি 'স' সবাইকে নিয়ে গেলেন শিকারে, দুপুরের খাবারের পর 'ল. ম.' আর আমি গাড়ি চেপে গেলাম দুর্গ-প্রাসাদে। আস্তে আস্তে গাড়ি চলেছে। সড়কটা প্রাচীন চেস্টনাট গাছের মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে, এঁকেবেঁকে, অস্তরবির আলোয় দীপ্ত, বাদেনের আশেপাশের সুন্দর মাঠঘাটের আভাস গাছের ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ছে।

দুজনের মধ্যে সিরিয়াস কথাবার্তা শুরু হল, এ রকম কথা-বার্তা আগে তাঁর সঙ্গে কখনো হয় নি। 'ল. ম.'র সঙ্গে আমার আলাপ অনেক দিনের, কিন্তু এই প্রথম বুঝলাম যে তিনি এত সদয় ও বুদ্ধিমতী, মনের কথা খুলে বলা যায় তাঁকে, বন্ধু হিসেবে তাঁকে পাওয়াটা প্রীতিকর। পরিবার, ছেলেপুলে আর এখানকার অর্বাচীন জীবনযাত্রা নিয়ে গল্প হল। দুজনের ইচ্ছে রাশিয়ায় ফিরে গেলে হয়, ফিরে গেলে হয় সেখানকার গ্রামে; এল মধুর বিষণ্ণ একটা ভাব, দুর্গ-প্রাসাদে যখন ঢুকলাম তখনো সে গম্ভীর

ভাবটা যায় নি। ভেতরটা ঠাণ্ডা, ছায়াঘন; ওপরে যেখানে ধ্বংসাবশেষে রোদের খেলা সেখান থেকে আসছে কাদের যেন পায়ের আর গলার আওয়াজ। দরজায় যেন ফ্রেমে বাঁধা পড়েছে বাদেনের প্রাকৃতিক দৃশ্য — দেখতে সুন্দর, তবে আমাদের কাছে, রুশীর পক্ষে ঠাণ্ডা। জিরোতে বসলাম দুজনে, নিঃশব্দে চেয়ে রইলাম অস্তরবির দিকে। গলার আওয়াজ আরো স্পষ্ট হয়ে এল, মনে হল কে যেন আমার নাম উচ্চারণ করছে। কান পেতে শুনলাম, প্রতিটি কথা কানে এল। লোকগুলির গলা আমার চেনা: মার্কিস 'দ' ও তাঁর একটি ফরাসী বন্ধু, তাঁকে আমিও চিনি। আমার ও লেডি 'স'র বিষয়ে আলাপ চলেছে। ফরাসীটি আমাদের দুজনের তুলনা চালিয়েছেন, কোন ধাঁচের রূপ আমাদের তাঁর বিশ্লেষণ চলেছে। খারাপ কিছু তিনি বললেন না, কিন্তু তাঁর কথা শুনে আমার মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল। আমার ও লেডি 'স'র চেহারার নানা গুণের বিচার খুঁটিয়ে ফরাসীটি করলেন: আমার বাচ্চা আছে, কিন্তু লেডি 'স'র বয়স মাত্র উনিশ; আমার খোঁপা তাঁর তুলনায় ভালো, কিন্তু লেডি 'স'র গঠন আরো লাবণ্যময়; লেডি 'স'র খানদানি আছে আর 'আপনার বন্ধু এই একরকম — অনেক ক্ষুদে রুশী প্রিন্সেস এখানে প্রায়ই আসতে শুরু করেছেন, তাঁদের একজন', লেডি 'স'র সঙ্গে তাল ঠোকার চেষ্টা না করে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছি, বাদেনে আমার বারোটা বেজে গেছে, এই বলে ফরাসীটি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

'ওর জন্যে দুঃখ হয়।' কঠোর ও ফূর্তির হাসি হেসে ফরাসীটি যোগ করলেন, 'শুধু আপনার কাছেই সান্ত্বনা যদি খুঁজত ও!'

'ও এখান থেকে চলে গেলে পিছু পিছু আমি যাব,' ইতালীয় উচ্চারণভঙ্গীতে অমার্জিত একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'সুখী মানুষ বটে! এখনো প্রেমের ক্ষমতা ধরেন!' হেসে বললেন ফরাসী ভদ্রলোকটি।

'প্রেম!' বলে থেমে গেল সেই কণ্ঠস্বর। 'ভালো না বেসে পারি না। জীবনের উদ্দেশ্য তো তাই: জীবনকে রোমান্সে পরিণত করার মতো ভালো কাজ আর কী আছে। আর আমার রোমান্স মাঝপথে কখনো থেকে যায় না। হালের রোমান্সটির জের শেষ পর্যন্ত টানব।'

'Bonne chance, mon ami,'* বললেন ফরাসী ভদ্রলোকটি।

আর কিছু শোনা গেল না, কোণ ঘুরে ওঁরা চলে গেলেন, অন্যদিক থেকে এল ওঁদের পায়ের শব্দ। সিঁড়ি দিয়ে নেমে মিনিট কয়েকের মধ্যে পাশের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন, আমাদের দেখে অত্যন্ত অবাক। মার্কিস 'দ' আমার কাছে আসাতে আরক্ত হয়ে উঠলাম, দুর্গ-প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আমার হাত ধরাতে অত্যন্ত খারাপ লাগল। কিন্তু না বলতে পারলাম না, মার্কিসের বন্ধু ও 'ল. ম.'র পিছন পিছন দুজনে চললাম গাড়ির দিকে। ফরাসীটির কথায় খুব চটেছিলাম, যদিও মনে মনে নিজে যা অনুভব করতাম সেটাই বলেছিলেন উনি। কিন্তু আমাকে অবাক আর ক্রুদ্ধ করেছিল মার্কিসের অমার্জিত বলার ধরনটা। ওঁর কথা শুনে ফেলেছি তবু মার্কিসের কোনো ভয় নেই, এটা ভেবে অস্বস্তি হচ্ছিল। আমার এত কাছে তিনি থাকাতে ঘৃণায় মনটা ভরে গেল। তাকালাম না তাঁর দিকে, কথার জবাব দিলাম না, হাতটা এমনভাবে ধরলাম যাতে চাপ না পড়ে, তাড়াতাড়ি চললাম 'ল. ম.' আর ফরাসীর

* ভাগ্য প্রসন্ন হোক আপনার, বন্ধুবর (ফরাসী ভাষায়)।

পিছন পিছন। অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য, আমার সঙ্গে দেখা হওয়াতে তাঁর অপ্রত্যাশিত আনন্দ, এ ধরনের কী সব বলছিলেন মার্কিস, কিন্তু তাতে কান দিলাম না। মনে হচ্ছিল স্বামীর কথা, ছেলের কথা, রাশিয়ার কথা। নিজেকে নিয়ে আমার লজ্জা, কীসের অনুশোচনা, কী যেন আমার চাই, তাড়াতাড়ি Hôtel de Bade'এ আমার ছোট্ট ঘরে ফিরে একলা বসে অব্যাহতভাবে মনের কথা সবকিছু ভেবেচিন্তে দেখার তাড়া আমার। কিন্তু 'ল. ম.' হাঁটছেন আস্তে আস্তে, গাড়ি তখনো বেশ দূর, আর আমার সঙ্গী মনে হল ইচ্ছে করে আস্তে চলেছেন, যেন আমাকে আটকিয়ে রাখতে চান। "তা হতে পারে না!" এই ভেবে আরো দ্রুত চললাম। কিন্তু তিনি সত্যি সত্যি আমাকে বাধা দিলেন, এমন কি আমার হাতে চাপ দিলেন পর্যন্ত। 'ল. ম.' রাস্তার একটা বাঁক ঘোরাতে আমরা দুজনে একলা হয়ে পড়লাম। ভয় পেলাম আমি।

'মাপ করবেন,' কঠিন গলায় বলে হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু আস্তিনের লেসটা আটকে গেল তাঁর জ্যাকেটের বোতামে। তিনি আমার বুকের কাছ ঘেঁষে ঝুঁকে পড়ে লেসটা ছাড়াতে লাগলেন, তাঁর দস্তানাহীন আঙুল লাগল আমার হাতে। নতুন একটা অনুভূতিতে — অনুভূতিটা হয়ত বিভীষিকার, হয়ত বা প্রীতির — আমার শিরদাঁড়া শিরশির করে উঠল। চাইলাম তাঁর দিকে, তাঁর প্রতি আমার সমস্ত অবজ্ঞা আনতে চাইলাম সে কঠোর দৃষ্টিতে, কিন্তু তার বদলে আমার চাউনিতে প্রকাশ পেল ভয় আর বিক্ষোভ। তাঁর আর্দ্র, জ্বলন্ত চোখ একেবারে আমার মুখ ঘেঁষে, আকাঙ্ক্ষায় চেয়ে আছে আমার গ্রীবায়, আমার বুকে; দুটো হাতে আদর করছেন আমার বাহুদেশে, ঠোঁট খুলে অস্ফুটভাবে কী যেন বললেন — বললেন আমাকে ভালোবাসেন, আমি তাঁর

সর্বস্ব। ঠোঁটদুটো আরো কাছে এল, তপ্ত হাতে আরো জোরে চেপে ধরলেন আমার হাত; আমার সমস্ত শরীরে আগুনের স্রোত, সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল; থরথর করে কেঁপে উঠলাম, বাধা দেবার চেষ্টা করে কী বলতে গেলাম, কিন্তু কথাগুলো গলায় আটকে গেল। হঠাৎ গালে লাগল তাঁর ঠোঁট, কম্পিত কঠিন দেহে দাঁড়িয়ে তাকালাম তাঁর দিকে। নড়াচড়ার বা কথা বলার ক্ষমতা নেই — গভীর বিভীষিকায় কী একটার প্রতীক্ষায় আছি, কী যেন চাইছি। মুহূর্তকাল কাটল এভাবে, ভয়ংকর সে মুহূর্তটি। সে মুহূর্তে সম্পূর্ণভাবে দেখলাম তাঁকে; তাঁর মুখটা আমার এত চেনা — খড়ের টুপির কিনারের নিচে সেই নিচু কপাল, আমার স্বামীর সঙ্গে যার এত মিল; সুন্দর খাড়া নাক, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র; মোম-দেওয়া দীর্ঘ গোঁফ, আর নূর, কামানো মসৃণ গাল, রোদে তামাটে গলা। ঘৃণা হল তাঁর প্রতি, ভয় হল, আমার কাছে তিনি অত্যন্ত বিজাতীয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কি না বিক্ষোভ আর বাসনা আমার মধ্যে জাগিয়েছে এই বিজাতীয়, ঘৃণ্য লোকটি! তাঁর স্থূল সুন্দর ঠোঁটের চুম্বনে, আংটি-পরা, নীলচে সূক্ষ্ম শিরাকীর্ণ হাতের আলিঙ্গনে নিজেকে সমর্পণ করার কী অদম্য বাসনা হল! আমার সামনে হঠাৎ খুলে-যাওয়া, আমাকে হাতছানি দেওয়া নিষিদ্ধ আনন্দের নর্দমায় ঝাঁপিয়ে পড়ার কী না কামনা!

ভাবলাম, "আমি তো হতভাগিনী, আরো দুর্বিপাকে জড়িয়ে পড়লে কী এসে যায়।"

এক হাতে আমাকে জড়িয়ে মুখ নিচু করলেন মার্কস। ভাবলাম, "আমার মাথায় আরো লজ্জা, আরো পাপ যদি ভেঙে পড়ে পড়ুক গে।"

'Je vous aime,'* ফিসফিস করে তিনি বললেন, গলাটা প্রায় অবিকল আমার স্বামীর মতো। স্বামীর আর সন্তানের কথা মনে পড়ল বহুকাল আগে চেনা প্রিয় জনের মতো, তাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে যেন। হঠাৎ শুনলাম রাস্তার বাঁক থেকে 'ল. ম.' আমায় ডাকছেন। আত্মস্থ হয়ে হাতটা জোর করে ছাড়িয়ে তাঁর কাছে প্রায় ছুটে চলে গেলাম, মার্কিসের দিকে তাকালাম না। গাড়িতে ঢুকলাম আর তখনি শুধু একবার চাইলাম তাঁর দিকে। টুপি খুলে দাঁড়িয়ে আছেন, মুখে হাসি, কী যেন বলছেন। সে মুহূর্তে তাঁর প্রতি কী অসহ্য বিতৃষ্ণা বোধ করলাম সেটা তাঁর জানার কথা নয়।

নিজের জীবনটা অত্যন্ত অসুখী মনে হল, আমার ভবিষ্যৎ আশাহীন, আর আমার অতীতে কী তমসা! 'ল. ম.' কথা বলছিলেন, কী বলছেন মাথায় ঢুকল না। মনে হল আমার প্রতি করুণা বোধ করছেন, আমার প্রতি তাঁর অবজ্ঞা গোপন করার জন্যে শুধু কথা বলছেন। প্রতিটি কথায়, প্রতিটি দৃষ্টিক্ষেপে তাঁর সে অবজ্ঞা আর অপমানকর করুণা বোধ করলাম। গালের যেখানটায় মার্কিস চুমো খেয়েছিলেন সেখানটা জ্বলছে লজ্জায়, স্বামী ও সন্তানের চিন্তাটা অসহ্য। ভেবেছিলাম ঘরে একলা বসে নিজের অবস্থাটা ভেবে দেখব, কিন্তু ভয় হল একলা থাকতে। চা দিয়েছিল, সেটা শেষ না করেই, কেন তা না ভেবে ভীষণ তাড়ায় বাঁধাছাঁদা শুরু করলাম সন্ধ্যার ট্রেনে হাইদেলবের্গে স্বামীর কাছে যাবার জন্যে।

পরিচারিকার সঙ্গে ফাঁকা কামরায় ঢুকলাম, ট্রেন ছাড়ল, জানলা থেকে তাজা হাওয়ার ঝলক; তখন আত্মস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের

* আপনাকে আমি ভালোবাসি (ফরাসী ভাষায়)।

অতীত ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আগের চেয়ে স্পষ্টভাবে ভাবতে পারলাম। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে আসার পর থেকে আমাদের দাম্পত্য জীবনটা নতুন আলোয় ধরা পড়ল আমার কাছে, বিবেকদংশন বোধ করলাম। ঠিক বিয়ের পর গ্রামে আমাদের জীবনযাত্রা, সে সময়কার আমাদের সব পরিকল্পনা এই প্রথম মনে ফিরে এল স্পষ্টভাবে, আর এই প্রথম নিজেকে শুধালাম, এতদিন কী সুখটা উনি পেয়েছিলেন? ওঁর কাছে অপরাধী ঠেকল নিজেকে। "কিন্তু উনি আমাকে রুখলেন না কেন?" জিজ্ঞেস করলাম নিজেকে। 'কেন আমার সঙ্গে ভণ্ডামি করলেন? আমাকে বোঝাবার চেষ্টা এড়িয়ে গেলেন কেন? কেন হেয় করলেন আমাকে? আমার ওপর ওঁর ভালোবাসার ক্ষমতা কেন জারি করলেন না? হয়ত আমাকে উনি ভালোবাসেন না?" কিন্তু যত দোষ উনি করে থাকুন না, অন্য মানুষটির চুম্বনের দাগ আমার গালে, সে দাগ এখনো বোধ করছি। হাইদেলবের্গ যত এগিয়ে আসছে তত স্পষ্টভাবে স্বামীকে মনে পড়ছে, ওঁর সঙ্গে আসন্ন সাক্ষাতের কথায় তত আতঙ্ক। ভাবলাম, "সবকিছু ওঁকে বলব, আমার অনুশোচনার অশ্রুতে উনি ক্ষমা করবেন আমাকে," কিন্তু 'সবকিছু'টা কী বলব ওঁকে আমার নিজের জানা নেই; তাছাড়া উনি যে ক্ষমা করবেন সেটাও বিশ্বাস হল না।

ঘরে ঢুকে ওঁর শান্ত অথচ বিস্মিত মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম যে ওঁকে বলার, ওঁর কাছে স্বীকার করার, ওঁর কাছে ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই আমার। আমার অব্যক্ত বিষাদ ও অনুতাপ বুকে বইতে হবে আমাকে।

'কী করে টের পেলে বলো তো?' উনি বললেন। 'ভাবছিলাম কাল তোমার কাছে যাব,' তারপর আমাকে আরো ভালো করে

দেখে যেন ভয় পেলেন। 'কী হয়েছে? কিছু ঘটেছে নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন।

'কিছু হয় নি,' বললাম, কোনোক্রমে চোখের জল চেপে। 'আমি একেবারে চলে এলাম। কালই রওনা দিতে রাজী, ঘরে ফেরা যাক।'

দীর্ঘ মুহূর্ত ধরে চুপ করে রইলেন উনি, গভীর মনোযোগ আমাকে দেখলেন।

'কিন্তু কী হয়েছে বলো তো,' আর একবার বললেন।

আপনা থেকে আরক্ত হয়ে উঠে চোখ নামিয়ে নিলাম। ওঁর চোখে নিমেষের জন্যে এল ক্রোধ ও অপমানের একটা ঝলক। উনি মনে মনে কী ভাবছেন কল্পনা করে দারুণ ভয় হল, ছলনা করে বললাম, ছলনার এত ক্ষমতা যে আমার আছে কখনো জানি নি।

'হবে আবার কী — শুধু একঘেয়ে আর খারাপ লাগছিল, আমাদের জীবনের কথা, তোমার কথা অনেক ভেবেছি। তোমার কাছে অনেক দিন অপরাধী! যে সব জায়গায় তুমি নিজে যেতে চাও না, সেখানে আমাকে নিয়ে যাও কেন? সত্যি, তোমার কাছে অনেক দিন অপরাধী,' আবার বললাম, আবার চোখে জল এল। 'চলো গ্রামে ফিরে যাই বরাবরের মতো।'

'সেণ্টিমেণ্টাল হবার দরকার নেই,' কঠিন গলায় উনি বললেন। 'টাকাকড়ি বেশী নেই, তাই গ্রামে ফিরে যেতে চাও বলে আমি খুশি, কিন্তু ওখানে বরাবর থাকা, সেটা শুধু স্বপ্ন। আমি জানি, ওখানে তুমি টিকে থাকতে পারবে না। চা খাওয়া যাক এখন — সেটাই সবচেয়ে ভালো,' চাকরকে ডাকার জন্যে উনি উঠে দাঁড়ালেন।

আমার সম্বন্ধে কী ভাবতে পারেন কল্পনা করলাম। ইতস্তত

এবং একটু লজ্জিতভাবে আমার দিকে ওঁর তাকানো দেখে কী না ভীষণ সব ধারণা ওঁতে আরোপ করেছিলাম। অত্যন্ত অপমানিত লাগল। না, উনি আমাকে বোঝেন না, বুঝতে চান না। খোকাকে দেখে আসি বলে চলে এলাম ওঁর কাছ থেকে। একলা থাকতে চাই, কাঁদতে চাই, শুধু কাঁদতে...

৯

নিকোল্‌স্কয়ের ফাঁকা, বহুদিন তাপবিহীন সেই বাড়িটায় জীবন ফিরে এল আবার, কিন্তু এককালে যা ওখানে প্রাণবন্ত ছিল তার জীবন আর ফিরে এল না। মা তো অনেকদিনই নেই, আমরা দুজনে একলা, মুখোমুখি দুজনে; কিন্তু নিভৃত বাসের কোন প্রয়োজন আমাদের নেই এখন, নৈঃসঙ্গের গুরুভার আমাদের ওপর। শীত কাটল খারাপভাবে। আমার অসুখ হল, শরীর সারল শুধু দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের পর। স্বামীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক সহরে যেমন তেমন নিরাসক্ত হৃদ্যতার, কিন্তু এখানে, গ্রামে, বাড়ির মেঝের সবকটি তক্তা, সমস্ত দেয়াল, প্রত্যেকটি ডিভান মনে করিয়ে দিত উনি এককালে আমার কী ছিলেন আর কী হারিয়েছি আমি। যেন দুজনের মধ্যে অন্যায়ের একটা ব্যবধান, সে অন্যায়ের মার্জনা মেলে নি — যেন কিছু একটার জন্যে আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন উনি আর ভান করছেন সে বিষয়ে কিছু জানেন না। ওঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করার মতো কিছু ছিল না, ছিল না করুণা ভিক্ষা করার কোনো কারণ: আমাকে ওঁর সমস্ত সত্তা, অন্তর অন্তর আগেকার মতো আর দেন না, এই হল আমার শাস্তি। কিন্তু ওঁর অন্তর তো উনি কাউকে, কোনো কিছুতে দেন না — যেন সেটার অস্তিত্ব নেই আর। মাঝে

মাঝে মনে হত শুধু আমাকে কষ্ট দেবার জন্যে উনি ভান করে যাচ্ছেন, পুরোনো সে অনুভূতি এখনো ওঁর মধ্যে জাগ্রত, চেষ্টা করতাম সে অনুভূতিকে জাগিয়ে দিতে। কিন্তু উনি মন-খুলে কথা এড়িয়ে চলতেন, মনে হত ওঁর সন্দেহ যে আমি ভান করছি, আর ভাবাবেগের প্রকাশকে হাস্যকর কিছু একটা বলে ডরাতেন। ওঁর দৃষ্টি, ওঁর কথা বলার ধরন জানাত: সবকিছু, সমস্ত কিছু আমার জানা আছে, বলার দরকার নেই, তুমি যা বলতে চাও এমন কি সেটা পর্যন্ত জানি। জানি তুমি মুখে এক আর কাজে অন্য। আমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে ভয় পান বলে প্রথম প্রথম রাগ হত, কিন্তু পরে এটা ধরে নেওয়া আমার অভ্যেস হয়ে গেল যে ভয় নয়, মন খুলে কথা বলার তাগিদ নেই ওঁর। আমি নিজেও তো চট করে বলতে পারব না তোমাকে ভালোবাসি, একসঙ্গে প্রার্থনা করতে বলতে পারি না, বলতে পারি না আমার বাজনা শোনো। আমাদের দুজনের পারস্পরিক ব্যবহার শিষ্টাচারের কয়েকটি নিয়মে বাঁধা। দুজনের জীবন আলাদা। ওঁর নিজের কাজকর্ম ছিল, তাতে যোগদান করার কোন দরকার নেই আমার, করবার ইচ্ছেও ছিল না। আমি সময় কাটাতাম আলস্যে, তাতে উনি আর চটতেন না, বিষণ্ণ বোধ করতেন না। ছেলেদুটির বয়স এত কম যে আমাদের দুজনকে এক করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বসন্ত এল, গ্রীষ্ম কাটাবার জন্যে সোনিয়া ও কাতিয়া এসে পড়ল। নিকোল্‌স্কয়ের বাড়িতে মেরামত চলেছে, আমরা গেলাম পক্রোভ্‌স্কয়েতে। আগেকার সেই পুরনো বাড়ি, সেই বারান্দা, আলো-ভরা ড্রয়িং-রুমে ফোল্ডিং টেবিল আর পিয়ানো, জানলায় শাদা পর্দা লাগানো আমার পুরনো ঘর, সেখানে আমার সব

কিশোরী স্বপ্ন, যেন ভুলে ফেলে রেখে এসেছি। দুটো ছোট্ট খাট সে ঘরে — একটা আমার পুরনো খাট, ককোশা* গোলগাল হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকত সেখানে আর আমি তার ওপরে ক্রুশ-চিহ্ন করতাম সন্ধ্যেবেলায়; আর একটা ক্ষুদে খাটে কাপড়ের বাণ্ডিল থেকে ভানিয়ার** ছোট্ট মুখ উঁকি মারত। ওদের ওপরে ক্রুশ-চিহ্ন করে শব্দহীন ঘরের মাঝখানে দাঁড়াতাম, যৌবনের ভুলে-যাওয়া পুরনো সব স্বপ্ন হঠাৎ যেন ভিড় করে ফিরে আসত ঘরের কোণ, দেয়াল আর পর্দা থেকে। শুনতে পেতাম কৈশোরের পুরনো সব গান। আমার স্বপ্নগুলি কোথায় গেল? কী হল প্রিয়, মধুর গানগুলির? যে সবের আশা পর্যন্ত করতে ভয় হত সে সব রূপ নিয়েছে। আমার ভাসা-ভাসা, চঞ্চল স্বপ্নগুলি পরিণত হয়েছে বাস্তবে, বাস্তব রূপ নিয়েছে কঠোর, কঠিন, নিরানন্দ জীবনে। আর সবকিছু থেকে গিয়েছে আগেকার মতো — জানলা দিয়ে চোখে পড়ে সেই বাগান, সেই লন, সেই পথ, খাদের ধারে সেই বেঞ্চ, পুকুরের ধারে গান-গাওয়া সেই নাইটিংগেল, ফোটা লাইলাকের সেই বাহার আর বাড়ির ওপরে সেই চাঁদ। আর সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু কী ভীষণ, কী অসম্ভব বদলে গিয়েছে! সবকিছু এত নিকট আর প্রিয় হতে পারত, কিন্তু সবকিছু কত না নিরাসক্ত! আগেকার দিনের মতো কাতিয়ার সঙ্গে বৈঠকখানায় বসে ওঁর কথা চলে মৃদু কণ্ঠে। কিন্তু কাতিয়ার মুখ রেখাকীর্ণ, পীতাভ, চোখে আর আনন্দ ও আশার দীপ্তি নেই, তাতে বরং বিষণ্ণ মমতা ও অনুতাপের ছাপ।

* ভালো নাম নিকোলাই। — সম্পাঃ

** ভালো নাম ইভান। — সম্পাঃ

আগেকার মতো ওঁকে নিয়ে আমরা আর উচ্ছ্বাসের আতিশয্য দেখাই না; ওঁর বিচার করি আমরা। কেন আমরা এত সুখী সে নিয়ে আর ভেবে আকুল হই না, যা ভাবি সারা জগতকে জানিয়ে দেবার ইচ্ছে নেই আর আগেকার মতো। দুজনে ফিসফিস করে কথা চলে, যেন চক্রান্তকারী, বারবার পরস্পরকে শুধাই, সবকিছু এমন করুণভাবে বদলে গেল কেন? আর উনি তো ঠিক আগেকার মতন, শুধু কপালের রেখা আরো গভীর, রগের ওপরের চুলে আরো পাক ধরেছে, আর ওঁর গভীর, জিজ্ঞাসু দৃষ্টি সর্বদা আমার কাছে ঝাপসা মেঘের আড়ালে। আমিও তো ঠিক আগেকার মতো, কিন্তু হৃদয়ে ভালোবাসা নেই, নেই ভালোবাসার বাসনা। কাজের কোনো দরকার নেই আমার, নিজেকে নিয়ে আমি সন্তুষ্ট নই। আমার সেই পুরনো ধর্মপ্রবণ উচ্ছ্বাস, ওঁর প্রতি আমার পুরনো অনুরাগ, আমার জীবনের সেই আগেকার পরিপূর্ণতা কত না দূর আর অসম্ভব মনে হয়! এককালে যেটা এত স্পষ্ট আর সত্য মনে হয়েছিল — অপরের জন্যে বাঁচার সুখ — সেটা আর বুঝব না এখন। নিজের জন্যে পর্যন্ত বাঁচতে চাই না, অপরের জন্যে আবার বাঁচা!

সেণ্ট পিটার্সবুর্গে যাবার পর গানবাজনা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু পুরনো পিয়ানোটা, পুরনো সঙ্গীত আবার আমাকে টানতে লাগল।

শরীর ভালো ছিল না বলে একদিন বাড়িতে একলা রয়েছি। কাতিয়া ও সোনিয়া বাড়ি মেরামত কেমন চলেছে দেখার জন্যে ওঁর সঙ্গে গিয়েছে নিকোল্‌স্কয়েতে। টেবিলে চা রাখা হল। নিচে গিয়ে ওদের অপেক্ষা করছি, পিয়ানোর পাশে বসলাম। বীঠোফেনের 'quasi una fantasia' সোনাটাটা খুলে বাজাতে শুরু করলাম।

দেখার বা শোনার কেউ নেই, বাগানের দিকের জানলাগুলো খোলা, পরিচিত বিষণ্ণ গম্ভীর শব্দে ঘর ভরে গেল। প্রথম পালা শেষ হল, কিছু না ভেবে শুধু অভ্যাস বশে তাকালাম ঘরের কোণে, ওখানটায় বসে উনি আমার বাজনা শুনতেন। ওখানে কিন্তু উনি নেই। চেয়ারটা তখনো, বহুদিন নড়াচড়া করা হয় নি সেটিকে; জানলা দিয়ে চোখে পড়ল সূর্যাস্তের আলোয় স্পষ্ট লাইলাকের একটা ছোট ঝোপ, খোলা জানলা দিয়ে এল সন্ধ্যার ঠান্ডা হাওয়া। পিয়ানোতে কনুই রাখলাম, হাতে মুখ ঢেকে ভাবতে লাগলাম। অনেকক্ষণ কাটল সেখানে, যে অতীত আর কখনো ফিরবে না তার কথা যন্ত্রণায় ভাবলাম, ভবিষ্যতের বিষয়ে ভীরুভাবে। সামনে যেন এরি মধ্যে কিছু নেই। মনে হল আমার কিছু বাসনা নেই, কোন আশা নেই। "আমার জীবন তাহলে ফুরিয়ে গিয়েছে?" ভাবলাম, ভয়ে মাথা তুলে আবার বাজালাম, ভুলে যেতে চাই, ভাবতে চাই না আমি, কিন্তু আবার সেই পুরনো মন্থর সুর। মনে মনে বললাম, "হে ভগবান, দোষ যদি করে থাকি তাহলে ক্ষমা করো, আমার অন্তরের সেই সব সুন্দর বোধ ফিরিয়ে দাও আমায়; না হলে কী করতে হবে, কীভাবে বাঁচতে হবে জানিয়ে দাও।" কানে এল ঘাসে গাড়ির চাকার আওয়াজ, গাড়ি-বারান্দায়, তারপর বারান্দায় পরিচিত সতর্ক পায়ের শব্দ, তারপর সে থেমে গেল।

কিন্তু পরিচিত পদধ্বনি আগেকার সেই অনুভূতি আর জাগাল না। বাজনা শেষ হল, পিছনে শুনলাম পায়ের শব্দ, কে যেন আমার কাঁধে হাত রাখল।

'কী সুন্দর বাজালে সোনাটাটা,' উনি বললেন।

জবাব দিলাম না।

'চা খাও নি?'

মাথা নাড়লাম ওঁর দিকে না চেয়ে, যাতে আমার মুখে আবেগের ছাপ ধরা না পড়ে ওঁর কাছে।

'ওরা এক্ষুণি এসে পড়বে, ঘোড়াটা এত ছটফট করছিল যে গাড়ি ছেড়ে ওরা সোজা পথ ধরে আসছে,' উনি বললেন।

'ওদের জন্যে তাহলে অপেক্ষা করি,' বলে বারান্দায় গেলাম, আশা ছিল উনি অনুসরণ করবেন; কিন্তু উনি শুধু বাচ্চাদের কথা জিজ্ঞেস করে তাদের কাছে গেলেন। ওঁর উপস্থিতি, ওঁর সদয়, অবিচলিত কণ্ঠস্বর আমাকে জানিয়ে দিল যে কিছু হারিয়েছি ভাবাটা আমার ভুল। আর কী চাইতে পারি আমি? উনি সদয় ও নম্র, স্বামী হিসেবে ভালো, পিতা হিসেবে যোগ্য — আর কী চাই আমার? নিজেই জানি না। বারান্দায় গিয়ে চাঁদোয়ার নিচে বেঞ্চে বসলাম, এই বেঞ্চে বসে প্রথম আমাদের প্রেমের বোঝাপড়া হয়েছিল। সূর্য ডুবে গিয়েছে, অন্ধকার হয়ে আসছে। বাড়ি আর বাগানের ওপরে বসন্তের কালো মেঘ, শুধু গাছগুলোর ওপারে সূর্যাস্তের মুমূর্ষু আলোয় উদ্ভাসিত, সবেমাত্র ওঠা শুকতারায় খচিত আকাশের একটি পরিষ্কার ফালি। হালকা মেঘের ছায়া সবকিছুর ওপরে, সবকিছু এক পশলা বাসন্তী বৃষ্টির প্রতীক্ষায়। হাওয়া পড়ে গেল, গাছের পাতা, ঘাসের শীষ নড়ছে না একটিও; লাইলাক আর বার্ডচেরির গন্ধ এত জোরালো যে মনে হয় হাওয়ায় মুকুল ধরেছে; কখনো পাতলা, কখনো জোরালো ঢেউ-এর পর ঢেউ-এ আসা গন্ধে বাগান আর বারান্দা ভরে গেল। ইচ্ছে হয় চোখ বুজে ফেলি, কিছু না দেখে, কিছু না শুনে বুক ভরে গন্ধ নিই শুধু। তখনো না-ফোটা ডালিয়া আর গোলাপগুলো কালো কেয়ারিতে নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে যেন চাঁচা বেড়া হয়ে আস্তে

আস্তে উঠছে। খাদে ব্যাঙের তীব্র কর্কশ ডাক, যেন এই শেষ ডাকছে, বৃষ্টিতে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাবে জলে। সমস্ত সোরগোল ছাপিয়ে উঠছে একটি তীক্ষ্ণ, পাতলা স্বর। এ জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়ে যেতে যেতে নাইটিংগেলগুলো পরস্পরকে ডাকছে উৎকণ্ঠায়। এ বসন্তে আবার একটি নাইটিংগেল ভেবেছিল জানলার নিচে ঝোপে বাসা বাঁধবে, বাইরে গিয়ে শুনলাম বাগান-পথের ওখানে সরে গিয়ে পাখিটা ডাকছে; কাঁপা গলায় একবার ডেকে চুপ করে গেল, ও-ও প্রতীক্ষা করছে।

বৃথায় নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম: আমিও কিছুর প্রতীক্ষায় আছি, অনুশোচনায় বুক ভরে গিয়েছে।

নিচে নেমে এসে উনি আমার পাশটায় বসলেন।

'মেয়েগুলো ভিজে সপসপে হবে মনে হচ্ছে,' বললেন।

'হ্যাঁ,' মৃদু কণ্ঠে বললাম। তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম দুজনে।

হাওয়া নেই, ক্রমশঃ নিচুতে নেমে এল মেঘগুলো; সবকিছু আরো স্তব্ধ, আরো গন্ধে-ভরা। হঠাৎ ক্যানভাসের চাঁদোয়ার এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে যেন ছিটকে চলে গেল। আর একটি ফোঁটা পথের কাঁকরে। কাঁটা ঝোপের চওড়া পাতায় কয়েকটি ফোঁটার ছপাৎ শব্দ, তারপর শুরু হল ঝরঝরে বৃষ্টি, ক্রমশঃ ছাট বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল নাইটিংগেল আর ব্যাঙের ডাক; শুধু সেই উচ্চ পাতলা স্বরটি আকাশে তখনো উঠছে, বৃষ্টির জন্যে মনে হল আরো দূর থেকে, আর বারান্দার কাছে শুকনো পাতার আড়ালে একটা পাখির নিয়মিত, একঘেয়ে দুটো পর্দার ডাক। উনি উঠে পড়লেন ভেতরে যাবার জন্যে।

'কোথায় যাচ্ছ?' বাধা দিয়ে বললাম। 'এখানটা তো বেশ সুন্দর।'

'ওদের ছাতা আর গালোশ পাঠিয়ে দিতে হবে,' উনি জবাব দিলেন।

'দরকার হবে না, এক্ষুণি বৃষ্টি থেমে যাবে।'

কথাটা মেনে নিলেন উনি, বারান্দার রেলিং-এর পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম দুজনে।

ভিজে পেছল রেলিং-এ হাতের ভর দিয়ে ক্যানভাসের নিচে থেকে মাথাটা বাড়িয়ে দিলাম। চুলে, গলায় ঝরঝরে বৃষ্টির অস্থির ছিটে।

ওপরের কালো মেঘটা নিজের ভার মোচন করে ক্রমশঃ পাতলা আর লঘু হয়ে এল, বৃষ্টির নিয়মিত ঝমঝম শব্দের বদলে এল আকাশ আর পাতা থেকে ঝরা বিরল ফোঁটার টপটপ আওয়াজ। আবার নিচে ব্যাঙের ডাক, আবার ভিজে ঝোপে নাইটিংগেলগুলো ভরসায় বুক বেঁধে ডাকতে শুরু করল পরস্পরকে। চারিদিক পরিষ্কার হয়ে এল।

'কী চমৎকার!' রেলিং-এ বসে, আমার ভিজে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে উনি বললেন।

সহজ আদরটা আমার কাছে তিরস্কারের মতো, কান্না পেল আমার।

'মানুষের আর কী চাই?' উনি বললেন। 'আমার পরিতৃপ্তির সীমা নেই এখন — আর কিছু চাই না আমি। আমি সম্পূর্ণ সুখী।'

মনে মনে ভাবলাম, "সুখের বিষয়ে এ কথাটা আগে তো বলতে না তুমি। বলতে, সুখ যত হোক না কেন, আরো কী যেন চাই।

আর এখন তুমি শান্ত, পরিতৃপ্ত, অথচ আমার হৃদয়ে অব্যক্ত হতাশা আর রুদ্ধ কান্না।"

বললাম, 'আমিও ভালো আছি, কিন্তু সবকিছু এত ভালো বলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। আমার ভেতরটায় সবকিছু এত গোলমেলে, এত অসম্পূর্ণ, এখানকার সবকিছু এত সুন্দর, এত স্থির, তবু সব সময়ে আমার কিছু একটা চাই। প্রকৃতির আবেশ তোমার অন্তরে বিষণ্ণ প্রীতির মতো কিছু একটা জাগায় না, যেন অসম্ভব কিছু একটা চাইছ, কী একটা হারিয়ে গিয়েছে বলে তোমার মন খারাপ হয় না?'

আমার মাথা থেকে হাতটা সরিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন উনি।

যেন কিছু মনে পড়েছে এমনভাবে বললেন, 'হ্যাঁ, ও রকমটা হত এককালে, বিশেষ করে বসন্তের সময়ে। রাত্তিরে ঘুম আসত না আমারো, কিসের আশায় আর প্রতীক্ষায় থাকতাম — সুন্দর ছিল সে সব রাত্রি!.. কিন্তু তখন সবকিছু আমার সামনে ছিল, আর এখন সবকিছু পেছনে ফেলে এসেছি; এখন যা আছে তাই নিয়ে আমি সন্তুষ্ট, আমি বেশ তৃপ্ত।'

এত বিশ্বাসে, এত হালকাভাবে শেষ করলেন উনি যে কথাটায় ব্যথা পেলেও মনে হল সত্যি বলছেন।

'তাহলে তোমার আর কিছু চাই না?' জিজ্ঞেস করলাম।

'অসম্ভব কিছু চাই না,' আমার মনোভাবটা ধরতে পেরে উত্তর দিলেন। 'মাথাটা ভিজে যাচ্ছে,' আরো বললেন, শিশুকে যেমন আদর করে তেমনভাবে আবার চুলে একবারে হাত বোলালেন। 'গাছের পাতা আর ঘাস বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছে বলে ওদের ওপর তোমার হিংসে — তোমার ইচ্ছে পাতা আর ঘাস আর বৃষ্টির মতো

হওয়া। কিন্তু ওদের শুধু দেখে আমি সন্তুষ্ট, যা কিছু নবীন, সুন্দর আর সুখী তা দেখে আমি খুশি।'

'অতীতের কোন কিছুর জন্যে তোমার অনুশোচনা হয় না?' জিজ্ঞেস করলাম, মনে হল বুকটা ক্রমশঃ ভারি হয়ে উঠছে।

আবার চুপ করে উনি ভাবতে লাগলেন। বুঝলাম উনি চান একেবারে অকপটভাবে উত্তর দিতে।

'না,' সংক্ষিপ্ত জবাব এল।

'কথাটা সত্যি নয়, সত্যি নয় কথাটা!' বলে, ফিরে ওঁর চোখে চোখ রাখলাম। 'অতীতের জন্যে তোমার দুঃখ হয় না?'

'না!' আবার বললেন উনি। 'অতীতের জন্যে আমি কৃতজ্ঞ, দুঃখিত নই।'

'কিন্তু সেদিন আবার ফিরে আসুক ইচ্ছে হয় না তোমার?' শুধালাম।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বাগানের দিকে উনি চেয়ে রইলেন।

'তার ইচ্ছে নেই, যেমন পাখা গজাবার ইচ্ছে নেই।' উনি বললেন। 'ওটা হয় না।'

'অতীত সম্বন্ধে তোমার কোনো অভিযোগ নেই? নিজেকে বা আমাকে কখনো দোষ দাও না?'

'কখনো না! যা হয়েছে সবকিছু ভালোর জন্যে হয়েছে।'

'শোনো,' ওঁর হাত ছুঁয়ে বললাম, যাতে উনি আমার দিকে তাকান। 'তুমি — যেমনটা উচিত মনে করো তেমনভাবে আমি থাকি তুমি চাও, কখনো আমাকে সেটা বল নি কেন? কেন আমাকে স্বাধীনতা দিলে? সে স্বাধীনতা কী করে কাজে লাগাতে হয় আমার অজানা ছিল। কেন আমাকে শিক্ষা দেওয়া বন্ধ করলে? যদি তুমি চাইতে — যদি আমাকে পথ দেখাতে, তাহলে কিছু ঘটত

না, কিছু ঘটত না।' কঠিন বিরক্তি আর ভর্ৎসনায় মুখর আমার কণ্ঠস্বর, পুরনো অনুরাগে নয়।

'কী ঘটত না?' অবাক হয়ে, আমার দিকে ফিরে উনি জিজ্ঞেস করলেন। 'কিছু তো ঘটে নি। সমস্ত কিছু ভালো, খুব ভালো,' হেসে যোগ করলেন।

ভাবলাম, "আমাকে বোঝেন না উনি, তাই কি? কিম্বা যেটা আরো খারাপ, হয়ত বুঝতে চান না?" চোখে জল এসে গেল।

'তাহলে বিনা অপরাধে এই যে তোমার উদাসীনতা আর এমন কি অবজ্ঞার শাস্তি আমাকে যে বইতে হয়, সেটা হত না,' বলে উঠলাম। 'আমি নির্দোষ, তবু যা কিছু আমার প্রিয় আমার কাছ থেকে যে তুমি নিয়ে নিয়েছ, সেটা হত না।'

'কী বলছ তুমি, মণি?' যেন আমাকে বোঝেন নি এমনভাবে উনি জিজ্ঞেস করলেন।

'বাধা দিও না, বলতে দাও আমাকে... আমার ওপর তোমার বিশ্বাস, তোমার ভালোবাসা, এমন কি তোমার শ্রদ্ধা পর্যন্ত সরিয়ে নিয়েছ, যা ঘটেছে তারপর আমি বিশ্বাস করি না তুমি আমাকে ভালোবাস। দাঁড়াও, আমাকে এতদিন ধরে যন্ত্রণা দিয়েছে যে সবকিছু তোমাকে খুলে বলতে হবে এক্ষুণি,' উনি আবার বলার চেষ্টা করাতে বাধা দিলাম। 'জীবন কী আমার জানা ছিল না, তা জানার জন্যে একলা আমাকে ছেড়ে দিলে, সেটা কি আমার দোষ?.. এখন কী দরকার সেটা বুঝি, প্রায় একবছর ধরে তোমার কাছে ফিরে আসার সব রকম চেষ্টা করছি আর তুমি আমাকে হটিয়ে দিচ্ছ, যেন আমি কী চাই তুমি বোঝ না, সেটা কি আমার দোষ? আর সেটা এমনভাবে কর যে তোমাকে তিরস্কার করা

চলে না, একমাত্র আমি দোষী আর অসুখী থেকে যাই। হ্যাঁ, তুমি আমাকে এমন একটা জীবনে আবার ঠেলে ফেলে দিতে চাও যাতে দুজনের অমঙ্গল হতে পারে।'

'কী থেকে এটা তোমার মনে হয়?' জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি অবাক আর শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন উনি।

'তুমিই না কাল বললে যে এখানে আমি কখনো টিঁকে থাকতে পারব না? বারবার বল যে শীতকালে আমাদের সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ফিরে যেতে হবে, যে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে আমার ঘেন্না। সাহায্য করা দূরের কথা, তুমি মন খুলে আমাকে কখনো কিছু বল না, তোমার মুখে কখনো অন্তরঙ্গ কোমল কথা শুনি না। আর পরে যখন আমি গোল্লায় যাব তখন তুমি আমাকে দোষ দেবে, গোল্লায় গিয়েছি বলে খুশি হবে।'

'দাঁড়াও,' কঠিন, কঠোর সুরে উনি বললেন। 'যা বলছ এখন, সেটা ভালো কথা নয়। এতে শুধু প্রমাণ হয় যে আমার প্রতি তোমার মনোভাব বিরূপ, আর তুমি...'

'তোমাকে ভালোবাসি না? বলো, বলো!' কথাটা শেষ করে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। বেঞ্চে বসে রুমালে মুখ ঢাকলাম।

ফোঁপানিতে দম বন্ধ হয়ে আসছিল, চাপার চেষ্টা করতে করতে ভাবলাম, "তাহলে উনি আমাকে এইভাবে বোঝেন? আমাদের সেই ভালোবাসা শেষ, আর নেই," কথাটা কে যেন বারবার বলতে লাগল আমাকে। উনি আমার কাছে এলেন না, সান্ত্বনা দিলেন না। আমার কথায় উনি চটেছেন। ওঁর কণ্ঠস্বর শান্ত, কঠিন।

'জানি না কীসের জন্যে তুমি আমাকে দোষ দিচ্ছ,' শুরু করলেন। 'আগেকার মতো তোমাকে ভালোবাসি না, এইজন্যে হয়তো।'

'আগেকার মতো!' রুমালে মুখ ঢেকে অস্ফুট কণ্ঠে আমি বললাম, তিক্ত অশ্রু আরো ছাপিয়ে এল।

'তাহলে দোষ দিতে হয় সময়কে, আর নিজেদের। আলাদা আলাদা সময়ে প্রেমের চেহারা আলাদা হয়...' একটু থামলেন উনি। 'সত্যি কথাটা তাহলে খুলে বলব? খোলাখুলি কথায় যদি তোমার একান্ত ইচ্ছে... যে বছরে প্রথম তোমাকে চিনলাম সে বছরে তোমার কথা ভেবে, তোমার ভালোবাসার স্বপ্নে অনেক রাত্তির ঘুমোই নি। নিজে নিজের ভালোবাসা সৃষ্টি করেছি আর আমার বুকে ক্রমশঃ সে ভালোবাসা বেড়েছে। আর ঠিক তেমনভাবে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে আর বিদেশে, যে ভালোবাসা আমাকে যন্ত্রণা দিয়েছে তাকে ভেঙেচুরে শেষ করে অনেক ভয়াবহ বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়েছি। ভালোবাসা শেষ হয় নি, শুধু যেটা আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল তার অবসান ঘটিয়েছি; শান্তি পেলাম, আর এখনো তোমাকে ভালোবাসি, কিন্তু ভালোবাসাটা অন্য ধরনের।'

'সেটাকে তুমি ভালোবাসা বলতে পার, কিন্তু আসলে সেটা যন্ত্রণা,' অস্ফুট কণ্ঠে বললাম। 'উচ্চ সমাজকে যদি এতই খারাপ মনে করতে যে তার জন্যে আমাকে ভালোবাসা ছেড়ে দিলে, তাহলে সে সমাজে আমাকে থাকতে দিলে কেন?'

'উচ্চ সমাজের জন্যে নয়,' উনি জবাব দিলেন।

'তুমি কেন আমার ওপর জোর করলে না?' বলে চললাম। 'কেন আমাকে বেঁধে মেরে ফেললে না? আমার সমস্ত সুখ থেকে আমাকে বঞ্চিত করার চেয়ে সেটা ভালো হত। তাহলে আমার মনে তৃপ্তি থাকত, লজ্জার কারণ থাকত না।'

মুখ ঢেকে আবার কাঁদতে লাগলাম।

ঠিক সে মুহূর্তে বারান্দায় এল কাতিয়া আর সোনিয়া, বৃষ্টিতে ভিজে বেজায় খুশি, হাসি আর জোর কথা চলেছে, কিন্তু আমাদের দেখামাত্র কোনো কথা না বলে ওরা চলে গেল।

ওরা যাবার পর আমরা দুজন নিঃশব্দে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। কেঁদে কেঁদে মনটা হালকা হয়ে এল। ওঁর দিকে তাকালাম, দুহাতে মাথা ধরে উনি বসেছিলেন, আমার দৃষ্টিতে সাড়া দিয়ে কী একটা বলতে গেলেন, কিন্তু গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতে আবার মুখ রাখলেন।

ওঁর কাছে গিয়ে হাতটা সরিয়ে দিলাম। আমার দিকে উনি তাকালেন চিন্তিত দৃষ্টিতে।

'হ্যাঁ,' উনি বললেন, যেন চিন্তার সূত্র ধরে বলছেন, 'সত্যিকার জীবনে ফিরে আসার জন্যে আমাদের সবাইকে, বিশেষ করে মেয়েদের, জীবনের তুচ্ছতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। অন্যকে বিশ্বাস করা চলে না। তখনো মন-ভোলানো তুচ্ছতায় বাঁচার অভিজ্ঞতা তোমার ছিল না বিশেষ, সেজন্যেই ভালো লাগত তোমাকে; তোমাকে ছেড়ে দিলাম তার মধ্যে, মনে হল তোমাকে আটকাবার কোনো অধিকার নেই আমার; যদিও সেভাবে থাকার সময় আমার নিজের বহুদিন পেরিয়ে গিয়েছিল।'

'তুমি আমাকে ভালোবাসতে যদি তাহলে কেন একসঙ্গে থেকে সে সবের মধ্য দিয়ে আবার গেলে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'কেননা, চাইলেও তুমি আমার কথাটা মেনে নিতে পারতে না। নিজের চোখে দেখা দরকার ছিল তোমার, আর সেটা দেখেছ।'

'তুমি বড্ডো ওজন মেপে চলেছিলে, ভালোবেসেছিলে অত্যন্ত কম,' বললাম।

আবার দুজনে চুপচাপ রইলাম।

'এইমাত্র যেটা বললে সেটা নিষ্ঠুর বটে, কিন্তু কথাটা সত্যি,' বলে হঠাৎ উনি দাঁড়িয়ে উঠে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলেন। 'হ্যাঁ, কথাটা সত্যি, আমারি দোষ,' আমার সামনে থেমে যোগ করলেন। 'উচিত ছিল হয় তোমাকে না ভালোবাসা, নয় সহজভাবে ভালোবাসা।'

'এসো, ও সব কিছু আর মনে রাখব না,' ভীরু কণ্ঠে বললাম।

'না, যা হয়ে গিয়েছে তা আর ঠিক করা যায় না, কখনো ঠিক করা যায় না,' বলতে বলতে ওঁর গলাটা কোমল হয়ে এল।

'সব ঠিক হয়ে গিয়েছে,' ওঁর কাঁধে হাত রেখে বললাম।

হাতটা ধরে চাপ দিলেন উনি।

'অতীত নিয়ে কোনো অনুশোচনা নেই, কথাটা সত্যি বলি নি। অনুশোচনা হয়, আগেকার সেই ভালোবাসা, যাকে আর কখনো বাঁচানো যাবে না, তাকে নিয়ে দুঃখ হয়। কার দোষে এটা হল? জানি না। ভালোবাসা আছে, কিন্তু আগেকার সে ভালোবাসা নয়। ভালোবাসার স্থান এখনো আছে, কিন্তু সে ভালোবাসা রুগ্ণ — শক্তি বা সরসতা আর নেই। আছে নানা স্মৃতি আর কৃতজ্ঞতা, কিন্তু...'

'এমন কথা বলো না,' বাধা দিলাম আমি। 'সবকিছু আগেকার মতো আবার হবে... হতে পারে, নয় কি?' ওঁর চোখে চোখ রেখে শুধালাম। কিন্তু ওঁর চোখ পরিষ্কার প্রশান্ত, গভীর দৃষ্টিতে দেখলেন না আমাকে।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম যা চাইছি, যা ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম অসম্ভব সেটা। উনি শান্ত সদয়ভাবে হাসলেন, মনে হল সেটা বৃদ্ধের হাসি।

'তোমার বয়স এত কম, আমার বয়স হয়েছে অনেক!' উনি বললেন। 'তুমি যা চাও সেটা আমার ভেতরে আর নেই — নিজেকে ঠকিয়ে কী লাভ?' বলে চললেন, মুখে তখনো স্মিত হাসি।

কোনো কথা না বলে ওঁর পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম, মনটা আগের চেয়ে শান্ত হয়ে এসেছে।

উনি বলে চললেন:

'যা গিয়েছে তা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা আমরা করব না। নিজেদের কাছে মিথ্যের বালাই রাখব না। যদি আগেকার সেই উৎকণ্ঠা, সেই উত্তেজনা না থাকে, ভগবানকে ধন্যবাদ! চাইবার মতো, উত্তেজিত হবার মতো আমাদের কিছু নেই। আমরা সুখের ভাগ বড়ো কম পাই নি। এখন সরে দাঁড়িয়ে ওর জন্যে পথ ছাড়ার সময় হয়েছে,' দোরগোড়ায় ভানিয়াকে কোলে নিয়ে আয়া এল, ভানিয়াকে দেখিয়ে উনি বললেন। 'ঠিক তাই, ওগো,' বলে ঝুঁকে চুমো খেলেন আমার মাথায়। চুম্বনটা প্রেমিকের নয়, পুরাতন বন্ধুর।

আর বাগান থেকে আরো প্রখর মধুর ভাবে উঠল শিরশিরে রাত্রির গন্ধ, আরো গাম্ভীর্য এল শব্দে আর নিস্তব্ধতায়, তারার আলো হল আরো দীপ্ত। ওঁর দিকে চাইলাম, সঙ্গে সঙ্গে মনটা হালকা হয়ে গেল, যেন দবদবে ব্যথাময় কোনো শিরা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

স্পষ্ট করে, শান্তভাবে বুঝলাম সে সময়কার অনুভূতি চলে গিয়েছে একেবারে যেমন চলে গিয়েছে সেই সব দিনও, তাকে

আবার বাঁচানো শুধু যে অসম্ভব তা নয়, বাঁচানোর চেষ্টা করাটা হবে যন্ত্রণাকর, বাধাগ্রস্ত। আর সত্যি কি সে সব দিন এত অপরূপ ছিল — সেই সব দিন যেগুলি আমার কাছে আনন্দের চরম বলে ঠেকত? কত দূরে, বহুদূরে সরে গেছে সে সময়টা!

'চায়ের কথাটা ভুলে যাচ্ছি,' উনি বললেন। আমরা দুজনে বৈঠকখানায় গেলাম। দোরগোড়ায় আবার দেখা হল ভানিয়া কোলে আয়ার সঙ্গে।

বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ওর খালি লালচে পা ঢেকে দিয়ে বুকে চেপে চুমো খেলাম খুব আলতোভাবে। যেন ঘুমের মধ্যে নিজের ছোট ছোট আঙুল নাচাল ও, ঝাপসা চোখ মেলে চাইল, যেন কিছু একটা খুঁজছে বা মনে করার চেষ্টা করছে। হঠাৎ চোখজোজাড়া নিবদ্ধ হল আমার মুখে, আর চেনার একটা ঝিলিক খেলে গেল তাতে। ভরা ঠোঁট জুড়ে হাসিতে খুলে গেল। "ও আমার, সম্পূর্ণ আমার!" ভেবে সমস্ত শরীরে একটা সুখের টান এল, বুকে চেপে ধরলাম ওকে, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালাম যাতে ওর না লাগে। চুমো খেলাম ওর ঠাণ্ডা ছোট্ট পায়ে, ওর পেটে আর হাতে, পশমে ঢাকা ওর ছোট্ট মাথায়। আমার কাছে এলেন স্বামী, বাচ্চার মুখটা চট করে ঢেকে দিয়ে আবার খুলে দিলাম।

'ইভান সের্গেইচ!' বলে উনি ওর চিবুকের নিচে আঙুল দিয়ে ছুঁলেন। কিন্তু ইভান সের্গেইচকে আবার তাড়াতাড়ি ঢেকে দিলাম আমি। আমি ছাড়া আর কেউ ওর দিকে বেশীক্ষণ তাকালে চলবে না। স্বামীর দিকে চাইলাম, আমার দিকে তাকিয়ে ওঁর চোখে হাসি, আর অনেকদিন পরে এই প্রথম ওঁর চোখে চোখ রেখে মনটা হালকা আর খুশি লাগল।

সেদিন থেকে স্বামীর সঙ্গে আমার রোমান্সের শেষ; যা ফিরে কখনো আসবে না তার প্রিয় স্মৃতির মতো আমার পুরনো ভালোবাসা রয়ে গেল, কিন্তু ছেলেদের এবং ছেলেদের বাপের প্রতি ভালোবাসার নতুন একটি অনুভূতি সূচনা করল অন্য একটি জীবনের; সে সুখী জীবন কিন্তু একেবারে আলাদা ধরনের, সে জীবন আজ পর্যন্ত শেষ হয় নি...

১৮৫৯

পক্ষিরাজ



(একটি ঘোড়ার গল্প)

১

ক্রমশঃ আকাশ খুলে যেতে লাগল। পূর্বরবির ছটা ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে, আরো চিকচিক করছে অস্বচ্ছ রূপালী শিশিরবিন্দু, ক্ষীণতর হয়ে এল চাঁদের কাস্তে, বনে জাগল সাড়া, লোকজন উঠে পড়ছে; জমিদার বাড়ির আস্তাবলে ঘোড়ার নাকের আওয়াজ আর খড়ে পায়ের খসখস আরো স্পষ্ট কানে আসছে। মাঝে মাঝে তীক্ষ্ন ক্রুদ্ধ হ্রেষাধ্বনি, কী একটা নিয়ে খেয়োখেয়ি লেগে গিয়েছে ভিড়-করা ঘোড়াগুলোর মধ্যে।

'হয়েছে, হয়েছে! তাড়া কীসের! এরি মধ্যে ভুখ লেগেছে দেখছি!' ক্যাঁচকেঁচে ফটকটা খুলতে খুলতে বলল বুড়ো ঘোড়াপালক। 'কোথায় যাচ্ছিস!' একটা ঘুড়ী ফটকের দিকে লাফিয়ে আসাতে হাত তুলে সে চেঁচিয়ে উঠল।

ঘোড়াপালক নেস্তেরের গায়ে কসাক জ্যাকেট* নক্সা-করা চামড়ার বেল্ট দিয়ে আটকানো; চাবুকটা কাঁধে ফেলা, তোয়ালেতে মোড়া রুটি বেল্টে গোঁজা। হাতে জিন ও লাগাম।

ঘোড়াপালকের বিদ্রূপের সুরে ঘোড়াগুলো ভয় পেল না, চটলও না, পরোয়া করে না এমন ভান দেখিয়ে ধীরেসুস্থে ফটকের কাছ

* কসাক জ্যাকেট — বাহ্যিক অবয়বে এক ধরনের ওভারকোটজাতীয় পোষাকের নাম। — সম্পাঃ

থেকে সরে গেল সবাই — শুধু একটা ঝাঁকড়া চুলো খয়েরি রঙের বুড়ী ঘোড়া কান মুড়ে এক ঝটকায় তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। এ ব্যাপারে পিছনের একটা জোয়ান ঘুড়ীর মাথা না ঘামালেও চলত কিন্তু সে চিঁহি ডাক ছেড়ে কাছাকাছি দাঁড়ানো ঘোড়াটাকে পাছা দিয়ে ঝটকা দিল একটা।

'হেই, হেই!' আরো জোরে, আরো শাসিয়ে চেঁচিয়ে ঘোড়াপালক আস্তাবলের একটা কোণে সরে গেল।

আস্তাবলের আঙিনার সবকটা ঘোড়ার মধ্যে (গুনতিতে প্রায় একশ) সবচেয়ে কম অধৈর্যপনা দেখাল একটা ডোরাদার আক্তা ঘোড়া; চালের নীচে একলা দাঁড়িয়ে আধ-বোজা চোখে আস্তাবলের একটা ওক-কাঠের খুঁটি চাটছিল সে। খুঁটিটার স্বাদ ঠিক কেমন বলা মুশকিল, কিন্তু চাটবার সময় ডোরাদার আক্তা ঘোড়াটার ভাব গম্ভীর আর চিন্তান্বিত।

'আবার দুষ্টুমি?' কাছে এসে নাদার ওপর জিন আর ঘামে চকচকে জিনের কাপড় রাখতে রাখতে আগেকার মতো গলায় বলল ঘোড়াপালক।

লেহন স্থগিত রেখে আক্তাটা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল নেস্তেরের দিকে, একটিও পেশী তার নড়ল না। হাসল না ঘোড়াটা, ভুরু কোঁচকাল না, চটে উঠল না, শুধু পেটটা কেঁপে উঠল থরথর করে, কয়েক মুহূর্ত পরে গভীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অন্য দিকে ফিরল। তার গলায় হাত গলিয়ে লাগাম বসাল ঘোড়াপালক।

'দীর্ঘনিঃশ্বেস আবার কেন রে?' শুধাল নেস্তের।

ঝট করে লেজ নাড়াল শুধু আক্তা ঘোড়াটা, যেন বলতে চায়: "ও কিছু নয়, নেস্তের।" ঘোড়াপালক জিন আর জিনের কাপড় পিঠে বসিয়ে দেওয়াতে হয়ত অপছন্দ বোঝাবার জন্য আক্তা

ঘোড়াটা কান ওল্টাল কিন্তু তাতে নেস্তের শুধু বোকা বলে গালি দিল তাকে। পেটের দড়া শক্ত করে টানার সময়ে ঘোড়াটা পেট ফুলিয়ে চেষ্টা করল বাধা দিতে, কিন্তু মুখে একটা ঘুষি আর পেটে হাঁটুর গুঁতো, ব্যস্‌, দম বেরিয়ে গেল তার। তবু দাঁত দিয়ে নেস্তের জিনের বেল্ট টানার সময়ে আবার কান মুড়ল সে, এমন কি ফিরে তাকাল। জানত এতে কোনো লাভ নেই, কিন্তু তার ইচ্ছে নেস্তেরকে জানিয়ে দেওয়া এটা তার ভালো লাগছে না, এবং ভালো না লাগাটা বরাবর জানিয়ে দেবে। জিন বসানোর পর ফুলে-ওঠা ডান পাটা একটু আলগা করে খলীন চিবোতে শুরু করল সে, যদিও এতদিনে তার জানা উচিত ছিল যে খলীনে কোন স্বাদ থাকা সম্ভব নয়।

খাটো রেকাবে পা দিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে নেস্তের চাবুকটা খুলে নিয়ে হাঁটুর নীচ থেকে কোটটা বের করে জিনে সেই বিশেষ কায়দায় বসল যেটা কোচওয়ান, শিকারী আর ঘোড়াপালকদের নিজস্ব, তারপর লাগামে টান দিল। যে চুলোয় বল যেতে তৈয়ার, এ রকম একটা ভাবে মাথা তুলল বটে ঘোড়াটি কিন্তু নড়ল না। তার জানা ছিল যে রওনা হবার আগে সওয়ারী গলা ফাটিয়ে অনেক হুকুম জারি করবে অন্য ঘোড়াপালক ভাস্কাকে আর ঘোড়াগুলোকে। আর সত্যি, হাঁকডাক শুরু করল নেস্তের। 'ভাস্কা,' হাঁকল সে। 'এই, ভাস্কা! ঘুড়ীগুলোকে ছেড়ে দিয়েছিস? কোথায় গেলি তুই, বদমাস? ঘুমোচ্ছিস নাকি? ফটক খোল! ঘুড়ীগুলোকে যেতে দে আগে!' ইত্যাদি হুকুম চলল।

ফটকের ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ। বিরক্ত নিদ্রালু ভাস্কা দরজার খুঁটির কাছে দাঁড়িয়ে একটা ঘোড়ার লাগাম ধরে অন্যগুলোকে যেতে দিল। একটার পর একটা ঘোড়া বেরিয়ে গেল, খড় শুঁকে, তার

ওপর সাবধানে পা ফেলে: জোয়ান ঘুড়ী, এক বছর বয়সের পালের ঘোড়া, দুগ্ধপোষ্য বাচ্চা আর পেটে বাচ্চা নিয়ে ঘুড়ী; তারা নিজেদের বিরাট পেটের দায়ে সাবধানে একে একে পার হচ্ছে ফটক। কমবয়সী ঘুড়ীগুলো দুয়ে-দুয়ে তিনে-তিনে এ ওর পিঠের ওপর মাথা বাড়িয়ে ঠেলাঠেলি করে চলেছে, তাড়াহুড়োয় হোঁচট খাচ্ছে বলে খিস্তি করছে ঘোড়াপালকরা। দুগ্ধপোষ্য বাচ্চাগুলো মাঝে মাঝে অচেনা ঘুড়ীদের পায়ের ফাঁকে তড়বড় করে ঢুকছে, বড়োদের হ্রেষাধ্বনিতে সাড়া দিয়ে ডাকছে তীক্ষ্ন চিঁহি স্বরে।

একটা বাচাল জোয়ান ঘুড়ী ফটক পার হয়েই মাথা বেঁকিয়ে পাছা ঝটকা দিয়ে অল্পস্বল্প চেঁচাতে শুরু করল, কিন্তু ছিটছিট দাগের বুড়ী জুল্‌দিবাকে ছাড়িয়ে যাবার সাহস হল না তার। জুল্‌দিবা অন্য দিনকার মতোই চলেছে সব ঘোড়ার আগেভাগে মন্থর ভারি ও ভারিক্কি চালে, বিরাট পেট দুলিয়ে।

এই এত হৈচৈ আর ভিড় ছিল খোঁয়াড়টায়, কয়েক মিনিট পরে কিন্তু সব ফাঁকা। চালের খুঁটিগুলোকে দেখাচ্ছে মনমরা পরিত্যক্ত, পায়ে দলা, নাদায় ভরা খড় ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। ডোরাদার আক্তা ঘোড়াটার এ দৃশ্য দেখা অভ্যেস হয়ে গেছে বটে, তবু মনে হল তার মুখে বিমর্ষ একটা ভাব ফুটে উঠেছে। যেন কাউকে সেলাম জানাচ্ছে এমনভাবে আস্তে আস্তে মাথা তুলে আর নামিয়ে, দড়ার চাপে যতটা সম্ভব ততটা দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে, আড়ষ্ট বেঁকা পা টেনে টেনে চলল পালের পেছনে। হাড় বের করা পিঠে বসে আছে বয়স্ক নেস্তের।

মনে মনে ভাবল, "রাস্তায় গিয়ে পড়লেই লোকটা চকমকি জ্বালিয়ে পেতলের কাজ-করা চেন লাগানো পাইপটা নির্ঘাৎ টানবে। তবু সেটা বেশ লাগে। ভোরবেলায় ঘাসে শিশির জমে আছে, তখন

পাইপের গন্ধটা খাসা; গন্ধটায় অনেক কিছু সুখের জিনিস মনে পড়ে যায়। আমার আপত্তি শুধু এই, দাঁতের ফাঁকে পাইপ বসানোর সঙ্গে সঙ্গে লোকটার চাল বেড়ে যায়, নিজেকে কেষ্টবিষ্টু ভেবে একপাশে সরে বসে, আর হামেশা বসে ঠিক সে পাশটায় যেখানটায় ব্যথা। যাকগে, গোল্লায় যাক। অন্যদের সুখের জন্যে যন্ত্রণা পাওয়াটা সয়ে গেছে। ঘোড়া বলে তাতে এমন কি একটু সন্তোষ বোধ করতে শুরু করেছি। চাল মারুক গে বেচারী, যখন একলা থাকে, অন্য কেউ দেখে না ওকে, শুধু তখনি তো চাল মারে। পাশে সরে বসে যদি আনন্দ পায়, বসুক গে," নড়বড়ে পা সাবধানে ফেলে রাস্তার মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে ভাবল দামড়া ঘোড়াটা।

২

নদীপারে ঘোড়া চরার জায়গায় পালটাকে তাড়িয়ে এনে নেস্তের নেমে জিন তুলে নিল। নদীর বঙ্কিম বাহু আর মাটি থেকে ওঠা কুয়াশায় ঝাপসা ও শিশিরসিক্ত সদ্য জোলো মাঠের দিকে ইতিমধ্যে মন্থর গতিতে চলেছে ঘোড়াগুলো।

লাগাম খুলে নেবার পরেই নেস্তের দামড়াটার গলার নীচে চুলকে দিল, আর খুশি ও কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য চোখ বুজল জানোয়ারটা। 'আহা, খুব ভালো লাগে দেখছি এটা বুড়ো কুত্তাটার,' বিড়বিড় করে বলল নেস্তের। কিন্তু আক্তাটার মোটে ভালো লাগত না এটা; শুধু ভব্যতার খাতিরে ভালো লাগার ভান করে মাথা নেড়ে মেনে নিত। কিন্তু হঠাৎ, আগে কোনো আভাস না দিয়ে বিনা কারণে, কিম্বা হয়ত নেস্তেরের মনে হয়েছিল বেশী আদিখ্যেতা দেখালে

ঘোড়াটার রোয়াব বেড়ে যাবে, ঘোড়াটার মাথা ধাক্কায় সরিয়ে লাগাম চালিয়ে বকলসটা দিয়ে বুড়ো তার শুকিয়ে-যাওয়া পায়ে লাগাল কষে এক ঘা, তারপর বাক্যব্যয় না করে হেঁটে চলে গেল ঢিবির সেই গাছের গুঁড়িটাতে যেখানটায় সে সচরাচর বসে।

এ রকম ব্যবহারে ঘোড়াটা না চটে পারে না, কিন্তু চটার কোনো আভাস সে দিল না। শুধু চলল নদীর দিকে খড়খড়ে লেজ আস্তে আস্তে দুলিয়ে, শুঁকে শুঁকে উদাসভাবে ঘাস খেতে খেতে। জোয়ান ঘুড়ী, বছরখানেকের বাচ্চা আর দুগ্ধপোষ্যগুলোর বেজায় ফুর্তি সুন্দর সকালটাতে, চারিদিকে তারা নাচানাচি ঝাঁপাঝাঁপি চালিয়েছে, কিন্তু ও সবের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই দামড়াটার। সে জানে যে স্বাস্থ্যের পক্ষে সবচেয়ে ভালো হল, বিশেষ করে তার বয়সে, খালি পেটে বেশ খানিকটা জল খেয়ে নিয়ে তারপর সকালের খানা খাওয়া; তাই নদীতীরের সবচেয়ে ঢালু আর চওড়া একটা জায়গা বেছে নিয়ে খুর আর পায়ের পেছনের লোম জলে ভিজিয়ে নিল, তারপর জলে মুখ ঢুকিয়ে কাটা ঠোঁটে শুষতে শুরু করল পাঁজর ফুলিয়ে, লেজ নাড়িয়ে; লেজটা ডোরাকাটা, সরু, গোড়ার দিকে নেড়া।

দুষ্টু বাদামি রঙের যে ঘুড়ীটা হামেশা আস্তো ঘোড়াটার পেছনে লেগে তাকে জ্বালাত, সে জল ঠেলে এল তার কাছে কাজের ছলে, আসল মতলবটা যেখানে ও খাচ্ছে সেখানকার জলটা ঘুলিয়ে দেওয়া। কিন্তু ঘোড়াটার এরি মধ্যে পেট ভরে জল খাওয়া হয়ে গেছে, ঘুড়ীটির বদ মতলব খেয়াল করে নি এমনভাবে সে ধীরেসুস্থে কাদা থেকে একটার পর একটা পা তুলে নিয়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে ছোকরাদের দল থেকে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে শুরু করল সকালের খানা। মাথা বলতে গেলে প্রায় না তুলে, যাতে ঘাস খুব

কম পায়ে চাপা পড়ে তার জন্য বিচিত্র ভঙ্গিতে পা রেখে একনাগাড়ে ঘণ্টা তিনেক সে খেয়ে চলল। এত বেশী খেল যে খোঁচা বাঁকা পাঁজর থেকে পেটটা ঝুলতে লাগল বোঝাই-করা বস্তার মতো, রুগ্ণ চার পায়ে ভর দিয়ে এমনভাবে দাঁড়াল যাতে কষ্ট বিশেষ না হয়, বিশেষ করে সবচেয়ে দুর্বল সামনের ডান পাটায়, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

বার্ধক্যের রূপ মাঝে মাঝে হয় উদাত্ত, মাঝে মাঝে বিশ্রী, আর মাঝে মাঝে করুণ। আবার কখনোসখনো হয় একাধারে উদাত্ত ও বিশ্রী। ডোরাদার আস্তো ঘোড়াটার বার্ধক্য ছিল সে রকম।

মাথায় বেজায় বড়ো সে — কম করে সাড়ে পাঁচ ফিট। কালো শরীরটার মধ্যে শুধু কয়েকটি হলদে-শাদা ছোপ। মানে, সে রকম রঙ ছিল এক কালে, এখন সেটা নোংরা তামাটে। সবসুদ্ধ তার গায়ে ডোরাদার রঙের তিনটে ছোপ: একটা নাকের একপাশ থেকে তেরছাভাবে উঠে মাথা আর গলার অর্ধেকটা ভরে দিয়েছে। পোকায় জট-পাকানো দীর্ঘ কেশর জায়গায় জায়গায় শাদা আর তামাটে। দ্বিতীয় ছোপটা ডান দিকের পাঁজর বেয়ে ছড়িয়ে ঢেকেছে পেটের অর্ধেক। তৃতীয়টি পাছায় শুরু হয়ে ছড়িয়েছে লেজের ওপর দিকটায় আর রাঙের অর্ধেকটায়। লেজের বাকিটা ডোরা-কাটা, শাদাটে। চক্ষুকোটরের চারধার বসে গেছে অনেকটা, নীচের ঠোঁটটা কালো, একবার কী একটা দাঙ্গার ফলে কেটে ঝুলে পড়েছে; হাড় বের করা প্রকাণ্ড মাথাটা এমনভাবে বসানো যে লম্বা হাড়গিলে ঘাড়টায় সেটাকে কাঠের মনে হয়। নীচের ঠোঁটটার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে আভাস পাওয়া যায় কষে ঝুলন্ত কালচে জিভের আর ক্ষয়ে-যাওয়া হলদে দাঁতের টুকরোর। কানের একটাতে কাটার দাগ, বেশীর

ভাগ সময় কানদুটো ঝাপটায় সে, কিন্তু মাঝে মাঝে নাছোড়বান্দা মাছি তাড়াবার জন্য আলস্য ভরে কাঁপায় তাদের। একটা কানের পেছনে সামনের ঝুঁটির ক্ষীণ আভাস; নেড়া কপাল বসা, শিরাল কাটা, গলকম্বল ঝুলে পড়েছে শূন্য থলির মতো। মাছি বসা মাত্র মাথা আর ঘাড়ের গাঁট-গাঁট শিরগুলো থরথর করে কাঁপতে থাকে। মুখের ভাবটা কঠোর সহিষ্ণু, গভীর, অনেক দিনের ক্লেশে-ভরা। সামনের পাদুটো হাঁটুর কাছে বেঁকে গেছে, খুরদুটো ফোলা, আর ছোপ-লাগা ডান পায়ে হাঁটুর কাছে হাতের মুঠোর মতো বড়ো একটা দলা। পেছনের পাদুটোর চেহারা তবু ভালো, কিন্তু রাঙের চামড়া একবার যে ঘষে উঠে গিয়েছিল আর ফিরে আসে নি। চর্মসার শরীরের জন্য পাগুলোকে বেজায় লম্বা দেখায়। পাঁজরার হাড়ের গঠন ভালো, কিন্তু এত ঠেলে বেরিয়ে আসা যে মনে হয় হাড়গুলোর ফাঁকে ফাঁকে চামড়া এঁটে বসেছে। কণ্ঠার ওপর দিকটায় আর পিঠে অনেক মারের দাগ, আর পাছায় একটা সদ্য, পচধরা ফোলা ঘা। মেরুদণ্ডে উদ্যত লেজের কালো গোড়ার দিকটা বেশ খানিকটা উঁচিয়ে আছে, বলতে গেলে লোম নেই একেবারে। লেজের কাছে বাদামি পাছায় হাতের তালুর সমান কামড়ের মতো ঘা, তাতে শাদা লোম গজিয়েছে, ঘাড়ের হাড়ে আর একটা ঘায়ের দাগ দেখা যায়। পুরনো পেটের অসুখের ফলে তার হাঁটুর পিছন দিক এবং লেজ কলঙ্করঞ্জিত। তার গায়ের লোম খাটো হলেও খাড়া। কিন্তু আক্তাটার বীভৎস বার্ধক্য সত্ত্বেও তাকে দেখে না ভেবে পারা যায় না যে যৌবনে চমৎকার ঘোড়া ছিল সে, অভিজ্ঞরা দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে কথা বলত।

বাস্তবিক, অভিজ্ঞ হলে বলত যে সারা রাশিয়ায় মাত্র একটা জাতের ঘোড়ারই হয় এ রকম চওড়া হাড়, হাঁটুর প্রশস্ত মালাইচাকি,

এত সুন্দর খুর, সুঠাম পা, গ্রীবার রূপ, যেটা হল সবচেয়ে বড়ো কথা, বড়ো কালো দীপ্ত চোখ, মুখে ও ঘাড়ে খানদানি শিরের গ্রন্থি এবং ছিমছাম চামড়া আর কেশর নিয়ে এত সুন্দর মাথা। সত্যি, ঘোড়াটার বীভৎস অথর্বতা — ডোরার জন্য যেটা আরো বেশী মনে হয় — আর চেহারা ও ভাবভঙ্গির প্রশান্ত আত্মবিশ্বাসের নিদারুণ সংমিশ্রণে রাজকীয় কী একটা আছে, সেটা তাদেরি বিশেষত্ব যারা নিজেদের শক্তি ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন।

শিশিরে-ভেজা মাঠে একলা দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা জীবন্ত ধ্বংসস্তূপের মতো, আর কিছু দূরেই শোনা যাচ্ছে ছত্রভঙ্গ পালের পা ঠোকা, নাসিকাধ্বনি, হ্রেষারব ও দামাল চিঁহি ডাক।

৩

এরি মধ্যে বনের মাথায় উঠে ঘাস আর নদীর বাঁকে ঝকঝকে আলো ফেলেছে সূর্য। শুকিয়ে যেতে যেতে বিন্দু বিন্দু জমেছে শিশির; জলাভূমি আর বনের ওপর এদিকে-সেদিকে কেটে যেতে যেতে সকালের শেষ কুয়াশা ভাসছে পাতলা ধোঁয়ার মতো। মেঘ উঠছে তরঙ্গে, কিন্তু হাওয়া নেই। নদীর ওপারের মাঠে রাইশস্য খাটো সবুজ নলের মতো খোঁচায় খোঁচায় দাঁড়িয়ে, হাওয়ায় উদ্ভিদ আর ফুলের মদির গন্ধ। বন থেকে ভাঙা গলায় ডাকছে একটা কোকিল আর চিৎ হয়ে শুয়ে নেস্তের ভাবছে জীবনের আর কটা দিন বাকি। রাই-ক্ষেত ও জোলো মাঠের ওপর উড়ছে ভারুই পাখি। একটা পিছু-পড়া খরগোস ঘোড়ার পালের মধ্যে এসে পড়ে দূরে একটা ঝোপের তলায় দৌড়ে গিয়ে কান খাড়া করে বসে রইল।

ঘাসে মাথা ডুবিয়ে ঢুলছে ভাস্কা; তাকে বড়ো বড়ো চক্কর দিয়ে জোয়ান ঘুড়ীগুলো ঢালু জায়গাটার নীচের দিকটায় ছড়িয়ে পড়েছে। বয়স্ক যারা তারা নাক দিয়ে শব্দ করে কেউ বিরক্ত করতে পারবে না এমন চরার জায়গা খুঁজে নিয়ে শুধু রসালো ঘাস চিবোতে লাগল, পেছনে শিশিরে রেখে গেল পায়ে চলার ঝকঝকে একটা ছাপ। কিছু না ভেবে গোটা পালটা চলল এক দিকে। আর আবার সেই জুল্দিবা আগে আগে ভারিক্কি চালে পা ফেলে আরো দূরে যাবার পথ দেখাল সবাইকে। জোয়ান কালো মুশ্কার এই প্রথম বাচ্চা হয়েছে, লেজ তুলে চিঁহি ডেকে বারবার তার পাশে ঘেঁষে-আসা, হাঁটু থরথর-করে-কাঁপা, বেগুনি রঙের বাচ্চাটার দিকে নাসিকাধ্বনি করছে সে। সাটিনের মতো চকচকে মসৃণ গা যার সেই সোয়ালো নামের খয়েরি রঙের ঘুড়ীটার এখনো বাচ্চা হয় নি। ঘাস নিয়ে খেলা-করা তার মাথাটা এত নামানো যে রেশমের মতো মসৃণ কালো সামনের ঝুঁটিতে ঢাকা পড়ে গেছে কপাল আর চোখ; ঘাসের কুচি দাঁতে ছিঁড়ে শিশিরে-ভেজা লোমওয়ালা পা দিয়ে ছুঁড়ে মারছে। ওদের মধ্যে একটি বড়োসড়ো বাচ্চা, বিশেষ একটা খেলা ভেবে নিশ্চয়, খাটো ঝাঁকড়া লেজ তুলে এরি মধ্যে ছাব্বিশ বার চক্কর দিয়েছে মাকে, আর মা'টি ধীরেসুস্থে ঘাস খেয়ে চলেছে, ছেলের রকমসকম এতদিনে তার চেনা হয়ে গেছে, শুধু এক একবার বড়ো কালো চোখ মেলে তাকাচ্ছে তার দিকে। কালো রঙের বড়ো মাথাওয়ালা একেবারে পুঁচকে একটা ঘোড়া কান খাড়া করে খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে দেখছে খেলুড়েটিকে, দৃষ্টিটা ঈর্ষার বা নিন্দের বলা কঠিন। তার সামনের ঝুঁটিটা তাজ্জবভাবে খাড়া হয়ে উঠেছে কানদুটোর মধ্যে, লেজটা তখনো মায়ের পেটে থাকার সময়কার মতো একপাশে বেঁকা। কয়েকটা বাচ্চা বাঁটে

মুখ দেকার জন্য অধৈর্যভরে মায়েদের পেটে গুঁতোচ্ছে, কয়েকটা আবার মায়েদের ডাকে কর্ণপাত না করে ছুটে চলে যাচ্ছে ঠিক উল্টো দিকে ক্ষিপ্র বেটপ গতিতে, যেন কী একটা জিনিসের খোঁজে, তারপর অকারণে হঠাৎ থেমে চেঁচাচ্ছে তারস্বরে। অন্যেরা আবার পা ছড়িয়ে হয় শুয়ে আছে ঘাসে নয় ঘাস ছিঁড়তে শিখছে বা পেছনের পা দিয়ে কানের পেছনটা চুলকে নিচ্ছে। দুটো ঘুড়ীর কিছু দিনের মধ্যেই বিয়োবার কথা, তারা অন্যদের কাছ থেকে সরে গিয়ে কষ্টেসৃষ্টে এগিয়ে একসঙ্গে ঘাস খাচ্ছে। তাদের অবস্থা দেখে অন্যেরা সমীহ করে সন্দেহ নেই, কাছে বিরক্ত করার সাহস হচ্ছে না কোনো বাচ্চার। কোন খেলুড়ে সাহস ভরে কাছে গিয়ে পড়লে, কান বা লেজের একটু সঙ্কোচনেই টের পেয়ে যাচ্ছে ব্যবহারটা কত অসমীচীন।

জোয়ান পালের ঘোড়া আর এক বছর বয়সের ঘুড়ীগুলোর ভাবগতিক বড়োদের মতো; তারা লাফাচ্ছে কচিৎ কখনো বা হুল্লোড়ে বাচ্চাগুলোর সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। ঘাস চিবোনো চলেছে অতিশয় গাম্ভীর্যে, রাজহাঁসের মতো ঘাড় বেঁকিয়ে, ছোট ঝাঁটার মতো লেজ দুলিয়ে, যেন তাদেরো রীতিমত লেজ আছে। বড়োদের মতো কখনোসখনো শুয়ে পড়ে গড়াগড়ি দিয়ে নিচ্ছে তারা, বা এ ওর পিঠ চুলকে দিচ্ছে। সবচেয়ে ফূর্তি হল দু-তিন বছরের ঘোড়া আর পাল-না-খাওয়া ঘুড়ীগুলোর। সোমত্ত ফূর্তিবাজ বয়স্কারা একটা আলাদা দল পাকিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। শোনা যাচ্ছে তাদের পা ঠোকাঠুকি, চাট মারার শব্দ, মিহি ও মোটা সুরে হ্রেষারব। কাছাকাছি জড়ো হয়ে এ ওর ঘাড়ে মাথা রেখে শুঁকছে পরস্পরকে, লাফ মারছে আর মাঝে মাঝে নাক দিয়ে শব্দ করে, লেজের বাহার দেখিয়ে এ ওর সামনে ছেনালের মতো পুরো আর আধা কদমের

মাঝামাঝি একটা চালে নিজেদের জাহির করে হাঁটছে। কুমারীদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর আর দুষ্টু গোছের হল বাদামি রঙের ঘুড়ীটা। সে যাই করে অন্যেরাও দেখাদেখি তাই করছে। যেখানেই যায়, পিছু পিছু চলেছে সুন্দরী কুমারীদের গোটা দলটা। আজ সকালে বিশেষ করে তার খেলার মেজাজ। খোশ মেজাজটা এসেছে ঠিক যেমন করে মানুষের আসে। নদীতে বুড়ো আক্তা ঘোড়াটার সঙ্গে দুষ্টুমি করার পর জলের ধার হয়ে ছুটেছে পাগলের মতো, কী একটাতে ভয় পাবার ভান করে, নাক দিয়ে একটা আওয়াজ ছেড়ে প্রাণপণ বেগে দৌড়িয়ে চলে গেছে জোলো মাঠে, ফলে তাকে এবং তার পিছু পিছু ছুটে-যাওয়া অন্যদের ধাওয়া করতে হয় ভাস্কাকে ঘোড়া ছুটিয়ে। কিছু খেয়ে নিয়ে ঘুড়ীটা মাটিতে গড়াগড়ি দিল, তারপর বুড়ী ঘুড়ীগুলোর একেবারে নাকের ডগায় তীরবেগে দৌড়িয়ে তাদের বিরক্ত করতে থাকল। তারপর মায়ের কাছ থেকে একটা বাচ্চাকে ভাগিয়ে, যেন তাকে কামড়াতে চায় এমনভাবে ছুটল পেছনে। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে খাওয়া স্থগিত রাখল মা, বাচ্চাটা চেঁচাতে লাগল করুণ সুরে, কিন্তু তাকে ছুঁল না পর্যন্ত বাদামি রঙের ঘুড়ীটা, বান্ধবীদের মনোরঞ্জনের জন্য ওকে একটু ভয় পাইয়ে দেওয়া শুধু, ওরা তার দুষ্টুমিটা দেখছিল মহা আনন্দে। নদীর ওদিকে দূরের রাই-ক্ষেতে কাঠের লাঙল নিয়ে ছাই রঙের ঘোড়া চালাচ্ছিল একটি চাষী, এবার তার মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার বেজায় সখ হল ঘুড়ীটার। থেমে পড়ে বেশ জাঁকে মাথা খাড়া করে, গা ঝেড়ে নিয়ে নরম মধুর চিঁহি ডাকল একটানা সুরে। ডাকটা দুষ্টু আর আবেগময়, কিছুটা বিষণ্ণ। বাসনা, প্রেমের প্রতিশ্রুতি, প্রেমের জন্য ব্যাকুলতা সে ডাকে।



নলখাগড়ার ঝোপে লাফিয়ে লাফিয়ে একটা সারস বান্ধবীকে ডাকছে তীব্র আবেগে, প্রেমের গান গাইছে একটা কোকিল আর একটা লার্ক পাখি, ফুলগুলো হাওয়ায় মিষ্টি মধুর রেণু ছড়াচ্ছে এ ওর দিকে।

চিঁহি ডাকে ঘুড়ীটা জানাল, "আমি সোমত্ত, সুন্দরী আর জোয়ান, তবু প্রেমের মধুর স্বাদ আমাকে এখনো দেয় নি কেউ; আর বলতে কী, প্রেমপূর্ণ নয়নে কেউ এখন পর্যন্ত তাকায় নি আমার দিকে, কেউ না।"

আর এই অর্থঘন চিঁহি ডাক বিষণ্ণ উচ্ছলতায় ঢালু পেরিয়ে ক্ষেতের ওপর দিয়ে কানে পৌঁছল দূরের ছাই রঙের ঘোড়াটার। কান খাড়া করে সে থেমে গেল। চাষী বাকলের জুতো দিয়ে লাথি মারল তাকে, তবু রুপালী আওয়াজটায় মোহমুগ্ধ হয়ে সে নিশ্চল দাঁড়িয়ে সাড়া দিয়ে ডাকল। চটে উঠে চাষী রাশ টেনে পেটে মারল আর একটা লাথি, এবার এত জোরে যে ডাক শেষ না করে চলতে শুরু করল ঘোড়াটা। কিন্তু তার মনে এসেছে মধুর একটা বিষণ্ণতা, তার তীব্র কামনার ডাক আর চাষীর ক্রুদ্ধ স্বর দূরের রাই-ক্ষেত থেকে এপারের ঘোড়ার দলটায় শোনা গেল অনেকক্ষণ।

ঘুড়ীটার গলা শোনা মাত্র এত মাথা ঘুরে গিয়েছিল ছাই রঙের ঘোড়াটার যে কাজের কথা ভুলে যায় সে; তাহলে কান খাড়া করে বিস্ফারিত নাসারন্ধ্রে হাওয়া টেনে নিতে, ঝুঁকে পড়ে নবীন সুন্দর শরীরের প্রতি অঙ্গে থরথর করে কেঁপে উঠে ডাকার সময় তার সমস্ত রূপটা চোখে পড়লে ঘোড়াটার মনের ভাবটা কী হত?

কিন্তু ঘুড়ীটা বেশীক্ষণ আবেগের হাতে নিজেকে ছেড়ে রাখল না। ছাই রঙের ঘোড়ার ডাকটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই সে আর একবার ডেকে মাথা নামিয়ে পা দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল, তারপর

ছুটল ডোরাদার আক্তা ঘোড়াটাকে বিরক্ত করে জ্বালিয়ে মারতে। কমবয়সীদের সব ঠাট্টা ইয়ার্কির ধাক্কাটা সামলাতে হয় তাকে, মানুষের চেয়ে বেশী তারা তাকে জ্বালায়। অথচ সে কারো কোনো ক্ষতি করে নি, না মানুষের, না ঘোড়ার। মানুষের এখনো তাকে দরকার, কিন্তু জোয়ান ঘোড়াগুলো তাকে জ্বালায় কেন?

৪

ওর বয়স হয়েছে, ওরা এখনো ছোকরা; ও চর্মসার, ওদের চামড়া চকচকে; ও বিষণ্ণ, ওরা হাসিখুশি। এক কথায় ও হল পর, বিজাতীয়, একেবারে অন্য ধরনের জীব, তাই করুণার পাত্র হতে পারে না। ঘোড়াদের দুঃখ হয় শুধু নিজেদের নিয়ে, কচিৎ কখনো হয় স্বজাতির তাদেরো প্রতি যাদের ওরা নিজেদের মতো দেখতে ভাবে। কিন্তু আক্তা ঘোড়াটা যে বুড়ো, চর্মসার ও কুৎসিত, সেটা কি তার দোষ? তা মনে হত না। কিন্তু অন্য ঘোড়াদের মতে দোষটা তারি, দোষ শুধু তাদেরি নেই যারা কমবয়সী, বলিষ্ঠ ও সুখী, যাদের সামনে পড়ে রয়েছে বিশ্বজগৎ, সামান্য কারণে যাদের পেশী কেঁপে ওঠে আর লেজ খাড়া হয়ে যায়। হয়ত এটা বুঝত ডোরাদার আক্তা ঘোড়াটা, আর তাই শান্ত মুহূর্তে মেনে নিত যে বয়স পেরিয়ে যাওয়ার পরও বেঁচে থাকার দোষটা তারি, এজন্য সাজা তার প্রাপ্য। তবু সে তো ঘোড়া বটে, তাই জীবন শেষে ওদের সবায়ের কপালে যা ঘটবে তাই নিয়ে শুধু তাকে জ্বালাতন করা, — ছোকরাগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে বিষণ্ণ, ক্রুদ্ধ ও অপমানিত বোধ না করে পারত না। ঘোড়াগুলোর হৃদয়হীনতায় খানদানি কী একটা মনোভাব আছে। ওদের প্রত্যেকের জন্ম

স্বনামধন্যা স্মেতাঙ্কার বংশে, আস্তো ঘোড়াটার বংশ কেউ জানে না। ও হল একটা কেউ, যাকে ঘোড়ার মেলায় বছর তিনেক আগে কেনা হয় আশি রুবলের কাগজী টাকায়।

যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে এমনভাবে একেবারে তার নাকের ডগায় গিয়ে একটা ধাক্কা মারল বাদামি রঙের ঘুড়ীটা। এটা তার অভ্যেস হয়ে গেছে। চোখ না খুলে কান নামিয়ে দাঁত বের করে দেখাল সে। তার দিকে পেছন ফিরে ঘুড়ীটা একটা চাট লাগাবার ভান করাতে চোখ খুলে সে সরে গেল। ঘুম কেটে গেছে, শুরু হল ঘাস খাওয়া। আবার মন্থর গতিতে কাছে এল ঘুড়ীটা আর তার সখীরা। দু বছর বয়সের একটা বোকা, কেশরহীন ঘুড়ী সব সময়ে বাদামি রঙের ঘুড়ীটাকে নকল করত, সে তার পাশে পাশে এসে অনুকরণ করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলল, নকলকারীরা হামেশা যা করে। বাদামি ঘুড়ীটা সাধারণতঃ এমনভাবে তার কাছে যেত যেন নিজের কাজে ব্যস্ত, তার দিকে না তাকিয়ে একেবারে নাকের ডগা হয়ে যেত, ফলে ঘোড়াটা ঠিক করে উঠতে পারত না চটা উচিত কি না, আর তার সে অবস্থাটা সত্যিই মজার। এখনো তাই করল ঘুড়ীটা, কিন্তু তার নেড়ী সখীটি ফূর্তির চোটে নিজের বুক দিয়ে প্রাণপণে ধাক্কা দিল ঘোড়াটাকে। আর সে দাঁত বের করে চেঁচিয়ে তাকে ধাওয়া করে কামড় বসাল রাঙে এত ক্ষিপ্রভাবে যে সেটা তার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত। পাছা দিয়ে ধাক্কা মারল তাকে নেড়ী ঘুড়ীটা, পাঁজরের শুকনো উদ্গত হাড় ঝনঝনিয়ে উঠল। ঘোঁৎ করে ঘুড়ীটার পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে সুবুদ্ধি হল ঘোড়াটার, গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সরে গেল অন্য দিকে। নেড়ীকে আক্রমণের দুঃসাহসের জন্য পালের সবকটা ছোকরা আর ছুকরী শোধ তুলবে বলে দৃঢ়সংকল্প বোঝা গেল, বাকি

দিনটা এমন নাছোড়বান্দাভাবে আক্তা ঘোড়াটার পেছনে তারা লাগল যে খাবার সুযোগ পর্যন্ত তার হল না, মুহূর্তের জন্য শান্তিতে থাকতে দিল না তাকে। কয়েকবার তো ঘোড়াপালক তার কাছ থেকে তাদের তাড়িয়ে দিল, ওদের কী হয়েছে মাথায় ঢুকল না তার। ঘোড়াটা এত দুঃখিত হয়েছিল যে বাড়ি ফেরার সময় হওয়াতে নিজেই গেল নেস্তেরের কাছে, জিন পরিয়ে নেস্তের পিঠে চাপাতে সে কিছুটা খুশি ও নিশ্চিন্ত বোধ করল।

ভগবান জানেন, বুড়ো ঘোড়াপালককে পিঠে বয়ে বাড়িতে নিয়ে যেতে যেতে কী ভাবছিল বুড়ো আক্তা ঘোড়া। হয়ত পিছু-লাগা কমবয়সীদের নিষ্ঠুরতার কথা ভাবছিল সখেদে; কিম্বা হয়ত বুড়োদের স্বভাব মতো অপমানকারীদের মাফ করে দিয়েছিল সে গর্বিত নিঃশব্দ অবহেলায়। কিন্তু আস্তাবলের আঙিনায় না পৌঁছনো পর্যন্ত নিজের চিন্তাভাবনা সে কোনো মতে প্রকাশ করল না।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় কয়েকজন আত্মীয়স্বজন দেখা করতে এল নেস্তেরের সঙ্গে। জমিদার বাড়ির চাকর-বাকরদের কুঁড়েঘরের কাছে ঘোড়াগুলোকে নিয়ে যাচ্ছে, চোখ পড়ল তার কুঁড়েঘরের অলিন্দে বাঁধা একটা ঘোড়া আর গাড়ি। বাড়ি পৌঁছতে এত তাড়া তার যে খোঁয়াড়ে ঘোড়াগুলোকে ঢুকিয়ে দিয়েই আক্তা ঘোড়াটাকে ছেড়ে চেঁচিয়ে ভাস্কাকে বলল ওর জিনটা খুলে নিতে। তারপর ফটকে তালা দিয়ে গেল দোস্তদের সঙ্গে মিলতে। স্মেতাঙ্কার দৌহিত্র কন্যাকে বাজারে-কেনা বেজন্মা 'ঘেয়ো ঘোড়াটা' অপমান করাতে হয়ত গোটা পালটার খানদানি মান ক্ষুণ্ণ হয়, হয়ত সওয়ারীবিহীন সুউচ্চ জিনসাজে আক্তা ঘোড়াটার চেহারা অন্যদের অতিশয় তাজ্জব ঠেকাতে সে রাত্রে একটি অসাধারণ বিচিত্র ব্যাপার

ঘটল খোঁয়াড়ে। বয়স নির্বিশেষে সমস্ত ঘোড়া দাঁত বের করে তাকে ধাওয়া করে এদিকে-ওদিকে তাড়িয়ে, খুর দিয়ে অনেক ঘা বসাল তার ফাঁপা পাঁজরে, যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল সে। আর সহ্য হয় না, ধাক্কা ঠেকাবার ক্ষমতা আর নেই যখন তখন খোঁয়াড়ের মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে পড়ল, মুখে এল অথর্ব বার্ধক্যের অশক্ত ক্রোধ, তারপর হতাশার ভাব। কান ঝুলিয়ে সে হঠাৎ এমন একটা জিনিস করে বসল যে পিছু-ধাওয়া সমস্ত ঘোড়া একেবারে থেমে পড়ল। সবচেয়ে প্রবীণা ভিয়াজপুরিখা কাছে এসে তাকে শুঁকে নিয়ে গভীর নিঃশ্বাস নিল একটা। গভীর নিঃশ্বাস নিল সেও।

৫

চন্দ্রালোকিত খোঁয়াড়ের মাঝখানে ঘোড়াটার দীর্ঘ শীর্ণ মূর্তি, পিঠে উঁচু জিনসাজ। যেন এইমাত্র তার কাছে শোনা নতুন অভিনব কোনো কথায় তাজ্জব হয়ে তাকে ঘিরে নিস্তব্ধ নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে অন্য ঘোড়াগুলো। আর সত্যি নতুন অপ্রত্যাশিত কিছু একটা তারা জেনেছে।

প্রথম রাত্রি

'লিউবেজ্নীয় ও বাবা-র সন্তান আমি। কুলজি মতে আমার নাম হল প্রথম মুজিক। কুলজি নাম প্রথম মুজিক বটে, কিন্তু আমাকে বরাবর ডাকত পক্ষিরাজ বলে, নামটা দিয়েছিল লোকে

আমার দীর্ঘ ক্ষিপ্র পদক্ষেপের জন্যে, যার তুলনা ছিল না সারা রাশিয়ায়। আমার রক্তের চেয়ে কুলীন রক্ত নেই দুনিয়ার কোনো ঘোড়ার; তোমাদের কখনো বলতাম না কথাটা — বলে কী লাভ? তোমরা কখনো চিনতে না আমায়, এই যেমন ভিয়াজপুরিখা চিনতে পারে নি, ও তো আমার সঙ্গে ছিল খেত্রনোভয়েতে — এইমাত্র আমাকে চিনল। ভিয়াজপুরিখা সায় না দিলে কথাটা এখনো বিশ্বেস হত না তোমাদের, আর আমি নিজে কখনো তোমাদের জানাতাম না — কয়েকটা ঘোড়ার আহা-উহুতে কোনো প্রয়োজন নেই আমার — কিন্তু তোমরা সেটা চাইলে। হ্যাঁ, আমি হলাম সেই পক্ষিরাজ যার খোঁজে সারা মুলুক তোলপাড় করে পাত্তা পাচ্ছেন না অশ্বকোবিদরা, সেই পক্ষিরাজ যাকে কাউণ্ট নিজে জানতেন, তাঁর পেয়ারের 'রাজহাঁস'কে দৌড়ে টেক্কা দিয়েছিলাম বলে যাকে তিনি তাড়িয়ে দেন পাল থেকে।'

'জন্মকালে 'ডোরাদার ঘোড়া' কাকে বলে জানতাম না। ভেবেছিলাম আমি শুধু একটা ঘোড়া। মনে আছে আমার রঙ নিয়ে প্রথম কথা ওঠাতে কী দারুণ বিচলিত হয়েছিলেন মা, আর আমি নিজে। মনে হয় আমি ভূমিষ্ঠ হই রাত্রিবেলায়, সকাল হল, ততক্ষণে মা আমাকে চেটে চেটে সাফ করেছেন, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলাম। মনে আছে কী যেন একটা চাইছিলাম, সবকিছু আমার কাছে ঠেকছিল অত্যন্ত আশ্চর্য অথচ অত্যন্ত সহজ। লম্বা গরম একটা বারান্দায় আমাদের চালা, দরজায় গরাদে দেওয়া, গরাদের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ত সবকিছু। দুধের বাঁট এগিয়ে দিলেন মা, কিন্তু আমি তখনো এত বোকা যে মুখটা একবার গুঁজছি সামনের

পায়ে, একবার গামলার বুকে। হঠাৎ দরজায় তাকিয়ে মা পায়ের তলা দিয়ে আমাকে সরিয়ে দিলেন। সেদিনকার সহিসটা গরাদের ফাঁক দিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল।

''এই দেখ, বাবা-র বাচ্চা হয়েছে,' বলে দরজার খিল খুলে টাটকা খড়ের ওপর পা ফেলে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। 'দেখ দেখ, কী ডোরারে বাবা, একেবারে ছাতারের মতো।'

'সোঁ করে ওর কাছ থেকে সরে গিয়ে হাঁটু দুমড়ে বসে পড়লাম।

''এই ক্ষুদে শয়তান!' বলে উঠল সে।

'মা অস্বস্তি বোধ করছিলেন বটে, কিন্তু আমাকে আগলাবার কোনো চেষ্টা করলেন না; কেবল গভীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে এক পাশে সরে গেলেন। আর সহিসগুলো এসে আমাকে দেখতে লাগল। একজন গেল অশ্বপালককে ডাকতে। আমার গায়ের রঙ নিয়ে সবাই হাসিতামাসা করতে লাগল, নানান মজার নাম দেওয়া হল আমাকে। নামগুলোর অর্থ কী না ঢুকল আমার মাথায়, না মায়ের। আমাদের বংশে বা আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে তখন পর্যন্ত কোনো ডোরাদার ঘোড়া জন্মায় নি। রঙদার ঘোড়া হওয়াটা যে দোষের আমাদের ধারণা ছিল না তবু আমার শক্তি আর সুন্দর গড়নের জন্যে সবাই বাহবা দিতে কসুর করল না।

''দেখ দিকি, কী তেজী বাচ্চাটা!' বলল সহিস। 'ওর নাগাল পাওয়া ভার।'

'কিছুক্ষণ পরে অশ্বপাল এল; দেখে অবাক সে, এমন কি মনে হল দুঃখিত হয়েছে।

''কোত্থেকে জুটল এই ক্ষুদে রাক্ষসটা,' বলল সে। 'জেনারেল সাহেব ওকে দলে কখনো রাখবেন না। ধুত্তোর ছাই, তুই তো

আমাকে ডোবালি বাবা,' মায়ের দিকে ফিরে বলল। 'ওই ডোরাদার ভূতটার জন্ম না দিয়ে একটা নেড়া বাচ্চা দিলেই পারতিস!'

'কিছু বললেন না মা, শুধু আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন; এমন অবস্থায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলাটা তাঁর অভ্যেস।

''কোন শয়তানের সঙ্গে এ বেটার আদল? দেখতে ঠিক চাষীর মতো,' অশ্বপালক বলে চলল। 'দলে রাখা যাবে না একে, তাহলে আমাদের দুর্নাম হবে, অথচ ঘোড়া হিসেবে বেটা খাসা — চমৎকার,' বলল সে; আমাকে যেই দেখল সেই বলল কথাটা। কিছু দিন পরে জেনারেল সাহেব স্বয়ং আমাকে দেখতে এলেন। আবার সবাই আঁতকে উঠল, আমার চামড়ার রঙের জন্যে বকাবকি করল আমাকে ও মাকে। 'তবু খাসা ঘোড়াটা, চমৎকার ঘোড়া,' যারা আমাকে দেখে তারাই একবাক্যে মানল।

'বসন্তকাল পর্যন্ত আমরা মাদী ঘোড়ার আস্তাবলে রয়ে গেলাম যে যার মায়ের কাছে। সূর্যের তাপে ঢালা-ছাতের বরফ গলতে শুরু করেছে। তখন মাঝে মাঝে মায়েদের সঙ্গে টাটকা খড় বিছানো বড়ো উঠোনে যেতে দেওয়া হত। এখানে প্রথম আলাপ হল নিকট ও দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে। দেখলাম আলাদা আলাদা দরজা থেকে বাচ্চা নিয়ে বেরিয়ে আসছে সে সময়কার সব নামজাদা মাদী ঘোড়া। তাদের মধ্যে ছিল বুড়ী গলাঙ্কা, স্মেতাঙ্কার মেয়ে মুশ্‌কা, ক্রাস্‌নুখা আর জিন-ঘোড়া দব্রখোতিখা — তখনকার সব স্বনামধন্যারা। বাচ্চাদের নিয়ে জড়ো হল তারা, রোদ্দুরে বেড়াল, খড়ের ওপর লুটোপুটি খেল, শুঁকল পরস্পরকে, ঠিক সাধারণ ঘোড়াদের মতো। সেই চাঁদের হাটের কথা আমার আজও মনে আছে। বললে তোমাদের অবাক লাগবে, হয়ত বিশ্বেস হবে না যে এককালে আমিও ছিলাম নবীন ও চঞ্চল, সত্যি সত্যি ছিলাম।

সেখানে দেখা হয় ভিয়াজপুরিখার সঙ্গে, ওর বয়স তখন এক বছর — স্বভাবটা কোমল, হাসিখুশি আর চঞ্চল। তবু বলতেই হবে, চটাবার মতলবে বলছি তা নয় — ওর মতো জাতঘোড়া ক্বচিৎ হয় তোমরা আজ ভাব, কিন্তু সে সব দিনে দলের মধ্যে ওকে নগণ্য বলে ধরা হত। ও নিজেই কথাটা মেনে নেবে।

'আমার ডোরা দাগ মানুষের অপছন্দ কিন্তু সেটা অসম্ভব ভালো লাগল ঘোড়াগুলোর। ওরা সবাই আমাকে ঘিরে তারিফ করল, খেলল আমার সঙ্গে। লোকদের কথা মন থেকে মুছে যেতে লাগল, সুখী বোধ করলাম। কিন্তু প্রথম দুঃখ পেতে দেরী হল না, আর পেলাম মায়ের কাছ থেকে। বরফ গলতে শুরু করেছে, চালার নীচে চড়ুই-এর কিচির-মিচির, হাওয়ায় বসন্তের ভরাট গন্ধ, তখন আমার প্রতি মায়ের মনোভাব বদলে গেল। বাস্তবিক, তাঁর ভোল বদলে গেল; ঘেরা উঠোনটায় তীরের মতো দৌড়িয়ে নাচানাচি করতেন, সেটা তাঁর বয়সে একেবারে অশোভন; কিম্বা হয়ত জাগ্রত-স্বপ্নে আনমনা হয়ে গিয়ে নীচু গলায় ডাকতেন; অন্য ঘুড়ীদের হয়ত কামড়ে দিতেন আর চাট লাগাতেন; আমাকে শুঁকে তাচ্ছিল্যে হয়ত নাসিকাধ্বনি করে উঠতেন, বা বাঁট থেকে ঠেলে সরিয়ে নিজের খুড়তুতো বোন কুপ্‌চিখার কাঁধে মাথা রেখে রোদে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কী ভাবতে ভাবতে তার পিঠ চুলকে দিতেন। একদিন অশ্বপাল এসে অন্যদের দিয়ে ওঁকে লাগাম পরাল, নিয়ে যেতে বলল তারপর বাইরে। মা জোরে ডেকে উঠলেন, সাড়া দিয়ে পিছু পিছু দৌড়লাম আমি, কিন্তু তিনি এমন কি আমার দিকে তাকালেন না পর্যন্ত। তিনি বেরিয়ে গেলেন, দরজায় তালা পড়ল, সহিস তারাস আমাকে জাপটে ধরে রইল। আমি হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে সহিসকে ফেলে দিলাম খড়ের ওপর, কিন্তু দরজা বন্ধ, মায়ের

ডাক ক্রমশঃ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে কানে এল। আর সে ডাকে আমাকে আহ্বানের সুর নয়, সম্পূর্ণ অন্য কিছু। সে ডাকে সাড়া দিয়েছিল আর একটা কণ্ঠ, গভীর জোরালো একটি কণ্ঠ, পরে জেনেছি দোব্বির কণ্ঠ, তাকে দুজন সহিস ধরে নিয়ে যাচ্ছিল মায়ের সঙ্গে মোলাকাতে। আমার বুক ভেঙে গেল একেবারে — চালা ছেড়ে তারাস চলে গেল, চোখে পড়ল না পর্যন্ত। মনে হল মায়ের ভালোবাসা হারিয়েছি চিরতরে। আর এ সবকিছুর জন্যে দায়ী আমার ডোরাগুলো, আমার রঙ নিয়ে অন্যদের মন্তব্যের কথা মনে করে ভাবলাম; আর এত ভয়ংকর রাগ হল যে চালার দেয়ালে মাথা আর হাঁটু ঠুকে চললাম যতক্ষণ না দরদর ঘাম ছুটে শ্রান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়লাম।

'মা ফিরে এলেন অল্পক্ষণের মধ্যে। কানে এল বারান্দা হয়ে বেশ অস্বাভাবিক কদমে আসছেন। দরজা খুলে দেওয়া হল; তাঁকে চেনা ভার, এত নবীন আর সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমাকে শুঁকে নাসিকাধ্বনি করে হাসতে লাগলেন। সবকিছুতে তাঁর এ কথাটা ফুটে উঠল যে আমাকে আর ভালোবাসেন না। বললেন কী সুন্দর চেহারা দোব্বির, তাকে কত না ভালোবাসেন! বার বার তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল দোব্বির কাছে; আর মা আর আমার সম্পর্ক দিনে দিনে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এল।

'শিগ্‌গিরই ঘাস খেতে ছেড়ে দেওয়া হল আমাদের। অতঃপর যে নতুন আনন্দের স্বাদ আমি পেলাম তাতে মায়ের ভালোবাসা হারানোর ক্ষতিপূরণ কিছুটা হল। জুটল বন্ধু আর সহচর, একসঙ্গে শিখলাম ঘাস কী করে খেতে হয়, বড়োদের মতো ডাকতে হয়, লেজ তুলে মা'দের চক্কর দিতে হয়। খাসা ছিল সে সব দিন। আমার সব দোষ মাফ, সবাই আমাকে ভালোবাসে, খাতির করে,

প্রশ্রয় দেয়। বেশী দিন নয়। শিগ্‌গিরই ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার ঘটল।' দীর্ঘনিঃশ্বাস টেনে আক্তা ঘোড়া অন্যদের কাছ থেকে সরে গেল।

ভোর হয়েছে। কিঁচকিঁচ করে উঠল দরজাগুলো, ভেতরে ঢুকল নেস্তের। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল ঘোড়াগুলো। আক্তা ঘোড়ার পিঠে জিন কষে নেস্তের পালটাকে নিয়ে গেল চরাতে।

৬

দ্বিতীয় রাত্রি

সন্ধ্যেবেলায় চালাতে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা আবার আক্তা ঘোড়ার চারিদিকে ভিড় করে দাঁড়াল।

সে বলে চলল:

'অগষ্ট মাসে মার কাছছাড়া করল আমাকে। তাতে বিশেষ দুঃখ পেলাম না। দেখলাম আমার ছোট ভাই (বিখ্যাত উসান) ভূমিষ্ঠ হবার আর দেরী নেই, আমি আগে মায়ের কাছে যা ছিলাম এখন আর তা নই। তাতে হিংসে হল না। মায়ের প্রতি আমার ভালোবাসা জুড়িয়ে গেছে মনে হল। তাছাড়া জানা ছিল মায়ের কাছছাড়া করে আমাকে রাখা হবে বাচ্চাদের আস্তাবলে, সেখানে আমরা থাকব দুয়ে-দুয়ে, তিনে-তিনে, প্রতিদিন হাওয়া খাওয়াতে আমাদের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে। পেয়ার নামের একটা ঘোড়ার সঙ্গে এক চালায় আমাকে রাখা হল। পেয়ার ছিল জিনঘোড়া, পরে সম্রাটের খাস ঘোড়া হয়, সম্রাট শুদ্ধ তার ছবি আঁকে চিত্রকরেরা, মূর্তি বানায় ভাস্করেরা। তখন ও ছিল মামুলি একটা বাচ্চা, গায়ের

চামড়া নরম চকচকে, গলাটা রাজহাঁসের মতো, আর পাগুলো রোগা লিকলিকে বাজনার তার যেন। হামেশা ওর ফূর্তি, স্বভাবটা ভালো আর অমায়িক, লাফানো-ঝাঁপানো বন্ধুদের চাটা আর ঘোড়া আর মানুষদের জব্দ করা ওর প্রিয়। একসঙ্গে থাকাতে আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেলাম, সারা যৌবন ছিল সে দোস্তি। সে সময়টাতে ও ছিল হাসিখুশি আর ছেবলা। তখনি ওর শুরু হয়েছে ঘুড়ীগুলোর প্রেমে পড়া, তাদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করা; আমার সরলতা নিয়ে হাসাহাসি করত ও। আত্মসম্মানের তাগিদে ওর নকল করতে গিয়ে বেগতিকে পড়ে গেলাম। অচিরে ভালোবেসে ফেললাম একজনকে। এই অকাল মোহ আমার অদৃষ্টে সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন এনে দিল।

'হ্যাঁ, পড়লাম প্রেমে। ভিয়াজপুরিখা আমার চেয়ে এক বছরের বড়ো, খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল ওর সঙ্গে। কিন্তু হেমন্তের শেষে চোখে পড়ল যে ও আমাকে দেখে এড়িয়ে চলতে শুরু করেছে... প্রথম প্রেমের করুণ কাহিনীটির আদ্যোপান্ত বলার চেষ্টা করব না, ওর প্রতি আমার উন্মত্ত অনুরাগের কথা ওর নিজেরি মনে আছে। সে অনুরাগের ফলে আমার জীবনে সবচেয়ে গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। ঘোড়াপালকেরা ওকে আমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দিল, বেধড়ক মারল আমাকে। সন্ধ্যেবেলায় বিশেষ একটা চালায় আমায় নিয়ে যাওয়া হল। সারা রাত কাঁদলাম আমি, যেন পরের দিনের ঘটনাটির পূর্বাভাস পেয়েছিলাম।

'সকালে বারান্দা হয়ে আমার চালায় জেনারেল সাহেব এলেন, সঙ্গে অশ্বপাল, সহিস আর ঘোড়াপালকেরা, শুরু হল ভয়ঙ্কর হৈচৈ। অশ্বপালকে বেজায় ধমকাতে লাগলেন জেনারেল সাহেব, অশ্বপাল সাফাই গাইতে লাগল এই বলে যে আমাকে বাইরে

না নিয়ে যাবার হুকুম সে দিয়েছিল, কিন্তু কথা শোনে নি সহিসগুলো। জেনারেল সাহেব বললেন সবাইকে তিনি চাবকাবেন আর আমাকে খাসী করে দিতে হবে। তাঁর সব আদেশ পালন করা হবে বলল অশ্বপাল। হৈচৈ থেমে গেল, চলে গেল ওরা। কিছু বুঝলাম না আমি, কিন্তু আঁচ পেলাম আমাকে নিয়ে কিছু একটা করার মতলব ওদের।'

'পরের দিন থেকে আমার চিঁহি ডাকে ছেদ পড়ল চিরতরে; এখন যা দেখছ তাই হলাম। দুনিয়ার ভোল বদলে গেল আমার কাছে। কোনো কিছুতে আর আনন্দ পাই না, নিজের মধ্যে সরে এসে চিন্তার হাতে আত্মসমর্পণ করলাম। প্রথম প্রথম সবকিছুতে আমার ঘেন্না। এমন কি অন্নজল পর্যন্ত ত্যাগ করলাম, হাঁটা পর্যন্ত, বন্ধুদের সঙ্গে খেলা তো দূরের কথা। মাঝে মাঝে খেয়াল হত লাফালাফি করে জোর কদমে ছুটে ডাক ছাড়ি একবার, কিন্তু তখনি মনে আসত ভয়াবহ প্রশ্নটি: কেন? কিসের জন্যে? আর প্রাণের সমস্ত শক্তি যেন চলে যেত।

'মাঠ থেকে একদিন সন্ধ্যেবেলায় আমাদের পালটিকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে, আমাকে নিয়ে গেল বেড়াতে। দূরে দেখলাম ধুলোর মেঘে-ঢাকা আমাদের ঘুড়ীগুলোর আবছায়া মূর্তি। কানে এল তাদের মুখের হাসি, মাটিতে পা ঠোকার শব্দ। দাঁড়িয়ে পড়লাম, সহিস জোরে টানাতে লাগামটা কেটে বসছে ঘাড়ে, তবু দাঁড়িয়ে এগিয়ে-আসা দঙ্গলটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম, চিরতরে হারানো সুখের পানে লোকে যেমনভাবে চেয়ে থাকে। ওরা কাছে আসাতে চিনলাম সবাইকে একে একে — আমার সব পুরনো

বন্ধুদের, কী সুন্দর, রাজকীয়, চকচকে আর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল তারা। ওদের মধ্যেও কে একজন তাকাল আমার দিকে। লাগামে হেঁচকা টান দিয়ে চলেছে সহিস, কিন্তু ব্যথাটা কিছু নয়। আত্মবিস্মৃত হয়ে আমি আগেকার মতো হ্রেষাধ্বনি করে জোর কদমে ছুটলাম ওদের দিকে। কিন্তু আমার ডাকটা শোনাল করুণ, হাস্যকর আর বেমানান। পুরনো বন্ধুদের কেউ হাসল না বটে, কিন্তু দেখলাম ওদের অনেকে ভব্যতার খাতিরে ফিরে দাঁড়াল অন্যদিকে মুখ করে। বুঝলাম আমার চেহারাটা ওদের কাছে বিশ্রী, করুণ, লজ্জাকর এবং সবচেয়ে বেশী করে হাস্যকর ঠেকছে। আমার লিকলিকে, শির বের করা গলা, বিরাট মাথা। তখন রোগা হয়ে গিয়েছিলাম, লম্বা বিদ্ঘুটে পা, আর বোকার মতো দুলকি চালে আগেকার মতো সহিসকে পরিক্রমণ, সবকিছু নিশ্চয় হাস্যকর দেখাল। আমার ডাকে সাড়া দিল না কেউ, মুখ ঘুরিয়ে নিল সবাই। আর হঠাৎ সমস্ত কিছু বুঝে ফেললাম, বুঝলাম ওদের সবায়ের কাছ থেকে আমি দূরে সরে গিয়েছি চিরতরে। জানি না কী করে সে দিন ফিরেছিলাম আস্তাবলে।

'এ ঘটনাটির আগে থেকেই গম্ভীরতা ও চিন্তার দিকে আমার ঝোঁক দেখা দিয়েছিল; এখন পুরোপুরি সেটা আমাকে পেয়ে বসল। লোকের মনে অবোধ্য ঘৃণাজাগানো আমার ডোরা দাগ, আমার অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত দুর্ভাগ্য, পাল ঘোড়ার খামারে আমার বিচিত্র স্থান, যার বিষয়ে আমি সচেতন, কিন্তু যার কারণ আমার অজ্ঞাত — সব মিলে আমাকে বাধ্য করল নিজের মধ্যে সরে যেতে। ডোরা দাগের জন্যে আমাকে দোষ-দেওয়া মানুষের অবিচার নিয়ে ভাবতাম; ভাবতাম মাতৃস্নেহের আর সাধারণতঃ নারীর প্রেমের ঠুনকো স্বভাব নিয়ে, সে প্রেম তো নির্ভর করে শুধু শারীরিক

কারণের ওপর; সবচেয়ে বেশী ভাবতাম, আমাদের জীবনে এত গুরুতর ভূমিকা যার সেই মনুষ্যপদবাচ্য জন্তুবিশেষের খামখেয়াল নিয়ে, যে খামখেয়ালের ফলে পাল ঘোড়ার দলে আমার অবস্থাটা এমন অদ্ভুত দাঁড়িয়েছে। অবস্থাটার বিষয়ে সচেতন আমি, কিন্তু কেন ভেবে কুলকিনারা পেলাম না। এর মূলে যে মনুষ্যসুলভ খামখেয়াল তা সম্পূর্ণরূপে আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হল একটি ঘটনায়।

'তখন শীতের ছুটি। সারা দিন আমাকে অন্নজল দেওয়া হয় নি। পরে শুনলাম তার কারণ, সহিস নেশায় বুঁদ ছিল। সে দিন অশ্বপাল আমার চালায় আসাতে দেখল আমাকে খাওয়ানো হয় নি, অনুপস্থিত সহিসটির উদ্দেশ্যে বেজায় খিস্তি করে চলে গেল। পরের দিন সহিস ও তার দোস্ত আমাদের চালায় খাবার আনাতে দেখলাম তার বিশেষ একটা ফ্যাকাশে ও মনমরা ভাব, তার লম্বা পিঠে এমন একটা কিছু ছিল যেটা মনোযোগ ও অনুশোচনা আকর্ষণ করে। গরাদে দিয়ে রাগতভাবে খড় ছুঁড়ে দিল সে। মাথাটা বের করে তার কাঁধ পেরিয়ে রাখতে যাচ্ছি, সে নাকে এমন একটা ঘুষি কশাল যে ছিটকিয়ে পিছিয়ে গেলাম। তারপর পেটে একটা লাথি।

''এই ঘেয়ো শয়তানটাই সব আপদের গোড়ায়,' বলল সে।

''কেন, কী হল?' জিজ্ঞেস করল অন্য একটা সহিস।

''বেটা কাউণ্টের ঘোড়ার বাচ্চা দেখতে যায় না, কিন্তু নিজের খাসঘোড়াকে দেখা চাই দিনে দুবার করে।'

''বটে, ডোরাদারটাকে বুঝি ওকে দিয়ে দিয়েছে?' শুধাল আর একজন।

''দিয়ে দিয়েছে না বেচেছে শয়তান জানে শুধু। কাউণ্টের ঘোড়ার বাচ্চাগুলো না খেতে পেয়ে মরুক, তাতে ওর কোনো

পরোয়া নেই, কিন্তু ওর মালকে খেতে দিই নি, কী দুঃসাহস আমার। বলল:

'শুয়ে পড়' আর চাবুক চালাল নিজে। খাঁটি খ্রীশ্চান কিনা! মানুষের চেয়ে জন্তুর প্রতি দরদ বেশী। সবাই জানে বেটা অধার্মিক, গুনে গুনে চাবুক মারল, জানোয়ার বেটা। এমন কি জেনারেল সাহেব পর্যন্ত কাউকে কখনো এত চাবকান নি — পিঠের ছাল চামড়া তুলে নিয়েছে, সত্যি বলছি। বেটার দয়ামমতা বলে কিস্সু নেই।'

'খৃষ্টধর্ম আর চাবকানোর ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে পারলাম, কিন্তু 'ওর খাসঘোড়া', 'ওর মাল' কথাগুলোর মানে কী তখন ঘুণাক্ষরে জানতাম না। মনে হল আমার ও অশ্বপালের মধ্যে কিছু একটা সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে কথাগুলোয়, কিন্তু সম্পর্কটা কী আমার কোনো ধারণা ছিল না তখন। এর বেশ কিছু দিন পরে অন্য ঘোড়াদের কাছছাড়া করা হল আমাকে, শুধু তখনি মানেটা স্পষ্ট হল। আমাকে যে কারো মাল বলা যেতে পারে, তখন আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। আমাকে উল্লেখ করে, জীবন্ত একটা ঘোড়াকে উল্লেখ করে আমার ঘোড়া বলাটা কী অদ্ভুত ঠেকল, ঠিক যেমন অদ্ভুত ঠেকত যদি ও বলত: আমার মাটি, আমার বাতাস, আমার জল।

'তবু কথাগুলো গভীর দাগ কাটল আমার মনে। অনেক তোলাপাড়া করে মানুষের সঙ্গে নানা বিচিত্র সম্পর্কের অভিজ্ঞতার পর শুধু এসব অদ্ভুত কথাগুলো বলতে কী বোঝায় হৃদয়ঙ্গম হল। মানেটা হচ্ছে এই: মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে কাজ নয়, কথা। কিছু করা বা না করার সুযোগ যে তারা উপভোগ করে তা নয়, কয়েকটি বস্তুতে ছকবাঁধা কয়েকটা কথা প্রয়োগ করার

সুযোগ পেলে তারা আনন্দ পায়। সবচেয়ে গুরুত্ব আরোপণ করে যে সব কথায় তাদের অন্যতম হচ্ছে 'আমার', কথাটা তারা প্রয়োগ করে রকমারি জীব আর বস্তুর প্রসঙ্গে, এমন কি জমি, মানুষ আর ঘোড়াও বাদ যায় না। ওরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিয়েছে যে একটি বিশিষ্ট জিনিস প্রসঙ্গে একটি মাত্র লোকের শুধু 'আমার' কথাটি ব্যবহারের অধিকার থাকবে। আর তাদের এই খেলায় যে সবচেয়ে বেশী জিনিসের প্রসঙ্গে কথাটি ব্যবহারের অধিকার পেয়ে যায়, লোকের মতে সেই হল সবচেয়ে সুখী জন। এমনটা কেন হয় আমার কল্পনার বাইরে, কিন্তু ব্যাপারটা হল এই। এতে প্রত্যক্ষ উপকারটা কী হয় অনেক দিন বার করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কূলকিনারা পাই নি।

'যেমন ধরো, অনেকে আমাকে তাদের ঘোড়া বলেছে, কিন্তু কখনো চড়ে নি আমার ওপর। চড়েছে অন্য লোক। আর তারা যে আমাকে খাইয়েছে তা নয়, খাইয়েছে অন্যেরা। আর আমার সেবা করে নি তারা, করেছে অপরেরা — কোচওয়ান, সহিস, ঘোড়ার ডাক্তার আর সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক। তাই অনেক দেখে শুনে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, শুধু ঘোড়া নয়, সব বিষয়ে 'আমার' এই প্রত্যয়টির মূলে আছে শুধু একটি নীচ বর্বরোচিত প্রবৃত্তি, যেটাকে ওরা নিজেরাই বলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সহজাত বোধ বা অধিকার। 'আমার বাড়ি' বলে লোকে, যদিও ওখানে থাকে না, তাদের চিন্তা শুধু বাড়ি বানিয়ে রেখে দেওয়া। 'আমার দোকান', 'আমার কাপড়ের দোকান' বলে ব্যবসাদার, যদিও খাস দোকানের সেরা কাপড়ের জামাকাপড় কখনো চড়ায় না গায়ে। এমন লোকও আছে যারা এক টুকরো জমিকে নিজেদের বলে দাবী করে, অথচ কখনো পা দেয় নি তাতে, চোখে দেখে নি কখনো।

এমন কি এমন লোকও আছে যারা অন্য মানুষদের নিজেদের সম্পত্তি বলে ভাবে, অথচ কখনো দেখে নি তাদের, তাদের সঙ্গে যা সম্পর্ক সেটা হল শুধু তাদের ক্ষতি করা। লোকে আবার কয়েকটি মেয়েছেলেকে নিজেদের মেয়েছেলে, নিজেদের স্ত্রী বলে, অথচ মেয়েগুলো থাকে অন্য পুরুষদের সঙ্গে। আর জীবনে মানুষের উদ্দেশ্য হল যেটাকে ভালো মনে করে তা করা নয়, যত বেশী পারে জিনিসকে নিজের বলাটা। আমার কোনো সন্দেহ নেই মানুষ আর আমাদের মতো পশুদের মধ্যেকার প্রধান পার্থক্যটা হল এই। মানুষের ক্রিয়াকলাপকে, অন্ততঃ যাদের সংস্পর্শে আমি এসেছি তাদের প্রত্যেকের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে কাজ নয়, কথা, আর আমাদের ক্রিয়াকলাপের পেছনে আছে কাজ; শুধু এটারি জন্যে, মানুষের তুলনায় শ্রেয় আমাদের অন্যান্য গুণাবলীর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, আমরা জোর করে বলতে পারি যে প্রাণীজগতে মানুষের চেয়ে আমাদের স্থান একধাপ উঁচুতে। যা হোক, আমাকে 'আমার ঘোড়া' বলার অধিকার দেওয়া হয়েছিল অশ্বপালকে, তাই সহিসকে চাবকাল সে। এটা টের পেয়ে অভিভূত লাগল, আমার রঙ দেখে অন্যদের ধরনধারণ ভাবসাব, সেটাও অভিভূত করে দিল আমাকে। একে মায়ের বিশ্বাসঘাতকতায় মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তায় এসব; সব মিলে আমি হয়ে দাঁড়ালাম গম্ভীর আর চিন্তাশীল, এখন যা দেখছ তাই।

'আমার দুর্ভাগ্য তিন রকমের: ডোরা দাগ, আমি আক্তা, আর লোকের ধারণায় আমি অশ্বপালের সম্পত্তি, নিজের এবং ঈশ্বরের জীব নয়, যেটা হওয়া প্রত্যেকটি প্রাণীর পক্ষে স্বাভাবিক।

'আমার বিষয়ে ওদের এটা ভাবার ফলাফল রকমারি হল। প্রথমতঃ, অন্য ঘোড়াদের কাছ থেকে আলাদা করে রাখা হয় আমায়,

খাওয়াদাওয়া ভালো জুটত, আরো শক্তি যাতে হয় তার জন্যে চক্কর খাওয়াত, আর অন্যদের চেয়ে আগে বাগ মানানো হল আমাকে। তিনে পা দিয়েছি তখন প্রথম রাশ লাগানো হয়। সে দিনটা এখনো মনে আছে। অশ্বপাল, আমাকে যে নিজের সম্পত্তি ভাবত, একদল সহিসের সঙ্গে এল গাড়িতে জুততে। ভেবেছিল আমি এমন বাধা দেব যে বাগ মানানো যাবে না। মুখ বেঁধে, বমের মাঝখানটায় জোর করে ঢুকিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধল, পিঠে চামড়ার চওড়া সব পেটি বসিয়ে বেঁধে দিল বমের সঙ্গে, যাতে পাছা দিয়ে ধাক্কা দিতে না পারি; অথচ সুযোগ পাওয়া মাত্র ওদের বুঝিয়ে দিতে চাইছিলাম যে কাজ আমি ভালোবাসি, ব্যাকুলভাবে কাজ চাই।

'প্রবীণ ঘোড়ার মতো পা ফেলে বেড়িয়ে আসাতে ওরা অত্যন্ত অবাক। আমাকে ছোটানো শুরু হল, শুরু হল আমার কদম শেখার পালা। এত তাড়াতাড়ি শিখলাম যে তিন মাস পরে আমার চলার ভঙ্গির তারিফ করলেন জেনারেল সাহেব স্বয়ং এবং অন্য অনেকে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, আমি নিজের নই, অশ্বপালের সম্পত্তি — এটা ভাবার ফলে আমার চলার অর্থটা ওদের কাছে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে ধরা দিল।

'অন্যান্য বাচ্চা ঘোড়াদের নিয়ে যাওয়া হত ঘোড়দৌড়ের মাঠে, তারা ভালো করলে টুকে রাখা হত; লোকে তাদের দেখতে আসত। তারা টানত গিল্টি করা দু-চাকার গাড়ি, পিঠে চাপাত দামী কাপড়। আর আমাকে অশ্বপালের ছ্যাকড়া গাড়ি টেনে তার কাজে যেতে হত চেস্‌মেনকা ও অন্যান্য গাঁয়ে। তার কারণ, আমার গায়ের ডোরা দাগ আর লোকেদের মতে কাউণ্ট আমার মালিক নয়, আমি অশ্বপালের সম্পত্তি।

'অশ্বপাল আমাকে তার সম্পত্তি ধরে নেওয়ার পরিণাম কী ভয়ঙ্কর হল, সে কথাটা তোমাদের কাল বলব, যদি বেঁচে থাকি।'

পরের দিন সারাক্ষণ পক্ষিরাজকে বিশেষ সমীহ দেখাল ঘোড়াগুলো। কিন্তু নেস্তের সেই বরাবরকার মতো রেহাই দিল না। চাষীর ক্ষেত-চষা ছাই-রঙা ঘোড়া পালের কাছে গিয়ে আবার ডাকল, আবার বাদামি ঘুড়ীটা ছেনালি চালাল তার সঙ্গে।

৭

তৃতীয় রাত্রি

প্রতিপক্ষের চাঁদের স্নিগ্ধ আলো পড়েছে পক্ষিরাজের ওপর; উঠোনটার মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে, চারিদিকে ভিড় করেছে অন্য ঘোড়ারা।

সে বলে চলল, 'আমি কাউণ্টের বা ঈশ্বরের নই, আমি হলাম অশ্বপালের সম্পত্তি, এতে অবাক কাণ্ড হল একটা: আমার ক্ষিপ্র-গতি, যেটা হল ঘোড়ার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ, আমার নির্বাসনের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

'একদিন 'রাজহাঁস' নামের ঘোড়াটাকে দৌড় করানো হচ্ছে, চেস্‌মেনকা থেকে ফিরতি পথে অশ্বপাল আমাকে নিয়ে গেল দৌড়ের জায়গায়। আমাদের ছাড়িয়ে গেল 'রাজহাঁস'। গতিটা ওর ভালো তবে জাঁক বেশী, আর দৌড়বার কায়দা আমার মতো রপ্ত হয় নি। একটা খুর মাটিতে লাগার সঙ্গে সঙ্গে অন্য খুর তুলে নেবার অভ্যেস আমি করেছিলাম, যাতে করে গতিবেগে বিন্দুমাত্র

বাধা না পড়ে, প্রতিটি পদক্ষেপ শরীরটাকে আগিয়ে নিয়ে যাবার কাজে লাগে। যা বলছিলাম, 'রাজহাঁস' আমাদের ছাড়িয়ে গেল। দৌড়বার জায়গার দিকে চললাম, বাধা দিল না অশ্বপালক। 'আরে, এর সঙ্গে পাল্লা দেবে না কি?' হাঁকল সে, আর 'রাজহাঁস' ফের আমাদের কাছে এসে পড়াতে ছেড়ে দিল আমাকে। ওর তো এরি মধ্যে বেশ গতিবেগ এসেছে, তাই প্রথম ঘুরটায় পিছিয়ে পড়লাম, কিন্তু পরেরটায় এগিয়ে যেতে শুরু করে ওকে ধরে ফেলে পাশাপাশি এসে পড়লাম, সেভাবে চলে গেলাম ওকে ছাড়িয়ে। আর একবার পরখ করা হল আমাকে। ফল হল আগেকার মতো। ওর চেয়ে ক্ষিপ্রগতি আমি। তাতে সবায়ের কী আতঙ্ক! ঠিক হল আমাকে দূরে কোথাও বেচে দেওয়া হবে, তাহলে আমার সন্ধান আর কেউ পাবে না। 'কথাটা কাউণ্টের কানে গেলে কী কান্ড হবে!' ওরা বলাবলি করল। তাই গাড়ির মাঝের ঘোড়া হিসেবে আমাকে বেচে দেওয়া হল একটি ঘোড়া-ব্যবসায়ীর কাছে। বেশী দিন থাকি নি তার সঙ্গে। নতুন ঘোড়ার জোগাড়ে-আসা একটি হুসারের কাছে বেচে দিল। সমস্ত ব্যাপারটা এত নির্দয়, এত অন্যায়, যে খ্রেনোভয়েতে থেকে আমার এত আপন ও প্রিয় সবকিছু ছেড়ে যখন আমাকে যেতে হল তখন খুশি হলাম। পুরনো বন্ধুদের মধ্যে থাকাটা অত্যন্ত কষ্টের। ওদের কপালে ভালোবাসা, সম্মান, মুক্তি; আমার কপালে শুধু কাজ আর গ্লানি, জীবনভোর শুধু কাজ আর গ্লানি। কী কারণে? শুধু ডোরা দাগ আছে বলে তাই আমাকে পাচার করে দেওয়া হল অন্যের হাতে।'

সে রাত্রে আর গল্প বলার সুযোগ হল না পক্ষিরাজের। একটা জিনিস ঘটাতে ঘোড়াদের মধ্যে ভয়ানক উত্তেজনা পড়ে গেল। মন দিয়ে এতক্ষণ গল্প শুনছিল কুপ্‌চিখা, তখনো তার বাচ্চা হয়

নি, কিন্তু হঠাৎ সে ঘুরে ভারি পায়ে চলে গেল চালায়, সেখানে গিয়ে এত জোরে কাতরাতে লাগল যে সবাই ফিরে তাকাল। দেখল একবার শুয়ে পড়ছে, ধড়মড় করে উঠছে, আবার শুয়ে পড়ছে। প্রবীণারা বুঝল কী ব্যাপার, কিন্তু কমবয়সীরা এত ঘাবড়ে গেল যে আস্তা ঘোড়াটিকে ছেড়ে কুপ্‌চিখার চারিদিকে দাঁড়াল ভিড় করে। সকালে দেখা গেল আর একটা বাচ্চা নড়বড়ে পায়ে দাঁড়িয়ে। অশ্বপালকে ডেকে পাঠাল নেস্তের; সহিস ঘুড়ী আর বাচ্চাকে আস্তাবলে নিয়ে গেল। কুপ্‌চিখাকে বাদ দিয়ে নেস্তের চলল ঘোড়ার পাল নিয়ে।

৮

চতুর্থ রাত্রি

সন্ধ্যেবেলায় দরজা বন্ধ হল; সবকিছু চুপচাপ। ডোরাদার আবার শুরু করল তার কাহিনী:

‘হাত বদলি হতে হতে দেখলাম অনেক মানুষ, অনেক ঘোড়া। যে দুজনের কাছে সবচেয়ে বেশী দিন ছিলাম তাদের একটি হুসার বাহিনীর অফিসার, রাজকুমার তিনি; অন্যটি বৃদ্ধা, সিদ্ধিদাতা সেণ্ট নিকলাসের গির্জার কাছে তাঁর বাড়ি।

‘জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো কেটেছিল হুসারের সঙ্গে।

‘যদিও তিনিই আমার সর্বনাশের মূলে, যদিও জীবনে তিনি কাউকে বা কোন কিছুকে কখনো ভালোবাসেন নি, তবু আমি ভালোবাসতাম তাঁকে, ভালোবাসতাম ঠিক সেইজন্যে। তিনি সুদর্শন, ধনী ও সুখী বলে কাউকে ভালোবাসতেন না, আর তাই তাঁকে ভালোবাসতাম। জিনিসটা তোমরা বুঝবে; এটা হল আমাদের

ঘোড়ার জাতের মহান মনোভাব। তাঁর নিরাসক্তি, তাঁর নিষ্ঠুরতা, তাঁর ওপর আমার একান্ত নির্ভরশীলতা আরো জোরালো করে তোলে তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসাকে। সে সব সুদিনে ভাবতাম, মারুন আমাকে, দৌড়িয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হোক, তাহলে আরো সুখ পাব।

'অশ্বপাল যে ঘোড়া-ব্যবসায়ীর কাছে আটশ রুবলে আমাকে বেচেছিল তার কাছ থেকে তিনি আমাকে কেনেন। কেনার কারণ — অন্য কারো ডোরাদার ঘোড়া নেই। সে সব দিন আমার জীবনে সবচেয়ে সুখের। রাজকুমারের একটি রক্ষিতা ছিল। কথাটা আমার অজানা ছিল না, প্রতিদিন তো তার কাছে নিয়ে যেতাম আর মাঝে মাঝে দুজনে একসঙ্গে গাড়ি চেপে বেড়াতেন। রক্ষিতাটি রূপসী, রাজকুমারের চেহারা ভালো, কোচওয়ানও দেখতে ভালো, সেজন্যে সবাইকে ভালোবাসতাম। আমার সুখের আর অন্ত ছিল না। দিন কাটত এইভাবে। সকালে তদারক করতে আসত সহিস, কোচওয়ান নয় — সহিস। সহিসটি চাষীর ছেলে, ছোকরা বয়স, বেশ চঞ্চল। ঘোড়াদের গায়ের ভাপ যাতে বেরিয়ে যায় তার জন্যে দরজা খুলে দিত, ফেলে দিত নাদা, তারপর আমাদের পিঠের কাপড় সরিয়ে খটরা দিয়ে আমাকে আঁচড়ানো চলত ; খাঁজকাটা কাঠের তক্তায় শাদা সারিতে চাঁচরা পড়ত। খেলাচ্ছলে পা ঠুকে তার জামার আস্তিন কামড়াতাম। আমার পালা এলে ঠাণ্ডা জলের চৌবাচ্চায় নিয়ে যেত, বেশ তারিফ করে দেখত হাতের কাজ, দেখত তীরের মতো সোজা গিয়ে চওড়া খুরে-বসা আমার পাগুলো ; দেখত আমার চকচকে পিঠ আর পাছা, এত মসৃণ যে তাতে ঘুমনো চলে। তারপর উঁচু ঝাঁঝরির ওপর দিয়ে ফেলে দেওয়া হত খড়, যই ছড়িয়ে দেওয়া হত ওক কাঠের

তৈরী গামলায়। অবশেষে দেখা দিত ফেওফান, কোচম্যানদের সর্দার।

'কোচম্যানের ভাবগতিক প্রভুর মতো। দুজনেই নিজেদের ছাড়া জগতে আর কাউকে ভালোবাসত না, ডরাত না কাউকে, আর সেজন্যেই ওদের ভালোবাসত সবাই। ফেওফান পরত লাল সার্ট, নকল মখমলের পেণ্টুলেন, বিনা-হাতা কোট। কী ভালো না লাগত যখন ছুটির দিনে বিনা-হাতা কোটে, তেল চকচকে চুল আর গালপাট্টা নিয়ে আস্তাবলে এসে চেঁচিয়ে ও বলত, 'কী রে, আমাকে ভুলে গিয়েছিস নাকি, বেটা জানোয়ার?' আর একটা উকনঠেঙ্গার বাঁট দিয়ে খোঁচা দিত আমার রাঙে, ব্যথা দেবার জন্যে নয়, মজা করে। আমি জানতাম ও শুধু মস্করা করছে, তাই কান লটকে দাঁত কড়মড় করতাম।

'একটা কালো ঘোড়া কাজ করত জোড়ে। রাত্তিরে আমার ঠাঁই হত তার সঙ্গে। পলকানটা ঠাট্টা ইয়ার্কি বুঝত না, একেবারে শয়তানের বেহদ্দ ছিল। আমাদের চালা পাশাপাশি, মাঝে মাঝে গরাদের শিক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমাদের আসল কামড়াকামড়ি চলত। ফেওফান তাকে ভয় পেত না। সটান কাছে গিয়ে হুঙ্কার দিত, যেন ওর জান নেবার মতলব, কিন্তু না — ওকে ছাড়িয়ে গিয়ে মুখের দড়ি নিয়ে ফিরে আসত। কুজ্‌নেৎস্কি স্ট্রীটে একবার পলকান আর আমি কী ছুট না দিয়েছিলাম। কিন্তু না মনিব না কোচম্যান, এতটুকু ভয় কারো নেই, হেসে হেঁকে লোকজনদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে তারা এমন সামলে আমাদের চালায় যে কারো চোট লাগে নি।

'অর্ধেক জীবন আর আমার যা কিছু সেরা গুণ দিয়েছিলাম ওদের। বড্ডো বেশী জল খেতে দিত আর আমার পাগুলোর

দফারফা হয়ে গেল বটে, তবুও আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কেটেছে তখন। বেলা বারোটার সময় জিন লাগাতে আসত ওরা; খুরে তেল দেওয়া হত, কেশরে আর সামনের ঝুঁটিতে জল; তারপর গাড়িতে জোতা।

'বেতের শ্লেজটায় মখমলের পাড় দেওয়া, লাগামে ছোট ছোট রুপোর বক্‌লস, রাশ আর জাল রেশমের। জিনটা এমন যে সবকটা বেল্ট আর পট্টি বসিয়ে কষে দেবার পর বলা যেত না কোথায় জিনসাজের শেষ আর কোথায় ঘোড়ার শুরু। সাধারণত আমাকে জোতা হত চালায়। পিঠের চেয়ে পাছা চওড়া ফেওফান বগলের নীচে লাল কাপড়ের বেল্টটা চেপে ধরে, সাজসজ্জা দেখে নিয়ে, রেকাবে পা দিয়ে একটা কিছু ইয়ার্কি করে, শ্লেজটায় বসে কোটটা ঠিকঠাক করে, চাবুকটা তুলত একবার; না তুললে নয় কিনা, অবশ্য আমার পিঠে কখনো পড়ত না ওটা; তারপর বলত, 'চল্ রে!' আর সঙ্গে সঙ্গে লাফাতে লাফাতে ফটক হয়ে যেতাম বেরিয়ে, দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়াত জলের বালতি হাতে রাঁধুনী, জ্বালানি কাঠ উঠোনে পেঁছিয়ে দিয়ে চাষীরা হাঁ করে চেয়ে থাকত। ফটক ছাড়িয়ে কিছু দূর গিয়ে থামার পালা। বাবুর চাকরবাকর আর অন্যান্য কোচম্যান গাড়ির চারদিকে জড়ো হয়ে গালগপ্প চালাত। সেখানে প্রবেশ-পথে সবাই দাঁড়িয়ে থাকতাম, কখনো কখনো পাক্কা তিনটি ঘণ্টা, মাঝে মাঝে একটু শুধু পা চালিয়ে আসা, তারপর ফিরে প্রতীক্ষার পালা।

'অবশেষে প্রবেশ-পথে সাড়াশব্দ, পাকা চুল মোটা পেট তিখন ফ্রককোট গায়ে ছুটে এসে হাঁকত, 'গাড়ি লেয়াও!' তখনকার দিনে ওরা বোকার মতো 'সামনে' বলে চেঁচাত না। যেন কোথায় যেতে হবে, সামনে না পেছনে, আমার জানা নেই! জিভ দিয়ে টকটক

করত ফেওফান। এগিয়ে যাওয়া হত, আর রাজকুমার বেরিয়ে আসতেন, শিরস্ত্রাণ আর ওভারকোটে সজ্জিত, কালো ভুরুতে সুন্দর তাঁর সেই টকটকে লাল মুখ বীবরের লোমের ছাই-রঙা কলারে ঢাকা, যেটা হওয়া কখনো উচিত নয়; তাড়াতাড়ি উদাসীনভাবে বেরিয়ে আসতেন তিনি, যেন স্লেজ, ঘোড়া আর ফেওফান — কেউ বা কিছু আহামরি নয় একেবারে — ফেওফান তো কুর্নিশ করে হাত ছড়িয়ে এমন একটা ভঙ্গি নিত যে মনে হত ও অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকা অসম্ভব; হ্যাঁ, যা বলছিলাম — জুতোর কাঁটা, তলোয়ার আর পেতলের গোড়ালি খটখটিয়ে, গালিচার ওপর পা ফেলে এমনভাবে বেরিয়ে আসতেন রাজকুমার যেন তাঁর বড্ডো তাড়াহুড়ো, তিনি ছাড়া আর সবাই যাকে হাঁ করে তারিফ করছে সেই আমাকে, ফেওফানকে ও অন্যান্য কোনো কিছুকে দেখার সময় নেই তাঁর। ফেওফানের টকটক আওয়াজে দড়িতে টান দিয়ে ভব্য গতিতে কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম, রাজকুমারের দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে রেশমের মতো কেশর-ঝুঁটিওয়ালা খানদানী মাথাটা ঝাঁকাতাম। মেজাজ ভালো থাকলে রাজকুমার ফেওফানকে শুনিয়ে রসালো মন্তব্য করতেন দু-একটা, উত্তরে সুন্দর মাথা একটুখানি ফেরাত ফেওফান, তারপর হাত না নামিয়েই রাশে প্রায় বোঝা যায় না অথচ আমার জানা এমন টান দিত, আর চলা শুরু হত আমার, খট খট খট. প্রতি পদক্ষেপে বেগ বাড়ছে, শরীরের সমস্ত মাংসপেশী কাঁপছে থরথর, কোচম্যানের সিটের সামনেটার গায়ে কাদা আর বরফের ছিটে লাগছে আমার পায়ের ধাক্কায়। সে সব দিনে, যেন পেটটা ব্যথায় সিঁটকে উঠেছে এমনভাবে বোকার মতো 'ওফ্!' বলে চেঁচাত না কোচম্যানরা, ওরা হাঁকত: 'খবরদার!'; ফেওফান হাঁকত: 'খবরদার!' আর ছত্রভঙ্গ হয়ে লোকে পথ করে দিয়ে গলা

দাঁড়িয়ে দেখত সুন্দর আস্তা ঘোড়া, সুদর্শন কোচম্যান আর রূপবান রাজকুমার চলেছে।

'ধৌরিতক-চালের ঘোড়াকে টেক্কা দিতে খাসা লাগত। প্রতিযোগিতার যোগ্য কোনো ঘোড়া ফেওফানের আর আমার চোখে পড়লেই তীরের বেগে পিছু ধাওয়া করতাম, ক্রমশঃ কাছে এসে পড়তাম, আরো কাছে, আরো, অবশেষে অন্য শ্লেজটার পেছনে লাগত আমার পায়ের কাদার ছিটে; যাত্রীটির পাশাপাশি এসে পড়ে তার মাথার ওপর নাক দিয়ে আওয়াজ, তারপর ঘোড়াটার জোয়াল বরাবর ছোটা, তারপর তাকে ছাড়িয়ে এত দূরে চলে যেতাম যে প্রতিযোগীকে আর দেখা যেত না, শুধু তার পায়ের শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে কানে আসত। এতটুকু আওয়াজ বেরোত না রাজকুমার বা ফেওফান বা আমার মুখ দিয়ে; ভান করতাম স্রেফ কাজে যাবার তাড়ায় পথের ছ্যাকড়া গাড়ির সওয়ারীদের দিকে তাকাবার পর্যন্ত অবসর নেই। অন্য ঘোড়াকে টেক্কা দিতে ভালো লাগত আর ভালো লাগত ধৌরিতক-চালের ভালো ঘোড়াকে আমার দিকে আসতে দেখলে: একটি মুহূর্ত শুধু শাঁশাঁ শব্দ, নিমেষের দৃষ্টি বিনিময় আর দুজন দুজনকে ছাড়িয়ে আবার যে যার পথে ছোটা।'

দরজাগুলোয় কিঁচকিঁচ আওয়াজ শোনা গেল, নেস্তের আর ভাস্কার গলা।

পঞ্চম রাত্রি

আবহাওয়া বদলাচ্ছে। সকাল থেকে আকাশের মুখ ভার, শিশির পড়ে নি, কিন্তু হাওয়া গরম, উত্ত্যক্ত করে মারছে মশার ঝাঁক। ঘেরা জায়গায় ফেরামাত্র ঘোড়ার দল পক্ষিরাজের চারপাশে জড়ো হল, নিজের কাহিনী সে শেষ করল সেই রাত্রে।

'আমার সুখের দিনের অবসান হতে দেরী হল না। মাত্র দু বছর সুখে কেটেছিল। দ্বিতীয় শীতের শেষে জীবনের সবচেয়ে বড়ো আনন্দের স্বাদ পেলাম, আর তার কিছুদিন পরে সবচেয়ে বড়ো বিষাদ। গ্রোভটাইড তখন, ঘোড়-দৌড়ের মাঠে নিয়ে গিয়েছিলাম রাজকুমারকে। আৎলাস্নি আর বিচক্ দৌড়চ্ছিল। জানি না বাজি রাখার জায়গায় কী নিয়ে কথা বলেছিলেন রাজকুমার, কিন্তু বেরিয়ে এসে তিনি ফেওফানকে হুকুম দিলেন দৌড়ের জায়গায় আমাকে নিয়ে যেতে। মনে আছে সেখানে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল, আৎলাস্নির সঙ্গে দৌড়তে হল আমায়। একটা দু চাকার গাড়ি টানছিল আৎলাস্নি, আমি জোতা ছিলাম সহুরে স্লেজে। মাথায় ওকে ছাড়িয়ে যেতে মাঠে হাসি আর হাততালির হুল্লোড় পড়ে গেল।

'দৌড়বার জায়গায় আমাকে ঘোরাবার সময় পিছু পিছু ভিড় করে এল কত লোক। হাজার হাজার টাকায় আমাকে কিনতে চাইল জন পাঁচেক ঘোড়া-বিলাসী। রাজকুমার শুধু ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসলেন।

''না, সে হয় না,' বললেন তিনি। 'ও তো শুধু ঘোড়া নয়, বন্ধুও বটে। পাহাড়প্রমাণ সোনা দিলেও বেচব না। নমস্কার, মশাইরা,' বলে স্লেজের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন।

''ওস্তজেন্কা স্ট্রীট!' রক্ষিতা থাকত সে রাস্তায়। তীরবেগে চললাম। আমাদের জীবনে সুখের শেষ দিন সেটা।

'এসে পড়লাম রক্ষিতার বাড়িতে। তিনি তাকে 'আমার' বলতেন, কিন্তু সে উধাও অন্য প্রেমিকের সঙ্গে, তাকেই ভালোবাসত। খবরটা তিনি পেলেন তার ফ্ল্যাটে। তখন বিকেল পাঁচটা। আমার সাজ খোলা আর হল না, মেয়েটির উদ্দেশ্যে তিনি চললেন! আর একটা

জিনিস — এর আগে কখনো তেমন হয় নি: চাবুক মারা হল আমাকে যাতে প্লুত গতিতে ছুটি। জীবনে এই প্রথম একবার সঠিক পা পড়ল না; লজ্জা পেয়ে ভুল শোধরাবার কথা ভাবছি, হঠাৎ শুনলাম রাজকুমার অস্বাভাবিক গলায় চে'চাচ্ছেন, 'ছোট্ বেটা।' আর হাওয়ায় শিস দিয়ে চাবুকটা পড়ল পিঠে, আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চললাম, কোচম্যানের সিটের সামনেটায় বারবার পা খটখট করে লাগতে লাগল। প'চিশ ভের্স্তা* যাবার পর ধরে ফেললাম মেয়েটিকে। বাড়ি ফিরিয়ে আনলাম রাজকুমারকে। সারা রাত শরীর থরথর কাঁপতে লাগল, খেতে পারলাম না কিছু। সকালে জল খেতে দিল। খেলাম আর তারপর আমি আর আগেকার আমি রইলাম না। অসুস্থ হয়ে পড়াতে আমাকে ওরা যন্ত্রণা দিল, শরীরের ক্লেশ ঘটাল — যাকে বলে আমার 'চিকিৎসা' চালাল। খুরগুলো ক্ষয়ে গেল, শরীর ভরে গেল পাঁচড়ায়, পাগুলো বে'কে গেল, বুক দুমড়ে বসে গেল, দেহে আর মনে শ্রান্ত হয়ে পড়লাম।

'একটা ঘোড়া-ব্যবসায়ীর কাছে আমাকে বেচে দেওয়া হল। সে গাজর আর কী সব খাইয়ে বোকা লোকের চোখে ধুলো দেবার মতো আমাকে কিছু একটা খাড়া করল, সেটা আমার স্বরূপ নয়। আমার না ছিল শক্তি, না ছিল দ্রুত দৌড়ের ক্ষমতা। তাছাড়া আমাকে আরো একটা যন্ত্রণা দিত ঘোড়া-ব্যবসায়ীটি: কোনো খরিদ্দার এলেই চালায় ঢুকে চাবকে আমাকে পাগল করে দিত তারপর চাবুক মারার দাগ মুছে বের করত আমায়। আমাকে কিনলেন একটি বৃদ্ধা। সিদ্ধিদাতা সেণ্ট নিকলাসের গির্জায় তিনি

* ভের্স্তা — প্রাক্‌বিপ্লব আমলের রাশিয়ায় পরিমাপ পদ্ধতি (বর্তমানে লুপ্ত)। এক ভের্স্তা সাড়ে তিন হাজার ফুটের সমান। — সম্পাঃ

আমাকে সর্বদা হাঁকিয়ে নিয়ে যেতেন, আর কোচম্যানকে চাবকাতেন। কোচম্যান আমার চালায় এসে কাঁদত। চোখের জলের যে একটা খাসা নোনতা স্বাদ আছে সেটা আবিষ্কার করলাম তখন। তারপর বৃদ্ধা দেহত্যাগ করলেন। তাঁর নায়েব একটা দোকানদারের কাছে আমাকে বেচে দিল; তার কাছে থাকার সময় এত বেশী গম খেতাম যে আমার রোগ আরো বেড়ে গেল। সে আমাকে বেচে দিল একটি চাষীর কাছে। লাঙল টানার পালা, খাওয়াদাওয়ার বালাই বলতে গেলে নেই। লাঙলের ফালে প্রায়ই কেটে যাচ্ছে। আবার অসুখে পড়লাম। আরেকটা ঘোড়ার বদলে আমাকে দিয়ে দেওয়া হল একটি বেদেকে। দারুণ নিপীড়ন করত লোকটা। শেষ পর্যন্ত আমাকে বেচে দিল এখানকার নায়েবের কাছে। এই তো দেখছ আমাকে।'

কোনো শব্দ করল না কেউ। ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হল।

৯

পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় ঘোড়ার পাল ঘরে ফিরছে, দেখা গেল মনিবকে, সঙ্গে একটি অভ্যাগত। বাড়ির কাছে এসে পড়ে প্রথমে তাদের দেখে জুল্‌দিবা — দুজন পুরুষ মূর্তি, একজন হলেন খড়ের টুপি মাথায় কমবয়সী মনিব, অন্যটি দীর্ঘকায় ও স্থূল, গায়ে ফৌজী পোষাক। বুড়ী ঘোড়াটা আড়চোখে তাকিয়ে পাশ কাটাল। কিন্তু অন্যদের বয়স কম, তাদের কেমন যেন অস্বস্তি আর সঙ্কোচ, বিশেষ করে যখন মনিব ও অভ্যাগতটি সোজাসুজি তাদের মধ্যে এসে পড়ে হাত দিয়ে এ ওকে কী সব দেখিয়ে কথা বলতে লাগলেন।

'ডোরাদার ছাই-রঙা ঘোড়াটা কিনেছি ভয়েইকভের কাছ থেকে,' মনিব বললেন।

'ওই শাদা-পা কালো ঘুড়ীটা কার? দেখতে বেড়ে,' বললেন অভ্যাগত। ঘোড়াদের পিছু ধাওয়া করে দাঁড়িয়ে অনেককে তাঁরা দেখলেন। বাদামি রঙের ঘুড়ীটা চোখে পড়ল।

'ও হল খেত্রনোভয়ের জিন-ঘোড়ার বংশজাত,' মনিব বললেন।

সবকটা ঘোড়াকে সে অবস্থায় দেখা সম্ভব নয়। মনিব নেস্তেরকে ডাকাতে ডোরাদার আস্তা ঘোড়াটির পাঁজরে জুতোর খোঁচা মেরে বুড়ো কদম চালে দৌড়ে এল। এক পায়ে খোঁড়াচ্ছে, তবু ভালো দৌড়বার একটা কোশিশ করল সে; বোঝা গেল প্রাণপণ বেগে দুনিয়ার একেবারে ও প্রান্তে তাকে ছোটার হুকুম দিলেও আপত্তি করবে না। বল্গিত চালে ছোটার অভিলাষ তার; যে পাটা ভালো সেটা দিয়ে চেষ্টাও করল একবার।

'সত্যি বলছি, ওর মতো ঘুড়ী সারা রাশিয়ায় আর পাবে না,' একটা ঘুড়ীকে দেখিয়ে মনিব বললেন। তারিফ করে সায় দিলেন অতিথি। মনিব উত্তেজনা ভরে এদিক-সেদিক ছুটে ঘোড়াগুলোকে দেখিয়ে তাদের বংশ ইতিহাস শোনাচ্ছেন। মনে হল অতিথিটির একঘেয়ে লাগছে, তবু আগ্রহ দেখাবার ভান করে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন।

'কী বললে? হ্যাঁ, তাই তো!' অন্যমনস্কভাবে তিনি বললেন।

'দেখ দিকি এটাকে,' মনিব বললেন, অতিথির যে একঘেয়ে লাগছে তাঁর হুঁশ নেই। 'পাগুলো একবার দেখ। ওর জন্যে মোটা টাকা দিতে হয়েছিল, কিন্তু ওর তিন বছরের বাচ্চা এখনি কদম চালে চলতে শুরু করেছে!'

'চালটা ভালো?' জিজ্ঞেস করলেন অতিথি।

একটার পর একটা ঘোড়া নিয়ে আলোচনা চলল, দেখাবার মতো আর কিছু নেই। কিছুক্ষণ চুপচাপ।

'তাহলে যাওয়া যাবে নাকি এবার?'

'চল।' ফটক হয়ে ভেতরে গেলেন দুজন। দেখাশোনা শেষ হয়েছে বলে অতিথি খুশি, এবার বাড়ি গিয়ে খাওয়া আর ধুম ও মদ্য পান করা চলবে। মেজাজটা তাঁর আগেকার চেয়ে খোশ বলে মনে হল। আরো কী হুকুম হয় তার প্রতীক্ষায় পক্ষিরাজের পিঠে চেপে নেস্তের বসেছিল; পাশ দিয়ে যেতে যেতে ঘোড়াটার পাছায় মোটাসোটা বড়ো হাতের থাপ্পড় বসিয়ে অতিথি বলে উঠলেন:

'এটা দেখছি ডোরাদার! এক কালে আমার একটা ডোরাদার ঘোড়া ছিল তোমাকে বলেছিলাম, মনে আছে?'

কথাটা তাঁর ঘোড়াদের নিয়ে নয়, তাই তাতে কান না দিয়ে মনিব নিজের ঘোড়াগুলোকে দেখে চললেন।

হঠাৎ একেবারে কান ঘেষে একটা হাস্যকর ক্ষীণ অথর্ব হ্রেষাধ্বনি। আওয়াজটা আস্তা ঘোড়ার, কিন্তু যেন বিব্রত বোধ করে সে থেমে গেল। হ্রেষাধ্বনিতে কান না দিলেন মনিব না অতিথি, বাড়ি চলে গেলেন। ঘোড়াটি চিনেছিল মেদবহুল বৃদ্ধটিকে — ইনি হলেন তার আগের প্রিয় মনিব, সেই একদা ধনী ও রূপবান রাজকুমার সেপুর্খভ্স্কোয়।

১০

. . . .
. . . .

ঝুরঝুর বৃষ্টির আর শেষ নেই। ঘেরা জায়গাটায় মন খিঁচড়ে যায়, বড়ো বাড়িতে কিন্তু আবহাওয়া আলাদা। জমকালো ড্রয়িং-

রুমে দেওয়া হচ্ছে জমকালো চা। টেবিলে বসে গৃহকর্তা, গৃহকর্ত্রী ও অতিথি।

গৃহকর্ত্রী সন্তানসম্ভবা; সেটা বোঝা যায় তাঁর স্ফীত উদর থেকে, সামোভারের পিছনে কেমন খাড়া হয়ে বসে আছেন তা থেকে, তাঁর থলথল ভাব আর বিশেষ করে তাঁর বড়ো বড়ো চোখ থেকে, তাতে মোলায়েম ও গম্ভীর একটা ভাব, মনে হয় নিজের অন্তরে দৃষ্টি নিহিত।

দশ বছরের পুরনো অতি উৎকৃষ্ট সিগারের বাক্স গৃহকর্তার হাতে, এ রকমটা আর কারো নেই; অন্তত তাই বলে অতিথির কাছে তাঁর বড়াই করবার কথা। গৃহকর্তাটির চেহারা ভালো, বয়স প্রায় পঁচিশ, হাবভাব তাজা, সুবেশ ফিটফাট মানুষ। বাড়িতে তিনি লণ্ডনে বানানো মোটা পশমের একটা ঢিলে স্যুট পরতেন। ঘড়ির চেনে ভারি সোনার রিঙ। কফ্‌লিঙ্কগুলো বড়ো ভারি সোনার, পীরোজা বসানো। দাড়ির ছাঁট তৃতীয় নেপোলিয়নের কেতায়, ওপরের ঠোঁটের দু পাশে পাতলা সরু গোঁফ মোম দিয়ে অতি সুষ্ঠুভাবে পাকানো, যেন খাস প্যারিসে চর্চা করা হয়েছে। গৃহকর্ত্রীর পরনে ফুলের গুচ্ছের নকসা-কাটা পাতলা সিল্কের গাউন, বড়ো বেঁকানো সোনার পিন ঘন কটা চুলের রাশে — অতি সুন্দর চুল, সবটা তাঁর নিজস্ব না হলেও। হাতে বেশ কয়েকটা দামী আংটি আর বালা। সামোভারটা রুপোর, চায়ের সেট সেরা চীনা মাটির। দরজায় পাথরের মূর্তির মতো ফাইফরমায়েশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে খানসামা, পরনে চমৎকার টেলকোট ও শাদা ভেস্ট, গলায় টাই। ঘরের আসবাবপত্র কাঠে খোদাই, বেঁকা চেহারায় একটু বেশী জমকালো। ওয়াল-পেপারে ঘোর ছাই-রঙা ফুল আঁকা। টেবিলের কাছে জাতে অত্যন্ত কুলীন একটি গ্রেহাউন্ড শুয়ে আছে,

গলার রুপালী চেনটা থেকে থেকে ঠুনঠুন আওয়াজ করে উঠছে। কুকুরটা অসাধারণ লিকলিকে, কী একটা জটিল ইংরেজী নাম তার, সেটা না মনিব না গৃহকর্ত্রী উচ্চারণ করতে পারতেন না, কেননা ইংরেজী ভাষার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল না। এক কোণে ফুলের মধ্যে অলংকৃত বড়ো একটা পিয়ানো। সবকিছু দেখে মনে হয় অভিনব, বিরল ও দামী। সবকিছু খাসা, তবে সবকিছুতে বিলাসের ও ধনের একটা ছাপ, বুদ্ধি ও রুচির একটা অভাব।

রেসের ঘোড়া নিয়ে পাগল গৃহকর্তা। তাগড়া চেহারার ফুর্তিবাজ লোকটি সেই জাতের মানুষ যারা কখনো বিলুপ্ত হয় না, যারা নকুলের লোমের পোষাকে গাড়িতে চেপে ঘুরে বেড়ায়, অভিনেত্রীদের ছুঁড়ে দেয় দামী ফুলের তোড়া, সবচেয়ে সৌখীন হোটেলে সবচেয়ে নতুন আর সবচেয়ে দামী মদ্য পান করে, নিজের নামে পুরস্কার বিতরণ করে, আর রাখে সবচেয়ে বেশী খরচার রক্ষিতা।

তাঁর অতিথি নিকিতা সেপুর্খভস্কোয়ের বয়স চল্লিশের বেশী -- তিনি দীর্ঘকায় ও মোটা, মাথায় টাক, গোঁফজোড়া বড়ো, জুলপি আছে। যৌবনে নিঃসন্দেহে তিনি অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন, এখন শরীর, নীতিবোধ ও অর্থ সামর্থ্যের দিক থেকে পতন হয়েছে।

ধারে তিনি এত ডুবে যান যে জেল এড়াবার জন্য সরকারী চাকরী নিতে হয়েছে। এখন তিনি যাচ্ছেন একটি প্রাদেশিক শহরে, সেখানে অশ্বপালনের ভার দেওয়া হয়েছে তাঁকে। চাকরীটা পেয়েছেন প্রতিপত্তিশালী আত্মীয়স্বজনের দৌলতে। তাঁর পরনে ফৌজী টিউনিক ও নীল পেণ্টুলেন। টিউনিক ও পেণ্টুলেন বড়োলোকসুলভ, অন্য কাপড়চোপড়ও তাই, ঘড়িটা ইংলণ্ডে তৈরী। জুতোর তলা অসাধারণ, প্রায় ইঞ্চিখানেক মোটা।

বিশ লক্ষ রুবল ফুঁকে দিয়েছেন নিকিতা সেপ্‌র্খভ্‌স্কোয়, এখন তিনি লোকের কাছে ধারেন এক লক্ষ বিশ হাজার। এত টাকার মালিক একবার হলে বেশ একটা প্রতিপত্তি হয়, তাতে করে আরো বছর দশেক ধারের টাকায় প্রায় বিলাসিতায় সময় কাটানো সম্ভব। কিন্তু সে দশ বছর সমাপ্ত হয়েছে, উবে গেছে প্রতিপত্তি, আর এখন নিকিতার জীবন দুর্বহ। মদ ধরেছেন তিনি, অর্থাৎ মদ খেলে এখন মাতাল হয়ে যান, যেটা আগে কখনো হত না। আর যদি মদ্য পানের কথা বলেন, কবে ধরেছেন, কবে শেষ করবেন বলা শক্ত। তাঁর অধঃপতন সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাকানোর অস্থির ভাবটায় (চোখে এরিমধ্যে শূন্য দৃষ্টি), কণ্ঠস্বর ও অঙ্গসঞ্চালনের বাধো বাধো ভঙ্গিতে। আগে কখনো তিনি কাউকে বা কোনো কিছুকে ডরান নি, শুধু হালের দুঃখকষ্টের ফলে স্বভাববিরুদ্ধ আশঙ্কার একটা ভাব এসেছে, এটা স্পষ্ট ধরা পড়ে বলে অস্বস্তিটা আরো বেশী করে চোখে ঠেকে। গৃহকর্তা গৃহকর্ত্রী দুজনেই এটা লক্ষ্য করে দৃষ্টি বিনিময় করলেন, পরস্পরের মনের কথা বুঝেছেন তার আভাস দিয়ে। শুতে যাবার সময় পর্যন্ত লোকটির কথা না হয় স্থগিত থাক; আপাততঃ বেচারাকে মেনে নেওয়া হোক, এমন কি মিষ্টি ব্যবহার করা হোক তাঁর সঙ্গে। নবীন গৃহকর্তার সুখের চেহারায় ক্ষুণ্ণ বোধ করলেন নিকিতা, অতীত দিনের, যে দিন আর কখনো ফিরবে না, সে দিনের স্মৃতি ফিরে আসাতে ঈর্ষা হল মনে।

'ধূম পান করলে আশা করি কিছু মনে করবেন না, মেরি?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন; মহিলাটিকে সম্বোধন করার ধরনটা বিচিত্র ও এড়িয়ে যাওয়া গোছের; অনেক অভিজ্ঞতার ফলে আসা এই

ধরনটা ভব্য ও হৃদ্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সম্মানসূচক নয় — বন্ধুর স্ত্রী নয়, তার রক্ষিতাকে এভাবে সম্বোধন করে চালু লোকের। মহিলাকে অপমান করবার মতলব তাঁর ছিল না; বরং তাঁর এবং গৃহকর্তার মন জুগিয়ে চলার অভিলাষ আছে — যদিও নিজে সেটা তিনি কখনো স্বীকার করতেন না। এ ধরনের মেয়েদের সঙ্গে এভাবে কথা বলা তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, এই যা। তিনি জানতেন যে গৃহকর্ত্রীকে মহিলার সম্ভ্রম দেখালে তিনি নিজে অবাক হয়ে যেতেন, এমন কি অপমানিত বোধ করতেন। তাছাড়া, সমকক্ষের খোদ স্ত্রীর সঙ্গে সমীহ করে কথা বলার প্রচলিত রীতিটা যত্রতত্র প্রয়োগ করা তো চলে না। রক্ষিতাদের তিনি সর্বদাই একটু খাতির করে সম্বোধন করতেন; তার কারণ এই নয় যে, পদনির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষের মূল্য বিবাহের কৃত্রিমতা, ইত্যাদি বিষয়ে কাগজে পত্রিকায় প্রকাশিত তথাকথিত মতামতে তিনি বিশ্বাস করেন (এ ধরনের পচা মাল তিনি কখনো পড়তেন না); কারণটা এই যে, ভব্য লোকেরা সবাই তাদের সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করে থাকে, আর তিনি নিজে তো অত্যন্ত ভব্য, অবস্থা না হয় পড়ে গেছে।

একটা সিগার নিলেন তিনি। সুবিবেচনার পরিচয় না দিয়ে গৃহকর্তা কয়েকটা সিগার তুলে বাড়িয়ে দিলেন তাঁর দিকে।

'এইগুলো নাও না, কী ভালো দেখ।'

সিগারগুলো সরিয়ে দিলেন নিকিতা। অপমান ও আঘাতের একটা ভাব ঝিলিক দিয়ে গেল চোখে।

'ধন্যবাদ,' নিজের সিগার-কেস বের করে বললেন, 'এর একটা খেয়ে দেখ।'

গৃহকর্ত্রী বুদ্ধিমতী। ব্যাপারটা বুঝে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'সিগার আমার ভয়ানক ভালো লাগে। আশেপাশের সবায়ের মুখে চব্বিশ ঘণ্টা সিগার না থাকলে হয়ত আমি নিজেই খেতাম।'

আর নিজস্ব মিষ্টি, সদয় হাসি একটা হাসলেন তিনি। নিকিতা কাষ্ঠহাসি হেসে সাড়া দিলেন; সামনের দুটো দাঁত তাঁর নেই।

'না, এটা নাও,' জেদ ধরলেন গৃহকর্তা, সূক্ষ্ম লোক তিনি নন। 'ওগুলো কড়া নয়। ফ্রিৎস্, bringen Sie noch *eine* Kasten, dort zwei!'*

নতুন একটা বাক্স নিয়ে এল জার্মান খানসামা।

'কী বেশী ভালো লাগে তোমার? কড়া? এগুলো চমৎকার। সবকটা নিয়ে নাও,' তিনি বলে চললেন। নিজের মহামূল্য সব জিনিস দেখাতে পেরে তিনি এত খুশি যে অন্য কিছুর হুঁশ নেই। সেপুর্খভ্স্কোয় সিগার ধরিয়ে তাড়াতাড়ি পুরনো আলাপের খেই ধরলেন।

'আৎলাস্নির জন্যে কত টাকা দিয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'তা বেশ। অন্ততঃ পাঁচ হাজার, কিন্তু ঠকি নি একেবারে। ওর বাচ্চাগুলোকে তোমার একবারটি দেখা উচিত।'

'রেসের ঘোড়া?'

'প্রত্যেকটা। এ বছরে ওর মন্দা বাচ্চাটা তিনটে প্রাইজ পেয়েছে; তুলায়, মস্কোয় আর পিটার্সবুর্গে। ভয়েইকভের ভরনোয়ের সঙ্গে টেক্কা দিয়েছিল। হতচ্ছাড়া জকিটা বারবার চারবার ভুল করল, তা নাহলে ভরনোয়কে একেবারে বসিয়ে দিত।'

* আর একটা বাক্স নিয়ে এসো, ওখানে দুটো আছে (জার্মান ভাষায়)।

'ও এখনো একটু কাঁচা। আমার মতে বড্ডো বেশী ডাচ্ রক্ত ওর শরীরে,' বললেন সেপর্‌খভ্‌স্কোয়।

'আর মাদীগুলো? কাল দেখাব তোমায়। দব্রিনিয়াকে কিনি তিন হাজার রুবলে, আর লাস্কভায়াকে দু হাজারে।'

গৃহকর্তা আবার নিজের ধনসম্পত্তির বড়াই চালালেন। গৃহকর্ত্রী দেখলেন এতে সেপর্‌খভ্‌স্কোয়ের মনে কষ্ট হচ্ছে, তিনি শুধু শোনার ভান করছেন।

'আর একটু চা নেবেন?' গৃহকর্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

'না,' বলে গৃহকর্তা কথা বলেই চললেন। গৃহকর্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন, কর্তা কিন্তু বাধা দিয়ে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন তাঁকে।

ওঁদের চেয়ে দেখতে দেখতে সেপর্‌খভ্‌স্কোয় হাসতে লাগলেন — মনোরঞ্জনের জন্য অস্বাভাবিক একটা হাসি হয়ত হাসতেন, কিন্তু গৃহকর্তা উঠে দাঁড়িয়ে মহিলাটির কোমর জড়িয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে তাঁর মুখের ভাব হঠাৎ বদলে গেল। গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন তিনি, ফোলা মুখে হঠাৎ এল হতাশার ছাপ। এমন কি ক্রুদ্ধ আক্রোশের একটা আভাস পর্যন্ত এল মুখে।

১১

হাসিমুখে ফিরে গৃহকর্তা বসলেন নিকিতার সামনে। কিছুক্ষণ কোনো কথাবার্তা নেই।

'ওকে ভয়েইকভের কাছ থেকে কিনেছ বলছিলে, তাই না?' এমনি জিজ্ঞেস করছেন ভাবটা।

'হ্যাঁ, আৎলাস্‌নিকে। দুবভিৎস্কির কাছে মাদী ঘোড়া কেনার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কেনার মতো কিছু পেলাম না।'

'ও ফতুর হয়ে গিয়েছে,' বলেই সেপ্র্খভ্স্কোয় হঠাৎ থেমে গিয়ে চারপাশে একবার তাকিয়ে নিলেন। মনে পড়ে গেল এই 'ফতুর হয়ে যাওয়া' লোকটির কাছে তিনি বিশ হাজার রুবল ধারেন। দুর্বাভিৎস্কি 'ফতুর হয়ে গেছে' যদি লোকে বলে, তাহলে তাঁর নিজের বিষয়ে কী বলবে? চুপ করে গেলেন তিনি।

অনেকক্ষণ কোনো কথা নেই। গৃহকর্তা ভাবতে লাগলেন কী নিয়ে অতিথির কাছে বড়াই করা চলে। নিজে এখনো ফতুর হন নি বোঝাবার জন্য কী বলা যায় ভাবতে লাগলেন সেপ্র্খভ্স্কোয়। সিগারগুলো বেশ কড়া বটে, কিন্তু দুজনেরি মাথা ঠিক খুলল না। "মদ খেলে মন্দ হয় না।" সেপ্র্খভ্স্কোয় চিন্তা করতে লাগলেন। "মদ না খেলে নয়, নইলে এর কাছে বসে একঘেয়েমিতে মারা পড়ব দেখছি," ভাবলেন গৃহকর্তা।

'এখানে তোমার অনেকদিন থাকার ইচ্ছে?' জিজ্ঞেস করলেন সেপ্র্খভ্স্কোয়।

'আর এক মাস। সাপার খেলে হয় এবার, কী বল? খাবার তৈরী, ফ্রিৎস্?'

খাবার-ঘরে দুজনে গেলেন। ঝাড়ের নীচে টেবিল, তাতে শাখাবিশিষ্ট সুন্দর দীপাধার আর গুচ্ছির চমকদার জিনিস: সাইফন, ছিপিতে আঁটা পুতুল, ভোদকা, উৎকৃষ্ট মদের ডিকাণ্টার, উৎকৃষ্ট চর্ব্যচোষ্যে বোঝাই রেকাবী। মদ্যপান হল, তারপর আহার, আবার মদ্যপান, তারপর আহার, অবশেষে শুরু হল কথাবার্তা। সেপ্র্খভ্স্কোয়ের মুখ লাল হয়ে উঠেছে, কথাবার্তা চালাচ্ছেন অবাধে।

কথা হল মেয়েদের নিয়ে। কার কাছে কী মাল — বেদেনী, বাইজী না ফরাসী মেয়ে।

'মাতিয়েকে ত্যাগ করলে না কি?' গৃহকর্তা জিজ্ঞেস করলেন। মাতিয়ে হল সেই মেয়েটি যে সেপুর্খভ্স্কোয়ের সর্বনাশ করে।

'ত্যাগ আমি করি নি, ত্যাগ করেছে ও। সত্যি ভাই, বয়সকালে কত টাকা না ফুঁকে দিয়েছি! আজ হাতে হাজারখানেক রুবল এলে বেড়ে লাগে, সবাইকে ছেড়ে কেটে পড়াটা মনে হয় বেশ। মস্কোতে থাকার আর উপায় নেই। যাকগে, ও সব আর বলে কী হবে!'

সেপুর্খভ্স্কোয়ের কথাবার্তা একঘেয়ে লাগছে গৃহকর্তার। তাঁর ইচ্ছে নিজের কথা বলা, জাঁক দেখানো। আর সেপুর্খভ্স্কোয় চান নিজের কথা বলতে, নিজের উজ্জ্বল অতীতের দিনগুলোর কথা বলতে। আর এক গেলাস তাঁকে ঢেলে দিয়ে গৃহকর্তা তাক করে রইলেন কখন তাঁর কথা শেষ হবে, তাহলে তিনি জানাতে পারবেন কীভাবে তিনি ঘোড়ার পাল-খামারের সুব্যবস্থা করেছেন, অভাবিত ব্যবস্থা সেটা; আর মারি তাঁকে যে শুধু টাকার জন্যই ভালোবাসে তা নয় ভালোও বাসে বৈ কি।

'তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম যে আমার খামারে...' আরম্ভ করলেন তিনি, কিন্তু বাধা দিয়ে সেপুর্খভ্স্কোয় বললেন:

'এক কালে বেঁচে থাকতে ভালো লাগত, জানতাম কী করে বাঁচতে হয়, জোর গলায় বলতে পারি সেটা। ঘোড়ায় চড়ার কথা এইমাত্র বলছিলে না? বলো তো, সবচেয়ে তেজী কোন ঘোড়া তোমার?'

পাল-খামারের কথা বলার সুযোগ এতক্ষণে পেয়ে খুশি হয়ে গৃহকর্তা তাড়াতাড়ি শুরু করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আবার বাধা দিয়ে সেপুর্খভ্স্কোয় বললেন:

'ও হ্যাঁ, পাল-খামারের মালিকরা তো শুধু জাঁকের তালে থাকে, আমোদপ্রমোদ, ভালোভাবে থাকার ইচ্ছে তাদের নেই। আমি কিন্তু

কখনো ও রকমটা ছিলাম না। তোমাকে আজকেই তো বলছিলাম আমার একটা ডোরাদার কদম চালের ঘোড়া ছিল, যে ঘোড়াটায় তোমার অশ্বপালক বসেছিল ঠিক তার মতো ডোরাদার। ঘোড়ার মতো ঘোড়া ছিল বটে! তোমার অবশ্য জানার কথা নয়। ১৮৪২ সালের ঘটনা, সবে মস্কোয় গিয়েছি। ঘোড়া-ব্যবসায়ীর ওখানে গিয়ে দেখলাম একটা ডোরাদার আক্তা ঘোড়া। বেশ ভালো। পছন্দ হল। দাম কত? এক হাজার। ঘোড়াটাকে পছন্দ হল, কিনে ফেললাম। চড়া শুরু হল। ওর মতো ঘোড়া তোমার আমার বা আর কারোর ছিলও না, আর হবেও না কখনো! যেমন বেগ তেমন শক্তি আর রূপ, ওর আর জুড়ি নেই! তোমার বয়স তখন নেহাৎ কম, ওকে দেখ নি, কিন্তু ওর কথা শুনেছ নিশ্চয়। সারা মস্কো জানত ওর কথা।'

'হুঁ। মনে হচ্ছে শুনেছিলাম,' অনিচ্ছাসত্ত্বে বললেন গৃহকর্তা। 'কিন্তু তোমাকে বলতে চাইছিলাম যে আমার...'

'শুনেছিলে নিশ্চয়। আমি তো ওকে সটান কিনে ফেলেছিলাম, কাগজপত্র, বংশপরিচয় বা সুপারিশের তোয়াক্কা করি নি। পরে জানতে পারি। ভয়েইকভ আর আমি বের করে ফেলি। ও হল পক্ষিরাজ, লিউবেজ্‌নীয়-এর ছেলে। পা ফেলার মাপটা ইয়া লম্বা। ডোরাদার বলে খ্রেনভোয়ে পাল-খামার থেকে ওকে অশ্বপালের কাছে বেচে দেওয়া হয়েছিল, সে তাকে আক্তা করে বেচে দেয় একটা ঘোড়া-ব্যবসায়ীর কাছে। ওর মতো ঘোড়া আর দেখি নি, দোস্ত! হ্যাঁ, ছিল বটে সে সব দিন! হায়রে যৌবন, হারানো যৌবন!' বেদেদের একটা গানের লাইন ভাঁজলেন তিনি। নেশা ধরতে শুরু করেছে তখন। 'হ্যাঁ, ছিল বটে সে সব দিন! আমার বয়স তখন পঁচিশ, আয় বছরে আশি হাজার, চুল একটাও পাকে নি,

একটা দাঁতও পড়ে নি, প্রত্যেকটা মুক্তোর মতো। যাতে হাত দিই সেটাই সফল হয়: আর এখন... সবকিছু শেষ।'

'সে সব দিনে কিন্তু ঘোড়াগুলো এত তেজী ছিল না,' সেপুর্খভ্স্কোয়ের থেমে যাবার সুযোগটা ছাড়লেন না গৃহকর্তা। 'তোমাকে বলি তাহলে, আমার প্রথম ঘোড়াগুলো দৌড়তে শুরু করে...'

'তোমার ঘোড়াগুলো বটে! তখনকার ঘোড়াগুলো দৌড়ত আরো অনেক জোরে।'

'আরো জোরে দৌড়ত — তার মানে?'

'যা বলছি তাই — আরো জোরে। মনে আছে একবার পক্ষিরাজকে মস্কোর রেসে দৌড় করিয়েছিলাম। রেসের ঘোড়া রাখতাম না আমি। রেসের ঘোড়া কখনো আমার ভালো লাগে নি, আমি শুধু খাস জাত ঘোড়া রাখতাম: যেমন জেনারেল, শোলে, মহম্মদ। হ্যাঁ, পক্ষিরাজে চেপে যেতাম। কোচম্যানটাও ছিল চমৎকার। আমার পেয়ারের কোচম্যান। পাঁড়মাতাল হয়ে যায় বেটা। যাহোক, পেঁছিলাম রেসের মাঠে। ওরা জিজ্ঞেস করল, 'সেপুর্খভ্স্কোয়, রেসের ঘোড়া কবে কিনছেন বলুন তো?' 'আপনাদের তো সব চাষাড়ে ঘোড়া, জাহান্নমে যাক! আমার এই গাড়ির ঘোড়া আপনাদের ঘোড়াগুলোকে দৌড়ে টেক্কা দেবে,' আমি বললাম। 'কী বলছেন আপনি, কখনো পারবে না,' ওরা বলে উঠল। 'বেশ, এক হাজার রুবল বাজি,' হাতে হাত মেলানো হল। ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হল। আমারটা পাঁচ সেকেন্ডে জিতে গেল, জিতে গেলাম হাজার রুবল। কিন্তু সেটা এমন কিছু নয়। একবার তিনটে খাস জাত ঘোড়ায় টানা গাড়িতে তিন ঘণ্টায় একশ ভের্স্তা গিয়েছিলাম। সারা মস্কো জানে।'

সমানে গড়গড় করে এত গল্প দিয়ে চললেন সেপ্রুখভ্স্কোয় যে গৃহকর্তা একটি কথাও বলতে পারলেন না; সামনে বিমর্ষ মুখে বসে নিজের এবং অতিথির জন্য মদ ঢালা ছাড়া চিত্তবিনোদনের আর কিছু নেই।

আলো হয়ে আসছে। তবু দুজনে বসে আছেন। অকথ্য একঘেয়ে লাগছে গৃহকর্তার। তিনি উঠে পড়লেন।

‘হ্যাঁ, শোওয়া যাক,’ বলে সেপ্রুখভ্স্কোয় অতিকষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে টলতে টলতে গেলেন নিজের ঘরে।

গৃহকর্তা শুয়ে আছেন রক্ষিতার পাশে।

‘লোকটা মহা ঘোড়েল। নেশা করে সমানে ধাপ্পা মেরে গেল।’

‘আমার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টির চেষ্টাও করেছিল।’

‘মনে হচ্ছে টাকা চাইবে আমার কাছে।’

জামাকাপড় না ছেড়ে বিছানায় শুয়ে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছেন সেপ্রুখভ্স্কোয়।

“অনেক গল্প দিয়েছি মনে হচ্ছে,” তিনি ভাবলেন। “বেশ, তাতে কী এসে যায়। মদটা ভালো, কিন্তু লোকটা একটা আস্ত শুয়োর। বেনের মতো। আর আমিও একটা আস্ত শুয়োর।” মনে মনে বলে খক খক করে হেসে উঠলেন তিনি। “আগে রক্ষিতা পুষতাম, এখন তারা আমাকে পোষে। ভিনক্লের-জায়া আমাকে পুষছে — টাকা বাগাই ওর কাছ থেকে। কেমন জব্দ লোকটা, যেমন কুকুর তেমন মুগুর। যাক, জামাকাপড় খুলে ফেললে হয় এখন। শালার বুট খোলা দায়।”

'এই!' বলে তিনি হাঁকলেন। কিন্তু তাঁর সেবার ভার যে লোকটার ওপর সে শুয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ।

উঠে বসে টিউনিক, ওয়েস্টকোট খুলে ফেলে, পা ছুঁড়ে শরীর থেকে খসালেন পেণ্টুলেনটা, কিন্তু বুটজোড়া আর খোলা যাচ্ছে না, নধর ভুঁড়ি বাদ সাধছে। শেষ পর্যন্ত একটা কোনোক্রমে খোলা গেল বটে, অপরটা অনেক চেষ্টাতেও সরল না, অনেক হাঁসফাঁস আর টানাহেঁচড়া সত্ত্বেও। অবশেষে বুটসুদ্ধই ধপাস করে শুয়ে পড়ে নাক ডাকাতে লাগলেন সেপুখভ্‌স্কোয়। ঘরটা ভরে গেল তামাক, মদ আর বার্ধক্যের দুর্গন্ধে।

১২

সে রাত্রে অনেক কিছু মনে আনতে পারত পক্ষিরাজ। কিন্তু ভাস্কা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। পিঠে একটা মোটা কাপড় চাপিয়ে তাড়াহুড়ো করে ছুটিয়ে নিয়ে গেল একটা শুঁড়িখানায়। সেখানে একটি চাষীর ঘোড়ার পাশে বেঁধে রাখল সারা রাত। দুটো ঘোড়া পরস্পরের গা চাটল। সকালে ঘোড়ার পালে ফিরে এসে পক্ষিরাজের শুরু হল চুলকানি।

"এত চুলকোচ্ছে কেন?" ভাবল সে।

পাঁচ দিন কেটে গেল। ডাক পড়ল পশুচিকিৎসকের।

'ওর তো দেখছি খোস-পাঁচড়া হয়েছে,' সানন্দে বলল পশুচিকিৎসক। 'বেদেদের কাছে ঝেড়ে দাও।'

'কেন? গলা কেটে দিলেই হবে, তাহলে আজকের মধ্যেই ওকে সরানো যাবে।'

সকালটা পরিষ্কার, চুপচাপ। চরতে গেছে ঘোড়ার পাল। পক্ষিরাজকে নিয়ে যাওয়া হয় নি। অদ্ভুত চেহারার একটা লোক এল — রোগা, কালো, নোংরা, সমস্ত কোটে কিসের দাগ। কসাই সে। পক্ষিরাজের দিকে তাকাল না পর্যন্ত, মুখের দড়ি টেনে চলল বাইরে। পক্ষিরাজ চলল শান্তভাবে, পিছন ফিরে তাকাল না, বরাবরকার মতো পা টেনে টেনে চলেছে, পেছনের পা দুটো খড়ের ওপর দুমড়ে যাচ্ছে। দরজা পার হয়ে সে কুয়োর দিকে ফিরেছে, লোকটা একটা টান নিয়ে বলল, 'ওতে কোন ফয়দা হবে না বাপু।'

ভাস্কা পেছন পেছন আসছিল; দুজনে তাকে নিয়ে গেল ইঁটের চালাটার পেছনের খাদে। তারপর দুজনে দাঁড়িয়ে পড়ল যেন এই অতি মামুলী জায়গাটায় আহামরি গোছের কিছু একটা আছে। তারপর ঘোড়ার মুখের দড়িটা ভাস্কাকে দিয়ে কোট খুলে ফেলে জামার আস্তিন গুটোল কসাই, বুটের ভেতর থেকে একটা ছুরি আর শান দেবার পাথর বের করে ছুরিতে শান দিতে লাগল। মুখের দড়িটার দিকে এগোল আক্তা ঘোড়া, একঘেয়ে লাগছে, ওটাকে চিবিয়ে তবু সময় কাটবে কিছুটা, কিন্তু দড়িটা বড্ডো দূরে, তাই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজল সে। ঠোঁটটা ঝুলে পড়ল, হলদে দাঁতের টুকরো দেখা গেল। ছুরি শানাবার আওয়াজে ঘুমের ঢুলুনি এসে গেছে। কেবল আলগাভাবে রাখা, ফোলা বেতো পাটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। হঠাৎ কে যেন চোয়াল চেপে মাথাটা ঠেলে ওপরে তোলাতে চোখ খুলল। সামনে দুটো কুকুর। একটা কসাই-এর দিকে নাক উঁচু করে হাওয়া শুঁকছে, আর একটা বসে তাকিয়ে আছে ঘোড়ার দিকে, যেন তার কাছে কিছু পাবার প্রত্যাশা। তাদের দিকে চেয়ে তাকে ধরে-থাকা হাতটায় ঘোড়াটা গাল ঘষতে লাগল।

"আমার চিকিৎসা হবে দেখছি," ভাবল সে। "বেশ, হোক।" আর সত্যি, ওর গলা নিয়ে কিছু একটা ব্যাপার চলেছে বোঝা গেল। কিসের হঠাৎ আঘাত যেন, আর ব্যথার ঝিলিক। চমকে উঠে পা ছুঁড়ল সে, কিন্তু টাল সামলে নিয়ে এর পর কী ঘটে তা দেখার অপেক্ষায় রইল। ঘাড় আর বুক বেয়ে দরদর ধারায় গরম কী একটা গড়িয়ে পড়তে লাগল। গভীর একটা নিঃশ্বাস নিল সে, এত গভীর যে পাঁজরাগুলো ফুলে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে আরাম হল। জীবনের সমস্ত বোঝা ঝরে যাচ্ছে যেন। চোখ বুজে এল, মাথাটা পড়ল ঝুঁকে। কেউ মাথা ধরল না। গলা নেমে এল, পাগুলো থরথর কাঁপছে, সমস্ত শরীর টলমল। সবকিছু একেবারে অন্য রকম ঠেকছে, ভয় যত নয় বিস্ময় তত। অবাক হয়ে ছুটে এগিয়ে যেতে চাইল সে, চেষ্টা করল লাফাবার, কিন্তু পাগুলো দুমড়ে গেছে, একদিকে কাত হয়ে যাচ্ছে শরীরটা। নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করাতে শরীরের বাঁ দিকে ভর দিয়ে পড়ে গেল হুড়মুড় করে। কুকুরদুটোকে ধরে সবুর করে রইল কসাই শরীরের আক্ষেপ থেমে না যাওয়া পর্যন্ত; তারপর কাছে এসে একটা পা ধরে ঘোড়াটাকে দিল চিৎ করে শুইয়ে, ভাস্কাকে পা ধরে রাখতে বলে চামড়া ছাড়াতে শুরু করল।

'ঘোড়াটা খাসা ছিল,' বলল ভাস্কা।

'গতরে একটু মাংস থাকলে চামড়াটাও খাসা হত,' বলল কসাই।

ছোট পাহাড় হয়ে সন্ধ্যেবেলায় ঘোড়ার পাল ফিরছে। বাঁ দিকের ঘোড়াগুলো দেখল মাটিতে লাল কী একটা জিনিস নিয়ে কয়েকটা কুকুর খুব ব্যস্ত; কয়েকটা চিল আর কাক ওপরে উড়ছে।

দু পায়ে জিনিসটাকে চেপে একটা কুকুর মাথা ঝাঁকিয়ে দাঁত দিয়ে এত জোরে টান দিল যে কড়মড় শব্দে একটা টুকরো বেরিয়ে এল।

বাদামি ঘুড়ীটা থমকে দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে অনেকক্ষণ হাওয়া শুঁকল। অনেক কষ্টে তাকে সরানো হল।

ভোরের দিকে পুরনো বনের খাদে ঘন ঝোপঝাড়ে কয়েকটা নেকড়ে ছানা ফূর্তিতে কুঁই কুঁই করছিল। পাঁচটা ছানা, চারটে আকারে প্রায় সমান; আর একটা একটু ছোট, শরীরের চেয়ে মাথা বড়ো। বিবর্ণ রোগা লিকলিকে নেকড়ে-গিন্নী বেরিয়ে এল ঝোপ থেকে, ঢাউস পেটের বাঁট ঝুলে পড়ে মাটিতে ঠেকেছে; বেরিয়ে বসল বাচ্চাগুলোর সামনে; তারা দাঁড়িয়ে রইল অর্ধ-বৃত্ত আকারে। সবচেয়ে ছোটটার কাছে গিয়ে, লেজ গুটিয়ে মাথা নীচু করে নেকড়ে-গিন্নী মুখ খুলল, অস্থিরভাবে কয়েকবার পেট কাঁপিয়ে বিরাট দাঁত বের করে মুখ খুলে ঘোড়ার মাংসের একটা বড়ো টুকরো ছুঁড়ে দিল ওপরে। বড়োগুলো দৌড়ল তার পেছনে, কিন্তু নেকড়ে-গিন্নী তোড় গিয়ে তাদের ভাগিয়ে দিয়ে গোটা টুকরোটা দিয়ে দিল ছোটটাকে। যেন রাগে গরগর করে উঠে বাচ্চাটা খপ্ করে টুকরোটা ধরে ফেলে থাবায় চেপে ছিঁড়তে শুরু করল। ঠিক তেমনি করে নেকড়ে-গিন্নী একে একে আরো চারটে টুকরো ছুঁড়ে দিল। তারপর বাচ্চাদের কাছে শুয়ে পড়ে জিরোতে লাগল।

সাতদিনের মধ্যে ইঁটের চালার কাছে পড়ে রইল শুধু একটা বড়ো খুলি আর রাঙের হাড়দুটো; আর কোনো কিছুর পাত্তা

নেই। গ্রীষ্মকালে হাড়-কুড়োনো একটি চাষী খুলি আর রাঙের হাড়দুটো পর্যন্ত নিয়ে সেগুলোকে গুঁড়ো করে লাগাল নিজের কাজে।

সমানে পানাহার করে চলেছিলেন যে সের্পুখভ্‌স্কোয় তাঁর মৃতদেহ গোরস্থ হল অনেক অনেকদিন পরে। তাঁর হাড়মাস বা চামড়া কাজে লাগল না কারো। বিশ বছর ধরে তাঁর যে দেহ ছিল দুর্বহ বোঝার মতো, সেই মৃতদেহের সৎকার লোকের কাছে ঠিক তেমনি বিরক্তিকর মনে হল। অনেকদিন তাঁকে কারো প্রয়োজন হয় নি; লোকের কাছে তিনি অনেক দিনই বোঝার সামিল। তবু জীবন্মৃত যারা মৃতদেহের সৎকার করে, তারা ভাবল স্ফীত গলিত দেহটাকে সুন্দর পোষাকে ও বুটে সাজানো প্রয়োজন; তাই করা হল। আর চার কোণে রেশমের থোপনা-লাগানো খাসা নতুন একটা কফিনে শুইয়ে সেটাকে আবার রাখা হল আর একটা সীসের কফিনে; তারপর নিয়ে যাওয়া হল মস্কোয়। সেখানে মাটি খুঁড়ে আগেকার মানুষের হাড় বের করা হল, যাতে ঠিক সে জায়গাটাতেই নতুন পোষাক ও চকচকে বুট-পরা তাঁর গলিত পোকাধরা দেহটিকে গোর দেওয়া যায়।

১৮৮৫

কাকের চিরুণী



১

চল্লিশের দশকে সেণ্ট পিটার্সবুর্গে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল: জনৈক রূপবান রাজপুরুষ, বর্মধারী অশ্বারোহী সৈন্যদলের এক সেনাপতি — তাঁর সম্পর্কে সকলেই বলাবলি করত যে সম্রাট প্রথম নিকোলাইয়ের অধীনে এডিকং পদ ও উজ্জ্বল চাকুরিজীবন তাঁর ললাটলিপি, বিয়ে ঠিক হয়েছিল সম্রাজ্ঞীর নেক-নজরে-পড়া অপূর্ব সুন্দরী এক রাজপরিচারিকার সাথে, হঠাৎ বিয়ের মাসখানেক পূর্বে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে, ভাবী বধূর সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে, অল্প যা বিষয়-সম্পত্তি ছিল নিজের বোনকে দান করে দিয়ে সন্ন্যাসী হবেন বলে মঠে চলে গিয়েছিলেন। যারা এর ভিতরের কাহিনী জানত না তাদের জন্য এই ঘটনাটি অসাধারণ ও অজ্ঞেয় বলে প্রতিভাত হয়েছিল, কিন্তু প্রিন্স স্তেপান কাসাৎস্কির নিকট সমস্ত কিছু এত সহজ স্বাভাবিক মনে হয়েছিল যে তিনি এ ছাড়া অন্য কোনো কিছু করার কথা ভাবতেই পারেন নি।

স্তেপান কাসাৎস্কির বাবা, রিটায়ার্ড কর্ণেল, ছেলের যখন বারো বছর বয়স তখন মারা যান। ছেলেকে ঘরের বাইরে পাঠাতে মায়ের কী কষ্টই না হয়েছিল, কিন্তু তবু মৃত স্বামীর ইচ্ছা — তিনি মারা গেলেও ছেলেকে যেন ঘরে না ধরে রেখে সামরিক স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়, সে ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন নি, ছেলেকে ক্যাডেট

স্কুলে পাঠিয়েছিলেন। আর নিজে চলে গিয়েছিলেন মেয়ে ভার্ভারাকে নিয়ে পিটার্সবুর্গে, উদ্দেশ্য ছেলে যেখানে আছে সেখানে থাকা, ছুটিছাটায় তাকে নিজের কাছে এনে রাখা।

ছেলেটি তার অত্যাশ্চর্য মেধা ও প্রচণ্ড অহংবোধের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিল; ও সবের জন্যই সে পড়াশুনোয়, বিশেষভাবে গণিতে (এই বিষয়টিতে তার অবশ্য বিশেষ ধরনের ঝোঁক ছিল), এবং নানাবিধ সামরিক কর্তব্যকর্মে ও অশ্বারোহণে প্রথম স্থান অধিকার করত। গড়নে খুব অস্বাভাবিক রকমের ঢ্যাঙ্গা হওয়া সত্ত্বেও সে ছিল অত্যন্ত সুন্দর, শক্তসামর্থ আর চটপটে। তাছাড়া, আচার ব্যবহারের দিক থেকে কেবল বদরাগ যদি না থাকত তো সে আদর্শস্থানীয় ছাত্রই ছিল বলা যায়। মদ্য বা নারীতে তার কোনো আসক্তি ছিল না, আর সে ছিল আশ্চর্য রকমের সত্যবাদী। তার একমাত্র যা দোষ ছিল তা হল অন্ধ ক্রোধ; রেগে গেলে সর্বপ্রকার আত্মসংযম হারিয়ে ফেলত সে, একেবারে বন্য পশুর মতো হয়ে যেত। বিভিন্ন ধাতুর যে সংগ্রহ তার আছে তাই নিয়ে ঠাট্টা করার ফলে একবার তো এক সমপাঠী ক্যাডেটকে জানলা গলিয়ে ফেলে দেয় আর কি! আর একবার তো সে নিজেই নিজের পায় প্রায় কুড়ুল মেরে বসেছিল: স্টুয়ার্ডের মুখের উপরে কাটলেটভর্তি প্লেট ছুঁড়ে মেরেছিল, তারপর এক অফিসারের উপর লাফিয়ে পড়ে — লোকে বলে — সমানে প্রহার, সে নাকি নিজের কথা রাখে নি আর বেধড়ক মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছিল। যদি ক্যাডেট স্কুলের ডিরেক্টর স্টুয়ার্ডকে বরখাস্ত করে ব্যাপারটা ধামাচাপা না দিতেন তাহলে এর জন্য নিশ্চয়ই তার পদাবনতি ঘটত।

আঠারো বছর বয়সে ছেলেটি কমিশন র‍্যাঙ্কের অফিসার — রাজপ্রাসাদের অভিজাত সান্ত্রীবাহিনীর একজন হয়ে গিয়েছিল।

তার ছাত্রাবস্থাকালেই তার উপর সম্রাট নিকোলাই পাভ্‌লভিচের নজর পড়েছিল, সে সময়েই তার উপর তাঁর দাক্ষিণ্য বর্ষিত হয়েছিল, ফলে সবাই আশা করেছিল যে এ্যাডিকং পদের দিকে সে হাত বাড়াবে। এটা কাসাৎস্কি নিজেও চেয়েছিল, তার কারণ এ নয় যে সে কেবল উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিল, তার চেয়েও বড়ো কারণ: সামরিক প্রশিক্ষণে থাকাকালীনই সে নিকোলাই পাভ্‌লভিচের জন্য আবেগমথিত — হ্যাঁ, ব্যাপারটা বোঝাতে হলে এটাই ঠিক শব্দ — আবেগমথিত ভালবাসা অনুভব করত। যখনই নিকোলাই পাভ্‌লভিচ ঐ রেজিমেণ্ট পরিদর্শন করতে আসতেন — বেশ ঘন ঘনই আসতেন তিনি; মাপা-মাপা পা ফেলে তাঁর লম্বা-চওড়া বিশালাকার চেহারা, সামনে টানটান করে চিতানো বুক, গোঁফের উপরে ঝুলে থাকা বাঁকানো নাক, ছোটো গালপাট্টা, মিলিটারী পোষাকে সুসজ্জিত তিনি তাঁর গম্ভীর ভরাট গলায় যখন ক্যাডেটদের সম্ভাষণ করতেন, কাসাৎস্কি প্রেমের হর্ষ অনুভব করত হৃদয়ে ঠিক যেমনটি সে পরে, প্রেমে পড়েছিল যখন, প্রেমিকার মুখোমুখি হলে অনুভব করেছে। তফাতের মধ্যে — নিকোলাই পাভ্‌লভিচের প্রতি তার অনুভব ছিল আরো তীব্রতর। নিজের নিঃসীম আত্মসমর্পণ দেখাতে ভীষণ ইচ্ছে যেত তার, তাঁর জন্য যে কোনো কিছু উৎসর্গ করা, যা কিছু নিজের আছে তা নিবেদন করার বাসনা হত। আর নিকোলাই পাভ্‌লভিচও জানতেন, কী আনন্দ জাগাচ্ছেন তিনি, এবং সচেতনভাবে তা টিকিয়ে রাখতেন। ক্যাডেটদের সাথে তিনি খেলাধুলো করতেন, নিজের চারপাশ ঘিরে রাখতেন তাদের দিয়ে, শিশুসারল্যে কখনো কথা বলেছেন, কখনো বা বয়োজ্যেষ্ঠ সুহৃদের মতো, আবার কখনো সম্রাটের রাজকীয় মর্যাদায়। অফিসারের সাথে কাসাৎস্কির গণ্ডগোলের পরে নিকোলাই

পাভ্‌লভিচ কোনো মন্তব্য করেন নি, কিন্তু ছেলেটি তাঁর কাছাকাছি যেতেই থিয়েটারি কায়দায় হাত নেড়ে সরে যেতে বলেছিলেন, ভ্রূ কুঞ্চিত হয়েছিল তাঁর, আঙ্গুল নেড়ে ইশারায় ধমক দিয়েছিলেন, তারপর চলে যাবার সময়ে বলে উঠেছিলেন:

'শোনো, আমি সবকিছুই জেনেছি, কিন্তু কিছু জিনিস আছে যা আমি জানতে চাই না। তবু তারা সবই এই-ই এখানে।'

ব'লে তিনি তাঁর নিজের বুক দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

পরীক্ষোত্তীর্ণ ক্যাডেটরা যখন তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিল, তখন তিনি আর ও ঘটনার উল্লেখ করেন নি, সর্বদা যেমন বলে থাকেন তেমনি বলেছিলেন যে, দরকার হলে তারা যেন সরাসরি তাঁর কাছে চলে আসে, যেন তাঁর ও দেশমাতৃকার সেবা করে, আর তিনি সব সময়েই নিজেকে তাদের সেরা বন্ধু মনে করে থাকেন। সর্বদা যেমন হয়ে থাকে এবারেও সকলে আলোড়িত বোধ করল এ কথা শুনে, আর কাসাৎস্কি পূর্বঘটনা মনে করে অশ্রুসিক্ত হল, প্রিয়তম সম্রাটের সেবায় নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করবে বলে প্রতিজ্ঞা করল।

কমিশন র‍্যাঙ্ক পেয়ে কাসাৎস্কি যখন চাকরি ঢুকল, তখন তার মা মেয়েকে নিয়ে প্রথমে মস্কো চলে এসেছিলেন, তারপর চলে গিয়েছিলেন গ্রামের দিকে নিজেদের বাড়িতে। কাসাৎস্কি তার সম্পত্তির অর্ধেক বোনকে দিয়ে দিয়েছিল। বাকী অর্ধেক থেকে যা আয় হত তাতে তার খরচ মোটামুটি চলে যেত, কেননা যে রেজিমেণ্টে সে ছিল তার জাঁকজমক-আড়ম্বর ছিল খুব বেশি।

বাইরে থেকে দেখলে কাসাৎস্কিকে অতি সাধারণ এক তীক্ষ্নধী তরুণ, চাকুরিসর্বস্ব অফিসার ছাড়া আর কিছু মনে হত না, কিন্তু এক জটিল ও তীব্র পরিশ্রম করে যাচ্ছিল যে নিজের ভিতরে। এই

পরিশ্রম তার ভিতরে বাল্যকাল থেকেই বহমান ছিল, এবং আমার ধারণা, বহুমুখীও; কিন্তু মূলে তা ছিল একটিই: সে যা কিছু করেছে, জীবনের পথে যা কিছু তার সামনে পড়েছে, সবই সে একই রকম সাফল্য ও দক্ষতায় করতে চেয়েছে যাতে অন্যের প্রশংসা ও বিস্ময় জাগ্রত করবে। যদি তা লেখাপড়া, জ্ঞানচর্চার ব্যাপার হত, তাহলে হুমড়ি খেয়ে পড়ত তার উপরে, যতদিন না তাকে আয়ত্ত করে নিয়ে অন্যের কাছে উদাহরণস্থল হয়ে উঠতে পারে ততদিন তা নিয়ে লেগে থাকত। বিষয়টি তার সম্পূর্ণ দখলে এলে তখন আবার অন্য কোনো কিছু নিয়ে পড়া। এভাবেই লেখাপড়ায় সব সময়ে প্রথম হয়ে এসেছে সে; এভাবেই একবার — তখনো সে সামরিক স্কুলে ছাত্র — ফরাসী কথাবার্তা বলতে গিয়ে একটু বাধোবাধো ঠেকে তার কাছে, তার পরে সে ফরাসী নিয়ে এমন মেতে রইল যে মাতৃভাষা রুশীর মতোই ফরাসীতেও দক্ষতা অর্জন করল; আরো পরে দাবা খেলা শুরু করেছিল যখন — সেও তার ছাত্রাবস্থাতেই — তখন যতদিন না চমৎকার দাবাড়ে না হয়েছিল ততদিন ক্ষান্তি দেয় নি।

তার জীবনের যে প্রধান উদ্দেশ্য -- জার ও মাতৃভূমির সেবা করা, তা ছাড়াও তার সামনে সর্বদাই কোনো-না-কোনো তাৎক্ষণিক লক্ষ্য থাকত, আর সেটা যত নগণ্যই হোক না কেন, যতক্ষণ না তা সিদ্ধ হচ্ছে ততক্ষণ তাতেই সমস্ত দেহমনপ্রাণ ঢেলে দিত সে। কিন্তু লক্ষ্য সিদ্ধ হয়ে যাওয়া মাত্রই পরক্ষণেই আরেকটা কোনো লক্ষ্যবস্তু উদিত হত তার সামনে, পূর্বের স্থান দখল করে নিত। বিশিষ্ট হওয়ার জন্য এই নিরন্তর কর্মপ্রয়াস, এবং বিশিষ্ট হওয়া, একের পর এক লক্ষ্যে গিয়ে পেঁছানো — এ সবই তার জীবন কানায় কানায় ভরে রেখেছিল। তাই অফিসার পদে বহাল হওয়া

মাত্রই তার উদ্দেশ্য হয়েছিল চাকরির সমস্ত আইনকানুন সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা, এবং সে খুব তাড়াতাড়িই এক আদর্শস্থানীয় অফিসারে পরিণত হতে পেরেছিল, অবশ্য তার ঐ এক দোষ — অদম্য ক্রোধের কথা বাদ দিলে, এর জন্য চাকুরিরত অবস্থায় উন্নতির পরিপন্থী নানান কেলেঙ্কারি কাণ্ডকারখানায় জড়িয়ে পড়তে হয়েছে তাকে। তারপর একবার কার সঙ্গে যেন আলাপ করতে গিয়ে নিজের শিক্ষার ত্রুটি সম্পর্কে সে সচেতন হয়ে ওঠে। এই অভাব পূরণের জন্য সে বদ্ধপরিকর হয়, এরপর বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকল সে, যা চেয়েছিল তা করে ছাড়ল। এরপর তার মনে হল সমাজের হাই সোসাইটিতে একটু চমক লাগানো দরকার; বল-নাচ ত্রুটিহীনভাবে শিখল আর অল্পদিনের মধ্যেই ঐ সব নাচের আসরে নিমন্ত্রণ পাওয়া শুরু হল, এমন কি ঘনিষ্ঠ ঘরোয়া আসরেও। এতে অবশ্য সে পরিতৃপ্ত হয় নি। প্রথম আসন পেতেই সে অভ্যস্ত হয়ে এসেছে এতদিন, আর এই সব জায়গায় সে তার কাছাকাছিও যেতে পারছিল না।

সে সব দিনে উঁচু সমাজ বলতে বোঝাত — আর আমার ধারণা, সব সময় সব জায়গাতেই তা-ই বোঝায় — চার ধরনের লোক: ১) যারা ধনী ও রাজসভার সঙ্গে সম্পর্কিত; ২) যারা ধনী নয় কিন্তু জন্মসূত্রে এবং শিক্ষাদীক্ষায় রাজসভার সাথে সম্পর্কিত; ৩) রাজসভায় গ্রহণযোগ্য হতে ইচ্ছুক ধনী ব্যক্তি, এবং ৪) যাদের প্রথম ও দ্বিতীয় দুটিরই অভাব অথচ অর্থ এবং রাজসভা উভয়েই নিজেদের সামর্থে পেতে চায়। কাসাৎস্কি প্রথম দলে পড়ে না। শেষ দুটো দলের মধ্যে অনায়াসেই তাকে ফেলা যায়। উঁচু সমাজে যাওয়া-আসার শুরুতেই সে লক্ষ্য ঠিক করে নিয়েছিল যে, সেখানকার কিছু মহিলার সঙ্গে তাকে ভালোরকম সম্পর্ক পাতাতে হবে —

আর তা অপ্রত্যাশিত দ্রুতভাবেই সে সম্পন্ন করতে পেরেছিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সে বুঝল যে, যেখানে তার স্বচ্ছন্দ বিহার প্রতিতুলনায় সে সমাজ নিম্নমানের, আর আরো উঁচু যে সমাজ ছিল, রাজসভার সাথে সম্পর্কিত উচ্চতর সমাজ, সেখানে সে গৃহীত হলেও সে ছিল আগন্তুক; ব্যবহারে তার প্রতি বদান্যতা ছিল সকলেরই, তথাপি প্রতিটি আচার ব্যবহারই তাকে বুঝিয়ে দিত যে, ঐ সমাজের আসল আপন লোক অন্যেরা, সে নয়। অথচ কাসাৎস্কি ওদেরই একজন হতে চেয়েছিল। আর তা হতে গেলে হয় তাকে এডিকং হতে হবে — সে তা হতে চাইছিলও, — নয়তো পাণিগ্রহণ করতে হবে ঐ সমাজেরই কারো। সে ঠিক করল, এটা করাই সঙ্গত। নির্বাচন করল একটি তরুণী, অপরূপা, রাজসভারই অন্তর্গত একজন, যে তার কাঙ্ক্ষিত সমাজেই যে শুধু থাকে তা নয়, যার নৈকট্যলাভে উদ্‌গ্রীব এমন কি সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন লোকজনেরা এবং ঐ সমাজভুক্ত অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ। মহিলাটি — কাউণ্টেস করৎকোভা। কাসাৎস্কি যে শুধু নিজের আখের গুছোবার জন্য কাউণ্টেসের দিকে ঝুঁকেছিল তা নয়, করৎকোভা ছিলেন অসাধারণ মনোমোহিনী, কাসাৎস্কি দ্রুত তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। প্রথম দিকে মহিলাটি স্পষ্টতঃই নিরুত্তাপ ছিল তার প্রতি, কিন্তু তারপর হঠাৎ দ্রুত সব কিছু পাল্টে গেল, মেয়েটি তার প্রতি হয়ে উঠল প্রসন্ন ব্রীড়াময়ী, আর তার জননী কাসাৎস্কিকে বিশেষভাবে প্রশ্রয় দিয়ে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ করতে লাগলেন।

বিবাহের প্রস্তাব পাঠাল কাসাৎস্কি এবং তা গৃহীতও হল। এত সহজে সব হয়ে যেতে সে ভীষণ অবাক এবং আনন্দিত হয়েছিল, জননী ও কন্যার সমস্ত ধরনধারণই কেমন অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক

মনে হয়েছিল তার। কিন্তু সে তখন প্রেমে মোহ্যমান আর তাই অন্ধ, নইলে সারা সহর যে কথা জানত — যে বছরখানেক আগেও নিকোলাই পাভ্‌লভিচের রক্ষিতা ছিল মেয়েটি — তা তার চোখেই পড়ে নি কখনও।

২

বিবাহের দু সপ্তাহ পূর্বে ত্‌সার্স্কয়ে সেলো-র গ্রীষ্মবাসে তাঁর বাগদত্তার কাছে বেড়াতে গিয়েছিলেন কাসাৎস্কি। মে মাসের গরমের দিন ভাবী বর-বধূ বাগানে ঘুরে বেড়ালেন কিছুক্ষণ, তারপর লাইম গাছের ছায়াচ্ছন্ন বীথিকায় একটা বেঞ্চির উপর বসে পড়লেন। স্বচ্ছ সাদা পোষাকে বিশেষভাবে সুন্দর লাগছিল মেরীকে। মনে হচ্ছিল পবিত্রতা ও প্রেমের প্রতিমূর্তি যেন: তিনি বসেছিলেন কখনও বা আনত মস্তকে, কখনও বা তাকিয়ে দেখছিলেন বারে বারে বিশালদেহী রূপবান পুরুষটির দিকে যিনি এত মৃদু, এত ভদ্রভাবে তাঁর সাথে কথা বলছিলেন যে মনে হচ্ছিল — পাছে তাঁর কোন কথা বা ভঙ্গী ভাবী বধূর স্বর্গীয় পবিত্রতা এতটুকু নষ্ট বা ক্ষুণ্ণ করে, এই তাঁর ভয়। কাসাৎস্কি ছিলেন চল্লিশ দশকের সেই সব লোকদেরই একজন — আজকাল অবশ্য তাঁদের কেউ আর অবশিষ্ট নেই — যাঁরা সজ্ঞানে নিজেরা যৌন শুদ্ধাচারের কোন ধার ধারতেন না এবং তাতে কোন ভুলও দেখতেন না অথচ স্ত্রীদের নিকট থেকে দাবী করতেন আদর্শিক ও স্বর্গীয় শুদ্ধতা, এবং নিজেদের চারপাশের সব মেয়েদের উপর সেই গুণাবলী আরোপ করে সেইভাবেই ব্যবহার করতেন তাদের সঙ্গে। এ ধরনের ধারণার মধ্যে ত্রুটি ছিল অনেক, পুরুষেরা নিজেদের উচ্ছৃঙ্খলতাকে

যে প্রশ্রয় দিত তার দোষ ছিল অনেক, কিন্তু নারীজাতির প্রতি তাদের মনোভাব (আজকালকার যুবক যারা মেয়ে দেখলেই মনে করে কোনো মাদী মন্দা খুঁজে বেড়াচ্ছে, তাদের মনোভাবের চেয়ে তা ছিল একেবারে আলাদা), আমার ধারণা, উপকারীই ছিল। নিজেদের এভাবে আদর্শিত হতে দেখে মেয়েরা সত্যি সত্যি যতখানি সম্ভব দেবী হওয়ার চেষ্টা করত। কাসাংস্কি নিজে ও রকম মনোভাবই পোষণ করতেন নারী সম্পর্কে, নিজের ভাবী বধূকেও তিনি সেই চোখেই দেখতেন। বিশেষভাবে সেই দিন নিজের মধ্যে এতো বেশি প্রেম তিনি অনুভব করছিলেন যে তাঁর প্রতি বিন্দুতম দৈহিক আসক্তিও তাঁর বোধ হচ্ছিল না, বরং উল্টো — আদরে সোহাগে তিনি তাকিয়েছিলেন ভাবী বধূর দিকে, যেন দেখছেন অপ্রাপনীয় কোনো অধরাকে।

তিনি তাঁর বিশাল দেহ নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, মহিলাটির সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন, দুটি হাত তরবারির উপর রাখা।

'আমি এই মাত্র জানলাম, জীবন কী সুখেরই না হতে পারে। আর তা আপনি, তুমি...' তিনি বলে চললেন, মুখে সলজ্জ হাসি, 'তুমিই তা আমাকে দিয়েছ।'

এ হল সেই সময়ের কথা যখন 'তুমি' বলাটা তখনও চালু হয় নি, আর উপরিমহলের এই মহিলাকে, তাঁর দেবীকে সদাচারের দিক থেকে 'তুমি' সম্বোধন করা তাঁর পক্ষে ভীতিজনক বৈকি।

'আমি যে আমাকে জানতে পারলাম সে তো তোমারই জন্যে, জানলাম এতোদিন যা আমি ভেবে এসেছি তার চেয়েও আমি ভালো।'

'আমি তা অনেকদিন থেকেই জানি। সেজন্যেই তো আপনাকে আমি ভালোবাসি।'

কাছাকাছি কোথাও একটা বুলবুল শীষ দিয়ে উঠল, দমকা হাওয়ায় শিরশিরিয়ে উঠল গাছের নতুন পাতা।

তিনি প্রিয়তমার হাত টেনে নিলেন, চুমু খেলেন হাতে, চোখে তাঁর জল এসে গেল। মহিলাটি বুঝলেন যে তিনি যা বলেছেন সেজন্য, তিনি যে ভালবেসেছেন কাসাৎস্কিকে সেজন্য এ হল ধন্যবাদ। ভদ্রলোক দু'একপা পায়চারি করলেন, মুখে কোনো কথা নেই, তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন ফের, বসে পড়লেন।

'আপনি জানেন... তুমি জান... আচ্ছা থাক, ঠিক আছে। তোমার কাছে যে আমি এসেছি, এ কিন্তু খুব নিঃস্বার্থ নয়, আমি চেয়েছিলাম সমাজে উঠতে, কিন্তু পরে... তোমার সংস্পর্শে এসে, যখন আমি জানলাম তোমাকে তারপরে, সবকিছুই কী রকম তুচ্ছ হয়ে গেল। তুমি আমার ওপর রাগ করছ না তো?'

কোনো উত্তর দিলেন না ভদ্রমহিলা, শুধু হাত দিয়ে স্পর্শ করলেন প্রিয়তমের হাত।

কাসাৎস্কি বুঝলেন এর অর্থ: "না, রাগ করি নি।"

'আচ্ছা, তুমি না বললে,' থেমে গেলেন ভদ্রলোক, মনে হল ধৃষ্টতা হচ্ছে না তো, বলতে লাগলেন, 'তুমি তো বললে ভালোবাস আমাকে, কিন্তু লক্ষ্মীটি, কিছু মনে করো না, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, কিন্তু — কী যেন একটা, মানে এ সবের বাইরেও কিছু একটা আছে যা তোমাকে ভাবিয়ে তুলছে, তোমাকে খোঁচাচ্ছে। সেটা কী বলো তো?'

"ঠিক, এই সময়, হয় এখনই নইলে কখনোই নয়," ভাবলেন মহিলাটি, "সব তো ও জানতে পারবেই এক সময়। কিন্তু এখন হলে আমাকে ও ছেড়ে যাবে না। আঃ, ও ছেড়ে গেলে কী ভয়ানক যে হবে!"

অতঃপর চোখে প্রেমিকার দৃষ্টি নিয়ে তিনি কাসাৎস্কির লম্বা, মনোহর, বিশাল অবয়বের দিকে তাকালেন। নিকোলাইয়ের চেয়েও এখন তিনি বেশী ভালোবাসেন এঁকে, আর রাজসান্নিধ্যের মর্যাদা বা সুযোগ-সুবিধাদি যদি না থাকত তাহলে এঁর চেয়ে সম্রাটকে তাঁর বেশী পছন্দ হত না।

'শুনুন তাহলে। মিথ্যে কথা বলতে পারব না। সবই বলতে হবে আমাকে। আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন, কী? সেটা এই: আমি ভালোবেসেছিলাম।'

প্রেমিকের হাতে হাত রাখলেন তিনি, অনুনয়ের ভঙ্গীতে।

কাসাৎস্কি চুপ করে রইলেন।

'আপনি জানতে চান, কাকে? হ্যাঁ, তাঁকে — সম্রাটকে।'

'তাঁকে তো আমরা সবাই ভালোবাসি; আমার মনে হয় তুমি তখনও ইনস্টিটিউটে...'

'না, না, তারও পরে। আসক্তি আর কি, তবে পরে সব চলে গেছে। কিন্তু আমাকে যেটা বলতেই হবে...'

'ঠিক আছে, আবার কী?'

'না, শুধু ওটুকুই নয়...'

হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন তিনি।

'মানে? সঁপে দিয়েছিলে নিজেকে?'

উত্তর দিলেন না তিনি।

'উপপত্নী?'

চুপ করে রইলেন মহিলা।

তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন কাসাৎস্কি, মৃতের মতো ফ্যাকাসে, গণ্ডদেশ থরথর করে কাঁপছে, সামনে মুখোমুখি দাঁড়ালেন তাঁর। এখন মনে পড়ল নিয়েভ্স্কি সড়কে সেদিন দেখা হলে

নিকোলাই পাভ্‌লভিচ কী রকম প্রীতিভরা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তাঁকে।

'হে ঈশ্বর, আমি কী করলাম? স্তেপান!'

'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না আমাকে। উঃ কী যন্ত্রণা!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে সোজা বাড়ির দিকে চললেন তিনি। মেরীর মায়ের সাথে সেখানে দেখা হয়ে গেল।

'কী হয়েছে, প্রিন্স? আমি...' প্রিন্সের মুখের চেহারা দেখে থেমে গেলেন তিনি। হঠাৎ দেহের রক্ত সারা মুখে ছুটে এসেছে প্রিন্সের।

'আপনি সবই জানতেন আর চেয়েছিলেন আমাকে দিয়ে সব চাপা দিয়ে দেবেন। আপনারা যদি শুধু মেয়েমানুষ না হতেন...' চীৎকার করে উঠলেন তিনি, হাতের বিশাল মুষ্টি নিয়ে তেড়ে গেলেন, তারপর ধাঁ করে পিছন ফিরে ছুটে বেরিয়ে চলে গেলেন।

ঐ লোকটি, যে তাঁর ভাবী বধূর প্রণয়ী ছিল, যদি সে কেবল সাধারণ কোনো লোক হত তো খুন করে ফেলতেন তিনি, কিন্তু এ যে মহামান্য রাজাধিরাজ!

পরের দিনই তিনি ছুটির দরখাস্ত করলেন এবং ইস্তফা দিলেন চাকরিতে, রটিয়ে দিলেন তাঁর অসুখ করেছে — পাছে কারো সাথে দেখা হয়ে যায়, এই ভয়ে; তারপর চলে গেলেন গ্রামে।

গ্রীষ্মটা নিজের গ্রামে কাটালেন, বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত কাজকর্ম গুছিয়ে নিলেন সব। গ্রীষ্ম যখন শেষ হল তখনও পিটার্সবুর্গে আর ফিরলেন না, যাত্রা করলেন মঠের উদ্দেশ্যে এবং সেখানে গিয়ে সন্ন্যাসী হলেন।

তাঁর মা তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন, এ রকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে বিরত করতে চেয়েছিলেন ছেলেকে। তিনি উত্তর

দিয়েছিলেন যে ঈশ্বরের আহ্বান অন্য সমস্ত কিছুর চেয়ে বড়ো; আর সত্যিই তিনি তা অনুভবও করছিলেন। শুধু তাঁর বোন, তাঁরই মতো অহংকারী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তিনিই শুধু বুঝতে পেরেছিলেন ভাইকে।

তিনি বুঝেছিলেন: যারা এতদিন তাঁকে দেখিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে যে, তারা তাঁর চেয়ে উঁচুতে, তাদের চেয়েও উঁচুতে ওঠার জন্য ভাই সন্ন্যাসী হয়ে গেল। এবং তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের ফলে কাসাৎস্কি সেই সব কিছুর ওপরে অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রকাশ করতে লাগলেন যা অন্যদের নিকট মনে হত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁর নিজের কাছেও মনে হয়েছিল একদা, যখন তিনি সেনাবাহিনীতে ছিলেন, তখন; এখন তিনি নিজেকে নতুনভাবে যে উচ্চস্তরে উন্নীত করলেন সেখানে বসে এককালে যাদের তিনি ঈর্ষা করেছিলেন তাদের প্রতি নীচু চোখে দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল। কিন্তু যে শুধু এই বোধই, তাঁর বোন যেমনটি ভেবেছিলেন, তাঁকে চালিত করেছিল তা নয়। এর সঙ্গে মিশে ছিল আরও একটি বোধ, সত্যিকারের ধর্মবোধ — যে-সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না বোন ভারেন্‌কা, যা জড়িয়ে ছিল তাঁর ঐ অহংবোধ ও প্রথম হওয়ার বাসনার সাথে, চালিত করেছিল তাঁকে। মেরী (ভাবী বধূ), যাঁকে তিনি ভেবেছিলেন দেবী, তাঁর বিষয়ে মোহভঙ্গ ও অপমান এত তীব্রভাবে বেজেছিল যে হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছিলেন তিনি, আর হতাশা থেকে কোন দিকে? — ঈশ্বরের দিকে, হ্যাঁ, তাঁর শৈশবী বিশ্বাসের দিকে, যে-বিশ্বাস কখনও তাঁর ভিতরে লাঞ্ছিত হয় নি।

৩

কাসাৎস্কি মঠে গিয়ে সন্ন্যাস নিলেন 'ইণ্টারসেশন' ধর্মীয় উপাসনার দিনে।

মঠাধ্যক্ষ ফাদার স্নুপিরিয়র ছিলেন ধনী অভিজাত বংশোদ্ভূত, পণ্ডিত ও লেখক মানুষ এবং স্তারেৎস্ও — যার মানে হল, নির্বাচিত নেতা ও পথপ্রদর্শকের ইচ্ছার কাছে প্রশ্নাতীত আত্মসমর্পণে চিহ্নিত ভ্লাক* হতে আগত সন্ন্যাসী পরম্পরার উত্তরসূরীদের একজন। পাইসি ভেলিচ্কোভ্স্কির শিষ্য স্তারেৎস্ লেওনিদ, তাঁর শিষ্য মাকারি, এবং তাঁর শিষ্য স্বনামধন্য স্তারেৎস্ আম্ব্রোসির শিষ্য হলেন এই ফাদার স্নুপিরিয়র। কাসাৎস্কি এঁকে তাঁর নিজের স্তারেৎস্ বা গুরু হিসেবে বরণ করে নিলেন।

মঠবাসী হওয়ার ফলে নিজেকে অন্যদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর মনে করার অনুভূতি ছাড়াও কাসাৎস্কি — ইতিপূর্বে যেমন বরাবর হয়ে এসেছে, এবারও তেমনি — সবকিছুতেই নিজের তৃপ্তি খুঁজে পেলেন; তৃপ্তি তাঁর এই নূতন ব্রতসাধনায়, তৃপ্তি ভিতর ও বাহির সর্বদিকে পরিপূর্ণ শুদ্ধতা অর্জনের নিরলস সাধনায়। সৈনিক জীবনে তিনি যে শুধু নিখুঁত অফিসার ছিলেন তাই নয়, ছিলেন তারও বেশী: তাঁর কাছ থেকে যা চাওয়া হত তার চেয়ে বেশী করতেন তিনি, কর্তব্য পালন করতেন অতিমাত্রায়, সরকারী নিয়মের আওতার বাইরেও। এখনও ঠিক সেই রকম,

* দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে, প্রধানত রুমানিয়ায়, বসবাসকারী একটি অন-স্লাভ জনগোষ্ঠীর নাম ভ্লাক; যে স্থানে এদের অধিবাস সে অঞ্চলটির নাম ভালাকিয়া (Walachia) — এটি রুমানিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে। — সম্পাঃ

এখন যখন তিনি সন্ন্যাসী তখনও তিনি হতে চাইলেন সঠিক যথাযথ ও নিখুঁত: অবিরাম চেষ্টা চলল পরিশ্রমী, সংযমী, বিনয়ী, ভদ্র, পবিত্র — শুধু কর্মে নয় এমন কি চিন্তাতেও — এবং বশ্যতাপ্রবণ কী করে হবেন তার। এই সর্বশেষ গুণটি কিংবা বলা যাক এই সদ্‌গুণটি বিশেষভাবে সহজতর করেছিল তাঁর জীবন। অসংখ্য দর্শনার্থী অধ্যুষিত এই মঠে সন্ন্যাসীর জীবনযাপনে তাঁর উপর যে সব দাবী জানানো হত তা সুখকর ছিল না তাঁর কাছে, তাঁকে ঠেলে দিত প্রলোভনের দিকে; কিন্তু বশ্যতাবোধ দ্বারা কাটিয়ে উঠতেন তা, কাটিয়ে উঠতেন এই যুক্তিতে: যুক্তিতর্ক তো আমার করার কথা নয়; যে কর্তব্য আমাকে দেওয়া হয়েছে তাই শুধু আমাকে পালন করতে হবে, তা সে যেমনই হোক না কেন — পুণ্য স্মারকাদির উপরে নজর রাখা কিংবা উপাসনা সঙ্গীতে গায়কদলের ঐকতানে কণ্ঠ মেলানো কিংবা মঠের আশ্রমের হিসাবপত্র রাখা, যেমনই হোক। কোনো ব্যাপারে বিন্দুতম সন্দেহ পোষণের সম্ভাবনাও যে বিলুপ্ত হত তাও সে ঐ একই সদ্‌গুণে, স্তারেৎস্‌-এর প্রতি বশ্যতাবোধের কারণে। এই বশ্যতাবোধটি যদি না থাকত তাহলে প্রাত্যহিক ধর্মীয় উপাসনার দীর্ঘতা ও একঘেয়েমি, দর্শনার্থীদের অবিরাম যাওয়া-আসা এবং মঠবাসী ধর্মভ্রাতাদের কদর্য রীতিনীতি তাঁর পক্ষে ভয়ানক পীড়াদায়ক হত; কিন্তু এখন বশ্যতাপ্রবণ হওয়ার কারণেই ও সব যে শুধু আনন্দচিত্তে সহনীয়ই মনে হল তা নয়, এমন কি তা তাঁকে এনে দিল এক নতুন ধরনের আরামবোধ ও জীবনধারণের অবলম্বন: "দিনের মধ্যে একই প্রার্থনা হাজার বার শুনে যাওয়া কেন যে দরকার, তা আমি বুঝতে পারি না; কিন্তু আমি জানি যে তা দরকার। আর যখন জানি যে তা দরকার, তখনই তার মধ্যে শান্তি খুঁজে পাই।"

স্তারেৎস্‌ তাঁকে বলেছিলেন যে দেহ ধারণের জন্য যেমন আমাদের আহার্য প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন আত্মিক জগতের জন্য আধ্যাত্মিক খাদ্য, উপাসনালয়ের প্রার্থনা। কাসাৎস্কি নিজেও তা বিশ্বাস করতেন; আর সত্যিই, প্রাত্যহিক ধর্মোপাসনা যার জন্য প্রত্যুষে ঘুম থেকে ওঠা কখনও-কখনও রীতিমতো কষ্টকর মনে হত তাঁর, সেটাই তাঁকে এক অনস্বীকার্য শান্তি ও আনন্দের আস্বাদ দিত। আত্মনিবেদনের অনুভবের মধ্যে এই আনন্দ নিহিত ছিল, স্তারেৎস্‌ নির্দেশিত তাঁর করণীয় সমস্ত কিছু প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নেওয়ার মধ্যেও ছিল সে আনন্দ। ক্রমবর্ধমান রূপে বাসনার সংহার সাধন, অধিক থেকে অধিকতর বিনয় ও আত্মসমর্পণ ইত্যাদিই যে শুধু জীবনের অর্থ সূচিত করছিল তাঁর কাছে তা নয়, আরো বেশি — খ্রীষ্টীয় গুণাবলী আত্তীকরণের মধ্যে তা মূর্ত হয়ে উঠছিল, এবং প্রথম দিকে এ সব আয়ত্ত করা বেশ সহজই মনে হয়েছিল তাঁর। নিজস্ব বিষয়-সম্পত্তি সবই বোনকে দান করেছিলেন, সেজন্য কোনো দুঃখও ছিল না; আর তিনি অলস ছিলেন না মোটেও। নিম্নস্তরের লোকজনের প্রতি ব্যবহারে বিনয় প্রদর্শন কঠিন তো নয়ই, ছিল আনন্দের উৎস। এমন কি এই মরদেহের শারীরী যত পাপ, যথা, কাম ও লোভ, জিত হয়েছিল সহজেই। এই সব পাপকর্মের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেন স্তারেৎস্‌, এতে কাসাৎস্কি বরং খুশিই ছিলেন, কেননা এ সব থেকে মুক্ত ছিলেন তিনি।

তাঁকে কষ্ট দিত শুধু বাগদত্তা বধূর স্মৃতি। আর শুধু স্মৃতিই নয়, কী যে হতে যাচ্ছিল তার অনুপুঙ্খ ছবিও কল্পনায় দেখতে পেতেন। সম্রাটের আর একজন পূর্বতন প্রেমিকা, যিনি পরে বিবাহ করে সংসারী হয়েছিলেন এবং আদর্শ স্ত্রী ও সন্তানের

জননীও, তাঁর কথা মনে হত। ভদ্রমহিলার স্বামী দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভ করেছিলেন, সম্মান ও ক্ষমতার এবং তৎসহ একটি চমৎকার, অনুতপ্তা পত্নীর অধিকারী ছিলেন তিনি।

কাসাৎস্কির মেজাজ ভালো থাকলে এই সব চিন্তা তাঁকে বড়ো একটা কাবু করত না। সে সব মুহূর্তে ও সব কথা মনে হলে তাঁর বরং আনন্দই হত এই ভেবে যে, প্রলোভনের হাত থেকে তিনি বেঁচে গেছেন। কিন্তু এমন মুহূর্তও আসত তাঁর জীবনে যখন যে সব নিয়ে তিনি এখন বেঁচে আছেন সে সব হঠাৎ মনে হত নীরস, তাঁর বর্তমান জীবনে যে অবিশ্বাস আসত ঠিক তা নয়, তবে এই জীবনের কোনো অর্থের উপলব্ধি আর নিজের মধ্যে অনুভব করতেন না, এবং স্মৃতি ও — আরো সাংঘাতিক — সন্ন্যাসগ্রহণের জন্য অনুশোচনা এসে ভর করত তাঁর উপর।

এ সব থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায়ও নিহিত ছিল তাঁর ঐ বশ্যতাবোধে — তাঁর উপর অর্পিত কর্মভার যথারীতি পালনে এবং দিবসের প্রতিটি মুহূর্ত উপাসনায় ব্যস্ত থাকার মধ্যে। বরাবরকার মতো তিনি উপাসনা করে যেতেন, বিনীত আত্মনিবেদনে আনত হতেন বারবার, এমন কি প্রার্থনার পরিমাণ মাত্রায় বেড়ে যেত, কিন্তু সেই প্রার্থনা হত যত না আত্মিক, তার চেয়ে বেশি দৈহিক। কিন্তু এ রকম চলত একদিন কি বড়ো জোর দুদিন। তবু সেই একটা কি দুটো দিন তাঁর পক্ষে ভয়াবহ ছিল আর কি। তারই মধ্যে কাসাৎস্কি অনুভব করতেন যে তিনি যেন আর নিজের অধীন নন, নন ঈশ্বরেরও, বরং অধীন যেন অচেনা, অজানা অন্য কোনো কিছুর। যা কিছু তাঁর করে ওঠার কথা বা করতেন ঐ সব সময়ে তা ছিল শুধু স্তারেৎস-এর উপদেশের অনুসরণ: বশ্য হও, কিছুই করো না নিজে থেকে, করো অপেক্ষা। সব মিলিয়ে,

এই সময়ে কাসাৎস্কির জীবন নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী চালিত হয় নি, চালিত হয়েছিল স্তারেৎস-এর ইচ্ছার অধীনে, এবং তাঁর এই পূর্ণ আত্মসমর্পণই তাঁকে আত্মিক প্রসন্নতা এনে দিয়েছিল।

প্রথম যে মঠটিতে কাসাৎস্কি ঢুকেছিলেন সেখানেই কেটেছিল এইভাবে সাতটি বছর। তৃতীয় বর্ষের শেষে তাঁকে 'ধর্মজ্ঞ পুরোহিত' হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং নবদীক্ষার পরে তাঁর নতুন নামকরণ হয়: সিয়েগি। তাঁর আত্মিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল সেটি। ধর্মোৎসবে অংশগ্রহণ সর্বদাই তাঁর মনে অপার সান্ত্বনা ও আধ্যাত্মিক উদ্ভাসন জাগ্রত করত; আর এখন, যখন তিনি নিজেই উৎসবের পরিচালক তখন আত্মোৎসর্জনের অনুভব তাঁর সমগ্র অন্তর অব্যক্ত আনন্দে আপ্লুত করে দিত। তবু সময়-সময় তাঁর এই ভাবাবেগ তার প্রাবল্য হারাত এবং তারপর হয়তো যখন কোনো দিন এ রকম মন-মরা ভাব নিয়ে প্রার্থনানুষ্ঠান পরিচালনা করতে হত তাঁকে (আর এ রকমটা তাঁর প্রায়ই হত), তিনি অনুভব করতেন যে এই আনন্দবোধও এক সময় চলে যাবে। আর সত্যি, ভাবোল্লাসের অনুভূতি হীনবল হত বটে, কিন্তু রয়ে যেত সেই অভ্যাস।

মোট কথা, তাঁর মঠজীবনের সপ্তম বর্ষে সিয়েগির কাছে সবকিছুই বড়ো একঘেয়ে লাগতে শুরু করেছিল। যা তাঁর জানার ছিল, যা কিছু ছিল অর্জনের সবই আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন তিনি। আর কিছু তাঁর করার ছিল না।

অথচ, অন্যপক্ষে তাঁর মানসিক জড়িমা যাতে তিনি মাঝে মাঝেই নিমজ্জিত হতেন, তা গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছিল ক্রমে ক্রমে। এ সময়েই খবর এসেছিল মায়ের মৃত্যুর এবং জনৈক ব্যক্তির সাথে মেরীর পরিণয়ের সংবাদও। উভয় ঘটনাই উদাসীনভাবে

তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সমস্ত মনোযোগ, সমস্ত স্বার্থ নিবদ্ধ ছিল তাঁর অন্তর্গত জীবনে।

দীক্ষিত হওয়ার চতুর্থ বৎসরে বিশপ বিশেষভাবে প্রসন্ন হয়ে উঠেছিলেন তাঁর প্রতি, এবং স্তারেৎস্ তাঁকে বলেছিলেন, উচ্চতর পদের জন্য তাঁকে মনোনীত করা হলে কাসাৎস্কি তা গ্রহণে যেন অস্বীকৃতি না জানান। আর সেই মুহূর্তে তাঁর মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল উচ্চাকাঙক্ষার লোভ, সন্ন্যাসীদের সেই লোভ যা অন্যদের মধ্যে দেখে তাঁর নিজের গা ঘিনঘিন করে উঠত। রাজধানীর কাছাকাছি একটি মঠে তাঁকে নিযুক্ত করা হল। রাজী হওয়ার ইচ্ছে ছিল না তাঁর, কিন্তু স্তারেৎস্ যে তাঁকে এ নিয়োগ মেনে নিতে বলেছিলেন। ফলে এ নিযুক্তি তিনি স্বীকার করে নিলেন, স্তারেৎস-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করলেন অন্য মঠের উদ্দেশ্যে।

রাজধানীর অনতিদূরে এই মঠে আগমন সিয়েৰ্গির জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সর্বৈব প্রকার প্রলোভন আশেপাশে ঘিরেছিল তাঁকে আর সিয়েৰ্গির সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হয়েছিল তার প্রতিরোধে।

পূর্ববর্তী মঠে কামজ বাসনা তাঁকে বড়ো একটা পীড়ন করে নি, আর এখানে সেটাই ভয়াবহ প্রতাপ নিয়ে ফুঁসে উঠেছিল এবং তা এতদূর পর্যন্ত যে তা নির্দিষ্ট আকার পরিগ্রহ করেছিল। কুৎসিত স্বভাবের জন্য সর্বত্রপরিচিতা জনৈক মহিলা দহরমমহরম শুরু করেছিলেন সিয়েৰ্গির সঙ্গে। সিয়েৰ্গির সাথে দেখা করে কথাবার্তা বলেছিলেন এই মহিলা, অনুরোধ করেছিলেন তাঁর বাসায় যেতে। কড়াভাবে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন সিয়েৰ্গি, কিন্তু নিজের তীব্র বাসনার স্বরূপ উপলব্ধিতে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন নিজেই। এতো ভয় পেয়েছিলেন যে স্তারেৎস্-কে শেষ পর্যন্ত

লিখে জানাতে হল, এমন কি তাঁর নিজের অহং বিসর্জন দিয়ে যে তরুণ সন্ন্যাসী তাঁর দেখাশোনা করত তার কাছে পর্যন্ত স্বীকার করে বসলেন এই দুর্বলতা, অনুরোধ জানালেন সে যেন তাঁর উপর নজর রাখে, দেখে যে তিনি যেন ধর্মীয় প্রার্থনাদি এবং মঠ সংক্রান্ত কাজকর্মের বাইরে আর কোথাও না যেতে পারেন।

এতদ্ব্যতীত সিয়েগির্র নিকটে আর একটি যে ব্যাপার বিরাট পরীক্ষা হিসেবে দাঁড়িয়েছিল তা হল, এই মঠের ফাদার সুপিরিয়র — চতুর, বৈষয়িক ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ভদ্রলোক সিয়েগির্র কাছে অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। নিজের সঙ্গে হাজার লড়াই করেও এই বিরূপতা ঘোচাতে পারেন নি সিয়েগির্। অবস্থাটা তিনি মেনে নিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু অন্তরের গভীরতম তলদেশে সর্বদাই তিনি তাঁকে দোষ দিয়েছেন। আর এই পাপচিন্তা এক সময় ফেটে বেরিয়েই পড়ল।

এটা ঘটেছিল তাঁর এই মঠে আসার দ্বিতীয় বৎসরে। ঘটেছিল এইভাবে। ইণ্টারসেশন উৎসবের দিনে মঠের বড়ো গীর্জাটায় সান্ধ্য প্রার্থনাসঙ্গীত হচ্ছিল। লোক হয়েছিল প্রচুর। ফাদার সুপিরিয়র নিজে পৌরোহিত্য করছিলেন। ফাদার সিয়েগির্ সচরাচর যেখানে দাঁড়ান সেখানেই দণ্ডায়মান ছিলেন, ডুবে ছিলেন নিজের প্রার্থনায়, মানে নিজের অন্তর্গত সংগ্রামে যা সর্বদাই, বিশেষতঃ এই বড়ো গীর্জায়, প্রার্থনাকালে — অন্ততঃ যে প্রার্থনা সভায় তিনি নিজে পুরোহিত নন — অধিকার করে নিত তাঁকে। দর্শনার্থীর দল, ভদ্রমহোদয়েরা, বিশেষতঃ কুলললনারা যে বিক্ষোভ এনে দিত মনে, তার জন্যই ছিল এই সংগ্রাম। তিনি তাদের না দেখার চেষ্টা করতেন, লক্ষ্য না করার চেষ্টা করতেন যা কিছু ঘটে যাচ্ছে সামনে:

সৈনিকেরা এসে যেভাবে পৌঁছে দিয়ে যেত তাদের, লোকদের পাশে হঠিয়ে রাস্তা করে দিত তাদের যাবার, মহিলারা যেভাবে সন্ন্যাসী দেখিয়ে দেখিয়ে — প্রায়শঃই তাঁকে কিংবা আর একজন রূপবান সন্ন্যাসী দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করত, কোনো কিছুই না দেখার চেষ্টা করতেন তিনি। যেন তাঁর সামনে কোনো পর্দা টাঙানো, তিনি কিছুই দেখতে চাইতেন না, আইকনের নিচে দীপাধারে প্রজ্বলিত দীপশিখা, আইকনের চাকচিক্য এবং প্রার্থনানুষ্ঠানে ব্যস্ত সন্ন্যাসীদের বাইরে আর কিছুই তিনি দেখতে চাইতেন না, শুনতে চাইতেন না কোনো কিছুই প্রার্থনাসঙ্গীত বা মন্ত্র ব্যতিরেকে, এবং প্রতিটি শ্রবণে, পূর্বে বহুবার শ্রুত প্রার্থনার প্রতিটি পুনরাবৃত্তিতে কর্তব্য পালনের যে আত্মবিস্মরণী বোধ অনুভূত হত তার বাইরে অন্য কোনো অনুভবে নিজেকে প্রশ্রয় দিতে চাইতেন না।

সেভাবেই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, আনত মস্তকে, প্রার্থনার মাঝে মাঝে প্রয়োজন মতো ক্রুশ-চিহ্ন আঁকছিলেন বুকে, নিজের শীতল ধিক্কার এবং সজ্ঞান উপলব্ধ চিন্তা ও বোধের ভয়াবহতার মধ্যে নিরন্তর যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন; এমন সময় ফাদার নিকোদিম, — এই আর এক মহা পরীক্ষা ফাদার সির্য়েগির জন্য — যাকে তিনি বাগাড়ম্বর আর ফাদার সুপিরিয়রের কাছে তোষামোদী করার জন্য মনে মনে নিন্দা না করে পারতেন না, — সেই নিকোদিম এগিয়ে এলেন তাঁর কাছে, অর্ধদেহ নুইয়ে মহাকুর্নিশের পর নিবেদন করলেন যে ফাদার সুপিরিয়র তাঁকে উপাসনাবেদীতে নিজের কাছে ডাকছেন। ফাদার সির্য়েগি ঠিকঠাক করে নিলেন নিজেকে, মাথা ঢেকে নিলেন, তারপর ভিড়ের ভিতর দিয়ে সামনে এগিয়ে চললেন ধীরে, সাবধানে।

'Lise, regardez à droite, c'est lui,'* এক মহিলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'Où, où? Il n'est pas tellement beau.'**

তিনি বুঝলেন, কথাগুলো তাঁকে নিয়েই বলা হল। আর তা শুনতে পাওয়া মাত্রই, প্রলোভনের মুহূর্তে সর্বদা যেমন তিনি বলে থাকেন, এবারও বারংবার উচ্চারণ করতে লাগলেন: 'প্রলোভনের দিকে আর আমাদের ঠেলে দিও না', মাথা নীচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে চলতে লাগলেন একটি বেদী পার হয়ে, আলখেল্লার উপরে উড়ুনি-পরা প্রধান ধর্মসংগীত-গায়করা যাঁরা সে-মুহূর্তে আইকন-স্থানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন তাদের ঘুরে গিয়ে উত্তরমুখী দরজাগুলোর কাছে গিয়ে পেঁাছলেন। বেদীতে উঠেই প্রথামত নিজের বুকে ক্রুশ এঁকে আনত হলেন ভূমিতে, আইকনের সামনে; তারপর মাথা তুলে উঠে তাকালেন ফাদার সুপিরিয়রের দিকে এবং পাশে দণ্ডায়মান চোখ-ধাঁধানো লোকটির দিকে যাকে তিনি এখানে ওঠার সাথে সাথে প্রথমেই আড়চোখে একবার দেখে নিয়েছিলেন।

দেয়ালের কাছে ফাদার সুপিরিয়র দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁর ছোট ছোট মেদল হাত ভুঁড়ির উপরে রাখা, তাঁর পোশাকের স্বর্ণখচিত সূচীকর্মের উপর আঙ্গুল নাচাতে নাচাতে হেসে হেসে কথা বলছিলেন সৈন্যাধ্যক্ষের পোশাক পরিহিত ভদ্রলোকটির সাথে; পোশাকের উপরে সোনালী পট্টি আর কাঁধের উপরে অলংকরণ

* লিজা, ডাইনে তাকিয়ে দ্যাখ, ইনিই তিনি (ফরাসী ভাষায়)।

** কোথায়, কোথায়? সে রকম তো আর দেখতে সুন্দর নেই (ফরাসী ভাষায়)।

দেখে ফাদার সিয়েগির্র একদা অভ্যস্ত সৈনিক-চোখ ভদ্রলোকের পদ সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলেছিল। জেনারেলটি তাঁর রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার ছিলেন। এখন দেখে স্পষ্টতঃই মনে হচ্ছে যে ইনি আরও কোনো উচ্চপদে সমাসীন; ফাদার সিয়েগির্ সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝে ফেললেন যে, ফাদার সুপিরিয়র তা জানেন, কেননা তাঁর টেকো মাথাসহ চর্বি-ভরা লাল মুখে আনন্দ ফুটে বেরুচ্ছিল। অত্যন্ত অপমানিত ও ক্রুদ্ধ বোধ করলেন ফাদার সিয়েগির্, তিনি আরও ক্ষেপে গেলেন এইজন্য যে বুঝলেন, ফাদার সুপিরিয়র তাঁকে ডাকিয়ে এনেছেন অন্য কোন কাজে নয়, শুধু এই জেনারেলটির কৌতূহল — এককালীন সহকর্মী প্রিন্স কাসাৎস্কিকে একনজর একটু দেখে নেওয়ার কৌতূহল মেটাতে।

'সন্তের পোশাকে আপনাকে দেখে বড়ো খুশি হলাম,' হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলেন জেনারেল, 'আশা করি, নিশ্চয়ই এই পুরনো বন্ধুকে ভুলে যান নি।'

ফাদার সুপিরিয়রের সারামুখ সাদা দাড়ির আড়ালে লাল হয়ে উঠল, জেনারেলের কথার অনুমোদনেই যেন হাসি জ্বলজ্বল করছিল সেখানে। জেনারেলের সযত্নে পরিপাটি-করা মুখে পরিতৃপ্ত হাসি, মুখ থেকে নির্গত মদের গন্ধ এবং গালপাট্টা থেকে চুরুটের — এই সব কিছুতে আত্মসংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গেল ফাদার সিয়েগির্র। ফাদার সুপিরিয়রের দিকে ঝুঁকে অভিবাদন করলেন তিনি, বললেন:

'প্রভু কী আমার খোঁজ করছিলেন?' বলেই থেমে গেলেন, তারপর তাঁর মুখ ও অবয়বে যে প্রশ্ন ফুটিয়ে তুললেম তার অর্থ: কী জন্য?

ফাদার সুপিরিয়র বললেন:

'হ্যাঁ, মানে জেনারেলের সঙ্গে দেখা করার জন্যে।'

'প্রভু, সংসার থেকে আমি বিদায় নিয়েছি প্রলোভন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে,' বললেন ফাদার সিয়েগি, ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন, ঠোঁট কাঁপছে তাঁর, 'ফের আপনি কেন এ সবের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন আমাকে এখানে, ঈশ্বরের মন্দিরে, এই প্রার্থনার মুহূর্তে?'

'আচ্ছা, যাও যাও,' লাল হয়ে উঠে ভ্রূকুটি করে উত্তর দিলেন ফাদার সুপিরিয়র।

পরের দিন ফাদার সিয়েগি নিজের এই অহংকারের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করলেন ফাদার সুপিরিয়র ও আশ্রমীভ্রাতাদের নিকটে, সেদিন সারারাত্র উপাসনায় ব্যয় করা সত্ত্বেও ঠিক করলেন যে এই আশ্রম তাঁকে ছেড়ে যেতে হবে। এ ব্যাপারে চিঠি লিখলেন স্তারেৎস্-কে, তাঁর মঠে পুনরায় প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। ফাদার সিয়েগি লিখেছিলেন যে নিজেকে দুর্বল লাগছে তাঁর, গুরুর সাহায্য বিনা প্রলোভনের বিরুদ্ধে একা লড়ে যেতে আর তিনি পারছেন না। এবং নিজের অহংজনিত পাপ স্বীকার করলেন তাঁর কাছে। ফিরতি ডাকেই উত্তর এল স্তারেৎস্-এর; লিখলেন যে, সবকিছুরই কারণ তাঁর ঐ অহংকার। বিশদ ব্যাখ্যা করে লিখলেন: ক্রোধের এই আকস্মিক বিস্ফোরণ যে ঘটল তার কারণ সন্ন্যাস জীবনের সম্মান যে অবনত চিত্তে তিনি নিয়েছেন তার হেতু ঈশ্বরে তাঁর সমর্পণচিত্ততা নয়, বরং নিজের অহংকেই সন্তুষ্ট করে চলেছেন তিনি, যাতে তিনি নিজেকে বোঝাতে পারেন — দ্যাখো, কী ভক্তপ্রাণ আমি, শুদ্ধ ভক্তি আমার, বিনিময়ে কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করি না। ফাদার সুপিরিয়রের আচরণ সহ্য করতে পারেন নি এজন্যই। আমি ঈশ্বরের জন্য সব তুচ্ছ করেছি, আর এখন আমাকে সবাই ডেকে ডেকে দেখাচ্ছে যেন আমি কোনো দর্শনীয় জন্তু।

'ঈশ্বরের জন্যে সব তুচ্ছ করলে এটাও তুমি সইতে পারতে। পার্থিব অহং তোমার মধ্যে এখনও নেভে নি। তোমার সম্পর্কে আমি অনেক ভেবেছি, বাছা সিয়েগির্, প্রার্থনা করেছি, তোমাকে নিয়ে আমার মনে পরমেশ্বরের নির্দেশ বলে যা মনে হল তা হচ্ছে: যেভাবে ছিলে তেমনিই থাকো, সমর্পিত চিত্ত হও। এর মধ্যে জানতে পারলাম, গুহাবদ্ধ তপস্বী ইল্লারিওনের পুণ্য জীবনের অবসান ঘটেছে তাঁর নির্জন কুটিরে। আঠারো বৎসর তিনি গুহাজীবন যাপন করেছেন সেখানে। ওখানে বাস করতে ইচ্ছুক কোনো ধর্মভ্রাতা আছেন কিনা খোঁজ করেছেন তাম্বিনোর ফাদার সুপিরিয়র, আর এই তো তোমার চিঠি। তাম্বিনো মঠে ফাদার পাইসি-র কাছে যাও, আমি তাঁকে লিখছি'খন; ইল্লারিওনের কুঠরিতে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করো। এ নয় যে ইল্লারিওনের শূন্যস্থান দখল করার যোগ্যতা আছে তোমার, এর কারণ — তোমার অহংকে স্ববশে আনার জন্যে তোমার নির্জনতা দরকার। ঈশ্বর তোমায় আশীর্বাদ করুন।'

স্তারেৎস-এর নির্দেশ পালন করেছেন সিয়েগির্। ফাদার সুপিরিয়রকে তাঁর চিঠি দেখিয়ে, অনুমতি নিয়ে, নিজ কক্ষের ভার ও মঠের যা কিছু ছিল তাঁর কাছে সব বুঝিয়ে দিয়ে তিনি যাত্রা করলেন তাম্বিনোর নির্জনাবাসের উদ্দেশ্যে। তাম্বিনো মঠে সিয়েগির্কে সহজ ও শান্তভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন মঠাধ্যক্ষ ফাদার সুপিরিয়র, চমৎকার সেবায়; নিজে তিনি এসেছেন সওদাগর শ্রেণী থেকে। ইল্লারিওনের নির্জন কুটির দিলেন সিয়েগির্কে; প্রথমে দেখাশোনার জন্য একজন আশ্রমীভ্রাতা দিয়েছিলেন কিন্তু পরে সিয়েগির্র অনুরোধে তা প্রত্যাহার করে সম্পূর্ণ একাকী থাকতে দেন তাঁকে। কুটিরটি ছিল পাহাড় কেটে

বানানো একটি গুহা। তার মধ্যেই বাস করেছিলেন ইল্লারিওন এবং সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। গুহার ভিতরে পিছন দিকটায় ইল্লারিওনের সমাধি, তার কাছেই ঘুমুবার জন্য খড়ের চাটাই পাতা একটা কুলুঙ্গি, তাছাড়া ছিল ছোটো একটি টেবিল আর আইকন ও বই ভর্তি একটা তাক। দরজার (তালাচাবির বন্দোবস্ত ছিল তাতে) বাইরের দিকে একটা তাক ছিল; দিনে একবার মঠের কোনো সন্ন্যাসী এসে খাবার রেখে যেত তার উপরে।

গুহাবাসী সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন ফাদার সিয়েৰ্গি।

৪

সিয়েৰ্গির আত্মনির্বাসনের ষষ্ঠ বৎসরে শ্রোভ্‌টাইড দিবসে পাশের একটি সহরে কিছু ফুর্তিবাজ বিত্তশালী ব্যক্তি, নারী ও পুরুষ উভয়েই, একত্রিত হয়ে পিঠে আর মদ খাওয়ার পর শ্লেজ-গাড়িতে করে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। দুজন এডভোকেট, একজন বিত্তশালী জমিদার, অন্যজন অফিসার এবং চারজন মহিলা ছিলেন দলটিতে। এদের মধ্যে অফিসারের স্ত্রী একজন, একজন জমিদারের, তৃতীয় জন অবিবাহিতা, জমিদারের ভগ্নী এবং চতুর্থ জন ছিলেন স্বামীসম্পর্কছিন্না জনৈক মহিলা, অপূর্ব রূপসী, ধনপতি এবং খামখেয়ালী, নিজের প্রগল্‌ভ আচরণে সারা সহরের বিস্ময় ও নিন্দার পাত্রী।

চমৎকার আবহাওয়া ছিল সেদিন, রাস্তা যেন গৃহতলের মতো মসৃণ। সহর পিছনে ফেলে প্রায় দশ ভের্স্তা যাওয়ার পর থেমে গেল, তর্ক শুরু হল: এখন কোথায় যাওয়া — পিছন ফেরা নাকি আরো সামনে।

'আচ্ছা, রাস্তাটা গেছে কোথা?' জিজ্ঞেস করলেন মাকোভ্‌কিনা, স্বামীসম্পর্কছিন্না রূপসীটি।

'গেছে তাম্বিনো, এখান থেকে বারো ভের্স্তা,' উত্তর দিলেন মাকোভ্‌কিনার একটু অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য লালায়িত এডভোকেট ভদ্রলোক।

'ভালো কথা, আর তারপরে?'

'তারপরে, মঠ ছাড়িয়ে ল...য়ের দিকে গেছে।'

'ফাদার সিয়েগির্ গ যেখানে থাকেন, সেখানে?'

'তাই।'

'কাসাৎস্কি? সেই সুন্দরদর্শন তপস্বী?'

'হ্যাঁ।'

'ভদ্রমহিলা! ভদ্রমহোদয়গণ! চলুন, কাসাৎস্কির কাছেই যাওয়া যাক। তাম্বিনোতেই খাওয়া ও বিশ্রাম করা যাবে।'

'কিন্তু তাহলে যে রাত্রে ঘরে ফেরা যাবে না।'

'তাতে কী! কাসাৎস্কির ওখানে রাত কাটাব।'

'ঠিক আছে, মঠে অতিথিশালা আছে, আর তা অতি চমৎকার। মাখিন-এর কেস নিয়ে লড়ছিলাম যখন, তখন ছিলাম এখানে।'

'মোটেই না, আমি রাত কাটাব কাসাৎস্কির ওখানে।'

'যাঃ! জানি আপনি মহাশক্তিময়ী, তবু তা অসম্ভব আপনার পক্ষেও।'

'অসম্ভব? বাজী।'

'ঠিক আছে। যদি আপনি রাত কাটাতে পারেন তো যা চাইবেন তা-ই।'

'A discrétion.'*

যা ইচ্ছে কিন্তু (ফরাসী ভাষায়)।

'আপনার দিক থেকেও তাই!'

'বাঃ, নিশ্চয়ই! তবে যাওয়া যাক।'

কোচোয়ানদের তাঁরা মদ এনে দিলেন। নিজেরা দিলেন বাক্সভর্তি প্যাস্ট্রি, মদ আর চকোলেট। কুকুরলোমের সাদা ওভারকোটে গা ঢেকে বসে আছেন মহিলারা। কোচোয়ানরা তর্ক শুরু করে দিল কার গাড়ী আগে যাবে তা নিয়ে, ওদের একজন, ছোকরাবয়সী মাতব্বরী চালে একপাশে ঝুঁকে লম্বা বেত হাঁকাল, চেঁচিয়ে উঠল, — আর টুংটাং করে বেজে উঠল গাড়ির ঘণ্টা, ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে উঠে গড়িয়ে চলল স্লেজের রানার।

স্লেজ কেঁপে কেঁপে দুলে দুলে ছুটতে লাগল; অভিজ্ঞ ঘোড়া সমান লয়ে মহা আনন্দে অলংকৃত পশ্চাদ্দেশের বেল্টের উপর মাঝে মাঝেই বালাম্চির ছাট মারতে মারতে দৌড়ুতে লাগল, পিছনে দ্রুত থেকে দ্রুততর বেগে অপসৃয়মান সমতল পথ, লাগাম নিয়ে যেন খেলা করতে লাগল বাহাদুর কোচোয়ান। এডভোকেট এবং অফিসার মাকোভ্কিনার উল্টো দিকে বসে বকবক করে তৎপার্শ্ববর্তিনীর কান ঝালাপালা করে তুলছিলেন, কিন্তু মাকোভ্কিনা নিজে ওভারকোট মুড়ি দিয়ে অনড়, নিশ্চল বসেছিলেন, ডুবে ছিলেন নিজের চিন্তায়: "সব সময় এই একই ব্যাপার, এক্কেবারে এক, কদর্য সবই : মদ ও তামাকের গন্ধ-ভরা সেই একই লাল চকচকে মুখ, একই কথা লক্ষবার, সেই একই চিন্তা, আর সবকিছুই ঘুরে ফিরে ঐ একই কদর্যতা। এরা সবাই এতো খুশী, এতো নিশ্চিত এই ভেবে যে, আমৃত্যু এভাবে বেঁচে যাওয়াটাই যেন বাঁচা। আর পারি না। ঘেন্না ধরে গেল। একটা কিছু আমার দরকার, অন্য কিছু, যা কিনা এই সব উল্টোপাল্টে লণ্ডভণ্ড করে দেবে। হোক না, ক্ষতি কী, ঐ সারাতোভে যেমন

হয়েছিল — যেতে যেতে ঠাণ্ডায় জমে একেবারে অক্কা? অমনটি হলে এই এরা কী করবে? নিজেরা কেমন ব্যবহার করবে? নির্ঘাত অত্যন্ত জঘন্যভাবে। সবাই নিজেকে নিয়েই নিজে ব্যস্ত হবে। হ্যাঁ, আর আমি নিজেও তো ঐ একই রকম জঘন্য ব্যবহার করব। তবু আমি অন্ততঃপক্ষে দেখতে ভালো। এরা তা জানেও। যাক গে, কিন্তু ঐ সন্ন্যাসী? সত্যিই কী এ সবের স্বাদ তিনি আর বোঝেন না? মিথ্যে কথা। এটাই একমাত্র যা ওরা বোঝে। গত হেমন্তে ঐ ক্যাডেটটার সঙ্গে যেমন হয়েছিল। এঃ, কী বুদ্ধুই না ছিল ব্যাটাচ্ছেলে...”

‘ইভান নিকোলাইচ!’ ডেকে উঠলেন মহিলা।

‘অধমের প্রতি কী আদেশ?’

‘আচ্ছা, বয়েস কতো?’

‘কার?’

‘মানে কাসাৎস্কির।’

‘মনে হয় চল্লিশ পেরিয়েছে।’

‘ভালো কথা, সকলের সাথেই কী উনি দেখা করেন?’

‘সকলের সাথেই, তবে সব সময় নয়।’

‘আমার পাটা ভালো করে একটু ঢেকে দিন তো। আরে অমন করে নয়। নাঃ, কোনো কাজের নয়! হ্যাঁ, আরো, আরো, এই তো — ব্যস! আহা পা অতো চেপে ধরার দরকার নেই।’

এভাবেই শেষ পর্যন্ত তাঁরা সেই বনের ধারে, যেখানে ফাদার সিয়েগির সেই গুহা ছিল, সেখানে গিয়ে পৌঁছুলেন।

মাকোভ্‌কিনা নেমে পড়লেন সেখানে, অন্যদের বললেন চলে যেতে। তাঁরা সবাই তাঁকে নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রেগে গেলেন ভদ্রমহিলা, ফের সকলকে চলে যেতে বললেন। শ্লেজ তখন

চলে গেল, আর তিনি, কুকুরলোমের সাদা ওভারকোটে, রাস্তা ধরে এগিয়ে চললেন। এডভোকেট মহাশয় গাড়ী থেকে নেমে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন।

৫

ফাদার সিয়ের্গির গুহাবাসের ষষ্ঠ বৎসর সেটা। তাঁর বয়স তখন ঊনপঞ্চাশ। জীবন অত্যন্ত কঠিন। উপবাস ও প্রার্থনাজনিত কষ্ট — সেটা এমন কিছু কঠিন নয়; কিন্তু আরো যা ছিল, তা হল: এক অন্তর্গত সংগ্রাম যা তিনি কখনও কল্পনা করেন নি। সংগ্রামের মূল উৎস ছিল দুটি: সন্দেহ এবং কাম। এবং এই দুই শত্রু সর্বদা একসঙ্গে মাথাচাড়া দিয়ে উঠত। তাঁর কাছে মনে হত ওদুটি যেন দুই ভিন্ন ভিন্ন শত্রু, অথচ বস্তুতঃ তারা এক ও অভিন্নই ছিল। সন্দেহ যখন অবসিত হত কামেরও ইতি ঘটত তখন। কিন্তু তিনি ভাবতেন, ওদুটি আলাদা আলাদা শয়তান এবং আলাদাভাবেই তিনি যুঝছিলেন ওদের সঙ্গে।

"হে ঈশ্বর, হে প্রভু," তিনি ভাবতেন, "কেন তুমি বিশ্বাস দিলে না আমার মনে? হ্যাঁ, কাম — সে তো বুঝি, এর সাথে লড়তে হয়েছে সন্ত আন্তনিকে, অন্যদেরও; কিন্তু বিশ্বাস! তাঁদের তো বিশ্বাস ছিল, প্রভু, আর আমার — কত মুহূর্ত, ঘণ্টা, দিন কেটে যাচ্ছে যখন আমার বিশ্বাসকে আর খুঁজে পাই না। কী জন্যে এই বিশ্বভুবন, এতো অপরূপ সবকিছু, টিকে থাকে যদি সত্যি তা পাপ হয়, সত্যিই তাকে অস্বীকার করা এতো দরকার হয়? তুমিই বা এই প্রলোভন কেন সৃষ্টি করলে? আর এই পরীক্ষা?

পরীক্ষা সেখানে নয় যে, পৃথিবীর আনন্দ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে অন্য কোথাও যেতে চাইছি যেখানে, কে জানে, হয়তো সত্যিই কিছু নেই।" নিজেকেই নিজে বলতেন এ সব আর তারপরে ভয়ে, নিজের প্রতি ঘৃণায় শিউরে উঠতেন নিজে: "ঘেন্না, ঘেন্না! আমি একটা পশু! এঃ আবার সন্ত হবার সখ!" নিজেকেই গালাগাল দিতেন নিজে। তারপরেই বসতেন প্রার্থনায়। কিন্তু প্রার্থনা শুরু করলেই চোখের সামনে জীবন্ত ভেসে উঠত সব: মঠে কীভাবে দিন কেটেছিল সেই সব ছবি — মস্তকে সন্ন্যাসীর শিরোপা, গায়ে আলখেল্লা, সত্যিই দর্শনধারী মহীয়ান। আর তখনই মাথা নেড়ে উঠতেন: "না, না, এ ঠিক নয়। এ প্রতারণা। অন্যকে না হয় ঠকাতে পারি, কিন্তু নিজেকে, আমার ঈশ্বরকে? না, মহীয়ান আমি নই. আমি অতিশয় দুর্ভাগা, আমি একটা ভাঁড়।" অতঃপর আলখেল্লার প্রান্তদেশ সরিয়ে ইজের-পরা নিজের শীর্ণ পদযুগলের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। হাসি ফুটে উঠত ঠোঁটে।

তারপর আলখেল্লা ঠিকঠাক করে নিয়ে স্তোত্র পাঠ করে যেতেন, ক্রুশ-চিহ্ন আঁকতেন বুকে, আভূমি আনত হতেন প্রার্থনায়। "তবে কি এই শয্যাই আমার শবাধার হইবে?" তিনি পড়তে থাকেন, আর যেন কোন শয়তান ফিসফিস করে বলে ওঠে তাঁকে: "একক শয্যা তো শবাধারই। সব ঝুট!" অতঃপর তাঁর চোখের সামনে ফুটে ওঠে সেই বিধবার স্কন্ধদেশ যার সাথে পাপাচারে লিপ্ত ছিলেন। মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে ফের পড়তে থাকেন। ধর্মীয় বিধান পড়ার পর খ্রীষ্ট-সুসমাচার তুলে নেন, পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সেই জায়গায় এসে থামেন যা তিনি অজস্রবার পাঠ করেছেন, তাঁর মুখস্থ হয়ে গেছে: "আমি বিশ্বাস করি, হে প্রভু, আমার অবিশ্বাসকে তুমি কাটাবে।" মনের মধ্যে উত্থিত সব সংশয় দূর করে দেন।

কম্পমান তুলাদণ্ডে কোনো জিনিস রাখলে যেমন হয় তিনিও তেমনি টলায়মান ভিত্তির উপরে ন্যস্ত করেন তাঁর বিশ্বাস, এবং সাবধানে পিছু হটে আসেন যাতে না ধাক্কা লাগে, যাতে না পড়ে যায়। ফের ঠুলি পরে নেন চোখে, এবং মন শান্ত হয়ে যায়। শৈশবী প্রার্থনা বারংবার উচ্চারণ করতে থাকেন: "ঈশ্বর, গ্রহণ করো, আমাকে তুমি গ্রহণ করো," — এবং তখন নিজেকে মনে হয় নির্ভার, লঘু, শুধু তাই নয়, আনন্দ-ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে ওঠেন তিনি। ক্রুশ-চিহ্ন আঁকেন বুকে; মাদুর পাতা তাঁর সরু বেঞ্চিটায় শুয়ে পড়েন, গরমের সময়ে পরবার হালকা আলখেল্লাটা গুটিয়ে নিয়ে মাথার নিচে রেখে বালিশের কাজ সারেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়েন এক সময়। হালকা ঘুমের মধ্যে একবার যেন মনে হল, শ্লেজের ঘণ্টির টুংটাং শুনতে পেলেন। বুঝতে পারলেন না, সে কী জাগরণে না কী স্বপ্নে। কিন্তু দরজার উপর করাঘাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল তাঁর। তিনি উঠে বসলেন, বিশ্বাস হল না কী শুনছেন। কিন্তু পুনরায় করাঘাত। হ্যাঁ, ঠিক, শব্দটা একেবারে কাছেই, তাঁরই দরজায়, এবং একটি নারীকণ্ঠ।

"হে ঈশ্বর! সন্তদের জীবনে যা ঘটেছে, শয়তান আসে মেয়ের রূপ ধরে — শেষ পর্যন্ত তাই ঘটল না কী... ঠিক, এ তো মেয়েরই গলা। কী নরম, মৃদু, সুন্দর! থুঃ!" থুথু ফেলেন তিনি, "নাঃ, এ আমার মনের ভুল," মনে মনে বলে ওঠেন, সরে যান ঘরের এক কোণে যেখানে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করার কাষ্ঠবেদী, সেখানে গিয়ে তাঁর অভ্যস্ত সঠিক ভঙ্গিতে হাঁটু গেড়ে বসেন — সেই ভঙ্গী, সেই আসন যার মধ্যে সুখ ও শান্তি খুঁজে পান তিনি। মাথা নীচু করে রইলেন, মাথার চুল সরে গিয়ে মুখের উপর এসে পড়ল, চেপে ধরলেন তাঁর কপাল — চুল কমে যাওয়ায় পূর্বের চেয়ে এখন

আরও প্রশস্ত — ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে বেদী-আবরণে। (দমকা বাতাস বয়ে গেল মেঝেয়।)

...যে স্তোত্রটি তিনি আবৃত্তি করছিলেন সেটি, বর্ষীয়ান ফাদার পিমেন বলেছিলেন তাঁকে, পাপ-প্রলোভন জয়ে সাহায্য করে। শিরাভর্তি পায়ের ওপর ভর দিয়ে তিনি তাঁর হালকা শরীরটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, আরো বেশ কিছুটা পড়বেন ভাবলেন, কিন্তু পড়লেন না, বরং অনৈচ্ছিকভাবেই যেন কান পেতে রইলেন কিছু শুনবেন বলে। শুনতে মন চাইছিল তাঁর। সমস্ত নিস্তব্ধ। ছাদ থেকে বরফ গলা জল ঘরের বাইরের এককোণে রাখা একটা পিপেয় টুপ্‌টাপ্‌ করে ঝরে পড়ছে। বাইরের আঙ্গিনা গ্রাস করেছে গলন্ত বরফ, সেখানে আলো-আঁধারি, কুয়াশায় সব ঢাকা। নিশ্চুপ, স্তব্ধ সব। আর হঠাৎ তখনই জানালায় খস্‌খস্‌ করে একটা শব্দ উঠল, তারপরেই স্পষ্ট একটি কণ্ঠস্বর: সে একই মৃদু, মোলায়েম কণ্ঠ, সে একই কণ্ঠস্বর — যা অপরূপা কোনো রমণীর ছাড়া অন্য কারো হতেই পারে না — মিনতি জানাল:

'খুলুন না দয়া করে, যীশুর দোহাই...'

মনে হল, দেহের সমস্ত রক্ত ছুটে গিয়ে জড়ো হল তাঁর হৃৎপিণ্ডে, তারপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিঃশ্বাস নিতে পারছিলেন না তিনি। "ঈশ্বর আবির্ভূত হউন এবং শত্রুরা পরাজিত হউক..."

'না, না আমি শয়তান নই...' এবং বক্তার ঠোঁটে হাসি, তাও শোনা গেল যেন। 'আমি শয়তান নই, আমি সাধারণ পাপী-তাপী মানুষ, পথ হারিয়েছি গো — সত্যি সত্যি, কোনো ঘোরানো অর্থে নয়' (মেয়েটি হেসে উঠল), 'ঠাণ্ডায় জমে গেলাম, একটু আশ্রয় দিন, বাবা...'

তিনি জানালার কাঁচে নিজের মুখ চেপে ধরলেন। আইকন-পদপ্রান্তের আলো পড়ে সবটুকু সার্শি চকচক করছিল। দুহাত দিয়ে চোখের পাশ ঢেকে তিনি ভালো করে বাইরের দিকে তাকালেন। কুয়াশা, আলো-ছায়া, গাছপালা, — আরে, এই তো ডানদিকে! — সে। ঠিকই, সে — লম্বা ফারের সাদা ওভারকোট গায়ে এক রমণী, মাথায় টুপী, সুন্দর, কী সুন্দর, কোমল, ভয়-পাওয়া মুখ, এই তো তাঁর থেকে মাত্র দু ভের্শোক্* দূরে, তাঁরই পানে তাকিয়ে আছে। চোখে চোখে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল, পরস্পর পরস্পরকে ঠিক চিনে নিল। এ নয় যে, কখনও দেখা হয়েছিল পরস্পরের মধ্যে: তাঁরা কেউ কখনও কাউকে দেখেন নি, কিন্তু ঐ দৃষ্টিবিনিময়ের মধ্যে উভয়েই (বিশেষতঃ তিনি) বুঝতে পারলেন যে, তাঁরা চেনেন একে অন্যকে, তাঁরা বুঝতে পেরেছেন একে অন্যকে। ঐ দৃষ্টির পরে এহেন সন্দেহ অসম্ভব হয়ে উঠল যে, এ কোনো সাধারণ, কোমল, সুন্দর, লজ্জাবতী মেয়ে নয়, মূর্তিমতী শয়তান।

'কে আপনি? কী চান?' বলে উঠলেন তিনি।

'আহা, খুলুন না!' এক ধরনের খামখেয়ালী একগুঁয়েপনায় বলে ওঠেন মহিলা, 'আমি জমে যাচ্ছি। বললাম তো আপনাকে, পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

'দেখতেই পাচ্ছেন, আমি সন্ন্যাসী, গুহাবাসী।'

'তাতে কী হল, খুলুন না। না কি চান জানালার বাইরে আমি জমে মরি, আর আপনি আপনার প্রার্থনা চালিয়ে যাবেন!'

* ভের্শোক্ — পূর্ব রাশিয়ায় দূরত্ব পরিমাপক হিসাব। এক ভের্শোক্ ১¾ ইঞ্চির সমান। — সম্পাঃ

'কিন্তু আপনি কী করে...'

'আহা, আমি তো খেয়ে ফেলব না আপনাকে। ঈশ্বরের দোহাই, ঢুকতে দিন। আমি ঠান্ডায় একেবারে জমে গেছি।'

মহিলাটি নিজেই এবার ভয় পেয়ে গেছেন যেন। প্রায় কান্নাভাঙ্গা গলায় কথাগুলো বললেন।

ফাদার সিয়ের্গি সরে এলেন জানালা থেকে, তাকিয়ে দেখলেন কণ্টকমুকুট-পরা যীশুর আইকনমূর্তি। "প্রভু, ত্রাণ করো, প্রভু, আমাকে ত্রাণ করো," বিড়বিড় করে বলে উঠে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকেন বুকে, নতজানু হন বেদীতে বারংবার, তারপর দরজার দিকে এগিয়ে যান, পাল্লা খুলে দেন ভেতরের দিকে। প্যাসেজে হাত দিয়ে ঠাওর করেন দরজার ছিটকিনি, সেটা খুলতে থাকেন। ওপারে পায়ের শব্দ তাঁর কানে এল। মহিলাটি জানালা ছেড়ে দরজার কাছে আসছেন। 'ঈশ্!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন মহিলা। ফাদার বুঝলেন, চৌকাঠের কাছে বাইরে জমে থাকা জলের মধ্যে পা পড়েছে বেচারীর। তাঁর হাত কাঁপতে থাকে, আঁট হয়ে বসে যাওয়া ছিটকিনি কোনো রকমেই খুলতে পারলেন না।

'কী করছেন আপনি, খুলুন না! ভিজে জবজবে হয়ে গেছি। ঠান্ডায় জমে মরে যাচ্ছি। আপনি নিজের আত্মার সদ্‌গতি নিয়ে খালি ভাবছেন, আর এদিকে আমি যে হিমে জমে গেলাম!'

দরজাটা নিজের দিকে টানাটানি করলেন ফাদার সিয়ের্গি, ছিটকিনিটা টেনে তুললেন ওপরে এবং দড়াম করে এমনভাবে দরজাটা খুললেন, তিনি ভাবেন নি এভাবে খুলে যাবে যে ভদ্রমহিলার গায়ে ধাক্কা খেল।

'ওহ্, এক্সকিউজ মী!' বলে ফেলেন তিনি, আচম্‌কিতে ফিরে এল মহিলার প্রতি সম্বোধনের সেই প্রাচীন অভ্যাস, ভব্যতাবোধ।

ঐ 'এক্সকিউজ মী' শুনে হাসি পেল মহিলাটির। "অ, আমার তাহলে অতখানি ভয় পাওয়ার কিছু নেই," মনে মনে ভাবলেন।

'না, না, ঠিক আছে। আপনিই আমাকে মাফ করুন,' তাঁর কাছে সরে এসে তিনি বললেন, 'ভাবি নি এমন কষ্ট দিতে হবে আপনাকে, কী করব, এমন ফেঁসে গেছি।'

'ভেতরে আসুন,' একপাশে সরে মহিলাকে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে তিনি বললেন। মৃদু সুরভির তীব্র মদির গন্ধ, কতদিন হল এসব তিনি ভুলেই গেছেন, নাকে এসে লাগল। প্যাসেজ পার হয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন মহিলা। বাইরের দরজা বন্ধ করে দিলেন ফাদার, কিন্তু ছিটকিনি লাগালেন না, প্যাসেজ পার হলেন, ঘরের ভিতরে গেলেন।

"হে প্রভু, ঈশ্বরপুত্র হে প্রভু যীশু, এ অধম পাপীকে দয়া করুন; প্রভু, দয়া করুন এ পাপীকে," প্রার্থনা করে চলেন তিনি, শুধু মনে মনে, হৃদয়ের গভীরেই নয়, বাহ্যতঃ নিজের স্ববশে না থাকা ওষ্ঠদ্বয়ও বিড়বিড় করতে লাগল।

'শান্ত হন,' বললেন ফাদার।

মহিলাটি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে, মেঝেয় জল ঝরছে তাঁর পোষাক থেকে, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ফাদার সিয়েৰ্গির পানে। চোখ তাঁর হাসছে।

'আপনার শান্তি ভঙ্গ করার জন্যে আমাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু দেখছেন তো কী অবস্থায় পড়েছি! আমরা সহর থেকে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলাম, ভরবিওভ্কা থেকে সহরে আমি একাই ফিরে যেতে পারব বলে বাজী ধরি, কিন্তু তারপর তো রাস্তা হারিয়ে বসে আছি। ভাগ্যিস আপনার এই আস্তানা চোখে পড়ল, নইলে...' মিথ্যে কথা বলতে শুরু করেন মহিলাটি। কিন্তু ফাদার

সিয়েগির্গর চোখ-মুখের ভাব দেখে এমন বিমূঢ় হয়ে গেলেন তিনি যে আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না, চুপ মেরে গেলেন। ফাদারকে যেমন দেখবেন ভেবেছিলেন ঠিক তেমনটি তো নয়। যেমন কল্পনা করেছিলেন ততখানি সুন্দর নন ফাদার, তবু তাঁর চোখে বেশ চমৎকারই ঠেকল: মাথার কুঞ্চিত কেশ ও শমশ্রু অল্পবিস্তর পাক-ধরা, নাক সরু খাড়া আর জলন্ত চোখ যেন অঙ্গার, যখন সোজাসুজি তাকালেন, হতবাক হয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা।

ফাদার দেখলেন যে মেয়েটি মিথ্যে কথা বলছে।

'অ, তাই না কী!' মহিলার চোখে চোখ রেখে বলে উঠলেন তিনি, চোখ নামিয়ে নিলেন ফের, 'আমি এখান থেকে যাচ্ছি, আপনি আরাম করুন।'

অতঃপর দীপাধার নিয়ে তাতে একটি মোমবাতি জ্বাললেন, সামনের দিকে ঝুঁকে তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পার্টিশনের ওধারের ছোট্ট কামরায় গিয়ে ঢুকলেন। সেখানে কিছু একটা টানা হেঁচড়ার শব্দ শুনতে পেলেন মহিলা। ভাবলেন, "নিশ্চয়ই, যা হোক কিছু দিয়ে আমার ও ঘরে যাবার পথ আটকাচ্ছেন," হাসলেন মনে মনে, কুকুরলোমের সাদা ওভারকোট গা থেকে ঝেড়ে ফেলে মাথার টুপী — চুলে বেধে গিয়েছিল সেটা — এবং গায়ের শাল খুলতে লাগলেন। জানালার বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন যখন তখন মোটেই ভিজে জবজবে হন নি, ছলছুতো করে ভেতরে আসার জন্য বলেছিলেন ও কথা। তবে, দরজার সামনে সত্যি সত্যি পা হড়কেছিল জলের মধ্যে, বাঁ-পায়ের ডিম অবধি ভিজে গিয়েছিল, জুতো ও গালোশ জলে ভরে গেছে। মহিলাটি ফাদারের বিছানায় বসলেন: একটা বেঞ্চি, উপরে কেবলমাত্র মাদুর পাতা; জুতো খুলতে লাগলেন। ঘরটি তাঁর কাছে বেশ সুন্দরই লাগল।

লম্বাটে ধরনের কামরা, দৈর্ঘ-প্রস্থে তিন বাই চার আর্শিন্,* পরিষ্কার ঝকঝকে যেন আয়না। ঘরটায় থাকার মধ্যে ছিল ঐ বিছানা যার উপর তিনি বসেছিলেন আর তার উপরে বইভর্তি একটা তাক। এবং ঘরের কোণে ঐ প্রার্থনাবেদী। দরজার পাশে পেরেক পোঁতা, তাতে পশুলোমের ওভারকোট আর আলখেল্লা। প্রার্থনাবেদীর ওপরে কণ্টকমুকুট সজ্জিত যীশু খ্রীষ্টের আইকনমূর্তি ও তার নীচে আইকন-দীপ। অদ্ভুত গন্ধ ঘরটায়: তেল, ঘাম ও মাটির গন্ধ। সবকিছু বড়ো ভালো লাগল তাঁর। এমন কি এ গন্ধও।

ভিজে পা, বিশেষভাবে অন্ততঃ একটা পা বড়ো অস্বস্তি দিচ্ছিল; তাড়াতাড়ি করে জুতো খুলতে লাগলেন। ঠোঁটের কোণে হাসি লেগেই ছিল সব সময়, তাঁর লক্ষ্য সিদ্ধ হয়েছে বলে ততখানি নয়, বরং যা তিনি দেখলেন, এবং এই চমৎকার, অপরূপ, অদ্ভুত, মন-কেড়ে-নেওয়া পুরুষ — ফাদার সির্য়েগিকে যা হতবিহ্বল করে দিয়েছে, তার জন্য আরো খুশী লাগছিল তাঁর। "ঠিক আছে, কোনো সাড়া মিলল না বটে, কিন্তু কী আর করা!" নিজেকে বোঝালেন তিনি।

'ফাদার সির্য়েগি! ফাদার সির্য়েগি! এ বলেই তো সবাই আপনাকে ডাকে, তাই না?'

'আপনার কি কিছু দরকার?' শান্ত কণ্ঠের উত্তর এল।

'আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, ফাদার, আমি এসে আপনার শান্তি ভঙ্গ করলাম। কিন্তু সত্যি বলছি, আমার আর কোনো উপায়

* আর্শিন্ — বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ায় দীর্ঘতা পরিমাপক হিসাব, এক আর্শিন ২৮ ইঞ্চির সমান। — সম্পাঃ

ছিল না। আমি ঠিক অসুখে পড়তাম। কে জানে এখনও হয়তো পড়ব। ভিজে জবজবে হয়ে গেছি, পা দুটো তো একদম বরফ।'

'মাফ করবেন,' শান্ত কণ্ঠে উত্তর এল, 'আমি তো আপনার কোনো সেবা করতে পারব না।'

'পারলে কোনো কষ্ট আপনাকে দিতাম না। সকাল হলেই আমি চলে যাব।'

তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। মহিলার কানে এল, ফিসফিস করে কী যেন তিনি বলছেন — প্রার্থনা করছেন নিশ্চয়ই।

'ফাদার, আপনি এ ঘরে আসবেন না তো?' হাস্যতরল কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'মানে আমি কাপড় ছাড়ব কি না, সব শুকোতে হবে তো।'

কোনো উত্তর এল না, পার্টিশনের ওধারে সমতালে অনতিউচ্চ প্রার্থনাপাঠ চলতেই থাকল।

"মানুষের মতো মানুষ একটা," পায়ের ভিজে চুবচুবে গালোশ টানাটানি করে খুলতে খুলতে তিনি ভাবেন। সমানে টানাটানি করছেন তবু খোলে না, ভারি হাসির ব্যাপার মনে হল তাঁর। হেসে ফেললেন তিনি, শোনা যায় কী যায় না এমন; কিন্তু, হাসলে ফাদার সিয়েগির্ শুনতে পাবেন এবং সেই হাসি তাঁর মনে সেই প্রতিক্রিয়া এনে দেবে অবিকল যেমনটি তিনি চান — একথা ভেবে সজোরে তিনি হেসে উঠলেন, আর সেই হাসি, আনন্দোচ্ছল, স্বাভাবিক, প্রসন্ন, সত্যি সত্যিই ফাদারের মধ্যে আলোড়ন এনে দিল, ঠিক সে রকম, যেমনটি চেয়েছিলেন মহিলা।

"সত্যি, এমন লোককেই ভালোবাসা যায়। কী চোখ। আর ঐ সাদাসিধে, অভিজাত এবং — অস্ফুট স্বরে প্রার্থনা করলে কী হবে — কী বাসনাদীপ্ত মুখ!'' ভাবতে থাকেন মহিলা, "আমাদের

ঠকানো যায় না বাপু! কেন, জানালার কাঁচে মুখ চেপে ধরে যখন দেখছিলেন আমাকে, তখনই সব বুঝতে পেরেছেন, ধরে ফেলেছেন। চোখ জ্বলজ্বল করে উঠেছিল, সব মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল সেখানে। তাঁর মনে কামনা জেগেছে, আমাকে পেতে চাইছেন তিনি। হ্যাঁ, পেতে চাইছেন," মনে মনে বলতে থাকেন। জুতো আর গালোশ, যাক, শেষ পর্যন্ত খোলা গেছে। এখন তিনি তাঁর অন্তর্বাস — আঁটো-পাজামা খুলতে থাকেন। এটা, মানে এই লম্বা গার্টার দেওয়া স্টকিংস্ খুলতে হলে লম্বা-ঝুল স্কার্ট কোমরের ওপর না তুলে উপায় নেই। তাঁর লজ্জা লাগল, চেঁচিয়ে বলে উঠলেন:

'ভেতরে আসবেন না যেন।'

কিন্তু দেয়ালের ওপার থেকে কোনো উত্তর এল না। সমতাল একঘেয়ে অস্ফুট প্রার্থনাধ্বনি চলতে লাগল পূর্বের মতোই, তাঁর চলাফেরার শব্দ হল। "নিশ্চয়ই মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রার্থনা করছেন," ভাবলেন মহিলা। "কিন্তু লাভ হবে না কিছু," অস্ফুট বলে ওঠেন, "এখন আমার কথাই ভাবছেন তিনি। ঠিক যেমন আমি তাঁর কথা। ঐ একই অনুভূতিতে আমার এই পদযুগলের কথা ভাবছেন," মনে মনে বললেন, ভিজে অন্তর্বাস খুলে ফেলে নগ্ন পদদ্বয় রাখলেন মাদুরের উপরে, তারপর পা গুটিয়ে কোলের কাছে টেনে নিলেন। কিছুক্ষণ এভাবে, হাঁটুর উপর দু'হাত রেখে বসে রইলেন, সামনের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন কী যেন: "ঠিকই, কী জনমানব শূন্য, কী নৈঃশব্দ। কেউ তো কখনো জানতেও পারত না..."

তিনি উঠে দাঁড়ালেন, ফায়ারপ্লেসের কাছে অন্তর্বাস নিয়ে গেলেন, বাতাস আসার ঘুলঘুলির ওপরে টাঙ্গিয়ে দিলেন।

ঘুলঘুলিটা দেখতে বিশেষ ধরনের। আঙ্গুল দিয়ে নাড়াচাড়া করলেন সেটা, তারপর তাঁর হালকা রিক্ত পা ফেলে মাদুরের ওপর ঘুরে দাঁড়ালেন, পা মুড়ে পুনর্বার বসে পড়লেন। দেয়ালের ওধারে কোনো শব্দ নেই। গলায় ঝোলানো তাঁর ছোট্ট চেনঘড়ির দিকে তাকালেন। রাত দুটো। "ওদের এসে পড়ার কথা তিনটে নাগাদ।" ঘণ্টাখানেকের বেশি নেই।

"মজার ব্যাপার, আমি এ রকম একা একা বসে থাকব নাকি। নিকুচি করেছে! পারব না। এক্ষুনি ওঁকে ডাকছি।"

'ফাদার সিয়েৰ্গি! ফাদার সিয়েৰ্গি! সেৰ্গেই দ্মিত্রিচ, প্রিন্স কাসাৎস্কি!'

দরজার ওদিকে নিশ্চুপ।

'শুনছেন, এ হল নিষ্ঠুরতা, বুঝলেন? আমি আপনাকে ডাকতাম না। দরকার না পড়লে ডাকতাম না, বুঝলেন। আমি অসুস্থ। কী যে হয়েছে বুঝতে পারছি না,' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, কণ্ঠস্বরে কষ্ট ফুটে উঠল, 'উঃ, ভগবান, উঃ!' বিছানার উপর পড়ে গোঙাতে লাগলেন। আর সবচেয়ে অদ্ভুত — তাঁর সত্যিই মনে হল: তিনি কষ্ট পাচ্ছেন, খুব কষ্ট, সারা দেহে যন্ত্রণা হচ্ছে, ভীষণ জ্বরে তিনি কাঁপছেন।

'শুনছেন, ফাদার, আমাকে বাঁচান। জানি না কী হয়েছে আমার। উঃ, মরে গেলাম!' জামার বোতাম খুলে দিলেন, স্পষ্ট বুক দেখা গেল, কনুই অবধি খোলা হাত দুটি মাথার ওপর রাখলেন, 'উঃ, উঃ!'

এতক্ষণ সারাটা সময় ধরে ফাদার সিয়েৰ্গি পিছনের ঘরে দাঁড়িয়েছিলেন, প্রার্থনা করে যাচ্ছিলেন। সান্ধ্য উপাসনার যত প্রার্থনা সমস্ত নিবেদন করে তিনি এখন নিস্পন্দ দাঁড়িয়েছিলেন,

আপন নাসিকাগ্রে চোখ নিবদ্ধ, গভীর অন্তর্লীন আবেগে প্রার্থনা করে যাচ্ছিলেন মনে মনে: "হে প্রভু, ঈশ্বরপুত্র হে প্রভু যীশু, আমাকে দয়া করো।"

কিন্তু সব শুনতে পেয়েছিলেন তিনি। শুনতে পেয়েছিলেন রেশমী কাপড় খোলার খস্‌খস্‌ শব্দ, মেঝের উপরে খালি পায়ে হেঁটে যাওয়ার মৃদু পদধ্বনি; শুনতে পেয়েছিলেন হাত দিয়ে যখন পা রগড়াচ্ছিলেন মহিলা, তার শব্দ। অনুভব করছিলেন যে দুর্বল তিনি, যে কোনো মুহূর্তে সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে, এবং সেজন্যই তাঁর প্রার্থনার আর বিরাম ছিল না। রূপকথার সেই নায়ক যার দরকার শুধু সামনে দেখা, পিছনে তাকানো মানা, তার মতোই কিছু একটা বোধ করেছিলেন তিনি। তার মতোই অনুভবে টের পেলেন ফাদার সিয়েগি, মন বলে উঠল: মাথার উপরে, তাঁর চতুর্দিকে, থমকে আছে বিপদ, সর্বনাশ; মুহূর্তের জন্যও পিছন ফিরে যদি না তাকান, তাহলেই শুধু পরিত্রাণ। অথচ ঠিক তখনই সেদিকে দৃষ্টিপাতের তীব্র বাসনা গ্রাস করে নিল তাঁকে। এবং সেই মুহূর্তেই ডেকে উঠলেন ভদ্রমহিলা:

'শুনছেন, ফাদার, এ হল অমানুষিকতা। আমি তো মারাও যেতে পারি।'

"হ্যাঁ, আমি যাব; তবে সেইভাবে, যেমন গিয়েছিলেন সেই ফাদার — এক হাত ন্যস্ত ভ্রষ্টা নারীর উপরে, আর অন্য হাত উনুনের মধ্যে। কিন্তু আমার যে উনুন নেই!" চারপাশে আঁতিপাঁতি করে তাকালেন। বাতি জ্বলছে। দীপশিখার উপরে হাত পাতলেন তিনি, মুখ সিটকিয়ে রইলেন, যন্ত্রণা সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হলেন; বেশ কিছুক্ষণ মনে হল কোনোকিছুই বোধ করছেন না, কিন্তু তারপর হঠাৎ — কষ্ট হচ্ছে কি না, হলেও তা কতখানি,

এ সব বোঝার আগেই শিউরে উঠলেন, ঝটিতি সরিয়ে নিলেন হাত।

"নাহ্, এ সম্ভব নয় আমার পক্ষে।"

'ঈশ্বরের দোহাই! এখানে আসুন না একবার। মারা যাচ্ছি আমি, উঃ!'

"মানে, সর্বনাশ কি ঘটতে যাচ্ছে তবে? না — না, সেটি হচ্ছে না।"

'এই যে, এক্ষুনি আসছি,' তিনি বলে ওঠেন, তারপর দরজা খুলে, মহিলাটির দিকে না তাকিয়ে, তাঁর পাশ দিয়ে সোজা চলে গিয়ে দরজার ওদিকে প্যাসেজে ঢুকলেন যেখানটায় তিনি জ্বালানী কাঠ কাটেন, যে কুঁদোর উপর রেখে কাটেন তা হাত দিয়ে ঠাওর করে নিলেন, এবং দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা কুড়ুলও।

'এই যে, এক্ষুনি,' পুনর্বার বলে ওঠেন; ডান হাতে কুড়ুল নিয়ে বাম হাতের তর্জনী রাখেন কুঁদোর উপরে, কুড়ুলের কোপ বসিয়ে দেন, দ্বিতীয় গাঁটের নীচে কোপ বসে যায়। আঙুলটা একই ধরনের মোটা কাঠের চেয়ে অনেক সহজেই কেটে বেরিয়ে গেল, ছিটকে গিয়ে ধাক্কা খেল কুঁদোর পাশে, তারপর মেঝের উপর পড়ে গেল।

যন্ত্রণা অনুভবের পূর্বেই এই ছিটকে পড়ার শব্দ শুনতে পেলেন তিনি। কিন্তু যন্ত্রণা হচ্ছে না কেন ভেবে যেই না অবাক হবেন, অমনি তীব্র তীক্ষ্ন যন্ত্রণা এবং ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইয়ে পড়া রক্তের উষ্ণতা অনুভব করলেন। ঝট্ করে আলখেল্লায় রক্তাক্ত আঙুলটা জড়িয়ে নিয়ে ঊরুর এক পাশে চেপে ধরেন, ফিরে গিয়ে দরজা পার হয়ে ঘরে ঢোকেন, তারপর মহিলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, মাটিতে চোখ রেখে, শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন:

'কী চাইছিলেন?'

তাঁর ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মুখ, বাম গণ্ডদেশ কাঁপছে — মহিলাটি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর হঠাৎ এক রাশ লজ্জা ঘিরে ধরল তাঁকে। তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠলেন, ওভারকোটটা টেনে নিয়ে জড়িয়ে নিলেন গায়ে।

'সত্যি, খুব কষ্ট হচ্ছিল... আমার ঠাণ্ডা লেগেছে... আমি... ফাদার সিয়েৰ্গি... আমি...'

মহিলার দিকে চোখ তুলে তাকালেন ফাদার, প্রসন্ন আনন্দ কাঁপছে সেখানে, বললেন:

'কী হয়েছে দিদি, কী জন্যে তোমার এই অমূল্য আত্মা এভাবে নষ্ট করতে চাইছ? পৃথিবীতে প্রলোভন তো থাকবেই, কিন্তু প্রলোভনের যারা বাহক তারা বড়ই দুর্ভাগা... প্রার্থনা করো, ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করুন।'

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শুনতে লাগলেন মহিলা। হঠাৎ কানে এল কী যেন টপ্‌টপ্ করে পড়ছে মেঝেয়। তাকাতেই দেখতে পেলেন আলখেল্লার আড়ালে হাত থেকে রক্ত ঝরছে।

'আরে, হাত নিয়ে কী করেছেন আপনি?' মনে পড়ে গেল, একটা শব্দ শুনেছিলেন বটে; বাতি নিয়ে দৌড়ে গেলেন প্যাসেজে, দেখলেন মেঝের উপরে রক্তাক্ত ছিন্ন করাঙ্গুলি। ফিরে এলেন তিনি ফাদারের চেয়েও ফ্যাকাশে, কী যেন বলতে গেলেন; কিন্তু ততক্ষণে ফাদার নীরবে তাঁর কামরায় গিয়ে ঢুকেছেন, বন্ধ করে দিয়েছেন দরজা।

'আমায় ক্ষমা করুন, ফাদার,' মিনতি করে ওঠেন মহিলা, 'কী করে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব আমি?'

'চলে যাও।'

'অন্ততঃ আপনার হাতটা আমি বেঁধে দিই।'

'চলে যাও এখান থেকে।'

নীরবে, দ্রুত পোষাক পরতে থাকেন মহিলা। ওভারকোট পরে তৈরী হয়ে বসে রইলেন, অপেক্ষা করতে লাগলেন। শ্লেজের ঘণ্টা শোনা গেল বাইরে।

ফাদার সিয়েৰ্গি, আমায় আপনি ক্ষমা করুন।'

'চলে যাও। ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করবেন।'

'ফাদার সিয়েৰ্গি, আর আমি এভাবে চলব না। আপনি আমাকে ফেলে দেবেন না, ফাদার।'

'চলে যাও।'

'আমায় ক্ষমা করুন, আপনার আশীর্বাদ দিন আমাকে।'

'পরম পিতা, ঈশ্বরপুত্র আর পবিত্র আত্মার দোহাই,' বন্ধ কামরা থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'তুমি চলে যাও।'

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন মহিলা, গুহা থেকে বেরিয়ে গেলেন। এডভোকেট ভদ্রলোক আসছেন তাঁর দিকে।

'যাক্‌গে, হেরেই গেলাম, কী আর করা! কোথায় বসবেন?'

'বসলেই হল।'

গাড়ীতে গিয়ে উঠে বসলেন, বাড়ি পর্যন্ত সারাটি পথ একটা কথাও বললেন না।

এক বৎসর পরে দীক্ষা নিলেন তিনি, তপস্বী আর্সেনির (যিনি প্রায়শঃই তাঁকে চিঠি লিখতেন) উপদেশাধীনে মঠে সন্ন্যাসিনীর সুকঠোর জীবন যাপন করতে লাগলেন।

৬

গুহাবাসে আরও সাত বৎসর কাটল ফাদার সিয়েগির্র। প্রথম দিকে ফাদার সিয়েগির্ যাই তাঁর কাছে আনয়ন করা হত সবই গ্রহণ করতেন: চা, চিনি, সাদা রুটি কিংবা দুধ, পোষাক বা জ্বালানী কাঠ। কিন্তু যতদিন যেতে লাগল ততই কঠোর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হতে লাগলেন তিনি, বাহুল্য ঝেড়ে ফেললেন একে একে, এবং পরিশেষে এতদূর কৃচ্ছ্রসাধন করলেন যে, সপ্তাহে একটিবার মাত্র কালো রুটি ব্যতিরেকে আর কিছুই গ্রহণ করতেন না। বাদ-বাকী যা কিছু আনা হত তাঁর কাছে সবই তিনি বিলিয়ে দিতেন আগত গরীব-দুঃখীর মধ্যে।

সমস্ত সময় ফাদার সিয়েগির্ হয় প্রার্থনায় অতিবাহিত করতেন গুহার মধ্যে, নয় তো ক্রমবর্ধমান দর্শনার্থীদের দর্শন দিতেন। বৎসরে মাত্র দুই কি তিন বার তিনি তাঁর নির্জনবাস ছেড়ে বেরুতেন গীর্জায় যাবার জন্য, কি প্রয়োজন পড়লে জল বা জ্বালানী কাঠ আনতে।

এহেন জীবনযাপনেরই ষষ্ঠ বৎসরে ঐ ঘটনাটি ঘটেছিল, ঐ মহিলা — মাকোভ্‌কিনার সাথে সেই সাক্ষাৎ, তাঁর সেই নৈশ অভিযান ও পরিশেষে জীবনের আমূল পরিবর্তন ও মঠে সন্ন্যাসিনী হয়ে যাওয়া, সবই প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল দিকে দিকে। ফাদার সিয়েগির্র খ্যাতি বেড়ে গেয়েছিল এর পর থেকে। দর্শকদের আসা-যাওয়া বেড়ে যাচ্ছিল ক্রমেই, তাঁর গুহার কাছে আস্তানা গাড়ল সাধু-সন্ন্যাসীর দল, এবং একটি গীর্জা ও অতিথিশালা গড়ে উঠল। ফাদার সিয়েগির্র সুখ্যাতি, বরাবরের মতোই, মাত্রাতিরিক্তভাবে কীর্তিত হতে লাগল, ছড়িয়ে পড়তে লাগল দূর হতে

আরো দূরে। দূরান্ত থেকে আগত দর্শনার্থীর ভিড় বেড়ে গেল, রোগ সারাতে পারেন ভেবে নিয়ে রুগী আনতে লাগল তাঁর কাছে।

গুহাবাসী জীবনের অষ্টম বর্ষে আরোগ্যদানের ঘটনাটি তাঁর দ্বারা সর্বপ্রথম সম্পন্ন হয়। আরোগ্যদান চতুর্দশবর্ষী একটি বালকের; তার মা ফাদার সিয়েগির্র নিকট তাকে এনে অনুনয়বিনয় করতে থাকেন যে তিনি অন্ততঃ একবার তাঁর সন্তানের গায়ে হাত রাখুন। ফাদার সিয়েগির্র কস্মিন্‌কালেও এ কথা মনে হয় নি যে, লোকের অসুখবিসুখ সারানো তাঁর দ্বারা সম্ভব। ও রকম ধারণা রাখাকে অহংজাত একটা মহাপাপ বলেই তিনি ভাবতেন; কিন্তু সন্তানের জননী নাছোড়বান্দা হয়ে অনুনয়বিনয় করছিলেন, হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন তাঁর পায়ে, মিনতি করে বলেছিলেন — তিনি অপরের রোগ সারান, আর তাঁর ছেলের অসুখ কেন সারাতে চাইছেন না; যীশুর দোহাই পেড়ে কান্নাকাটি করেছিলেন। রোগ সারানোর ক্ষমতা একমাত্র ঈশ্বরের — ফাদার সিয়েগির্র এই কৈফিয়তের জবাবে সেই জননী বলেছিলেন, তিনি তো তাঁর ছেলের গায়ে হাত রেখে শুধু প্রার্থনা করার কথাই বলছেন। অস্বীকৃতি জানিয়ে নিজের গুহায় গিয়ে ঢুকেছিলেন ফাদার সিয়েগির্। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে (তখন হেমন্তকাল, রাত্রিতে রীতিমতো ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে) যখন জল আনতে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছেন, দেখেন — জননী ঠায় বসে আছেন তাঁর সন্তান নিয়ে, চৌদ্দ বছরের একটি বালক, ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া, রোগা লিকলিকে; সেই একই অনুনয়বিনয় শুনতে হল ফের। ফাদার সিয়েগির্র মনে পড়ে গেল পক্ষপাতদুষ্ট সেই বিচারকের কাহিনী; অস্বীকৃতিজ্ঞাপন ব্যাপারে কোনো দ্বিধা পূর্বে তাঁর মনে আসে

নি, কিন্তু এবারে সন্দেহ দেখা দেওয়ায় প্রার্থনায় বসলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রার্থনা করে চললেন যতক্ষণ না নিজের অন্তরে এর একটা সদুত্তর মিলল। তাঁর সিদ্ধান্তটা হল এ রকম: মায়ের দাবী অবশ্যই তাঁর মেটানো উচিত, হয়তো মায়ের বিশ্বাসই আরোগ্য করে তুলবে সন্তানকে; আর তিনি, ফাদার সিয়েৰ্গি, নিজে এক্ষেত্রে ঈশ্বরের একটা অযোগ্য মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই নন।

অতঃপর রুগ্ন সন্তানের জননীর কাছে বেরিয়ে এসে ফাদার সিয়েৰ্গি তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন, ছেলেটির মাথায় হাত রেখেছিলেন, প্রার্থনা করেছিলেন।

সন্তানসহ বিদায় নিয়েছিলেন জননী, এবং মাসান্তে ছেলেটি আরোগ্য লাভ করেছিল, আর স্তারেৎস্ সিয়েৰ্গির (লোকে আজকাল এ নামেই তাঁকে ডাকে) রোগ সারানোর অত্যাশ্চর্য পবিত্র ক্ষমতার খ্যাতি চতুর্দিকে ঘোষিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে এমন একটি সপ্তাহও যায় নি যখন কোনো না কোনো রুগী নিয়ে লোকজন আসে নি তাঁর কাছে। আর এক জনের ক্ষেত্রে রাজী হওয়ার ফলে তাঁর পক্ষে অন্যদের উপেক্ষা করাও সম্ভব হয় নি, তেমনি হাত রেখেছেন গায়ে, প্রার্থনা করেছেন, তাদের অনেকে হয়তো ভালোও হয়েছে, আর ফাদার সিয়েৰ্গির খ্যাতি দূরে, দূরান্তরে বিস্তৃত থেকে বিস্তৃততর হয়েছে।

এভাবেই কেটে গিয়েছিল ন'টি বৎসর মঠে, আর তেরোটি এই নির্জন গুহাবাসে। বয়স বেড়েছে ফাদার সিয়েৰ্গির: দাড়ি লম্বা এবং সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর মাথার চুল, বিরল হলেও, এখনও তেমনি ঘন কৃষ্ণ এবং কুঞ্চিত।

৭

বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে ফাদার সিয়েগির মনে ক্রমাগত একই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে: বর্তমানে যে পরিস্থিতির মধ্যে তিনি আসীন, স্বেচ্ছায় ততখানি নয় যতটা না মঠের মোহান্ত এবং ফাদার সুপিরিয়রের ইচ্ছাক্রমে, তা মেনে নিয়ে তিনি কি ভাল করলেন? চতুর্দশবর্ষী সেই বালকের রোগ সারানো থেকেই এ সবের শুরু; তারপর থেকে প্রতিটি মাস, প্রতিটি সপ্তাহ, প্রতিটি দিন তিনি অনুভব করেছেন তাঁর অন্তর্গত জীবন কীভাবে ধ্বসে পড়ছে আর সেই শূন্যস্থান দখল করে নিচ্ছে সম্পূর্ণ পার্থিব জীবন। সত্যিই, তাঁর ভিতরের সবকিছু যেন বাইরে টেনে এনে প্রকাশ্যে দেখানো হচ্ছে।

তিনি দেখতে পেলেন যে, মঠে দর্শনার্থী আকর্ষণ করা এবং মঠের আয় বাড়ানোর তিনি একটি উপায় মাত্র; আর সেজন্য মঠ-কর্তৃপক্ষ এমন সব কাণ্ডকারখানার মধ্যে টেনে নিয়ে গেল তাঁকে যাতে তিনি আরো বেশী করে তাদের উপকারে আসেন। যেমন ধরা যাক, তাঁর জন্য কায়িক পরিশ্রমের সম্ভাবনা আর ছিল না। যা কিছু তাঁর দরকার পড়তে পারে তা তাঁর জন্য বরাদ্দ করা হল, এবং পরিবর্তে শুধু একটি দাবীই করা হল তাঁর কাছে: দর্শনার্থী যারা আসে তাদের যেন তিনি দর্শন দেন, আশীর্বাদ করেন। তাঁর সুবিধার জন্য দেখা করার নির্দিষ্ট সময় স্থির করে দেওয়া হল। প্রস্তুত হল পুরুষদের জন্য ওয়েটিং রুম এবং রেলিং-দেয়া একটা জায়গা, যাতে করে তাঁর পদপ্রান্তে হুড়ো দিয়ে পড়া শরণাগত মহিলাদের চাপে তিনি পড়ে না যান, যেখান থেকে তিনি তাঁর আশীর্বাণী সিঞ্চন করবেন তাদের উপর। যখন বলা হত, লোকজনের

দরকার তাঁকে, যীশু নির্দেশিত প্রেমধর্মের কথা মনে রেখে জনগণের তাঁকে দর্শনলাভের দাবী তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না, তাদের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া নিষ্ঠুরতা হবে, তখন রাজী না হয়ে তিনি পারতেন না; কিন্তু এই জীবনের প্রতি তিনি যত বেশি আত্মসমর্পণ করছিলেন ততই মনে হচ্ছিল: তাঁর অন্তর্জীবন ক্রমশঃই বহির্জীবনে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল, সজীব প্রাণধারার উৎস যাচ্ছিল শুকিয়ে, যা তিনি করছেন সে সবই কেবল, শুধুই কেবল মানুষের জন্য, ঈশ্বরের জন্য নয়।

লোকজনকে ধর্মোপদেশদান, কি আশীর্বাদ করা, কিংবা রুগ্নের জন্য প্রার্থনা, অথবা জীবনে সঠিক পথ নির্ধারণে করণীয় কর্তব্যের নির্দেশদান ইত্যাদির সময়ে কিংবা যাদের তিনি রোগ সারিয়েছেন বা সৎপথে এনেছেন তাদের প্রশস্তি শুনতে শুনতে খুশী না হয়ে তিনি পারেন না, লোকের উপর নিজের প্রভাব, নিজের সুকীর্তির সুফল সম্বন্ধে উৎসাহ না বোধ করে পারেন না। তাঁর মনে হত, তিনি যেন কোনো জ্বলন্ত আলোকবর্তিকা, আর যত বেশি তিনি তা অনুভব করতেন, তাঁর মনে হত, নিজের অন্তরে প্রজ্বলিত ঐশ্বরিক আলোকের উৎস ক্রমশঃ নিস্তেজমান, নির্বাণোন্মুখ। "আমি যা করছি তার কতটুকুই বা ঈশ্বর সাধনায়, আর কতটুকুই বা মানুষের জন্যে?" — এই প্রশ্ন ক্ষান্তিহীন যন্ত্রণা দিত তাঁকে, এবং এর উত্তর দেওয়া দূরে থাক, উত্তরদানের চিন্তাটা পর্যন্ত এড়িয়ে চলতেন। হৃদয়ের অন্তস্তলে তিনি অনুভব করতেন যে, তাঁর ঈশ্বরসাধনার স্থান দখল করে নিয়ে শয়তান এনে দিয়েছে মানুষের জন্য পার্থিব যত কাজ। এটা তিনি অনুভব করতেন, কারণ পূর্বে তাঁর যে একাকীত্বে ব্যাঘাত হলে কষ্ট হত, সেই নৈঃসঙ্গই আজ দুর্বিষহ বলে মনে হয়। দর্শনার্থীদের ভিড়ে তিনি হাঁপিয়ে উঠতেন, ক্লান্তি

বোধ করতেন ঠিকই, তবু হৃদয়ের গভীরে তৃপ্তিও বোধ করতেন, যে প্রশস্তিতে তাঁর চতুর্দিক ভরে থাকত তাতে আনন্দ পেতেন।

একটা সময় এসেছিল যখন তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, চলে যাবেন, পালাবেন। এমন কি, কীভাবে তা করবেন সেটাও ভেবেচিন্তে ঠিক করে রেখেছিলেন। চাষাভুষোর পোষাক — জামা, প্যাণ্ট, কাফ্‌তান্‌,* টুপি সমস্তই জোগাড় করেছিলেন। অন্যদের বুঝিয়েছিলেন যে, দানখয়রাত করার জন্য ওগুলো তাঁর প্রয়োজন। নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিলেন সব, ভেবে রেখেছিলেন — মাথার চুল ছেঁটে ফেলে, ওগুলো পরে, কেটে পড়বেন একদিন। প্রথমে তিন শ' ভের্স্তা পর্যন্ত পথ যাবেন রেলগাড়ি চড়ে, তারপর নেমে পড়ে পায়ে হেঁটে গ্রামে, গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াবেন। এক বৃদ্ধ সৈনিককে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কীভাবে সে ঘুরে বেড়ায়, ভিখ্‌ মাগে, রাতের আশ্রয় চায়। সৈনিকটি গল্প করেছিল তাঁর কাছে, কোথায় কোথায় ভিক্ষা ও রাত্রিবাসের আশ্রয় মেলে সহজে, এবং ফাদার সিয়েগি ঠিক ঐ রকমটি করতেই মনস্থ করেছিলেন। একবার এক রাত্রে তিনি এমন কি কাপড়চোপড়ও পরে ফেলেছিলেন, ভেবেছিলেন বেরিয়েই যাবেন, কিন্তু বুঝতে পারেন নি কোনটা ভালো হবে: থেকে যাওয়া, নাকি পালানো। প্রথমে ঠিক করতে পারেন নি কী করবেন, তারপর দোলাচল কেটে গিয়েছিল: এ জীবনেই তিনি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন, নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন শয়তানের হাতে; চাষাভুষোর সেই পোষাক শুধু এককালীন বাসনা ও অনুভবের স্মৃতিচিহ্ন রূপে পড়ে ছিল।

---

* কাফ্‌তান্‌ — পূর্বকালে রাশিয়ায় ব্যবহৃত পুরুষদের ঊর্ধাঙ্গের পোষাক। আমাদের দেশে আচ্‌কান বা শিরওয়ানীর মতো অনেকটা দেখতে। — সম্পাঃ

প্রতিদিন তাঁর নিকটে লোকজনের আসা-যাওয়া ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল, আর সে পরিমাণেই কমে আসছিল তাঁর অধ্যাত্মপ্রতিরোধ রচনা ও প্রার্থনার সময়। কদাচ কখনো, উজ্জ্বল কোনো মুহূর্তে, তিনি ভাবতেন যে, এমন এক স্থানে এসে তিনি দাঁড়িয়েছেন যেখানে কখনোই ঝর্ণার উৎসধারা ছিল। "সপ্রাণ জলধারার ক্ষীণ স্রোত আমা হতে নির্ঝরিত হত, বয়ে যেত আমার মধ্য দিয়ে; সেদিন ছিল আমার জীবনসত্য যখন 'তিনি' (ফাদার সিয়েগির্ সর্বদাই গভীর আবেগে তাঁকে ও সেই রাত্রিকে স্মরণ করে থাকেন; আজ তিনি মাদার আগ্নিয়া) প্রলোভন রূপে এসেছিলেন আমার কাছে। সেই নির্মল জলধারার স্বাদ তিনি পেয়েছিলেন। তারপর থেকে সেই জল আহরণের সময়টুকুরও আর তর সয় না, পিপাসার্তের দল এসে এ ওকে হটিয়ে দিয়ে তা কেড়ে নেয়ার জন্যে জটলা জমায়। সবকিছু তারা পা দিয়ে ছেনেছে, এখন পড়ে আছে শুধু কাদা।" — এ রকমই তিনি ভাবতেন তাঁর বিরল কোনো কোনো উজ্জ্বল মুহূর্তে; কিন্তু তাঁর সচরাচর মানসিক অবস্থা যা ছিল, তা হল: ক্লান্তি, এবং ক্লান্তিজনিত আত্মশ্লাঘা বোধ।

তখন বসন্তকাল, 'প্রেপলভেনিয়ে'* পরবের আগের দিন। ফাদার সিয়েগির্ তাঁর গৃহাভ্যন্তরস্থ গীর্জায় সান্ধ্য উপাসনা পরিচালনা করছিলেন। ঘরটিতে যতগুলো লোক ধরা সম্ভব, ততগুলোই — প্রায় কুড়ি জনের মতো লোক ছিল। তারা সকলেই ভদ্রসমাজের এবং মহাজনস্থানীয় ব্যক্তি — সকলেই বিত্তশালী। ফাদার সিয়েগির্ সকলকেই আসতে বলতেন, কিন্তু কে ভিতরে আসবে বা না আসবে

* ইস্টারের পঁচিশ দিন পর পালিত রুশ ধর্মোৎসব। — সম্পাঃ

তা নিয়ন্ত্রণ করত তাঁর সেবাদাস এক সন্ন্যাসী এবং প্রতিদিন মঠ থেকে দ্বাররক্ষীর কাজে প্রেরিত কোনো না কোনো সাধু। দরজার বাইরে লোকজন জটলা করছে — জন আশী তীর্থযাত্রী, তন্মধ্যে আবার অধিকাংশই মহিলা, ফাদার সিয়েগি কখন বেরিয়ে এসে তাদের আশীর্বাদ করবেন সেজন্য তারা অপেক্ষমাণ। ফাদার উপাসনা পরিচালনা করছিলেন ভিতরে, যখন বেরিয়ে এসে, মুখে প্রভুর গুণগান, তাঁর পূর্বসূরীর সমাধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ মাথা ঘুরে গেল, পড়েই যাচ্ছিলেন আরেকটু হলে যদি না পশ্চাতে দণ্ডায়মান এক বণিক ও এক যাজক সন্ন্যাসী তাঁকে ধরে ফেলতেন।

'হায়, হায়, কী হল! হে ভগবান! ফাদার সিয়েগি! হে ভগবান! কী কাণ্ড!' কয়েকটি নারীকণ্ঠ আর্তনাদ করে উঠল, 'আপনার মুখ যে কাগজের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে!'

কিন্তু ফাদার সিয়েগি তৎক্ষনাৎ সামলে উঠলেন এবং, একেবারে সাদা ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, বণিক ও যাজককে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে প্রভুর গুণকীর্তন গেয়েই চললেন। ঐ যাজক ফাদার সেরাপিঅন, আশ্রমীভ্রাতা এবং সোফিয়া ইভানভ্না নামে জনৈকা মহিলা — ইনি গুহার কাছাকাছি বাস করতেন এবং ফাদার সিয়েগির সেবা করতেন নানাভাবে — সকলেই প্রার্থনাসভার কাজ বন্ধ করে দেয়ার মিনতি জানাতে লাগলেন।

'আরে কিছু না, কিছু না,' বিড়বিড় করে ওঠেন ফাদার, শ্মশ্রুর কোণে দেখা যায় কি যায় না মৃদু হাসি খেলে গেল, 'অনুষ্ঠানে বাধা দেবেন না।'

"ঠিক, সন্তেরা তো এ রকমই ব্যবহার করেন," নিজের মনে মনে ভাবলেন।

'সন্ত বাবা! দেবাত্মা!' পিছন থেকে সোফিয়া ইভানভ্‌নার এবং যে বণিকটি তাঁকে ধরে ছিলেন তার গলা ভেসে আসে।

ফাদার তাদের কারো কথায় কান দিলেন না, প্রার্থনাসঙ্গীত গেয়েই চললেন। পুনর্বার গা ঘেঁষাঘেঁষি করে সবাই সরু প্যাসেজ পার হয়ে ছোট্টো গীর্জাঘরটায় এসে ঢুকলেন, এবং ফাদার সিয়েগি শেষ পর্যন্ত তাঁর উপাসনা পরিচালনার কাজ, কিছুটা সংক্ষেপে হলেও, শেষ করলেন।

উপাসনার কাজ সমাপ্ত হওয়া মাত্রই ফাদার সিয়েগি উপস্থিত সকলকে আশীস দান করলেন, তারপর গুহার বাইরে একটা এল্‌ম্‌ গাছের তলে পেতে রাখা বেঞ্চিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। ভাবলেন, বিশ্রাম করবেন একটু, কিঞ্চিৎ নির্মল বায়ু সেবন করবেন; মনে হল এটা তাঁর একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি বেরিয়ে এলেন লোকজনের ভিড় যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর উপর, আশীর্বাদ চাইতে লাগল, উপদেশ ও সাহায্য ভিক্ষা করতে লাগল। তাদের মধ্যে এমন বৃদ্ধাও ছিল অনেক যারা তীর্থ থেকে তীর্থে, এক স্তারেৎস্‌ থেকে আরেক স্তারেৎস-এর কাছে ক্রমাগত ঘুরে বেড়ায়, তীর্থ আর স্তারেৎস্‌ দর্শন মাত্রেই একেবারে গদগদ হয়ে যায়। ফাদার সিয়েগি এইসব অতি সাধারণ, একেবারে অধার্মিক, নিরুত্তাপ, প্রচলিত ধরনধারণ ভালোভাবেই জানেন। তাদের ভিতরে এমন বৃদ্ধও ছিল অনেক যারা বেশির ভাগই সৈন্যদল থেকে খারিজ হয়ে যাওয়া, স্বাভাবিক জীবন থেকে পরিত্যক্ত, দারিদ্র্যলাঞ্ছিত, বেশির ভাগই মদ্যপ, দু' মুঠো অন্নের জন্য মঠ থেকে মঠে ভ্রাম্যমান; ছিল চাষী বুড়ো-বুড়ীর দল যারা রোগ সারানোর, কি অতিশয় জাগতিক ব্যাপারস্যাপারে উপদেশ পাওয়ার আত্মসর্বস্ব দাবী নিয়ে

সর্বদা হাজির: মেয়েকে পাত্রস্থ করা, দোকান ইজারা নেওয়া, বিষয়সম্পত্তি কেনা, কি ঘুমের মধ্যে শিশুকে চেপে মেরে ফেলার বা জারজ সন্তান লাভের পাপ থেকে মুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে হাজারটা দাবী তাদের। এ সবই দীর্ঘদিন হল জেনে গেছেন ফাদার সিয়েগি; আর তাঁর ভালো লাগে না এ সব। তিনি জানেন, নতুন কিছুই জানার নেই এদের কাছ থেকে, তাঁর মধ্যে অধ্যাত্মবোধ সঞ্জীবিত করা সম্ভব নয় এদের পক্ষে; তথাপি এই ভিড়, যাদের কাছে তিনি, তাঁর আশীর্বাদ, মুখের কথা প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান, — তাদের এই ভিড় তাঁর ভালো লাগে এবং সেজন্যই এদের সান্নিধ্যে বিরক্তি এলেও সেই সাথে যুগপৎ আনন্দের স্বাদও তিনি পান। ফাদার সিয়েগি খুব ক্লান্ত বলে তাদের হটিয়ে দিচ্ছিলেন ফাদার সেরাপিঅন। কিন্তু ফাদার সিয়েগির মনে পড়ে যায় সেই ধর্মোপদেশ: "তাহারা (সন্তানগণ) যাহারা আমার নিকট আসিতে চায় তাহাদের বাধা দিও না," এবং অতঃপর, এই স্মৃতিচারণে উজ্জীবিত বোধ করায়, তিনি বলেন তাদের যেন হটিয়ে দেয়া না হয়।

তিনি উঠে দাঁড়ান, এগিয়ে যান রেলিংয়ের কাছে যেখানে সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে, আশীস দান করতে থাকেন, তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকেন ক্ষীণ দুর্বল কণ্ঠে, নিজের গলা শুনে তাঁর নিজেরই মায়া লাগল এখন। কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সকলকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হল না: তাঁর চোখে পুনর্বার অন্ধকার ঘনিয়ে এল, প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন, রেলিং ধরে ফেলে টাল সামলে নিলেন। ফের অনুভব করলেন, মাথার ভিতরে যেন তুমুল ঝঞ্ঝা বইছে; প্রথমে ফ্যাকাশে হয়ে গেল তাঁর মুখ, তারপরেই একেবারে হঠাৎ টকটকে আরক্তিম হয়ে উঠল।

'তাই, মনে হচ্ছে, কাল পর্যন্ত আর কিছু করা যাবে না। আজ আর সম্ভব নয়।' তিনি বলে উঠলেন, সকলের উপর সাধারণ আশীর্বাণী উচ্চারণ করে বেঞ্চিটার কাছে ফিরে গেলেন। বণিকটি পুনর্বার এসে তাঁর হাত ধরে নিয়ে গেল, বসিয়ে দিল বেঞ্চির উপরে।

'ফাদার!' হট্টরোল উঠল ভিড়ের ভিতরে, 'ফাদার! আমাদের ফেলে যাবেন না, ফাদার! আমাদের কেউ নেই, বাবা, আপনি ছাড়া। হে ঈশ্বর!'

এল্‌ম্‌ গাছের নিচে বেঞ্চির উপর ফাদার সিয়েগিকে বসিয়ে রেখে এসে মহাজন ভদ্রলোক এবার যেন পুলিশী দায়িত্ব গ্রহণ করল আপনা থেকেই, লোকজনকে বীরবিক্রমে হটিয়ে দেয়ার কাজে ব্রতী হল। এ কথা সত্যি, গলা তার চড়ে নি, নইলে ফাদার সিয়েগি শুনতে পাবেন যে; কিন্তু সে একগুঁয়েভাবে এবং ক্রুদ্ধ কণ্ঠেই কথা বলছিল:

'হটো, হটো সব এখান থেকে! আশীর্বাদ তো করেছেন, আরো কী চাই? বেরোও, বেরিয়ে যাও সব! অ, এমনিতে হবে না, গলা ধাক্কানি চাই বুঝি! ভাগো, ভাগো! এই যে, এই চাচী বুড়ি, এই কেলো অনুচি*, হটো, হটো! আঃ গেল যা, বলি যাচ্ছিস কোথা? বললাম তো, ব্যস! ঈশ্বর চাইলে ফের কালকে, আজ এই অবধিই।'

'হেই বাবা, দয়া করো, একনজর খালি দেখে নিই বাবাঠাকুরকে।' — এক বুড়ি বলে ওঠে।

'বটে! এক নজর তোর দেখাচ্ছি! আরে যাচ্ছিস কোথা?'

* অনুচি — অতীতে রাশিয়ায় সাধারণ লোকে গাছের বাকল দিয়ে এক রকম জুতোর মতো কিছু একটা ঘরে বানিয়ে নিত; সেটা পরার আগে তার নিচে ন্যাকড়ার ফেট্টি জড়াত। এই ফেট্টিটাই হচ্ছে 'অনুচি'। — সম্পাঃ

ফাদার সিয়েগি লক্ষ্য করলেন, বণিকটি বাড়াবাড়ি করে ফেলছে, ক্ষীণ কণ্ঠে তাঁর পরিচারককে বললেন, লোকজনকে যেন তাড়িয়ে দেয়া না হয়। কিন্তু এত তিনি জানতেন, যে করেই হোক লোকটা ওদের তাড়াবেই, এবং ভীষণ একা থাকতে ইচ্ছা যাচ্ছিল তাঁর, বিশ্রাম করতে, তবু পরিচারককে ও কথা বলার জন্য পাঠালেন যেহেতু উপস্থিত সকলের উপর তা বেশ দাগ কাটবে।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি তাড়াচ্ছি না, কেবল একটু সহবত শেখাতে চাই,' উত্তর দেয় বণিক, 'এরা একবার নাই পেলে মানুষের জান খতম করে দেবে। ওদের শরীরে দয়ামায়া বলতে তো কিছু নেই, কেবল নিজেকে নিয়ে মশগুল। হবে না আজকে, বললাম তো। বেরোও সব। ফের কালকে।'

শেষতক সকলকেই দূর করে দিল বণিকটি।

লোকটি যে এহেন কর্মতৎপর হয়ে উঠেছিল, তার কারণ — সে নিয়মশৃঙ্খলা ভালোবাসত, ভালোবাসত লোকজনের উপর হম্বিতম্বি করা, তাদেরকে দূর-ছাই করা, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কারণ — ফাদার সিয়েগিকে দরকার ছিল তার। সে বিপত্নীক, একমাত্র সন্তান ছিল তার একটি মেয়ে, অসুস্থ, এখনো বিয়ে দেওয়া যায় নি, চৌদ্দ শ' ভের্স্তা দূর থেকে মেয়েকে সঙ্গে করে এনেছে ফাদার সিয়েগি তাকে দেখে ভালো করে দেবেন বলে। দু' বছর ধরে মেয়ের এই অসুখে বহু জায়গাতেই সে চিকিৎসা করিয়েছে মেয়ের। সর্বপ্রথম গুবের্নিয়ায়* তাদের বিশ্ববিদ্যালয়-সহরের ক্লিনিকে — কোনো লাভ হয় নি; গেছে সামারা গুবের্নিয়ায় এক

* প্রাক্‌বিপ্লব রাশিয়ায় 'গুবের্নিয়া' ছিল প্রশাসনিক বিভাগের নাম, বর্তমানে অবলুপ্ত। বাংলায় বলা যেতে পারে 'বিভাগ'। — সম্পাঃ

বাদ্যির কাছে মেয়েকে নিয়ে — সামান্য কিছু ফল ফলেছিল; তারপর নিয়ে গেছে মস্কোর ডাক্তার দেখাতে, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢেলেছে — কিচ্ছুটি উপকার হয় নি। শেষ কালে লোকের মুখে শুনতে পেয়েছে, ফাদার সিয়েৰ্গি অসুখ সারাতে পারেন, তারপর তো এই এখানেই এসেছে। সমস্ত লোকজন বিদায় হওয়া মাত্রই সে ফাদার সিয়ের্গির কাছে এসে দাঁড়াল, কোনো রকম ভণিতা না করে সোজা নতজানু হয়ে বসে পড়ে জোরে বলতে লাগল:

'সন্তবাবা, আমার মেয়েটা বড়ো কষ্ট পাচ্ছে অসুখে, তাকে একবারটি আশীর্বাদ করে দিন। প্রভু রাগ না করলে প্রভুর পাদপদ্মে নিয়ে এসে ফেলি।' হাত জোড় করে অনুনয়বিনয় করতে থাকে সে। সবকিছু সে এমনভাবে করল, এমনভাবে বলে গেল যে, মনে হল অন্য কোনো রকম আচরণ নয়, অবিকল ঠিক এ রকম করাটাই প্রথাসিদ্ধ ও নিয়মসম্মত, কন্যার রোগ সারানোর অনুরোধ এভাবেই করা বিধেয়। সে এত আত্মবিশ্বাসের সাথে ব্যবহার করল যে, এমন কি ফাদার সিয়ের্গির পর্যন্ত মনে হল — হ্যাঁ, ঠিক এমনটি বলা-কওয়া, আচার-ব্যবহার করাটাই তো উচিত। তবু তিনি তাকে উঠে দাঁড়াতে বললেন, কী হয়েছে বলতে বললেন। বণিকটি বলতে থাকে: তার মেয়ে, বাইশ বছরের অনূঢ়া কন্যা, দু' বৎসর পূর্বে, তার মায়ের আকস্মিক মৃত্যুর পর একদিন গোঁ-গোঁ করে চিৎপটাং (এভাবেই ব্যাখ্যা করল সে), আর তারপর থেকে বুদ্ধিআক্কেল ঠিকমতো কাজ করছে না; চৌদ্দ শ' ভের্স্তা দূর থেকে এতখানি অবধি টেনে এনেছে মেয়েকে, অতিথিশালায় আছে সে, ফাদার সিয়ের্গি হুকুম করলেই নিয়ে আসে; দিনের বেলায় একেবারে বাইরে বেরুতে চায় না, আলো দেখে ভয় পায় মেয়ে, একমাত্র সূর্য ডুবলেই চলাফেরা করতে পারে।

'তার মানে, খুবই দুর্বল?' জিজ্ঞাসা করেন ফাদার সিয়েগির্ ।

'না, দুর্বলতা ঠিক নেই, বরং গায়েগতরে ভালোই, তবে ঐ এক অসুখ — কুপিতবায়ুইড়াবিপত্তি, ডাক্তার বলেছে। ফাদার সিয়েগির্, আপনি শুধু একবার মুখ ফুটে বললেই এক নিঃশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে নিয়ে আসতাম। সন্তবাবা, বাপের পরাণটার দিকে একটু মায়া করুন, আমার বংশটা তাহলে বাঁচে, প্রার্থনা ক'রে মেয়েটার রোগশোক ভালো করে দিন, বাবা।'

পুনর্বার নতজানু হয়ে বসে পড়ে বণিক, ঘাড়টা একপাশে হেলিয়ে করজোড়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে অনুনয় করতে থাকে। ফাদার সিয়েগির্ ফের তাকে উঠে দাঁড়াতে বললেন, ভাবলেন একবার — এ কী দুঃসহ কর্মের বোঝা আর কী অবনতমস্তকেই না তিনি তা বহন করছেন, দীর্ঘশ্বাস পড়ল তাঁর, কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলে উঠলেন :

'ঠিক আছে। সন্ধ্যের সময় নিয়ে এসো। আমি তার জন্যে প্রার্থনা করব'খন, কিন্তু এখন বড়ো ক্লান্ত।' চোখ বন্ধ করেন তিনি। 'আমি তোমাকে তখন খবর দেব।'

মহাজন ভদ্রলোক চলে যায় তাঁকে নিষ্কৃতি দিয়ে, বালির উপর আস্তে পা টিপে টিপে, তাতে শুধু আরো বেশি করে মচ্‌মচ্‌ শব্দ ওঠে জুতোর। ফাদার সিয়েগির্ একা বসে থাকেন।

ফাদার সিয়েগির্‌র জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ধর্মোপাসনা আর দর্শনার্থীদের ভিড়ে ঠাসা, তবু আজকের এই দিনটি বিশেষভাবে ক্লান্তিকর। সকালেই একদল হোমরাচোমরা লোক এসেছিল, বহুক্ষণ ধরে তাঁর সঙ্গে কথা বলে গেছে; তারপর এসেছিল সন্তান সঙ্গে নিয়ে জনৈকা অভিজাত মহিলা। ছেলেটি তরুণ অধ্যাপক, নাস্তিক; প্রচন্ড ধর্মভীরু এবং ফাদার সিয়েগির্‌তে নিবেদিতপ্রাণা জননী

সন্তানকে নিয়ে এসে ফাদারের হাতে ছেড়ে দিয়েছিল, অনুনয় জানিয়েছিল — ফাদার সিয়েগি যেন তার সাথে একটু কথা বলেন। আলাপ-আলোচনা করা মোটেই সহজ হয় নি। স্পষ্টতঃই, তরুণটি পাদ্রীমহোদয়ের সাথে কোনো তর্কবিতর্কে নামতে চায় নি, যা কিছু তিনি বলেছেন সবেতেই সে একমত হয়েছে যেমন কেউ একমত হয় অসমকক্ষ দুর্বল কারো সাথে; কিন্তু ফাদার সিয়েগি দেখতে পেয়েছিলেন যে, ছেলেটি কিছু বিশ্বাস করছে না এবং তদ্‌সত্ত্বেও সে বেশ চুপচাপ, সহজ ও শান্ত। নিরানন্দ চিত্তে এখন ফের স্মরণ করলেন সেই সব কথাবার্তা।

'বাবা, একটু কিছু মুখে দিন,' পরিচারক এসে বলে।

'যা হোক কিছু নিয়ে এসো।'

ছোটো কুঠরিটার মধ্যে, গুহামুখ থেকে মাত্র দশ পা দূরে যেটা তৈরি করা হয়েছে, তাতে গিয়ে ঢোকে পরিচারকটি, এবং ফাদার সিয়েগি পুনর্বার একা হয়ে যান।

সে সব দিন কবেই গত হয়েছে যখন ফাদার সিয়েগি নির্জনে একাকী থাকতেন, সবকিছু করতেন নিজে হাতে, এক প্রসাদ ও কালো রুটি ছাড়া খেতেন না কিছুই। বহুদিন পূর্বেই তাঁকে বলে দেয়া হয়েছে যে, নিজের স্বাস্থ্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার কোনো অধিকার তাঁর নেই, এবং তাঁকে যা দেয়া হত তা নিরামিষ হলেও অতিশয় পুষ্টিকর। তিনি অবশ্য গ্রহণ করতেন অল্পই, তবু তা পূর্বাপেক্ষা পরিমাণে অনেক বেশিই হত, এবং প্রায়শঃই যা খেতেন তা পূর্বের ন্যায় বিতৃষ্ণা ও পাপবোধে পীড়িত হতে হতে নয়, বিশেষ পরিতৃপ্তির সাথেই আহার করতেন। এই হল বর্তমান অবস্থা। তিনি একটু পায়েস খেলেন, তারপর একটুকরো সাদা পাঁউরুটির অর্ধেক, আর এক কাপ চা।

পরিচারক চলে গেল, এবং তিনি এল্ম্ গাছের নিচে বেঞ্চির উপরে একা বসে রইলেন।

অপূর্ব সুন্দর যে সন্ধ্যা। বার্চ, এল্ম্, এ্যাস্পেন, বার্ড্চেরী এবং ওক্ গাছের মুকুল সবেমাত্র ফুটতে শুরু করেছে। এল্মের পিছনে বার্ডচেরী কুঞ্জ ফুলে ফুলে ভরে গেছে, এখনও শুরু হয় নি তাদের ঝরে পড়া। নাইটিংগেল, একটা তো একেবারে কাছে আর আরও দু'-তিনটে নদীর ধারে ঝোপের মধ্যে চুলবুল করছে, গানে ভরে দিচ্ছে চারদিক। নদীর দিক থেকে দূরাগত গানের ধ্বনি ভেসে আসছে, নিশ্চয়ই কাজ-ফিরতি লোকজনের; বনানীর ওপারে সূর্য ডুবছে, পত্রপল্লবের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর আলোকচ্ছটা বিকীর্ণমান। ওদিকের সবটাই হালকা সবুজ আর অন্যদিক, যেদিকে এল্ম্, তমসাচ্ছন্ন। নানা পতঙ্গ উড়ছে, ছিটকে, নিচে পড়ছে।

সান্ধ্য আহারের পর ফাদার মনে মনে প্রার্থনা করেন: "ঈশ্বরপুত্র, হে প্রভু যীশু, ত্রাণ করো আমাদের", এবং অতঃপর স্তোত্র পাঠ করতে থাকেন; হঠাৎ, স্তোত্রপাঠের মাঝখানে, কান্ড দ্যাখো দেখি, ঝোপ থেকে একটা চড়ুই উড়ে এসে মেঝেয় পড়ল, কিচির-মিচির করে লাফিয়ে লাফিয়ে আগিয়ে এল তাঁর কাছে, কিসে যেন ভয়ও পেয়ে গেল তারপর উড়ে পালিয়ে গেল। তিনি মন্ত্রপাঠ করেই চলেন, তার মধ্যে সংসার-বন্ধন হতে মুক্তিলাভের কথা; পড়ার গতি দ্রুততর হয়, তিনি এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রুগ্ন কন্যা সহ বণিকটিকে ডাকিয়ে আনতে চান: মেয়েটিকে দেখতে খুব কৌতূহল হচ্ছে। কৌতূহল এজন্য যে একটা নতুন মুখ, এ একটা নতুন আনন্দ, তাছাড়া বাপ-মেয়ে দুজনেই তাঁকে এমন একটা কিছু ভেবে নিয়েছে যার প্রার্থনা ঈশ্বর মঞ্জুর করেন। এ সব তিনি নিজে অস্বীকার

করেন লোকজনের কাছে, অথচ হৃদয়ের অন্তস্তলে নিজে কিন্তু ও রকমটাই ভাবেন নিজেকে।

নিজের মনে এ কথা ভেবে প্রায়শঃই অবাক মানেন যে এটা কী করে হল যে তিনি, স্তেপান কাসাৎস্কি, তাঁর কাছে কিনা এই অত্যাশ্চর্য মহিমা, অলৌকিক ক্ষমতা এসে ধরা দিল; কিন্তু এমনটা যে ঘটেছে এতো সত্যিই, এতে তো কোনো সন্দেহ নেই: যা তিনি নিজে দেখেছেন, সেই রুগ্ন ছেলেটি থেকে শুরু করে সর্বশেষ যে বৃদ্ধাটিকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন প্রার্থনা করে, তা বিশ্বাস না করে তাঁর উপায় কী।

ব্যাপারটা আশ্চর্যের যেমনই হোক, আসলে সত্যি। বণিক-কন্যা যে তাঁর কৌতূহল উদ্রেক করেছে তার কারণ সে একটি নতুন মুখ, কারণ তাঁর ক্ষমতায় সে বিশ্বাসী, কিন্তু আরও বড়ো কারণ তাঁর লোককে আরোগ্যদানের ক্ষমতা ও নিজের খ্যাতি আরেকবার নিশ্চিত করার মাধ্যম হিসেবে সে উপস্থিত। "হাজার ভের্স্তা দূর থেকে লোকজন আসে, খবরের কাগজে লেখালেখি হয় এ নিয়ে, সরকার জানে, ইউরোপে — নাস্তিক ইউরোপে পর্যন্ত সকলে জানে," তিনি ভাবতে থাকেন। হঠাৎ নিজের মিথ্যাদম্ভ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠে ভয়ানক লজ্জা পান, পুনর্বার প্রার্থনায় আনত হন ঈশ্বরের কাছে। "প্রভু, হে সুরলোকের অধীশ্বর, সন্তপ্ত হৃদয়ের পরিত্রাতা, হে মহাসত্য, আবির্ভূত হও, অধিষ্ঠিত হও আমাদের মধ্যে, আমাদের কলুষমুক্ত করো, আমাদের আত্মাকে, হে প্রভু, ত্রাণ করো। যে পার্থিব খ্যাতির লোভের বশীভূত আমি সেই ইতর দুর্বলতা থেকে আমাকে বাঁচাও," বারংবার বলতে থাকেন তিনি, মনে পড়ে যায় কতবারই না এই একই প্রার্থনা তিনি করেছেন, অথচ সে সব প্রার্থনা অদ্যাবধি শুধু ব্যর্থতাতে অপচয়িত হয়েছে: তাঁর প্রার্থনা

অন্যের ক্ষেত্রে অলৌকিক কাণ্ড ঘটায়, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট হতে তাঁর এই হীন বাসনা থেকে মুক্তি অর্জনে তিনি সিদ্ধ হন নি।

নির্জনবাসের প্রথমদিকের প্রার্থনা তাঁর মনে পড়ল: যখন তিনি পবিত্রতা, বিনয় ও প্রেম ভিক্ষা করতেন তাঁর উপাসনায়, সে সব দিনে মনে হত, ঈশ্বর শুনেছেন সে প্রার্থনা, এবং পুণ্যস্নাত হয়ে উঠতেন তিনি, নিজের হাতের আঙ্গুল নিজে কেটেছিলেন; এখন কুঞ্চিতত্বক সেই কর্তিত অঙ্গুলি তুলে ধরলেন চোখের সামনে, চুম্বন করলেন; তাঁর মনে হল, সেই সব দিনে যখন অন্তর্গত পাপবাসনার জন্য সর্বদা ঘৃণা করতেন নিজেকে তখন সত্যিই বিনমিত ছিলেন তিনি, এবং মনে হল যে, সেই সব দিনে হৃদয়ে প্রেম ছিল যখন — স্মৃতিচারণ করেন তিনি — তিনি করুণায় দ্রব হয়েছিলেন একবার এক বৃদ্ধকে দেখে, আর এক মাতাল সৈনিক তাঁর কাছে এসে যখন দাবী করেছিল অর্থ, এবং সেই তখন যখন তিনি দেখা পেয়েছিলেন ঐ মহিলার। আর এখন? নিজেকে প্রশ্ন করেন: আদৌ কি কাউকে ভালোবাসেন তিনি, ভালোবাসেন সোফিয়া ইভানভ্না বা ফাদার সেরাপিঅনকে, আজ যারা এসেছিল তাঁর কাছে তাদের কারো জন্যই কি ভালোবাসা অনুভব করেছেন, ভালোবাসা অনুভব করেছেন সেই অতিশিক্ষিত তরুণটির প্রতি যার সাথে গুরুর মতো আলাপ করেছিলেন, নিজের ধীশক্তি ও অধীতবিদ্যার পরিচয় দিতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন তিনি? অন্যের ভালোবাসা পেতে ভাল লাগে তাঁর, সেটা তাঁর প্রয়োজন; কিন্তু নিজে তাদের প্রতি কোনো প্রেম তো অনুভব করেন না। তাঁর হৃদয়ে আজ কোনো প্রেম নেই, নেই কোনো বিনয়, নেই পবিত্রতা।

বণিক-কন্যাটির বয়স বাইশ জেনে খুশী হয়েছিলেন মনে মনে, জানতে ইচ্ছা হয়েছিল সে সুন্দরী কি না। এবং সে দুর্বল কি

না জিজ্ঞাসা করার পিছনে ঠিক যে জিনিসটি তিনি জানতে চেয়েছিলেন তা হল — নারীসুলভ মাধুর্য তার আছে না নেই।

"সত্যিই কি এতদূর নিচে নেমে গেছি?" তিনি ভাবতে থাকেন। "প্রভু, আমাকে ত্রাণ করো, উদ্ধার করো আমাকে, হে প্রভু, হে আমার ঈশ্বর।" অতঃপর করজোড়ে আবদ্ধ করেন দুই হাত, প্রার্থনায় বসেন। নাইটিংগেলের গানে ভেসে যাচ্ছে চারদিক। একটা ভ্রমর উড়ে এসে পড়ল তাঁর উপর, মাথার পিছনে ঘাড় বেয়ে উঠতে লাগল। তিনি সেটা ঝেড়ে ফেলে দিলেন। "তিনি কি সত্যিই আছেন? নাকি বদ্ধদ্বারেই করাঘাত করে যাচ্ছি আমি... অদৃশ্য তালা ঝুলছে দরজায়, আমি যদি তখন তা দেখতে পেতাম। সেই তালার নাম — নাইটিংগেল, ভ্রমর, নিসর্গ। হয়তো সেই তরুণই ঠিক, কে জানে।" উচ্চৈঃস্বরে উপাসনা করতে থাকেন তিনি, দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রার্থনা করে যান, যতক্ষণ ঐ সব চিন্তা সম্পূর্ণ দূরীভূত না হয় এবং তিনি পুনরায় মানসিক প্রশান্তি ও আত্মবিশ্বাস না অনুভব করেন নিজের মধ্যে। তিনি ঠুংঠুং করে ছোটো একটা ঘণ্টি নাড়লেন; পরিচারক এলে তাকে বললেন যে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বণিক এখন আসতে পারে।

কন্যাকে হাতে ধরে বণিকটি নিয়ে এল, গুহাস্থ কামরায় তাকে পৌঁছে দিয়েই তৎক্ষণাৎ চলে গেল।

মেয়েটি স্বর্ণকেশী, অত্যন্ত ফর্সা, ফ্যাকাশে, গোলগাল, অত্যন্ত লাজুক, তার মুখ যেন ভয়-পাওয়া কোনো শিশুর, আর দেহ বাড়ন্ত কোনো রমণীর শরীর। প্রবেশপথে বেঞ্চির উপরে ফাদার সিয়েগি তেমনিই বসে ছিলেন। মেয়েটি যখন পাশ দিয়ে চলে গেল এবং যেতে যেতে মুহূর্তেক থামল তাঁর পাশে এসে এবং তিনি

আশীর্বাদ করলেন, তখন যেভাবে তিনি মেয়েটির সারা শরীর জরিপ করে নিচ্ছিলেন তাতে নিজেই শিউরে উঠলেন ভয়ে। সে ভিতরে চলে গেল আর তিনি নিজে যন্ত্রণাবিদ্ধ হতে লাগলেন। মুখ দেখেই তিনি বুঝেছিলেন যে মেয়েটি ইন্দ্রিয়পরায়ণা এবং দুর্বলমতি। তিনি উঠলেন, গুহার ভেতরে গেলেন। সে একটা ছোট্ট টুলে তাঁর অপেক্ষায় বসে ছিল।

যখন তিনি ঢুকলেন, উঠে দাঁড়াল সে।

'আমি বাবার কাছে যাব,' সে বলে ওঠে।

'ভয় নেই তোমার,' তিনি বলেন, 'তোমার কিসের কষ্ট বলো তো?'

'সবকিছুরই কষ্ট আমার,' সে উত্তর দেয়, আর হঠাৎ মুখে তার মৃদু হাস্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

'প্রার্থনা করো,' তিনি বললেন, 'ভালো হয়ে যাবে তুমি।'

'প্রার্থনা যা করার আমি তা করেছি, ওতে কিছু হয়টয় না।' সর্বাঙ্গ হাসতে থাকে মেয়েটির। 'এখন আপনি প্রার্থনা করুন, আমার উপর হাত রেখে আশীর্বাদ করুন। আমি আপনাকে স্বপন দেখেছি।'

'কী দেখেছ?'

'দেখেছি যে, আপনি আপনার হাত ঠিক এইভাবে আমার বুকের উপর রেখেছেন।' সে তাঁর হাত ধরে নিজ স্তনের উপর চেপে ধরল, 'ঠিক এইখানে।'

তিনি তাঁর ডান হাতটি দিয়েছিলেন তাকে।

'তোমার নাম কী?' তিনি জিজ্ঞাসা করেন, সারা শরীর কাঁপছে তাঁর; তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি হেরে গেছেন, কামজ বাসনা তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

'মারিয়া। কেন?' সে তাঁর হাত টেনে নিল, চুমু খেল তাতে, আর তারপর এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল তাঁর কোমর, সবেগে চেপে ধরল নিজের সাথে।

'এ কী, এ কী?' তিনি বলে ওঠেন, 'মারিয়া! তুমি মূর্তিমতী শয়তান।'

'হলামই বা, ক্ষতি নেই।'

এবং সে অতঃপর আলিঙ্গনে বাঁধে তাঁকে, বিছানার উপর বসে পড়ে তাঁকে নিয়ে।

সকাল হতেই তিনি বেরিয়ে আসেন দেউড়িতে।

"সত্যিই কি সব ঘটে গেল? এখন বাপ আসবে, সবকিছু বলে দেবে ও। মূর্তিমতী শয়তান ও। কিন্তু আমি এখন কী করি? এই তো, ব্যস্, পেয়ে গেছি, কুড়ুল — যা দিয়ে নিজের আঙুল কেটেছিলাম।" তিনি কুড়ুলটা তুলে নেন, ঘরের দিকে এগিয়ে যান।

পরিচারকটির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

'প্রভুর কি কাঠ কাটতে হবে? আমাকে দিন কুড়ুল।'

তিনি দিয়ে দেন। ঘরে গিয়ে ঢোকেন। মেয়েটি শুয়ে আছে, ঘুমুচ্ছে। ঘৃণাভরে তিনি একবার তাকিয়ে দেখেন তাকে। পার হয়ে পিছনের ঘরে যান, চাষীর পোষাক পেড়ে এনে পরে ফেলেন, কাঁচি নিয়ে চুল কেটে ফেললেন, তারপর বেরিয়ে গিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে পায়ে-চলা সরু পথ ধরে চলতে থাকেন নদীর দিকে — চার বৎসর হল তিনি আসেন নি এখানে।

নদীর ধারে ধারে রাস্তা চলে গেছে; তিনি সেই পথ ধরে এগুতে থাকেন, দুপুর পর্যন্ত চলেন একটানা। দুপুরবেলায় একটা

গমক্ষেতের মধ্যে ঢুকে সেখানে শুয়ে পড়েন। সন্ধ্যা যখন হয়-হয়, তখন নদীর পাশে একটা গ্রামে গিয়ে পৌঁছুলেন। গ্রামে গেলেন না তিনি, গেলেন নদীর দিকে, তার খাড়া উঁচু পাড়ের দিকে।

খুব ভোর তখন, সূর্যোদয়ের তখনো আধ-ঘণ্টার মতো বাকী। সবকিছু কেমন বিবর্ণ ও বিষণ্ন, ভোরবেলাকার কনকনে হাওয়া আসছে পশ্চিম দিক থেকে। "এবার সব চুকিয়ে ফেলতে হয়। ঈশ্বর নেই। কিন্তু শেষ করব কী করে? জলে ঝাঁপ দেব? সাঁতার কাটতে জানি, ডুবব না তো। গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ব? পেয়ে গেছি, — এই তো কোমরের বেল্ট, সোজা গাছের ডাল থেকে।" হাতের কাছেই এত সহজ সম্ভাব্য উপায় মনে হল এটা যে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। সর্বদা হতাশার সময় যা করেছেন এখনো তাই. প্রার্থনা করতে ইচ্ছা হল। কিন্তু কেউ যে নেই যার কাছে প্রার্থনা করতে পারেন। ঈশ্বর নেই। একটা হাতের উপর মাথা ভর দিয়ে তিনি শুয়ে থাকেন। হঠাৎ মনে হয়, ঘুমে চোখ ভেঙে পড়ছে তাঁর, মাথা আর ধরে রাখতে পারছেন না হাত দিয়ে, হাত ছড়িয়ে দেন, তার উপর মাথা রেখে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর নিদ্রা বড়জোর মুহূর্তখানেক ছিল; সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম টুটে যায় এবং না স্বপ্নে না জাগরণে অজস্র স্মৃতি এসে ভিড় জমায় চোখের সামনে।

তিনি দেখতে থাকেন: ছোট্টটি তিনি, প্রায় শিশু, গ্রামে মায়ের বাড়ীতে। একটা গাড়ী এগিয়ে আসে তাঁদের কাছে, গাড়ী থেকে নামেন কাকা নিকোলাই সের্গেইয়েভিচ্ তাঁর বেলচে আকারের বিশাল কালো ঘন চাঁপ দাড়ি নিয়ে, সঙ্গে বড়ো বড়ো বিনম্র দু'টি চোখ আর করুণ লাজুক একটি মুখ নিয়ে নামে রোগা পটকা ছোট্ট খুকী পাশেন্‌কা। পাশেন্‌কাকে তাঁদের কাছে, একদঙ্গল ছেলের

কাছে, নিয়ে এসে রেখে যায়। তার সঙ্গে খেলা দরকার কিন্তু খেলতে ভালোই লাগে না। মেয়েটি একেবারে বুদ্ধু। শেষ পর্যন্ত হয় কি — তাকে নিয়ে মহা হাসাহাসি করে সবাই; বলে, তুমি যে সাঁতার কাটতে পার দেখাও দেখি। মেয়েটি মেঝের উপর শুয়ে প'ড়ে শুকনো ডাঙ্গায় সাঁতার কাটে। হো-হো করে হেসে ওঠে সবাই, বোকা বানায় তাকে। আর মেয়েটি তা বুঝে ফেলে, লাল হয়ে ওঠে লজ্জায় এবং তার মুখ করুণ, এতো করুণ হয়ে ওঠে যে লজ্জা লাগে ছোট্ট স্তেপানের; প্রসন্ন, বিনীত, কষ্টের এমন একটা হাসি ফুটে ওঠে মেয়েটির মুখে যা জীবনে কখনো তিনি ভুলতে পারেন নি। তারপরে আর কবে কবে তিনি তাকে দেখেছেন তাও মনে পড়ে সিয়েগির্'র। বহু পরে, সন্ন্যাসী হওয়ার কিছু আগে, তিনি তাকে একবার দেখেন। তখন সে বিবাহিতা, গ্রাম্য জমিদারশ্রেণীর কোনো একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, স্ত্রীর সমস্ত সম্পত্তি ফুঁকে দিয়ে তখন সে রীতিমতো মারধর করে তাকে। সন্তান দুটি: পুত্র এবং কন্যা। অল্প বয়সেই ছেলেটি মারা যায়।

সিয়েগির্'র মনে পড়ে কী অসুখী অবস্থাতেই না দেখেছিলেন তাকে। পরে দেখা হয়েছিল মঠে, তখন সে বিধবা। অবিকল সে আগের মতোই ছিল তখনো — না, ঠিক নির্বোধ নয়, কিন্তু কেমন যেন নির্জীব, অতিশয় নিরীহ এবং করুণ। মেয়ে ও তার ভাবী বরকে নিয়ে এসেছিল সে। ততদিনে তারা গরীব হয়ে গেছে। পরে তিনি শুনেছিলেন, কোথায় কোনো একটা জেলাসহরে সে থাকে, এখন আরো বেশি দরিদ্র। "কিন্তু ওর কথা এত ভাবছি কেন?" নিজেকে প্রশ্ন করেন। তবু ঐ ভাবনা থেকে অব্যাহতি মেলে না। "কোথায় সে আজ? কী রকম আছে? এখনো কি সেই রকমই সে অসুখী, যখন মেঝের ওপরে সাঁতার কাটা দেখিয়েছিল সে, তখনকার মতো,

সেই রকম? তবে তার কথা ভেবে লাভ কী? আমার কী হয়েছে? এবার সব খতম করে ফেললেই চুকে যায়।"

পুনর্বার ভয় তাঁকে গ্রাস করে নেয়, এবং পুনর্বার, ঐ চিন্তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য, তিনি পাশেন্‌কার কথাই ভাবতে থাকেন।

এভাবেই শুয়ে রইলেন বহুক্ষণ, একবার ভাবেন নিজের অনিবার্য অন্তিম নিয়ে, তো ফের ভাবতে থাকেন পাশেন্‌কার কথা। তাঁর কাছে পাশেন্‌কা মনে হল উদ্ধার। অবশেষে ঘুমিয়ে পড়লেন একসময়। স্বপ্ন দেখলেন এক দেবদূত এসে তাঁকে বলছে: "পাশেন্‌কার কাছে তুমি যাও, তার কাছ থেকেই জেনে নাও তোমার কী করণীয়, কোথায় তোমার পাপ, আর কীসে তোমার উদ্ধার।'

ঘুম ভেঙে গেল তাঁর; মনে মনে স্থির করলেন যে, এ ঈশ্বরেরই প্রকাশ। বড়ো আনন্দ হল মনে, ঠিক করলেন — স্বপ্নে যা নির্দেশ পেয়েছেন তাই তিনি করবেন। পাশেন্‌কা যেখানে থাকে সে সহরটি তিনি জানতেন, এখান থেকে তিন শ' ভের্স্তা দূরে; সেখানেই চললেন তিনি।

৮

পাশেন্‌কা তো আর সেই ছোট্টো পাশেন্‌কা নেই; এখন সে চর্মসার বৃদ্ধা এক — প্রাস্কোভিয়া মিখাইলোভ্‌না, বলিরেখা কুঞ্চিত তার মুখ, দুর্ভাগ্যতাড়িত মাতাল সরকারি কর্মচারী মাভ্রিকিয়েভের শাশুড়ী সে। জামাতার সর্বশেষ কর্মস্থল ছিল যেখানে সেই জেলাসহরে তিনি আছেন, একা সংসার টানছেন: মেয়ে, নিউরেস্‌থেনিয়ার রুগী অসুস্থ জামাতা এবং পাঁচ নাতি-নাতনী। সদাগর-মহাজনের মেয়েদের গান শেখান, ঘণ্টায় পঞ্চাশ

কোপেক মাইনে, এভাবেই সংসারে অন্ন জোটান। মাসে অন্ততঃ ষাট রুবলের মতো উপার্জন করার জন্য কোনোদিন চার ঘণ্টা, কোনোদিন বা পাঁচ ঘণ্টা গান শেখাতেন তিনি। যতদিন না জামাতার কোন চাকুরি সংস্থান হয়, ততদিন এভাবেই সাময়িক বন্দোবস্ত হয়েছিল। নিজের আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত সকলকেই জামাতার জন্য একটা চাকরির অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন প্রাস্কোভিয়া মিখাইলোভ্‌না, সিয়েগিও বাদ যান নি। অবশ্য মঠ ছাড়ার পূর্বে সে চিঠি তাঁর হাতে গিয়ে পেঁছয় নি।

সেদিন শনিবার। প্রাস্কোভিয়া মিখাইলোভ্‌না কিসমিস দেওয়া মিষ্টি রুটি তৈরি করবেন বলে ময়দা মাখছিলেন; তাঁর পিতৃগৃহে রাঁধুনী চাকরটি এতো সুন্দর তৈরি করত এটা। আগামী কাল উৎসবের দিনে নাতি-নাতনীকে আদর করে খাওয়াতে ইচ্ছা হয়েছিল প্রাস্কোভিয়া মিখাইলোভ্‌নার।

মাশা, তাঁর মেয়ে, সবচেয়ে ছোটো কোলের বাচ্ছাটাকে নিয়ে ব্যস্ত; বড়ো দুটি — ছেলে এবং মেয়ে — ইস্কুল গেছে। জামাতাটি সারা রাত ঘুমোয় নি, এখন একটু ঝিমুচ্ছে। গত রাত্রে প্রাস্কোভিয়া মিখাইলোভ্‌নাও ঘুমুতে পারেন নি, জামাতার উপর থেকে মেয়ের রাগ যাতে কমে তার চেষ্টাতেই রাত কাবার হয়ে গেছে।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জামাতা দেহেমনে পঙ্গু মানুষ, অন্যভাবে চলা-বলা বা থাকা সম্ভব নয় তার পক্ষে; বুঝেছিলেন, স্ত্রীর গালিগালাজে কোনো ফল হবে না। তিনি নিজে সমস্ত শক্তি দিয়ে সব কিছু সহজ করে দিতে চেয়েছেন যাতে সংসারে কোনো লজ্জা-সঙ্কোচ, কোনো বিদ্বেষ আর না থাকে। লোকজনের মধ্যে বিন্দুতম কোনো নির্দয় আচরণ প্রায় শারীরিকভাবেই তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর কাছে পরিষ্কার রূপে ধরা পড়েছিল

যে, ওতে কারো কিছু ভালো তো হয়ই না, বরং আরো বেশি খারাপ হয়। এটা যে তিনি সচেতনভাবে ভাবনাচিন্তা করে ঠিক করেছিলেন, তা নয়; কোনো দুর্গন্ধ নাকে এলে, কি তীক্ষ্ন কর্কশ কোনো চেঁচামেচি কানে এলে, কিংবা শরীরে কোনো আঘাত লাগলে যেমন হয়, কোনো অকল্যাণের চিহ্ন দেখামাত্রই তাঁর ঠিক তেমনি কষ্ট হত।

ময়দার তাল কেমন করে ছানতে হবে মনের আনন্দে নিজে থেকে সবেমাত্র শেখাচ্ছিলেন লুকেরিয়াকে, এমন সময় ছ' বছরের নাতি মিশা ভীতচকিত মুখে রান্নাঘরে এসে হাজির, পরনে তার ঢোলা আলখেল্লা গোছের জামা, বাঁকা দুটি শীর্ণ পায়ে শতছিন্ন রিফু-করা আঁটো-পাজামা।

'দিদিমা, এক কুচ্ছিৎ বুড়ো তোমায় ডাকছে।'

লুকেরিয়া উঁকি দিয়ে বাইরেটা দ্যাখে:

'ঠিকই তো, মুসাফির কেউ হবে, মা।'

প্রাস্কোভিয়া মিখাইলোভ্‌না নিজের বিশীর্ণ কনুই দুটি তাঁর অ্যাপ্রোনে ভালো করে মোছেন, তারপর বটুয়া ঝেড়েঝুড়ে একটা পাঁচ কোপেক পান কিনা দেখার জন্য ঘরের ভিতরে যাবেন, এমন সময় মনে হল দশ কোপেকের নিচে থলিতে তো কোনো পয়সা নেই; ঠিক করলেন রুটিই দেবেন, ফিরে এলেন আলমারীর কাছে, কিন্তু তারপর ভিক্ষা দিতে হাত উঠছে না মনে হওয়ায় অকস্মাৎ আরক্তিম হয়ে উঠলেন লজ্জায়, লুকেরিয়াকে একটুকরো রুটি কাটতে বলে আরও দশ কোপেক আনার জন্য ভেতরে গেলেন। 'ব্যস, বুঝলি এই তোর শাস্তি,' নিজেকে তিনি ধমকান, 'এখন দুটোই দাও।'

মুসাফিরকে রুটি ও পয়সা দিতে দিতে মাফ চাইলেন তিনি, এবং যখন দিচ্ছিলেন স্বীয় বদান্যতায় কোনো অহমিকা মনে এল

না, বরং উল্টো, বড়ো লজ্জা পেলেন যে এত অল্প দিচ্ছেন। আহা মুসাফিরটি দেখতে এত সৌম্য দর্শন।

প্রভু যীশুর নাম নিয়ে তিন শ' ভের্স্তা পথ হেঁটে এসেছেন, চেহারা মলিন, রোগা হয়ে গেছেন এবং কালো, ছোটো করে ছাঁটা মাথার চুল, মাথায় চাষীর টুপী, হাঁটু-তোলা বুটজুতোও তাদের মতো, কিন্তু তাসত্ত্বেও — বিনয় আনত মস্তকে বসেছিলেন তিনি, কিন্তু তাসত্ত্বেও সিয়েগির্র চেহারায় চোখে পড়ার মতো সেই রাজকীয়তা ছিল যা সব সময় লোকজনকে কাছে টেনে এনেছে। কিন্তু প্রাস্কোভিয়া মিখাইলোভ্না তাঁকে চিনতে পারেন নি। চেনা সম্ভব ছিল না, প্রায় তিরিশ বৎসর দেখেন নি তাঁকে।

'বাবা, কিছু মনে করো না, ক্ষিদে লেগেছে? খাবে কিছু?'

রুটি ও পয়সা তিনি তুলে নেন। প্রাস্কোভিয়া মিখাইলোভ্না অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন, মুসাফির তবু চলে যাচ্ছে না, দাঁড়িয়েই আছে, তাকিয়ে আছে তাঁর পানে।

'পাশেন্কা, আমি তোমার কাছেই এসেছি। আমায় তাড়িয়ে দিও না।'

সুন্দর কালো চোখ অপলকে, একান্ত অনুনয়ে তাকিয়ে থাকে পাশেন্কার দিকে, উদ্গত অশ্রুর ফোঁটায় তা চকচক করে। আর কাঁচাপাকা গোঁফের নিচে তাঁর ওষ্ঠদ্বয় অসহায় কাঁপতে থাকে।

প্রাস্কোভিয়া মিখাইলোভ্না দু' হাতে নিজের শুকনো বুক চেপে ধরেন, মুখ বিস্ফারিত হয়ে যায়, চোখের তারা একদৃষ্টে নিবদ্ধ থাকে মুসাফিরের মুখে।

'অসম্ভব! স্তেপা! সিয়েগির্! ফাদার সিয়েগির্।'

'হ্যাঁ, ঠিকই দেখছ,' অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে সিয়েগির্ বলে ওঠেন, 'কেবল শুধু ঐ সিয়েগির্ নয়, ফাদার সিয়েগির্ নয়। বলো, মহাপাপী

স্তেপান কাসাৎস্কি, উচ্ছন্নে যাওয়া মহাপাপী। তাড়িয়ে দিও না, আমায় একটু সাহায্য করো।'

'আরে ছিঃ ছিঃ, এ সব বলে না! হে ঈশ্বর, নিজেকে এইভাবে বিলিয়ে দিয়েছেন আপনি? আসুন আসুন, ভিতরে আসুন।'

হাত বাড়িয়ে দেন তিনি, কিন্তু সিয়েগি তা ধরেন না, তাঁর পিছুপিছু যেতে থাকেন।

এখন কোথায় রাখা যায় এঁকে? ঘর এত ছোটো। আগে একটা খুপরির মতো ঘর ছিল তাঁর, ছোট্টো ভাঁড়ারঘর যেমন হয়, পরে সেটা মেয়েকে দিয়ে দিয়েছেন। ওখানে এখন মাশা, কোলেরটাকে দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে।

'বসুন এখানে, এই মিনিটখানেক,' রান্নাঘরের একটা বেঞ্চি দেখিয়ে দেন সিয়েগিকে।

তৎক্ষণাৎ বসে পড়েন সিয়েগি, কাঁধে-ঝোলানো থলি নামিয়ে রাখেন — স্পষ্টতঃই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন এতে — প্রথমে এক কাঁধ থেকে, পরে অন্যটা থেকে খুলে।

'হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, কীভাবেই না বিলিয়ে দিয়েছেন নিজেকে! হায়, হায়! কী খ্যাতি-প্রতিপত্তি, আর হঠাৎ একেবারে...'

সিয়েগি কোনো উত্তর দেন না, ঝোলাটা নিজের পাশে নামিয়ে রাখতে রাখতে শুধু একটু মৃদু হাসেন।

'মাশা, জানিস কে এসেছেন?'

অতঃপর প্রাস্কোভিয়া মিখাইলোভ্‌না ফিসফিস করে সিয়েগি যে কে তা বলে যান, এবং উভয়ে মিলে মাশার খাট, বাচ্চার বিছানা সব বের করে আনেন ঘরটা থেকে, সিয়েগির জন্য ফাঁকা করে দেন ঐ ছোট্টো খুপরিটা। তারপর সিয়েগিকে সেখানে নিয়ে আসেন প্রাস্কোভিয়া মিখাইলোভ্‌না।

'এবার একটু বিশ্রাম করুন। মাফ করবেন, এত ছোটো ঘর। আমাকে এবার একটু যেতে হবে।'

'কোথায়?'

'পড়ানো আছে, আপনাকে বলতে লজ্জাই হচ্ছে — আমি যে গান শেখাই।'

'গান? খুব ভালো। হ্যাঁ, শুধু একটা কথা। প্রাস্কোভিয়া মিখাইলোভ্না, আমি খুব একটা কাজে আপনার কাছে এসেছি। আমার সঙ্গে কখন আপনার একটু কথা বলার সময় হবে?'

'এ যে আমার কী সৌভাগ্য! সন্ধ্যেয় হলে চলে?'

'চলে, চলে। শুধু একটা অনুরোধ: আমি কে কাউকে যেন বলবেন না। একমাত্র আপনার কাছেই মন খুলে সব বলেছি। কেউ জানে না আমি কোথায় গেছি। দরকার ছিল এ রকম করা।'

'হায়, হায়, আমি যে মেয়েকে বলে ফেলেছি।'

'কী করা! বলে দিন, সে যেন আবার কাউকে না বলে।'

সিয়েগি জুতো খুলে শুয়ে পড়েন এবং তৎক্ষণাৎ, বিনিদ্র রজনী ও চল্লিশ ভের্স্তা রাস্তা হাঁটার পর, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েন।

প্রাস্কোভিয়া মিখাইলোভ্না যখন ফিরে এলেন তখনো সিয়েগি তাঁর ছোট্টো কুঠরিতে বসে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন। দুপুরের খাবার খেতেও তিনি ঘর থেকে বেরোন নি, কেবল লুকেরিয়া যে একটু সুপ ও পায়েস এনেছিল তাই খেয়েছিলেন।

'যা বলে গিয়েছিলে তার চেয়ে আগে ফিরে এলে যে?' সিয়েগি জিজ্ঞাসা করেন, 'এখন তাহলে কথাবার্তা শুরু করা যাক, নাকি?'

'কী আমি করেছি যার জন্যে আজ আমার এই সৌভাগ্য, এই রকম অতিথি আজ আমার ঘরে? আমি একটা ক্লাস না নিয়েই চলে এসেছি। পরে দেখব'খন ও... কদ্দিন ধরে ভাবছি আপনাকে দেখতে যাব, একটা চিঠিও লিখেছি, তারপর হঠাৎ কি না এই সৌভাগ্য!'

'পাশেন্কা! শোনো, যে সব কথা তোমাকে এখন বলতে যাচ্ছি, মনে রেখো এ আমার স্বীকারোক্তি, লোকে মৃত্যুর সময় ঈশ্বরের কাছে যেমন স্বীকারোক্তি করে সে রকম। পাশেন্কা, আমি সাধু-সন্ত নই, এমন কি সরল সাধারণ মানুষ পর্যন্ত নই: আমি পাপী, নোংরা, বদমাইশ, পথভ্রষ্ট, অহংকারী এক পাপী, না — আরো খারাপ, জানি না পৃথিবীর সকলের চেয়ে খারাপ কিনা, তবে সবচেয়ে খারাপ লোকের চেয়েও খারাপ।'

পাশেন্কা প্রথমে চোখ বড়ো বড়ো করে শুনে যাচ্ছিলেন, তিনি সবই বিশ্বাস করছিলেন। পরে সমস্ত ব্যাপারটা যখন বিশ্বাস্য মনে হল তাঁর, তখন হাত রাখলেন সিয়েগির্র হাতে, করুণভাবে হাসলেন একটু, বললেন:

'স্তিভা,* তুমি হয়তো বাড়িয়ে বলছ।'

'না, পাশেন্কা। আমি ব্যভিচারী, আমি খুনী, আমি ঈশ্বরদ্বেষী, প্রতারক।'

'হে ঈশ্বর! এ কী বলছেন আপনি?' প্রাস্কোভিয়া মিখাইলোভ্না বিড়বিড় করে ওঠেন।

'কিন্তু বেঁচে থাকতে তো হবে। আর আমি, যে কিনা ভেবেছে সব জেনে বসে আছি, কীভাবে বাঁচতে হবে এমন কি অন্যকে

স্তেপানকেই আদর করে বলা, ডাকনাম। — সম্পাঃ

শিখিয়েছে, সে আমি আসলে কিছু জানি না ; তোমার কাছে এসেছি আমি, তুমি শেখাও।'

'কী, বলছ কী স্তিভা! তুমি হাসছ মনে মনে। লোকে সব সময় কেন আমাকে নিয়ে মজা করে?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, হাসছিই না হয়; তুমি কেবল একটা কথা আমাকে বলো — কীভাবে তুমি জীবন কাটাচ্ছ, কীভাবে তুমি কাটিয়ে এলে এতদিন?'

'আমি? আমি সবচেয়ে কদর্যভাবে, জঘন্যভাবে জীবন কাটিয়েছি। আজ ভগবান তার শাস্তি দিচ্ছেন, ঠিকই করছেন; বেঁচে আছি, সে যে কী বিশ্রীভাবে, কী বিশ্রী...'

'তোমার বিয়ে-থা হয়েছিল কীভাবে? তোমাদের দাম্পত্য জীবন কেমন ছিল?'

'সব, সবই বিশ্রী। বিয়ে হল, মানে — প্রেমে পড়েছিলাম, তাও বাজে লোকদের মতো। বাবা রাজী ছিলেন না। আমি কোনো দিকে তাকাই নি, বিয়ে করে বসলাম। আর বিয়ের পর স্বামীকে কোথায় সাহায্য করব, সে জায়গায় হিংসা করে করে তাকে আমি জ্বালিয়ে মেরেছি — এই একটা জিনিস যাকে আমি বশ মানাতে পারি নি।'

'সে খুব মদ খেত বলে শুনেছি।'

'তা ঠিক, কিন্তু আমি তো তাকে কোনো শান্তি দিতে পারি নি। সব সময় খোঁটা দিয়েছি। অথচ, দেখো না, এটা তো একটা অসুখ। ওটা ছাড়া তার চলত না, অথচ আমি — এখন সব মনে পড়ে — কীভাবেই না আমি সেগুলো তার নাগালের বাইরে রাখতাম। যে সব কেলেঙ্কারি হত আমাদের মধ্যে তা মর্মান্তিক।'

অতঃপর কাসাৎস্কির ওপর নিবদ্ধ তাঁর সুন্দর আঁখি স্মৃতিতে যন্ত্রণাকাতর হয়ে উঠল।

কাসাৎস্কির মনে পড়ে যায়, স্বামী যে পাশেন্‌কাকে কী রকম মারধর করত সে কথা লোকমুখে তিনি জানতে পেতেন। আর এখন কাসাৎস্কি তাঁর সেই শীর্ণ শুষ্ক কণ্ঠদেশ, কানের পিছনে ফুলে ওঠা শির, মাথায় আধ-পাকা পাতলা একগুছি চুলের ঝুঁটি — এ সবের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মনে সব যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন যেভাবে যা কিছু ঘটেছিল সব।

'পরে তো দুটি বাচ্চা নিয়ে একা পড়ে রইলাম আমি, একেবারে সহায়-সম্বলহীন।'

'কিন্তু তোমাদের তো কিছু জমিজমা ছিল।'

'ভাসিয়া যখন বেঁচে তখনই তো ওগুলো বিক্রী করে ফেলা হয়, স-ব... সবই পেটে গেছে। অথচ বেঁচে থাকতে হল, এদিকে নিজে কিচ্ছুটি করতে জানি না — আমরা সব ধনীদুলালী তো এ রকম। তবে আমার অবস্থাটা ছিল আরো খারাপ, একেবারে সহায়হীন। যাই হোক, উচ্ছিষ্ট যা একটু-আধটু পড়েছিল তাতেই কোনো রকমে টিকে রইলাম, বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখালাম, সেই সঙ্গে নিজেও সামান্য শিখলাম। তারপর তো ক্লাস ফোরে পড়ার সময় অসুখে পড়ল মিতিয়া, ভগবানই তাকে নিলেন। মানেচ্‌কা* প্রেমে পড়ল ভানিয়ার — মানে, আমার জামাতার। কী করা ছেলেটা ভালোমানুষ, — কেবল বড়ো অসুখী। অসুস্থ মানুষ।'

'মা,' মেয়ের ডাকে কথায় বাধা পড়ে, 'মিশাকে একটু ধরো, আর টানতে পারি না বাপু সব।'

* মেয়ে মাশাকেই আদর করে ডাকা হচ্ছে 'মানেচ্‌কা' বলে। — সম্পাঃ

প্রাস্কোভিয়া মিখাইলোভ্‌না চমকে ওঠেন, উঠে দাঁড়ান, হেঁটে যান অতি দ্রুত, পায়ে পুরনো তলা-ক্ষয়ে-যাওয়া জুতো, দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান, কিন্তু তখনই আবার ফিরে আসেন কোলে দু'বছরের একটি শিশু নিয়ে — সে, শিশুটি, তাঁর কাঁধের ওপর পড়ে আছে, ছোটো ছোটো দুটি হাত দিয়ে দিদিমার মাথার রুমাল টানাটানি করে।

'কোন্‌খানে যেন থেমেছিলাম? হ্যাঁ, মনে পড়েছে — খুব ভালো চাকরী করছিল জামাতা, অফিসের বড়ো বাবু, মনটা খুব দরদী। হলে কি হয়, ভানিয়া আর চাকরী করতে পারল না, অবসর নিতে বাধ্য হল।'

'তার অসুখটা কী?'

'নিউরেস্‌থেনিয়া। খুব খারাপ অসুখ। চিকিৎসা, পরামর্শ অনেক করেছি, আসলে দূরে যাওয়া দরকার, কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায়, কিন্তু সামর্থ যে নেই। তবু, আমার খুব আশা রোগটা ধীরে ধীরে হয়তো চলে যাবে। বিশেষ কোনো জ্বালাযন্ত্রণা যে আছে তা নয়, কেবল...'

'লুকেরিয়া!' ভানিয়ার গলা শোনা যায়, রাগান্বিত, দুর্বল কণ্ঠ, 'যখনই দরকার তখনই দ্যাখো কোথাও না কোথাও পাঠাচ্ছে। মা!..'

'এই যে আসছি,' কথা রেখে ফের দৌড়োন প্রাস্কোভিয়া মিখাইলোভ্‌না, 'দুপুরে তো এখনও খায় নি। ও আবার আমাদের সাথে একসঙ্গে বসে খেতে পারে না।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান তিনি, এটা-ওটা কি যেন করেন সেখানে, সরু রোগা রোদে-পোড়া হাত মুছতে মুছতে ফিরে আসেন।

'এই তো, এইভাবেই বেঁচে আছি। সবকিছুতেই আপত্তি, খুঁতখুঁতি, কিছুতেই আর খুশী নই আমরা। তবে ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমার নাতি-নাতনীগুলো খাসা, অসুখবিসুখ বড়ো একটা নেই; কেটে যাচ্ছে জীবন, খারাপ আর কি? যাক্‌গে, নিজেকে নিয়েই খালি বকবক করছি!'

'কিন্তু তোমাদের চলে কী করে?'

'কেন, আমি তো যাহোক অল্পসল্প উপায় করি। গানবাজনা কখনও আমার তেমন ভালো লাগে নি, অথচ এখন দেখো সেটাই আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে।'

ছোটো একটা দেরাজ-আলমারীর কাছে বসে বসে তিনি কথা বলছিলেন, রোগা-পটকা ছোটো হাতখানি তার ওপরে রাখা, সরুসরু আঙ্গুল নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন, ঠিক যেন কোন গৎ বাজাচ্ছেন।

'গানের ক্লাশ নেওয়ার জন্যে লোকে কী রকম দেয়?'

'এক রুবল, পঞ্চাশ কোপেক, কেউ কেউ তিরিশও দেয়। তারা সবাই আমার ওপর এতো সদয়।'

'তা না হয় হল, কিন্তু তাদের উন্নতি কী রকম?' জিজ্ঞাসা করেন কাসাৎস্কি, চোখে যেন ক্ষীণ হাসির আভা দেখা গেল।

প্রাস্কোভিয়া মিখাইলোভ্‌না প্রশ্নটার গুরুত্ব সঙ্গে সঙ্গে ঠিক বুঝতে পারেন নি, জিজ্ঞাসাপূর্ণ দৃষ্টিতে সিয়েগির্র মুখের দিকে তাকালেন।

'উন্নতি, হ্যাঁ উন্নতি করে বৈ কি। একটা মেয়ে তো খুবই ভালো, কসাইয়ের মেয়ে। মনটা খুব ভালো, চমৎকার মেয়ে। আমার যদি সত্যিই বুদ্ধি-আক্কেল চালচুলো কিছু থাকত তো মনে হয় বাবার চেনাজানা লোকদের ধরে-টরে জামাতটার জন্যে একটা হয়তো কিছু

জোগাড় করতে পারতাম। কিন্তু আমি তো একেবারে অযোগ্য, সকলকেই কী অবস্থায় টেনে এনেছি দেখো।'

'বুঝলাম, সবই বুঝলাম,' কাসাৎস্কি মাথা হেঁট করে বিড়বিড় করে ওঠেন। 'ঠিক আছে; আচ্ছা, পাশেন্‌কা, গির্জেয়টির্জেয় যাওয়া, ধম্মকম্ম এগুলো কী ঠিক মতো করো?'

'সে কথা আর বলো না, খুবই খারাপ কথা, কীভাবে যে এ সব অবহেলা করি বলবার নয়। পর্ব পার্বণে উপবাস করি, গির্জাতেও যাই কখনোসখনো, আবার মাসের পর মাস যাই না। ছেলেপিলেগুলোকে পাঠাই।'

'কিন্তু নিজে তুমি যাও না কেন?'

'সত্যি কথা বলতে,' তিনি রাঙা হয়ে ওঠেন, 'মেয়ে, নাতিনাতনী, এদের সাথে ছেঁড়া জামাকাপড়ে যেতে লজ্জা লাগে, নতুন কাপড়জামা তো নেই। তাছাড়া আসলে আমি খুব অলস।'

'তাহলে ঘরে নিশ্চয়ই প্রার্থনা করো?'

'প্রার্থনা করি, তাকে কী আর প্রার্থনা বলে, যন্ত্রের মতো করে যাই আর কি। বুঝি যে এ রকম করা ঠিক নয়, কিন্তু আমার যে সে রকম কোনো অনুভূতি হয় না, যেটা হয় তা হল — নিজের যা কিছু নোংরা, তাই শুধু মনে পড়ে...'

'হুঁ, ব্যাপারটা তাহলে এই, বুঝলাম,' যেন তিনি সায় দেন এভাবে অস্ফুটে মনে মনে বলে ওঠেন কাসাৎস্কি।

'এই যে, আসছি, এক্ষুনি আসছি,' জামাতার ডাকে সাড়া দিয়ে ওঠেন, তারপর মাথার চুল ঠিক করতে বেরিয়ে যান ঘর থেকে।

এবার বহুক্ষণ ধরে তিনি আর ফিরে আসেন না। যখন ফিরলেন তখনও কাসাৎস্কি তেমনিভাবে বসে আছেন হাঁটুর ওপর কনুইয়ে

ভর দিয়ে, মাথা নীচু করে। কিন্তু তাঁর ঝোলাটা এবারে তাঁর পিঠে।

মাথায় শেড ছাড়া টিনের একটা কুপি নিয়ে যখন তিনি ঘরে এলেন কাসাংৎস্কি তাঁর ক্লান্ত, সুন্দর চোখ তুলে একবার তাকালেন পাশেন্‌কার দিকে, গভীর, গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'আপনি কে, আমি ওদের বলি নি,' ভয়ে ভয়ে তিনি বলেন, 'শুধু বলেছি, সম্ভ্রান্তঘরের এক তীর্থযাত্রী, আমার চেনাশোনা একজন। খাবার ঘরে একটু চলুন, চা খাবেন।'

'না...'

'তাহলে এখানে নিয়ে আসি।'

'না, কিচ্ছুটি দরকার নেই। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবেন, পাশেন্‌কা। আমি চলি। যদি আমার জন্যে মায়া হয়, বলি — আমাকে যে দেখেছ কাউকে এ কথা বলো না। ঈশ্বরের নামে আমি মিনতি করছি: কাউকে বলো না। অশেষ ধন্যবাদ তোমায়। তোমার পা জড়িয়ে ধরতাম এখন, কিন্তু জানি অপ্রস্তুত হয়ে যাবে। ধন্যবাদ তোমাকে, যীশুর নামে আমাকে মাফ করে দিও।'

'আমাকে আপনি আশীর্বাদ করে যান।'

'ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করবেন। যীশুর নামে আমাকে মাফ করে দিও।'

এবং তিনি চলেই যাচ্ছিলেন, কিন্তু প্রাস্কোভিয়া মিখাইলোভ্‌না ছাড়লেন না তাঁকে, রুটি, শক্ত টোস্ট বিস্কুট আর মাখন এনে দিলেন। সব গ্রহণ করলেন সিয়েগির্, তারপর চলে গেলেন।

তখন অন্ধকার, দুটো বাড়ীও তিনি পার হন নি, পাশেন্‌কা আর তাঁকে দেখতে পেলেন না, কিন্তু তিনি যে যাচ্ছেন তা শুধু বুঝলেন পাদ্রীবাড়ির কুকুরটা তাঁকে দেখে চেঁচাচ্ছিল বলে।

''এই তাহলে আমার স্বপ্নের অর্থ। পাশেন্‌কা হলো তাই যা আমার হওয়া উচিৎ ছিল। ঈশ্বরের অজুহাত দিয়ে আমি আসলে বেঁচে ছিলাম মানুষের জন্যে; আর ও যদিও ভাবছে, বেঁচে আছে মানুষের জন্যে, আসলে কিন্তু ঈশ্বরের জন্যেই সে বেঁচে রয়েছে। একটা সৎ কাজ, প্রতিদানের কথা না ভেবে তৃষার্তকে এক গেলাস জল আগিয়ে দেওয়াও আমি খ্যাতিলোভে যতকিছু করেছি তার চেয়ে অনেক বেশি প্রিয় ঈশ্বরের কাছে। কিন্তু ঈশ্বরসেবার কোনো সত্যিকার বাসনা একটুও কি ছিল না আমার মধ্যে?'' নিজেকেই প্রশ্ন করেন তিনি; উত্তর পান: ''হ্যাঁ, ছিল; কিন্তু জনখ্যাতি লাভের বাসনায় তা কলুষিত হয়েছিল। ঠিকই, আমার মতো যে লোকজনের কাছে যশ পাওয়ার জন্যে বেঁচে থাকে তার তো ঈশ্বর থাকতে পারে না। এবার আমার তাকে খুঁজে ফেরার পালা।''

অতঃপর তিনি চলতে থাকেন, যেমন এসেছিলেন পাশেন্‌কার কাছে, তেমনি গ্রাম হতে গ্রামান্তরে শুরু হয় তাঁর প্রব্রজ্যা, কখনো পুরুষ ও নারী তীর্থযাত্রীদের দলে ভিড়ে যান, কখনো একাকী, প্রভু যীশুর নামে এক টুকরো রুটি চান, কখনো বা একটু আশ্রয়। হয়তো বা কখনো বদমেজাজী কোনো গৃহবধূ তাঁকে মুখ ঝামটা দ্যায়, গৃহস্থ চাষী কেউ কেউ বা মদের ঘোরে গালিগালাজও করে, তবু বেশির ভাগ সময়েই তিনি অন্নজল ও আশ্রয় পান, এমন কি পথচলার পাথেয়ও কখনো-কখনো। তাঁর অভিজাত চেহারায় আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই তাঁর উপকার করে। অনেকে আবার ঠিক উল্টো, বড়ো ঘরের ছেলে গরীব ভিখিরি হয়ে গেছে দেখে খুশি হয়। কিন্তু তাঁর নম্র অমায়িকতা সকলেরই মন জয় করে নেয়।

কোনো বাড়িতে বাইবেল দেখলে প্রায়শঃই তিনি পাঠ করে শোনান, আর লোকজন সর্বত্র সব সময়েই অভিভূত হয়ে যায় তা শুনে, করুণায় দ্রবীভূত হয় — যদিও কত পুরাতন, তবুও শুনতে শুনতে নতুন হয়ে ওঠে পুণ্যগ্রন্থ।

কাউকে কোনো উপদেশ-পরামর্শ দান, কি অশিক্ষিত লোকজনকে লিখে-পড়ে দেয়া কিছু, ঝগড়াঝাঁটি মধ্যস্থতা করে মিটিয়ে দেয়া ইত্যাদি কোনো রকমে সাহায্য করার যদি কোনো সুযোগ তিনি পান তাহলে সানন্দে করেন, কিন্তু তাদের কৃতজ্ঞতা শোনার পূর্বেই সেখান থেকে এক ফাঁকে সরে পড়েন। আর এভাবেই, অতি ধীরে, তিনি তাঁর ঈশ্বরকে খুঁজে পাচ্ছিলেন নিজের মধ্যে।

দুই বৃদ্ধা ও এক ফৌজী লোকের সাথে পথ চলছিলেন তিনি। সুন্দর ছটফটে ঘোড়া জোতা এক ঘোড়গাড়িতে জনৈক অভিজাত তদ্রলোক ও মহিলা, আর দু' ঘোড়ার পিঠে অশ্বারোহী এক পুরুষ ও নারী তাঁদের পথ রোধ করেন। গাড়ির আরোহিণী মহিলাটির স্বামী ও কন্যা অশ্বপৃষ্ঠে যাচ্ছিলেন, অন্য পুরুষটি গাড়ি মধ্যে, দেখে মনে হচ্ছিল কোনো ফরাসী পর্যটক হবেন।

তাঁরা যে পরিব্রাজকদের থামিয়ে দিলেন, সে শুধু ফরাসী ভদ্রলোককে les pélerins*, মানে — কাজ করার বদলে স্থান থেকে স্থানান্তরে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ানোর যে কুসংস্কার রুশ জনগণের মজ্জাগত, তা দেখাবেন বলে।

* তীর্থযাত্রী (ফরাসী ভাষায়)।

তাঁরা কথা বলছিলেন ফরাসীতে, ভেবে নিয়েছিলেন — এরা কেউ বুঝবে না।

'Demandez leur,' ফরাসীটি বলে ওঠেন, 's'ils sont bien sûrs de ce que leur pélérinage est agréable à dieu.'*

জিজ্ঞাসা পরিব্রাজকদের প্রতি। বৃদ্ধাদ্বয় উত্তর দেয়:

'ঈশ্বর যেমনভাবে নেবেন। পায়ের কাজ তো পা করে যাচ্ছে, অন্তরটাও হয়তো এক সময় সেখানে পেঁছুবে।'

ফৌজী লোকটাকেও জিজ্ঞাসা করা হল। সে বলল, পৃথিবীতে সে একা, মাথা গোঁজার কোনো ঠাঁই নেই।

কাসাৎস্কিকে প্রশ্ন করা হল, তিনি কে?

'ঈশ্বরের দাস।'

'Qu'est ce qu'il dit? Il ne répond pas.'**

'Il dit qu'il est un serviteur de dieu.'***

'Cela doit être un fils de prêtre. Il a de la race. Aver vous de la petite monnaie?'****

ফরাসী ভদ্রলোক পকেট হাৎড়ে কিছু পয়সা খুঁজে পেলেন। প্রত্যেককে বিশ কোপেক করে বিলি করলেন।

'Mais dites leur que ce n'est pas pour des cierges que je leur donne, mais pour qu'ils se

* জিজ্ঞাসা করুন তো ওরা কি নিশ্চিত যে তাদের তীর্থযাত্রায় ঈশ্বর খুশি হবেন (ফরাসী ভাষায়)।

** কী বলল? উত্তর দিল না তো (ফরাসী ভাষায়)।

*** ও বলছে, ও ঈশ্বরের দাস (ফরাসী ভাষায়)।

**** কোনো পাদ্রীর ছেলে হবে হয়তো। ভালো ঘরের ছেলে। আপনার কাছে খুচরোখাচরা কিছু আছে? (ফরাসী ভাষায়)।

régalent de thé;* চা, চা,' হেসে ওঠেন ভদ্রলোক, 'pour vous, mon vieux,'** দস্তানা-পরা হাত দিয়ে কাসাৎস্কির পিঠ চাপড়ে তাঁর কথা শেষ করলেন।

'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন,' কাসাৎস্কি মাথা থেকে টুপি খুলে, খলিতকেশ শূন্য মস্তক নমিত করে উত্তর দেন।

এই দেখাসাক্ষাতে বিশেষভাবে খুশি হয়েছিলেন কাসাৎস্কি, কেননা লোকে তাঁর সম্পর্কে কী ভাবছে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হতে পেরেছিলেন তিনি, সবচেয়ে সহজ-সরল, স্বাভাবিক আচরণ করতে পেরেছিলেন, নম্র বিনয়ে ঐ বিশটি কোপেক গ্রহণ করেছিলেন, পরে তাঁরই সহগামী এক অন্ধ ভিক্ষুককে দিয়ে দেন। লোকে কী ভাবছে সে বিষয়ে তাঁর মনোযোগ যত কমে এল, তত গভীরভাবে তিনি অনুভব করতে লাগলেন তাঁর ঈশ্বরকে।

আট মাস এইভাবে পথে পথে কাটালেন কাসাৎস্কি। নবম মাসে একটা জেলাসহরে, একটা আস্তানায় যেখানে রাত কাটিয়েছিলেন তিনি অন্যান্য মুসাফিরদের সাথে, সেখানে তাঁকে আটক করা হল, কেননা তাঁর কোনো শনাক্তপত্র*** ছিল না। তাঁর কাগজপত্র কই, কে তিনি — এ সব প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, তাঁর পাসপোর্ট নেই এবং ঈশ্বরের দাস তিনি। ভবঘুরে বদমাইশ হিসেবে তাঁর

* কিন্তু ওদের বলে দিন, মোমবাতি কেনার জন্যে আমি দিচ্ছি না এ দিয়ে ওরা চা খাবে (ফরাসী ভাষায়)।

** তোমার জন্যে, বুড়ো দাদু (ফরাসী ভাষায়)।

*** জার আমলের রাশিয়াতে সহরে প্রতি লোকের কাছে তার আভ্যন্তরীণ 'পাসপোর্ট', বা আইডেণ্টিটি কার্ড থাকত। প্রশাসনিক ও আইনশৃঙ্খলাগত সুবিধার জন্য এ প্রথা চালু করা হয়। এ নিয়ম এখনো সোভিয়েত ইউনিয়নে বর্তমান। — সম্পাঃ

বিচার হয় এবং দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি স্বরূপ সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠানো হয়।

সাইবেরিয়ায় এক ধনী চাষীর ক্ষেতেখামারে তিনি কাজ করতে থাকেন। এখনো সেখানেই আছেন। তাঁর মনিবের বাগানে কাজ করেন, গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখান, সেবা করেন অসুস্থ লোকজনদের।

১৮৯৮

রত্ন-লাভের পর



'তাহলে আপনারা বলছেন ভালোমন্দের স্বাধীন বিচারশক্তি মানুষের নেই, সব হচ্ছে পরিবেশের ব্যাপার, মানুষ পরিবেশের ক্রীড়নক। কিন্তু আমার মনে হয় সব হল দৈবের হাতে। নিজের বিষয়ে বলি শুনুন...'

বললেন আমাদের সকলের মাননীয় বন্ধু ইভান ভাসিলিয়েভিচ একটি আলোচনার উপসংহারে। ব্যক্তির উন্নয়নের জন্য আগে দরকার পরিবেশ বদলানো, যে অবস্থায় লোকে আছে সে অবস্থাটা বদলানো, এই নিয়ে চলেছিল আমাদের কথাবার্তা। সত্যি বলতে, ভালো বা মন্দের বিচারশক্তি অসম্ভব — এমন কথা কেউ বলে নি, কিন্তু ইভান ভাসিলিয়েভিচের অভ্যেস ছিল, আলোচনা প্রসঙ্গে নিজের মনেই যে সব ভাবনা উঠেছে তারই জবাব দেওয়া এবং সেই উপলক্ষে নিজের জীবনের নানা ঘটনার কথা বলা। মাঝে মাঝে গল্পতে তিনি এত মত্ত হয়ে যেতেন যে কেন বলছেন মনে থাকত না, বিশেষ করে এজন্য যে তিনি সর্বদা গল্প বলতেন গভীর আন্তরিকতায় ও সততায়।

এবারেও তিনি তাই করলেন।

'আমার কথা বলি। ওভাবে নয়, আমার সারা জীবনটাই গড়ে উঠেছে অন্যভাবে — পরিবেশের দরুন নয়, সম্পূর্ণ অন্য কিছুর ফলে।'

'কিসের ফলে?' আমরা শুধালাম।

'সে অনেক কথা। বুঝতে গেলে অনেক কিছু বলতে হয়।'

'বলুন না শুনি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মুহূর্তখানেক ভেবে নিলেন ইভান ভাসিলিয়েভিচ।

'হ্যাঁ, তিনি বললেন, 'একটা রাত্রি, বরং একটা সকাল — আমার জীবনে আমূল পরিবর্তন আনে।'

'কি হয়েছিল?'

'হয়েছিল কি — দারুণ প্রেমে পড়েছিলাম। অনেকবার প্রেমে পড়েছি, কিন্তু এমন গভীরভাবে নয়। অনেক দিন আগেকার কথা — ওর মেয়েদের এদ্দিনে বিয়ে-থা হয়ে গিয়েছে। ওর নাম ব., ভারেঙ্কা ব...' মহিলার পদবীটা বললেন ইভান ভাসিলিয়েভিচ। 'পঞ্চাশেও ওর চেহারা ছিল তাকিয়ে দেখার মতো, কিন্তু যৌবনে, আঠারো বছর বয়সে ও ছিল মোহিনী: দীর্ঘাঙ্গী সুঠাম লাবণ্যময়ী, গরীয়ান, রাণীর মতো, হ্যাঁ, ঠিক রাণীর মতো। ভঙ্গিটা ছিল একেবারে খাড়া হয়ে, যেন খাড়া না হয়ে সে পারেই না। মাথাটা থাকত একটু পিছনে হেলানো। রোগা বলতে হাড্ডিসার হলেও এটা তার দীর্ঘাকৃতি ও রূপের সঙ্গে মিলে চেহারায় এমন একটা রাণীর মতো ভাব আনত যে লোকে সভয়ে পিছিয়েই যেত যদি না তার হাসিটা হত এত উচ্ছল, মনভোলানো, চোখদুটো এত দীপ্ত অপরূপ, যদি না তার যৌবনোচ্ছল সত্তায় থাকত এত মোহ।'

'ইভান ভাসিলিয়েভিচ বর্ণনা দিতে পারেন বটে।'

'যতই বর্ণনা দিই, আপনাদের বোঝাতে পারব না সে দেখতে কেমন ছিল। তবে সেটা অন্য কথা। যে ঘটনাটার কথা বলছি সেটা ঘটে পঞ্চম দশকে। প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন। জানি না ভালো কি মন্দ, কিন্তু সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের না ছিল

কোন পাঠচক্র না ছিল মতবাদের বালাই; আমরা ছিলাম শুধু নওজোয়ান আর থাকতাম ঠিক জোয়ানদের মতো, পড়াশুনো করতাম আর ফুর্তি চালাতাম। অত্যন্ত ফুর্তিবাজ ও তুখোড় ছোকরা ছিলাম আমি — তারপর পয়সাকড়ি ছিল মন্দ নয়। একটা তেজী ঘোড়ার মালিক, মেয়েদের নিয়ে শ্লেজে চেপে পাহাড় গড়িয়ে নামতাম (স্কেটিং-এর রেওয়াজ তখনো আসে নি); বন্ধুদের সঙ্গে যেতাম মদের আড্ডায় (সে সব দিনে শ্যাম্পেন ছাড়া কিছু ছুঁতাম না; পকেটে পয়সা না থাকলে কিছুই খেতাম না, আজকালকার মতো ভোদকা চলত না আমাদের); কিন্তু আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস ছিল পার্টি আর বল-নাচ। নাচতাম ভালোই, চেহারাটাও কুৎসিত ছিল না।'

'থাক, আর বিনয় করবেন না,' এক ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন। 'আপনার ফোটো আমরা সবাই দেখেছি। খারাপ কেন, চেহারাটি খাসা ছিল আপনার।'

'হয়ত ছিল, কিন্তু কথাটা ওটা নিয়ে নয়। কথাটা হল, আমার সে সময় হাবুডুবু প্রেম। শ্রোভটাইডের শেষ দিনে গেছি একটা বল-নাচে মার্শালের ওখানে, বৃদ্ধটি দিলদরাজ, ধনী, অতিথি আপ্যায়ন করতে ভালোবাসতেন। তাঁর স্ত্রী ঠিক স্বামীর মতো অমায়িকভাবে অতিথিদের অভ্যর্থনা করলেন। পরনে মখমলের গাউন, মাথায় হীরের টায়রা, বার্ধক্যের ছাপ লাগা গোলগাল শাদা গলা আর কাঁধ খোলা, মহারাণী ইয়েলিজাভেতা পেত্রোভ্‌নার ছবির মতন। অপরূপ নাচের আসর। হলঘরটি সুন্দর, ঘরের ভিতরে ব্যালকনিতে বাজনদাররা, তারা সে সময়কার সঙ্গীতপ্রিয় এক জমিদারের নামকরা ভূমিদাসদল। খাদ্যের অভাব নেই, শ্যাম্পেনের স্রোত বইল। শ্যাম্পেনের বড়ো অনুরাগী হলেও খেলাম না — বিনা মদেই আমি

তখন প্রেমের নেশায় মশগুল। কিন্তু নাচে বিরাম দিই নি, নাচতে নাচতে পড়ে যাবার মতো দশা। কোয়াড্রিল নাচলাম, নাচলাম ওয়াল্‌জ্‌ আর পলোনেজ্‌, আর বলা বাহুল্য যতটা পারি নাচলাম কেবলি ভারেঙ্কার সঙ্গে। তার গায়ে গোলাপী ফেটি-দেওয়া শাদা পোষাক, হাতে নরম চামড়ার লম্বা দস্তানা সরু ছুঁচলো কনুই পর্যন্ত ঠিক পেঁছয় নি, পায়ে শাদা সাটিনের জুতো। আনিসিমভ নামে হতচ্ছাড়া ইঞ্জিনিয়র আমাকে ফাঁকি দিয়ে একটা মাজুরকা নাচল ওর সঙ্গে। এখন পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করি নি সেজন্য। কেশ পরিচারকের কাছে দস্তানা নিতে গিয়ে দেরী হয়ে গিয়েছিল, নাচের ঘরে ভারেঙ্কা ঢোকামাত্র আনিসিমভ ওকে নাচতে বলল। তাই ওর সঙ্গে না নেচে মাজুরকাটা নাচতে হল একটি জার্মান মেয়ের সঙ্গে, তার ওপর এক সময়ে আমার একটু ঝোঁক হয়েছিল। কিন্তু মনে হচ্ছে সে সন্ধ্যায় তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করি নি, কথা বলি নি, তাকাই নি পর্যন্ত তার দিকে, আমার চোখজোড়া পড়ে ছিল শুধু গোলাপী ফেটি-দেওয়া শাদা পোষাক-পরা একটি দীর্ঘাঙ্গী তন্বী মেয়ের ওপর, যার টোল-পড়া গাল, উজ্জ্বল আরক্তিম মুখ, মধুর স্নিগ্ধ যার চোখ। শুধু আমি নই, সবাই তার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিল, পুরুষ — মায় মেয়েরা পর্যন্ত, যদিও ওর দীপ্তিতে সবাই হতশ্রী। মুগ্ধ না হয়ে উপায় ছিল না।

'নিয়মমতো দেখলে মাজুরকায় ও আমার জুড়ি ছিল না, কিন্তু আসলে প্রায় সব সময় নাচি ওরি সঙ্গে। ঘরের অন্যদিক থেকে ও বারবার সোজা আসে আমার কাছে অসঙ্কোচে, ডাকের অপেক্ষা না করে আমিও তাল মেলাই ওর সঙ্গে আর ও মুচকি হেসে ধন্যবাদ জানায় আমার অনুমান কৃতিত্বে। নাচের সঙ্গী বাছাই-এর সময়ে

আমার গুণ* ওর কাছে ধরা পড়ে নি, রোগা কাঁধ একটু ঝাঁকিয়ে, আমার দিকে খেদ ও সান্ত্বনার হাসি হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল অন্য একজনের দিকে।

'মাজুরকার তালে ওয়াল্‌জ্‌ শুরু হল, অনেকক্ষণ ওয়াল্‌জ্‌ নাচলাম ওর সঙ্গে, হাঁপাতে হাঁপাতে হেসে ও বলছিল, 'Encore'।** আর আমি ওর সঙ্গে ওয়াল্‌জ্‌ নাচছি তো নাচছি, শরীরের কোনো হুঁশ নেই।'

'হুঁশ ছিল না, মানে? ওর কোমর জড়িয়ে হুঁশটা বেশ প্রখর হয়েছিল মনে হচ্ছে — শুধু নিজের শরীরের নয়, ওরও,' অতিথিদের একজন বললেন।

হঠাৎ টকটকে লাল হয়ে উঠে প্রায় ধমক দিয়ে বললেন ইভান ভাসিলিয়েভিচ:

'সেটা আপনাদের, আজকালকার ছেলে ছোকরাদের হতে পারে। দেহ ছাড়া আপনারা আর কিছু দেখেন না। আমাদের দিনকালে অন্য রকম ছিল। কাউকে বেশী ভালোবাসলে অদেহী মনে হত তাকে। আজকাল আপনারা মেয়েদের পা, পায়ের গোছ ইত্যাদি বিষয়ে বেশ সচেতন সজাগ, যাদের ভালোবাসেন তাদের বিনাবস্ত্রে দেখেন, কিন্তু আমার কথা যদি বলেন, আলফঁস কার যেমন বলেছিলেন — পাকা লেখক ছিলেন তিনি — আমার প্রেমিকাকে সর্বদা দেখতাম ব্রোঞ্জের পোষাকে। বিনাবস্ত্রে দূরের কথা, আমরা চাইতাম নগ্নতাকে ঢাকতে, যেমন চেয়েছিল নোয়ার সুসন্তান। কিন্তু আপনাদের মাথায় এটা ঢুকবে না...'

---

* কোনো কোনো নাচে এক একজনে এক-একটি গুণের প্রতিম হত। — সম্পাঃ

** আবার (ফরাসী ভাষায়)।

'ওর কথায় কান দেবেন না। গল্পটা চালিয়ে যান,' বললেন আর একজন শ্রোতা।

'হ্যাঁ, বেশীর ভাগ সময়ে ওর সঙ্গে নাচলাম, সময়ের হুঁশ ছিল না। ক্লান্তিতে বাজিয়েদের হাঁফ ধরে গিয়েছে — বল-নাচোয় শেষটায় কেমন হয় জানেন তো — ওরা একটার পর একটা বাজিয়ে চলেছে কেবলি মাজুরকা; সাপারের প্রত্যাশায় ড্রয়িং-রুমের তাসের টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ছেন বাপ মায়েরা; চাকরগুলো এটা-ওটা হাতে নিয়ে এদিকে-সেদিকে ছুটোছুটি করছে। দুটো বেজে গেছে। শেষ মুহূর্তগুলোর সদ্ব্যবহার করতে হয়। ওকে আবার ডাকলাম নাচতে, আবার প্রায় একশ বারের বার ঘরময় নেচে বেড়ালাম ওর সঙ্গে।

''সাপারের পর আমার সঙ্গে কোয়াড্রিল্‌টা নাচবেন তো?' ওর বসার জায়গায় ওকে নিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম।

''নাচব বইকি, অবশ্য যদি বাড়ি যেতে না হয়,' মৃদু হেসে ও বলল।

''যেতে দেব না আপনাকে,' আমি বললাম।

''হাতপাখাটা দিন তো,' বলল ও।

''ফেরৎ দিতে হচ্ছে বলে মনে বড়ো ব্যথা পাচ্ছি,' শস্তা শাদা পাখাটা দিতে দিতে বললাম।

''আহা, ব্যথা পেতে হবে না, এই নিন,' পাখার একটা পালক ছিঁড়ে আমাকে দিয়ে ও বলল।

'পালকটা নিলাম, উচ্ছ্বাস আর কৃতজ্ঞতা জানালাম শুধু আমার চোখ দিয়ে। শুধু যে আনন্দ আর তৃপ্তি মনে তা নয়, আমি সুখী, চরম সুখী, মনটা দরাজ হয়ে গিয়েছে, আমি আর আমি নই, আমি তখন অপার্থিব কোনো প্রাণী হিংসাদ্বেষ যে জানে না, ভালো বই

মন্দ করতে পারে না। দস্তানায় পালকটা গ‍ুঁজে দাঁড়িয়ে রইলাম, ওকে ছেড়ে যাবার শক্তি নেই।

‘‘দেখছেন, ওরা বাবাকে নাচতে বলছে,’ দোরগোড়ায় গৃহকর্ত্রী ও অন্য কয়েকটি মহিলার সঙ্গে দণ্ডায়মান একটি দীর্ঘদেহ, জমকালো চেহারার ভদ্রলোককে দেখিয়ে ও বলল। ওর বাবা কর্ণেল, টিউনিকের কাঁধে রূপোর কাজ-করা।

‘হীরের টায়রা-পরা গৃহকর্ত্রী, কাঁধ যাঁর ইয়েলিজাভেতার মতো, ডেকে বললেন, ‘ভারেঙ্কা, এদিকে এসো তো!’

‘ভারেঙ্কা দরজার দিকে গেল, আমি তার পিছু পিছু।

‘‘Ma chére,* বাবাকে বলে কয়ে ও‍ঁর সঙ্গে নাচো না। দয়া করে নাচুন, পিওতর ভ্লাদিস্লাভিচ,’ কর্ণেলকে বললেন গৃহকর্ত্রী।

‘ভারেঙ্কার বাবা বেশ লম্বা আর জমকালো, চেহারাটি অত্যন্ত সুন্দর; বুড়ো হলেও বেশ তাজা। টকটকে লাল মুখে শাদা গোঁফজোড়া প্রথম নিকলাইয়ের কায়দায় পাক-দেওয়া, শাদা জুলফি নেমে এসেছে গোঁফের দিকে, রগ থেকে চুল সটান সামনে আঁচড়ানো, উজ্জ্বল চোখে আর ঠোঁটে ঠিক মেয়ের মতো স্নিগ্ধ সানন্দ হাসি। বেশ সুন্দর সুঠাম গড়ন, চওড়া বুক ফৌজী কায়দায় চেতানো, সম্মান পদকের ঘটা তত নেই, কাঁধজোড়া শক্ত, পাদুটো লম্বা আর সুগঠিত। নিকলাইয়ের রেওয়াজের, সেকেলে কায়দার অফিসার।

‘দরজার কাছে গিয়ে দুজনে শুনলাম তিনি আপত্তি করে বলছেন নাচতে ভুলে গিয়েছেন; তবু একটু হেসে বাঁ হাতে খাপসুদ্ধ তলোয়ার খুলে সেবা তৎপর একটি ছোকরাকে দিলেন, ডান হাতে সোয়েডের একটা দস্তানা চাপিয়ে — মুচকি হেসে বললেন ‘নিয়ম মাফিক চলা

* লক্ষ্মীটি (ফরাসী ভাষায়)।

চাই’ তারপর মেয়ের হাত ধরে এক চক্কর ঘোরার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ঠিক তালের অপেক্ষায় রইলেন।

‘মাজুরকার তাল শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই চট করে একটা পা ছুঁড়ে আরেক পায়ে তাল ঠুকলেন তিনি, ঘরময় ভাসতে লাগল তাঁর দীর্ঘ ভারী দেহ কখনো শান্ত মসৃণ, কখনো বা উদ্দাম সশব্দ ভঙ্গিতে। পায়ে পায়ে তাল ঠুকে। তাঁর পাশে ভাসছে ভারেঙ্কার সাবলীল শরীর। তার ছোট শাদা সাটিনের জুতো-পরা পায়ের পদপাত কখনো দীর্ঘায়িত কখনো বা সংকুচিত করে প্রায় অলক্ষ্যে তাল দিয়ে গেল সে। দুজনের প্রতিটি ভঙ্গি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল অতিথিরা। আমার যে ভাবটা হল সেটা তারিফের শুধু নয় ঘোর উচ্ছ্বাসের। মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিল কর্ণেলের বুটজোড়া। বাছুরের চামড়ায় তৈরী ভালো বুট, তবে গোড়ালি নেই, সামনের দিকটা চারকোণা, হাল ফ্যাশানী ছুঁচলো নয়। দেখে মনে হয় ব্যাটেলিয়নের মুচী বানিয়েছে বুটজোড়া। মনে হল ‘আদরের মেয়েকে সাজগোজ করিয়ে ভদ্র সমাজে আনার জন্যে সৌখিন জুতোর বদলে উনি নিজে পরেন ঘরে-তৈরী বুট,’ আর সামনে চারকোণা ওঁর বুটজোড়া দেখে বিশেষ বিচলিত লাগল। বেশ বোঝা গেল, এক কালে তিনি ভালো নাচতেন, কিন্তু শরীরটা এখন ভারী হয়ে গিয়েছে, পাদুটোর সেই তৎপরতা আর নেই বলে ক্ষিপ্র খাসা চালগুলো চেষ্টা সত্ত্বেও করে উঠতে পারছেন না। কিন্তু দুবার ঘরময় বেশ ঘুরলেন তিনি, আর পাদুটো চকিতে ছড়িয়ে দিয়ে আবার করে জোড়া লাগিয়ে, এক হাঁটুতে ভর দিয়ে, অবশ্য একটু ভারী কায়দায়, যখন খট বসে পড়লেন আর আটকে-যাওয়া স্কার্টটা ছাড়িয়ে নিয়ে মেয়ে মুচকি হেসে সাবলীলভাবে যখন পাক দিল তাঁর চারদিকে তখন সবাই সজোরে হাততালি দিয়ে উঠল। কিছুটা

চেষ্টা করে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি সস্নেহে মেয়ের মাথা চেপে চুমু খেলেন কপালে, তারপর নিয়ে এলেন আমার কাছে, ভেবেছিলেন ওর নাচের সঙ্গী আমি। জানালাম তা নয়।

''কিছু এসে যায় না তাতে; নাচুন ওর সঙ্গে,' খাপসুদ্ধ তলোয়ার বাঁধতে বাঁধতে সস্নেহে হেসে বললেন।

'বোতল থেকে এক ফোঁটা বেরুবার পর জল যেমন হুড়হুড় করে বেরিয়ে আসে, তেমনি ভারেঙ্কার ওপর ভালোবাসা আমার অন্তরের সমস্ত ভালোবাসার পথ খুলে দিল। সে সময় আমার প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়ল গোটা পৃথিবীটা। ভালোবাসলাম রাণী ইয়েলিজাভেতার মতো যাঁর বুক সেই হীরের টায়রা-পরা গৃহকর্ত্রীকে, তাঁর স্বামীকে, অতিথিদের, চাকরবাকরদের, এমন কি আনিসিমভকে, যে আমার ওপর বেজায় চটেছিল। আর চারকোণা ঘরোয়া বুট-পরা ওর বাবা, হাসিটা যাঁর ঠিক মেয়ের মতো — তাঁর প্রতি যে অনুরাগ বোধ করেছিলাম সেটা একেবারে উচ্ছ্বসিত।

'মাজুরকাটা শেষ হতে গৃহকর্তা ও কর্ত্রী সাপারের টেবিলে ডাকলেন অতিথিদের। কর্ণেল ব. অনিচ্ছা জানিয়ে বললেন খুব ভোরে উঠতে হবে তাঁকে। ভয় হল বুঝি ভারেঙ্কাকে নিয়ে যাবেন। কিন্তু ও মায়ের সঙ্গে রয়ে গেল।

'সাপারের পর প্রতিশ্রুত কোয়াড্রিল নাচলাম ওর সঙ্গে। মনে হয়েছিল এর চেয়ে বেশী সুখ আর হতে পারে না, কিন্তু সুখ আমার উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। দুজনের মধ্যে প্রেমের কথা কিছু হল না; আমাকে ভালোবাসে কিনা সে কথাটাও জিজ্ঞেস করলাম না ওকে না নিজের কাছে। ওকে ভালোবাসি, তাই যথেষ্ট। ভয় হচ্ছিল শুধু একটা, এ সুখ নষ্ট হয়ে যাবে না তো।

'বাড়ি ফিরে জামাকাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ার কথা ভাবতে গিয়ে মনে হল ঘুমোনো একেবারে অসম্ভব। আমার হাতে ওর হাতপাখার পালক, এমন কি একটা দস্তানা পর্যন্ত, গাড়িতে ওকে আর ওর মাকে তুলে দেবার সময়ে আমাকে দিয়েছিল শেষেরটা। জিনিস দুটোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আবার চোখের সামনে দেখলাম সেই মুহূর্তটি যখন নাচের সঙ্গী বাছতে গিয়ে আমার গুণ আন্দাজ করতে পেরেছে সে, কানে এল তার মিষ্টি গলা, 'গৌরব? তাই না?' তারপর সানন্দে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে আমার দিকে; কিম্বা যখন সাপারের টেবিলে বসে শ্যাম্পেন খেতে খেতে অনুরাগ-ভরা চোখে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী করে ওকে দেখলাম সেই সময়ে যখন বাপের সঙ্গে সাবলীল ভঙ্গিতে নাচছিল সে, এবং বাপের ও নিজের দরুন খুশিতে আর গর্বে তাকাচ্ছিল মুগ্ধ দর্শকদের দিকে। আর অজান্তেই ওঁরা দুজনে মিশে আমার মনে এক হয়ে গেল, গভীর কোমল এক অনুভূতিতে ঘিরে রইল আমার মন।

'আমার বিগত ভাই আর আমি তখন একলা বাড়িতে থাকতাম। সমাজটমাজে কোনো ঝোঁক ছিল না ভাইয়ের, বল-নাচে কখনো যেত না। এম. এ. পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছে তখন, তার জীবনযাপনের ধরনটা খুবই নিয়ম মাফিক। ঘুমিয়ে পড়েছে সে। কম্বলে আধো ঢাকা, বালিশে গোঁজা তার মুখ দেখে মায়া হল — আহা, বেচারী জানে না আমার কী সুখ, সে সুখের ভাগ নিতেও পারবে না ও। আমাদের ভূমিদাস খাস-চাকর পেত্রুশা বাতি হাতে এল জামাকাপড় ছাড়িয়ে দিতে আমার, কিন্তু ছুটি দিলাম ওকে। লোকটার ঘুম-জড়ানো মুখ আর এলোমেলো চুল দেখে মমতা হল। পাছে কোনো শব্দ হয়, পা টিপে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানার ওপরে

বসলাম। এত সুখ আমার মনে, ঘুম এল না। ঘরে গরম লাগাতে ইউনিফর্ম না খুলেই চুপিচুপি সদর ঘরে এসে ওভারকোটটা চাপিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরোলাম।

'বল-নাচ থেকে যখন চলে আসি তখন প্রায় পাঁচটা, বাড়ি পেঁ৺ছে বসে থেকে তারপর প্রায় দুঘণ্টা কেটেছে; বেরোলাম যখন আকাশ ফরসা হয়ে এসেছে। শ্রোভটাইডের সেই বিশেষ আবহাওয়া — কুয়াশা, ভিজে বরফ গলছে রাস্তায়, ছাত থেকে টুপটুপ করে ঝরছে জলের ফোঁটা। সহরের উপকণ্ঠে একটা খোলা মাঠের কিনারে তখন থাকত ভারেঙ্কারা, মাঠের এক দিকে মেয়েদের স্কুল, অন্য দিকে বেড়াবার জায়গা। আমাদের নির্জন গলিটা পার হয়ে বড়ো রাস্তায় গেলাম; সেখানে চলেছে পথচারী, আর কাঠ বোঝাই শ্লেজ নিয়ে চালকেরা, শ্লেজের রানারগুলো রাস্তার বরফ কেটে প্রায় পাথর ঘেঁষে চলেছে; আর সবকিছু — ভিজে চকচকে যোয়ালের নিচে তালে তালে মাথা ওঠা-নামা করা ঘোড়াগুলো, গায়ে গাছের ছালের চাটাই জড়ানো শ্লেজগুলোর পাশে পাশে বিরাট জুতোয় বরফ কাদা ভেঙে-যাওয়া চালকেরা আর পথের দুধারে কুয়াশায় যে ঘরবাড়িগুলোকে ভারি উঁচু মনে হচ্ছিল — সবকিছু মনে হল বিশেষ রকমের মধুর ও অর্থময়।

'যে মাঠে ওঁদের বাড়ি সেখানে পেঁ৺ছে বেড়াবার জায়গাটার দিকে বড়ো আর কালো কী একটা চোখে পড়ল, কানে এল ঢাক আর বাঁশির আওয়াজ। আমার হৃদয়ে তখনো সঙ্গীতের ঝঙ্কার, মাঝে মাঝে মাজুরকার রেশ ভেসে আসছে। কিন্তু এটা যেন অন্য ধরনের বাজনা, নিষ্ঠুর অসুন্দর।

'"কী ব্যাপার," ভাবতে ভাবতে মাঠ চিরে-যাওয়া গাড়ির পেছল রাস্তা হয়ে চললাম সেদিকে যেদিকে আওয়াজ। প্রায় একশ গজ গিয়ে

কুয়াশায় লোকের কালো ভিড়টা স্পষ্ট হতে শুরু করল। সৈন্য নিশ্চয়। কুচকাওয়াজ চলেছে ভেবে একটি কামারের সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে চললাম, তার গায়ে লোমের তৈরি তেলচিটে কোট আর অ্যাপ্রন, কী যেন একটা তার হাতে রয়েছে। কালো কোট পরে দু সারি সৈন্য মুখোমুখি নিশ্চল দাঁড়িয়ে, বন্দুকগুলো পাশে ধরা। তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে বাঁশি-বাজিয়ে আর ঢাকী বারবার বাজিয়ে চলেছে অপ্রীতিকর কর্কশ সুরটা।

''কী করছে ওরা?' দাঁড়িয়ে পড়ে কামারটিকে জিজ্ঞেস করলাম।

''কেটে পড়ার চেষ্টা করেছিল বলে একটা তাতারকে তাড়িয়ে আনছে,' সৈন্যদের দু সারির একেবারে শেষের দিকটায় তাকিয়ে ক্রুদ্ধভাবে জবাব দিল কামার।

'সে দিকে তাকিয়ে দেখলাম বীভৎস কী একটা দু সারির মাঝখান দিয়ে আসছে আমার দিকে। কোমর অবধি খালি গা, দু বন্দুকে বাঁধা একটি লোক, বন্দুকগুলো ধরেছে দুটি সৈনিক, তাড়িয়ে আনছে তাকে। পাশে পাশে হাঁটছেন ফৌজী কোট আর ফৌজী টুপি-পরা দীর্ঘাকৃতি একটি অফিসার, চেহারাটা চেনা চেনা ঠেকল। সমস্ত শরীর ঠকঠক করে কেঁপে, গলন্ত বরফে থসথস করে পা ফেলে বন্দীটি এগিয়ে আসছে, দু ধার থেকে তার ওপরে পড়ছে মারের পর মার, থেকে থেকে সে নিচু হয়ে পিছিয়ে পড়লে বন্দুক-ধরা সৈনিকদুটি তাকে ঠেলে দিচ্ছে সামনে, কখনো-বা ঢলে একটু বেশী এগিয়ে পড়লে সৈনিকেরা ঝটকা দিয়ে টেনে নিচ্ছে যাতে পড়ে না যায়। আর তার পাশে সমানে দৃঢ় পায়ে হাঁটছেন দীর্ঘাকৃতি অফিসারটি, পিছিয়ে পড়ছেন না একবারও। তিনি হলেন ভারেঙ্কার বাবা, টকটকে লাল মুখ, শাদা গোঁফ আর জুলফি।

'লাঠি পড়াতে প্রত্যেক বার বন্দীটি যন্ত্রণায় বিকৃত মুখ ফিরিয়ে যেন অবাক হয়ে তাকাচ্ছে সেদিকে যেদিক থেকে আঘাত আসছে, ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে কী-একটা বলে চলেছে বারবার। কাছে না আসা পর্যন্ত কী বলছে বুঝতে পারি নি। সেটা ঠিক, বলা নয়, কান্না। 'দয়া করো, ভাইসব! দয়া করো, ভাইসব!' কিন্তু কোনো দয়া নেই ভাইদের; মিছিলটা ঠিক আমার সামনে এসে পড়ল, দেখলাম আমার সামনেকার সৈন্যটি দৃঢ় চিত্তে এগিয়ে এসে এত জোরে মারল তাতারটির পিঠে যে হাওয়ায় শিস দিয়ে উঠল বেতটা। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে, সৈনিকেরা টেনে ধরে রাখল, ওপাশ থেকেও একই রকম আঘাত এল, এপাশ থেকে আবার, আবার ওপাশ থেকে... তাল ঠুকে তার পাশে চলেছেন কর্ণেল, কখনো তাকাচ্ছেন নিজের পায়ের দিকে কখনো-বা বন্দীটির দিকে, বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে গাল ফুলিয়ে চাপা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিচ্ছেন। যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম মিছিলটা সেখানটা পেরিয়ে যাবার সময়ে দু সারি সৈন্যের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল বন্দীর পিঠের আভাস। দাগড়া দাগড়া ভেজা লাল অস্বাভাবিক একটা পিঠ। মানুষের দেহ বলে বিশ্বাস হল না।

' 'হে ভগবান,' পাশের কামারটি বলে উঠল অস্ফুট কণ্ঠে।

'এগিয়ে গেল মিছিল। হুমড়ি খেয়ে পড়া আঁকুপাঁকু মানুষটির ওপর দুধার থেকে সমানে চলল মারের পর মার। সমানে ঢাকের বাজনা, বাঁশির আওয়াজ, বন্দীর পাশে দৃঢ় পদক্ষেপে সমানে এগিয়ে চললেন দীর্ঘাকৃতি জমকালো অফিসারটি। হঠাৎ দাঁড়িয়ে, তারপর দ্রুত পায়ে তিনি গেলেন একটি সৈনিকের কাছে।

' 'ফাঁকি দিবি আর? দেখাচ্ছি তোকে!' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি। 'দিবি ফাঁকি?' দেখলাম সোয়েডের দস্তানা-পরা বলিষ্ঠ

হাতে তিনি কষে একটা চড় বসালেন ছোটখাটো ভীত দুর্বল সৈনিকটির মুখে, তাতারের দগদগে লাল পিঠে যথেষ্ট জোরে সে বেত চালায় নি বলে।

''লে আও নয়া বেত!' হাঁকলেন কর্ণেল। তাকাতেই দেখতে পেলেন আমাকে। চিনতে না পারার ভান করে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বদরাগী, একটা ভ্রূকুটি টেনে তাড়াতাড়ি মুখ ফেরালেন। এত লজ্জা হল আমার যে কোন দিকে তাকাব ভেবে পেলাম না, যেন অত্যন্ত জঘন্য একটা অপরাধে হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছি। মাথা নিচু করে তাড়াতাড়ি চললাম বাড়িমুখো। সারা পথ কানে বাজতে লাগল ঢাকের শব্দ, বাঁশির চীৎকার, সেই কথাগুলো, 'দয়া করো, ভাইসব,' কর্ণেলের ক্রুদ্ধ রোয়াব-ভরা হাঁক, 'ফাঁকি দিবি আবার!' আর বুকের ভেতরটায় প্রায় শারীরিক গা ঘুলিয়ে ওঠার মতো এমন একটা কষ্ট হল, কয়েক বার দাঁড়িয়ে পড়তে হল রাস্তায়। মনে হল দৃশ্যটির সমস্ত বিভীষিকা উদ্‌গার করে ফেলতে হবে আমায়। কী করে বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়লাম মনে নেই, কিন্তু ঘুম আসতে না আসতে আবার সবকিছু ফিরে এল চোখের সামনে, বেজে উঠল কানে। তড়াক করে উঠে পড়লাম।

'কর্ণেল সম্পর্কে, মনে হল, "ও'র নিশ্চয়ই এমন একটা যুক্তি আছে যেটা আমার জানা নেই। উনি যা জানেন আমার জানা থাকলে ব্যাপারটা বুঝতে পারতাম, যা দেখলাম তাতে এত কষ্ট হত না।" কিন্তু শত ভেবেও কর্ণেলের জানা জিনিসটি কী মাথায় ঢুকল না, ঘুম এল না সন্ধ্যা পর্যন্ত, আর তাও এল একটি বন্ধুর ওখানে গিয়ে প্রচুর মদ্য পানের পর।

'আপনারা ভাবছেন যে দৃশ্যটি দেখি সেটি মন্দ বলে ধরে নিয়েছিলাম! মোটেই নয়। "ব্যাপারটা যখন এত নিশ্চিন্তভাবে করা

হয়ে থাকে, লোকে যখন সেটাকে দরকার বলে মেনে নিয়েছে তখন তার মানে — ওদের নিশ্চয়ই এমন কিছু একটা যুক্তি আছে যেটা আমার অজানা,” এই ভেবে সেটা কী বের করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বের করতে পারি নি কখনো। আর পারি নি বলে আমার পূর্বেকার সংকল্প মতো সামরিক কাজে যোগ দিতে পারি নি; শুধু যে সামরিক কাজে যোগ দিতে পারি নি তা নয়, কোনো কাজেই নয়, আর দেখতেই তো পাচ্ছেন কিছুরই যোগ্যতা আমার নেই।’

‘আপনি যে কেমন অযোগ্য সেটা ভালো করে আমাদের জানা আছে,’ অতিথিদের একজন বললেন। ‘আপনি না থাকলে কত লোক যে কী অযোগ্য হয়ে থাকত সেটা বরং ভেবে দেখুন।’

‘যত সব বাজে কথা।’ রীতিমত বিরক্তির সঙ্গে বললেন ইভান ভাসিলিয়েভিচ।

‘আচ্ছা, প্রেমের কী হল?’ আমরা প্রশ্ন করলাম।

‘প্রেম? সেদিন থেকে উবে গেল প্রেম। যখনি ভারেঙ্কা অভ্যেস মতো মৃদু হেসে অন্যমনা হয়ে যেত তখনি মাঠে কর্ণেলের কথাটা মনে না করে পারতাম না, কেমন যেন অস্বস্তি আর বিশ্রি লাগত; দেখাসাক্ষাৎ কমিয়ে দিতে লাগলাম, প্রেমও খতম হয়ে গেল। তাহলে দেখছেন তো কি না ঘটে, কোথা থেকে মানুষের গোটা জীবনটায় পরিবর্তন আসে, মোড ঘুরে যায়। আর আপনারা কি না বলছেন. .’ উপসংহার করলেন তিনি।

১৯০৩

পরিশিষ্ট

দুই হুসার (১৮৫৬)

গল্পটির রচনাস্থল পিটার্সবুর্গ। এক মাসের মধ্যে এই গল্প রচনা করেছিলেন তলস্তোয়। প্রথম প্রকাশিত হয় 'সভ্রেমেন্নিক' পত্রিকায়। উৎসর্গ করেছিলেন বোন ম. ন. তলস্তায়া-কে।

প্রথমে রচনাটির নাম ছিল 'পিতা ও পুত্র', কিন্তু পরে নেক্রাসভের পরামর্শানুযায়ী নাম পাল্টে 'দুই হুসার' রাখলেন।

১৮৫৬-র এপ্রিল মাসে নিকোলাই নেক্রাসভ সাহিত্যসমালোচক ভ. প. বোৎকিন-কে লিখলেন: 'তলস্তোয় অপূর্ব একটি বড়ো গল্প লিখেছেন — 'দুই হুসার'; এটি এখন আমার কাছেই রয়েছে, 'সভ্রেমেন্নিক'এর ৫ম সংখ্যায় যাবে। খাসা তলস্তোয়! এই শেষ দিনগুলোয় সবচেয়ে চমৎকার কিছু মুহূর্ত আমাকে উপহার দেবার জন্যে সাংবাদিক হিসেবে তাঁকে ধন্যবাদ দিতেই হবে...'

'দুই হুসার' গল্পের মূল বিষয়বস্তু দুই ভিন্নধরনের নৈতিকতা ও মানসিকতাসম্পন্ন চরিত্রের প্রতিতুলনা এবং তারও প্রেক্ষাপটে রয়েছে বিকাশমান রুশ সমাজের দুটি ভিন্ন ভিন্ন যুগ।

প্রকাশিত হওয়া মাত্রই বহুলপ্রশংসিত হয়েছিল উপাখ্যানটি। ন. গ. চের্নিশেভ্স্কি মূল্যায়ন করেছিলেন এই বলে: 'গল্প লেখায় আরো এগিয়েছেন তিনি।' আর ন. আ. নেক্রাসভ

লিখেছিলেন তুর্গেনেভ্‌কে (২৪ মে ১৮৫৬): 'তল্‌স্তোয়কে বলবেন যে, তাঁর সাম্প্রতিক গল্পটি ভালো লেগেছে, — আমি ও কভালেভ্‌স্কি প্রচুর প্রশংসাবাক্য শ্ুনেছি এ নিয়ে...'

সুখের সংসার (১৮৫৯)

১৮৫৯ সালে 'রুস্কি ভেস্ত্‌নিক্‌' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। তল্‌স্তোয়ের সমকালীন সাহিত্যসমালোচকেরা গল্পটি সম্পর্কে মোটামুটি উদাসীন ছিলেন। তাঁদের অন্যতম বক্তব্য ছিল এই যে, 'সুখের সংসার' কাহিনীর বিষয়বস্তু অনেকাংশে অবাস্তব এবং তদানীন্তন সমাজে ও সংবাদপত্রে যে সমস্ত সমস্যা আলোড়ন তুলেছিল সে সব থেকে তা বহুদূরে অবস্থিত।

১৮৫৮ সালে যাঁর সঙ্গে তাঁর বিবাহ প্রায় ঘটে যাচ্ছিল সেই মহিলা — ভালেরিয়া ভ্ল্যাদিমিরভ্‌না আর্সেনিয়েভার সাথে তাঁর সম্পর্ক, মর্মবেদনা ও পর্যবেক্ষণজাত অভিজ্ঞতা থেকে তল্‌স্তোয় বর্তমান কাহিনীটি নির্মাণ করেছেন।

প্রকাশের পূর্বেই তল্‌স্তোয়ের এই গল্পটি পাঠ করে ভ. প. বোৎকিন লেখকের সাথে তাঁর আলাপ-আলোচনার বক্তব্য জানিয়েছিলেন ই. স. তুর্গেনেভকে: 'গতকাল আমি সোজাসুজিই তাঁকে বলেছি যে, বড়ো নিরুত্তাপ ও একঘেয়ে গল্প এটা। তাঁর ধারণা সম্পূর্ণ অন্যরকম। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দেখানো যে, বিবাহের মধ্যে প্রেমের কী বিবর্তন ঘটে — রোম্যাণ্টিক যাতনার ভিতরে কীভাবে তার শুরু হয়, আর সন্তানসন্ততির প্রতি স্নেহের মধ্যে কীভাবে তার পরিসমাপ্তি ঘটে... প্রণিধান করা প্রয়োজন যে, নিজের ক্ষমতা ও নিজের রচনা সম্পর্কে তল্‌স্তোয় নিজে অত্যন্ত উচ্চ

ধারণা পোষণ করেন।' যাই হোক, গল্পটি প্রকাশ করার সময়ে এর উৎকর্ষতা সম্বন্ধে সম্ভবতঃ তলস্তোয়ের নিজের মনেই সন্দেহ জেগেছিল; একবার তিনি এমন কি ভেবেছিলেন যে স্বনামে নয়, ছদ্মনামের আড়ালে লেখাটি ছাপাবেন।

এ সময়ে 'সুখী জীবনের' আদর্শ তিনি আর ঘোষণা করেন নি, বরং একে সম্পূর্ণ খোলাখুলিভাবে আক্রমণ করেছিলেন।

'এখন মনে পড়লে হাসি পায়,' ১৮৫৭ সালের অক্টোবরে লেভ তলস্তোয় আ. প. তলস্তায়া-কে লিখছেন, 'কী যে ভাবতাম তখন! মনে হয়, আপনারাও নিশ্চয়ই ভাবছেন যে সত্যিই বুঝি বিনা ভ্রান্তিতে, বিনা অনুশোচনায়, বিশৃঙ্খলা ব্যতিরেকে খাঁটি, সুখী জীবন গড়ে তোলা যায় — যার মধ্যে শান্তভাবে নির্বিঘ্নে জীবন বয়ে যাবে আপনার, কোনো কিছুরই তাড়াহুড়ো নেই, সব যথাযথ, সবই কেবল ভালো। হাস্যকর ব্যাপার!.. সৎভাবে বাঁচতে হলে দরকার বিদ্রোহ, দিকভ্রম, দরকার লড়াই করা, ভুল করা, দরকার শুরু করা এবং শুরু করে ছেড়ে দেওয়া, তারপর পুনরায় শুরু ও পরিত্যাগ, আর এইভাবে চিরন্তন সংগ্রাম ও বঞ্চনার মধ্যে লিপ্ত থাকা।'

পক্ষিরাজ (১৮৮৫)

'পক্ষিরাজ' দীর্ঘদিন ধরে বহু কর্মের ফাঁকে ফাঁকে লেখা; তলস্তোয় রচনাটি শুরু করেছিলেন ১৮৫৬ সালে, আর শেষ করেন ১৮৮৫-তে।

লেখার পরিকল্পনা প্রথম এসেছিল ১৮৫৬ সালে। এ প্রসঙ্গে তাঁর দিনলিপিতে ৩১শে মে তিনি লিখেছিলেন: 'ঘোড়ার কাহিনী লিখতে মন যাচ্ছে।'

বিষয়বস্তু তিনি গ্রহণ করেছিলেন সাহিত্যিক ম. আ. স্তাখোভিচের (১৮২০-১৮৫৮) নিকট হতে। নামকরা তাজি ঘোড়াকে (কাউণ্ট আ. গ. অর্লোভ-চেস্‌মেন্‌স্কির অশ্বশালায় এটি ছিল) নিয়ে একটি গল্প রচনার মনস্থ করেন তিনি; কাউণ্টের মৃত্যুর পর ঘোড়াটিকে প্রথমে খাসী করে দেয়া হয়, পরে বিক্রী করে ফেলা হয়।

এই ঘোড়ার কাহিনী তল্‌স্তোয়ের গভীর মনযোগ আকর্ষণ করেছিল। ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসের শেষাশেষি কি মে-র প্রথম দিকে আ. আ. ফেৎ-কে রচিত একটি পত্রে তিনি 'আস্তো ঘোড়ার কাহিনী' নিয়ে গল্প রচনার সংবাদ জানিয়ে সে বৎসরেরই হেমন্তেই গল্পটি ছাপা হতে পারে বলে জানান। মনে হয়, গল্পটি নিয়ে লেখক সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না, তাই তখন অসমাপ্ত রেখেই ছেড়ে দেন।

'পক্ষিরাজ' গল্প প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ সালে, 'কাউণ্ট ল. ন. তল্‌স্তোয়ের রচনাসংকলন'এর (পঞ্চম সংস্করণ) ৩য় খণ্ডে।

ফাদার সিয়ের্গি (১৮৯৮)

১৮৯০-১৮৯১, ১৮৯৫ ও ১৮৯৮ সালে এই গল্পটির উপর কাজ করেন তল্‌স্তোয়।

১৮৯১ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'ফাদার সিয়ের্গি' রচনা স্থগিত রাখেন, কেননা রচনাটি 'অতিশয় মূল্যবান', 'কী জন্যে যেন এখন আর লিখে যেতে মন যাচ্ছে না।' ভ. গ. চের্ৎকোভ্‌কে রচিত একটি পত্রে তল্‌স্তোয় আলোচ্য বড়োগল্পটির সারাৎসার লিপিবদ্ধ করেন এভাবে: 'বাসনামলিন প্রলোভনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এই কাহিনীটি

দ্রুত অন্য মাত্রায় উন্নীত হয়েছে — প্রকৃত সংগ্রাম অন্য কিছুর বিরুদ্ধে, মিথ্যা অহংয়ের বিরুদ্ধে।'

· রচনাটিতে আবার হাত দেন এবং প্রায় একনাগাড়ে লিখে যান ১৮৯১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত; মিথ্যার স্বরূপ উন্মোচন, স্বেচ্ছানির্বাসিত জীবনের আলস্য এবং সিয়েগির্র মানসিক যন্ত্রণার অনুপুঙ্খ বিবৃতির দিকে গল্পটি মোড় নেয়।

কাহিনীটিতে আর বলার কিছু নেই বলে যখন তাঁর মনে হল, তখন ঠিক করলেন প্রকাশ করবেন। যাই হোক, 'ফাদার সিয়েগির্'র প্রকাশ ব্যাপারে দ্রুত মতপরিবর্তন করেন তিনি, এবং 'পুনরুত্থান' উপন্যাস রচনায় এত মগ্ন হয়ে যান যে বর্তমান গল্পটিতে আর কখনো হাত দেন নি।

তল্‌স্তোয়ের মৃত্যুর পর প্রকাশিত গল্প ও উপন্যাস সংকলনের দ্বিতীয় খণ্ডে (মস্কো, ১৯১২) 'ফাদার সিয়েগির্' সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়, তাও সেন্সরশিপের মাহাত্ম্যে খর্বীকৃত আকারে, কেননা জার প্রথম নিকোলাই ও তাঁর নানান প্রেমাভিযানের নাকি ছায়া ছিল সেখানে।

বল-নাচের পর (১৯০৩)

তল্‌স্তোয়ের মধ্যম ভ্রাতা সের্গেই নিকোলায়েভিচের জীবনের একটি ঘটনাকে ভিত্তি করে তলস্তোয় এই গল্পটি লিখেছিলেন। কাজান শহরের সামরিক অধিনায়ক আ. প. করেইশ-এর কন্যা ভার্ভারা আন্দ্রেইয়েভ্‌নার প্রেমে পড়েছিলেন সের্গেই নিকোলায়েভিচ। ভার্ভারার পিতার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি শাস্তিদান অনুষ্ঠান দেখার পর প্রেমাস্পদার সহিত সব সম্পর্ক ছিন্ন করেন তিনি।

লেভ তল্‌স্তোয় ব্যক্তিগতভাবে ভার্ভারা আন্দ্রেইয়েভ্‌না করেইশ ও তাঁর পিতাকে জানতেন। ১৮৮৬ সালে লিখিত 'নিকোলাই পাল্‌কিন' প্রবন্ধে তিনি তাঁর পরিচিত জনৈক সেনাধ্যক্ষের (ভদ্রলোকটি যে আ. প. করেইশ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই) স্মৃতিচারণ করেছেন যিনি 'প্রথমে নিজের অপূর্ব সুন্দরী কন্যার সাথে বল-নাচের আসরে মাজুর্কা নেচে আসর ভাঙার পূর্বেই স্থান ত্যাগ করেন, কেননা ধরে আনা পলাতক এক তাতার সৈন্যের মৃত্যুর আয়োজন পরের দিন ভোরবেলাতেই তাঁকে করতে হবে; সৈনিকটি যতক্ষণ না মারা যায় ততক্ষণ বেত্রাঘাত চালান, তারপর ঘরে ফেরেন পরিবারপরিজনের সাথে মধ্যাহ্নভোজন করতে।'

গল্পটি তল্‌স্তোয়ের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় নি; তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত গল্প ও উপন্যাস সংকলনে এটি প্রথম বেরোয়।

লেভ তল্‌স্তোয়: জীবন ও সাহিত্য

১৮২৮। ২৮শে আগস্ট (নতুন পঞ্জিকানুসারে ৯ই সেপ্টেম্বর) লেভ নিকোলায়েভিচ তল্‌স্তোয়ের জন্ম। কাউণ্ট তলস্তোয়দের পারিবারিক জমিদারি ইয়াস্নায়া পলিয়ানায়। বাবা নিকোলাই ইলিচ তল্‌স্তোয় ও মা মারিয়া নিকোলায়েভ্‌না তল্‌স্তায়ার (কুমারী নাম: প্রিন্সেস ভল্‌কোন্‌স্কায়া) চতুর্থ পুত্র।

১৮৩০। মায়ের মৃত্যু।

'জীবনস্মৃতি'তে তল্‌স্তোয় পরে লিখেছেন: 'মা... তাঁর নিজের যুগে অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন। রুশ ছাড়াও আরো চারটি ভাষা জানতেন তিনি: ফরাসী, জার্মান, ইংরেজি ও ইতালীয়... পিয়ানো বাজাতে পারতেন চমৎকার, আর তাঁর সমসাময়িকদের মুখে শুনেছি যে মুখে মুখে গল্প তৈরী করে বলায় তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ।'

১৮৩৭। ইয়াস্নায়া পলিয়ানা থেকে তল্‌স্তোয় পরিবারের মস্কো আগমন।

পিতার মৃত্যু।

সতেরো বৎসর বয়সে নিকোলাই ইলিচ তল্‌স্তোয় জারের হুসার বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন, ১৮১২ সালের যুদ্ধে (নেপোলিয়নের সাথে) এবং বিদেশে রুশ বাহিনীর বিভিন্ন অভিযানে তিনি লড়াই করেছিলেন; সেনা বাহিনীর চাকুরি থেকে লেফটেন্যাণ্ট-কর্ণেল হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন ১৮১৯ সালে। তল্‌স্তোয় তাঁর পিতা সম্পর্কে লিখে গেছেন: 'জমিদারি নিয়েই সারা জীবন ব্যস্ত ছিলেন তিনি... আমি যদ্দুর বুঝি, তাঁর কোনো বৈজ্ঞানিক প্রবণতা ছিল না, তবে তাঁর সমকালীন লোকজনদের শিক্ষার মান তাঁর ছিল।'

১৮৪০। তল্‌স্তোয়ের প্রথম সাহিত্যপ্রচেষ্টা: 'আমার প্রিয় কাকীমাকে' — ত. আ. ইয়ের্গোল্‌স্কায়ার উদ্দেশ্যে কাব্যপ্রশস্তি।

১৮৪১। তল্‌স্তোয়-পরিবারের অভিভাবিকা কাউণ্টেস আ. ই. ওস্টেন-সাকেন ওপ্তিনা পুস্তিন কন্‌ভেণ্টে মারা গেলেন।

তল্‌স্তোয়দের সব ক'টি ভাই (নিকোলাই, সের্গেই, দ্‌মিত্রি ও লেভ) মস্কো থেকে চলে এল কাজান শহরে, নতুন অভিভাবিকা প. ই.ইউশ্‌কোভার তত্ত্বাবধানে থাকবার জন্য (প্রসঙ্গত, তল্‌স্তোয়ের পিসিমা নি. ই. তলস্তোয়-ভগ্নীকে বিয়ে দেয়া হয়েছিল কাজানের গভর্ণরের সাথে)।

১৮৪৪। কূটনীতিবিদের কর্মজীবন গ্রহণের জন্য তৈরী হচ্ছেন তল্‌স্তোয়; কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা অনুষদের আরবী ও তুর্কী ভাষা বিভাগে ভর্তি হলেন।

১৮৪৫। বিভাগ পরিবর্তন করে আইন অনুষদে ভর্তি করার অনুরোধ।

১৮৪৭। বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ, স্বাধীন জীবনযাপনের শুরু, কাজান ছেড়ে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ইয়াস্নায়া পলিয়ানায় চলে এলেন। ১৭ই মার্চ, তখনো তিনি কাজানে থেকে একটা দিনপঞ্জী রাখতে শুরু করেন পরে যা তাঁর আজীবন সঙ্গী হবে। এই দিনপঞ্জীতে শেষ উল্লেখিত তারিখ ৩রা নভেম্বর, ১৯১০, তল্‌স্তোয়ের মৃত্যুর মাত্র দিন কয়েক তখন বাকি।

তল্‌স্তোয়ের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সাহিত্যিক জীবন এবং পঠিত গ্রন্থাদি সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব এবং যে সব ব্যক্তির সাথে তাঁর দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে — সব কিছুর দলিল এই দিনপঞ্জীটি। তিনি তাঁর নিজ কর্ম ও চিন্তা বিশ্লেষণ করেছেন এতে এবং নৈতিক শুদ্ধতা অর্জনের উপায় লিপিবদ্ধ করেছেন। সাহিত্য সম্পর্কিত টুকিটাকি, কখনো-বা ভবিষ্যৎ কোনো সাহিত্যকর্মের নকসা পর্যন্ত তাতে মেলে। এ যেন তল্‌স্তোয়ের সৃজনপ্রতিভার এক গবেষণাগার।

১৮৪৮। অক্টোবর ১৮৪৮— জানুয়ারি ১৮৪৯। মস্কোর 'নিষ্কর্ম, ভাবনাচিন্তারহিত ও লক্ষ্যহীন' বিলাসজীবন।

১৮৪৯। সেন্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পরীক্ষা দিতে বসলেন, কিন্তু মাত্র দুটি বিষয়ে ভাল নম্বর পেয়ে পাশ করে বাকিগুলোয় আর পরীক্ষাই দিলেন না।

১৮৫০। 'যাযাবর জীবন থেকে নেয়া একটা কাহিনী' সম্পর্কে চিন্তাভাবনা — সাহিত্য নিয়ে তাঁর প্রথম গভীর অনুধ্যান।

১৮৫১। 'গতকালকের গল্প' রচিত হল, 'চতুষ্পর্ব বিকাশ' ('শৈশব', 'কৈশোর', 'যৌবন' ও 'দ্বিতীয় যৌবন') উপন্যাসের খসড়া নির্মাণ চলছে।

'গতকালকের গল্প' তল্‌স্তোয়ের জীবদ্দশায় কখনো প্রকাশিত হয় নি। ১৯২৮ সালে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত ৯০ খণ্ডে সম্পূর্ণ রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে গল্পটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। কাহিনীটি সম্পর্কে তাঁর দিনপঞ্জীতে ১৮৫১ সালের ২৪শে মার্চে লেখা হয়েছে: 'বর্তমানকে আমি তার সমস্ত চিন্তা ও প্রভাবসহ ধরে রাখছি।' রচনাশৈলীর দিক থেকে গল্পটিকে ভবিষ্যত সাহিত্যধারায় 'চৈতন্যপ্রবাহে'র পূর্বসূরী বলা চলে, কিন্তু সব মিলিয়ে রচনাটি তল্‌স্তোয়ের অত্যুজ্জ্বল এক আবিষ্কারের সাক্ষ্য বহন করছে: মানুষের মানসিক উদ্বেগ সেখানে চিত্রিত বহু বিপরীত অনুভবের সংমিশ্রণ রূপে — 'আত্মার ডায়ালেক্টিক্স'।

'চতুষ্পর্ব বিকাশ'এর তিনটি পর্ব ('শৈশব', 'কৈশোর', 'যৌবন') সমাপ্ত করেছিলেন।

মে মাসে (১৮৫১) ককেশাসে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিকোলাইয়ের সাথে দেখা করতে গেলেন।

ককেশাস অঞ্চলে অভিযানরত রুশ বাহিনীতে অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন নিকোলাই নিকোলায়েভিচ তল্‌স্তোয়। বহু বছর ধরে রুশ সরকার সেখানে যুদ্ধ

ও কূটনৈতিক কলাকৌশল চালানোর পরে ককেশাস শেষকালে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়।

ককেশাসে তল্‌স্তোয়ের জীবন তাঁকে ব্যক্তি ও লেখক হিসেবে সমৃদ্ধ করে। সাধারণ সৈনিক ও অফিসারদের ব্যক্তিমানস গভীরভাবে অনুধাবন করার সুযোগ পান তিনি; ককেশাসকেন্দ্রিক ফৌজী গল্পসমূহে এবং আরো পরে লিখিত 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাস ও 'হাজি মুরাদ' গল্পে তাঁর এই অভিজ্ঞতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার ঘটে। তেরেক্ নদীর তীরে এক কসাক জনবসতিতে বাস করার ফলে 'এই সব বিশেষ ধরনের মানুষগুলোর' জীবনের সাথে তিনি পরিচিত হতে পেরেছিলেন।

১৮৫২। ক্যাডেট রূপে সৈন্যদলে যোগদান; রণকৌশল দেখার সুযোগলাভ; গোলন্দাজ বাহিনীতে 'চতুর্থ শ্রেণীর গোলন্দাজ' রূপে নিয়োগ (এই পদটি নন্-কমিশন্ড্ অফিসারের সমতুল্য)।

পাহাড় অঞ্চলে একটি অভিযানের পর 'আক্রমণ' গল্প রচিত হল।

তল্‌স্তোয়ের প্রথম প্রকাশিত রচনা 'আমার শৈশবের গল্প' (পরবর্তীকালে শুধু 'শৈশব' নামে প্রচলিত) ছাপা হল সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত ও নিকোলাই নেক্রাসভ সম্পাদিত 'সভ্রেমেন্নিক' (সমকালীন) পত্রিকার নবম সংখ্যায়।

নেক্রাসভ ও অন্যান্য সমালোচক প্রশংসা করেন গল্পটির। নেক্রাসভ চিঠি লিখলেন তল্‌স্তোয়কে: 'আমি নিশ্চিতভাবে

বলতে পারি যে, লেখকের প্রতিভা আছে।' বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখাটি সম্পর্কে মন্তব্য বেরুল — 'অপূর্ব', 'চমৎকার, নির্ভেজাল গল্প'।

'জনৈক রুশী জমিদারের কাহিনী' উপন্যাসের পরিকল্পনা, ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত সেটা নিয়ে খাটাখাটুনির পর অসমাপ্ত রেখে ছেড়ে দিলেন। ১৮৫৬ সালে এর অংশবিশেষ 'জনৈক জমিদারের একটি সকাল' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। 'কৈশোর' রচনায় হাত দিলেন (শেষ হল ১৮৫৪ সালের এপ্রিলে)। পাণ্ডুলিপি পাঠ করে নেক্রাসভ তাঁকে লিখলেন: ''কৈশোর' রচয়িতার প্রতিভা একান্ত নিজস্ব ও সর্বোচ্চ মানের; গ্রীষ্মকালীন পথঘাট ও ঝড়ের বর্ণনা, কিংবা জেলে বন্দী অবস্থা — এই সবকিছু এবং আরো, আরো বহুকিছু আমাদের সাহিত্যে গল্পটিকে দীর্ঘায়ু দান করবে।'

১৮৫৩। চেচেন্‌দের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানে অংশগ্রহণ। 'কসাক' নামে একটি বড়ো গল্প রচনায় হাত দিলেন। অপ্রত্যাশিত ও স্বেচ্ছাকৃতভাবে ককেশাসে চলে-যাওয়া অলেনিন নামে অভিজাত রুশ চরিত্রটিতে বহু আত্মজৈবনিক মালমসলা হুবহু বর্তমান। উপরন্তু এই প্রথম তল্‌স্তোয় কোনো জনগণের জাতীয় চরিত্র অঙ্কনের (এ ক্ষেত্রে তেরেক অঞ্চলের কসাকদের — এই রুশী কৃষকেরা বহু পূর্বে ককেশাসে চলে এসেছিল, এখানে তারা ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্ত স্বাধীনভাবে থাকতে পেরেছিল) বিশাল, প্রায় মহাভারতীয় প্রচেষ্টা গ্রহণ

করলেন। এই দিক থেকে দেখতে গেলে 'কসাক' (১৮৬২ সালে সমাপ্ত) সরাসরিভাবে মহাকাব্যিক 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসের (রচনারম্ভ ১৮৬৩ সালে) পূর্বসূরী। নিজের ব্যক্তিগত যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা ও নানা ধরনের রুশ সৈনিকদের জীবনধারা পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে 'বনানী ধ্বংস' গল্প রচনা।

১৮৫৫ সালে 'সভ্রেমেন্নিক' পত্রিকার ৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত হবার পরে নেক্রাসভ লিখেছিলেন তুর্গেনেভকে: গল্পটিতে 'বহু ধরনের সৈনিকের (এবং অংশতঃ অফিসারদেরও) চরিত্রচিত্রণ, অর্থাৎ এতদিন পর্যন্ত রুশ সাহিত্যে যা অনুপস্থিত তাই' বর্তমান। 'বিলিয়ার্ড খেলার মার্কার' গল্পরচনা সমাপ্ত হল।

১৮৫৪। পরীক্ষা পাশ না করেই তাঁর নিম্নপদস্থ সেনাপতি-পদে নিযুক্তি লাভ — যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শনের কারণে। বৃটিশ ও ফরাসী মিত্র-বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রস্তুয়মান ক্রিমিয়া সৈন্যবাহিনীতে বদলীর জন্য দরখাস্ত প্রেরণ।

'সল্‌দাৎস্কি ভেস্ত্‌নিক' (ফৌজী মুখপত্র) কিংবা 'ভয়েন্নি লিস্তোক' (সামরিক পত্র) পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা। সামরিক পত্রিকার জন্য গল্প রচনা ('রুশ সৈনিকদের মৃত্যুবরণ' ও অন্যান্য গল্প)।

অবরুদ্ধ নগরী সেভাস্তোপলে আগমন — ৭ই নভেম্বর।

১৮৫৫। 'যৌবন' লেখা শুরু (শেষ হয় ১৮৫৬ সালের সেপ্টেম্বরে)। সেভাস্তোপল গল্পবৃত্ত রচনা: 'ডিসেম্বরের

সেভাস্তোপল', 'মে মাসের সেভাস্তোপল' এবং 'সেভাস্তোপল: আগস্ট ১৮৫৫'। কাহিনীগুলোর মূল লক্ষ্য যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু গভীর সত্য উদ্ঘাটন — 'শোণিত, যন্ত্রণা ও মৃত্যু' এবং সামরিক অফিসারদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং বাস্তব সর্বনাশের মুখে জনসাধারণের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। 'মে মাসের সেভাস্তোপল' শেষ হয়েছে এই ক'টি কথা দিয়ে: 'কিন্তু আমার এই কাহিনীর নায়ক যাকে আমি আমার হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়ে ভালবেসেছি, যাকে আমি তার পূর্ণ সৌন্দর্য সমেত চেষ্টা করেছি চিত্রিত করতে এবং যে সর্বদাই অতুলনীয়ভাবে অপূর্ব রয়েছে ও থাকবে, সে হল সত্য।'

২রা সেপ্টেম্বরে নেক্রাসভ লিখলেন তল্স্তোয়কে: 'রুশী সমাজ এখন যা চায় সংক্ষেপে এ হল তাই; এই সত্যকে যে উপায়ে আপনি আমাদের সাহিত্যে গ্রথিত করে দিচ্ছেন তা এখানে সম্পূর্ণ এক নতুন জিনিস। যাঁকে আমি এই চিঠি লিখছি তাঁর চেয়ে আর কোনো লেখক জনগণের ভালোবাসা ও সহানুভূতি বেশি অর্জন করেছেন বলে আমার জানা নেই। আপনার শুরুই হয়েছে এভাবে যে, সবচেয়ে নৈরাশ্যবাদীও গভীর আশায় নিমজ্জিত হবে।'

১৯শে নভেম্বরে তল্স্তোয়ের পিটার্সবুর্গ আগমন। তুর্গেনেভ, নেক্রাসভ, গঞ্চারভ, ফেৎ, তিউৎচেভ, চের্নিশেভ্স্কি, সাল্তিকোভ-শ্চেদ্রিন, অস্ত্রোভ্স্কি ও আরো অনেক কবি-সাহিত্যিকের সাথে সাক্ষাৎ হল।

১৮৫৬। 'তুষারঝটিকা' ও 'পুনর্মিলন' গল্প রচনা; তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বড়ো গল্প 'দুই হুসার' রচনা সমাপ্ত।

তলস্তোয়ের পদোন্নতি—লেফটেন্যাণ্ট হলেন। সামরিক চাকুরি হতে অবসর গ্রহণের জন্য আবেদন।

বরাবরের জন্য ইয়াস্নায়া পলিয়ানায় বাসা বাঁধলেন। কৃষকদের ভাগ্য পরিবর্তন মানসে ভূমিদাসত্ব থেকে তাদের মুক্তি দিতে সচেষ্ট হলেন। সঙ্গত সর্তে নিজের সম্পত্তির কিছু তাদের স্বাধীনভাবে বসবাসের জন্য ছেড়ে দিলেন, ঘরবাড়ি তোলার জন্য তাদের কাঠ ইত্যাদিও জোগালেন।

'মৃগয়াস্থল' নামে বড়ো গল্প শুরু করলেন, ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত লিখে অসমাপ্ত ফেলে রাখলেন।

'সভ্রেমেন্নিক' পত্রিকার দ্বাদশ সংখ্যায় তলস্তোয়ের 'শৈশব', 'কৈশোর' ও 'সামরিক গল্পসম্ভার'এর উপর চের্নিশেভ্স্কির প্রবন্ধ বেরুল।

তলস্তোয়ের সাহিত্যপ্রতিভার প্রশংসা করতে গিয়ে চের্নিশেভ্স্কি তাঁর সাহিত্যকর্মের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছিলেন: 'মানবমনের গোপন ক্রিয়াকান্ড সম্পর্কে সুগভীর জ্ঞান ও নৈতিক অনুভব বিষয়ে স্বতঃস্ফূর্ত শুদ্ধতাবোধ'। লেখক হিসেবে তলস্তোয় মানুষের অন্তর্গত মনস্ক্রিয়া, তার গতিবিধি ও বাহ্যিক প্রকাশ, মনুষ্যহৃদয়ের ডায়ালেক্টিক্স বিষয়ে অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। প্রবন্ধটি সমাপ্ত হয়েছিল এই ক'টি কথা দিয়ে: 'আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, এযাবৎ কাউণ্ট তলস্তোয় আমাদের সাহিত্যে যা কিছু দিয়েছেন তা ভবিষ্যতে তিনি আরো যা দেবেন তার অল্প একটু

নিদর্শন মাত্র, কিন্তু সেই নিদর্শনটুকুও কতই না সমৃদ্ধ, কতই না অপূর্ব!'

১৮৫৭। নতুন গল্পে হাত দিলেন — 'আল্‌বেৎ' (শেষ হয়েছিল ১৮৫৮ সালের মার্চে)।

প্রথম বার বিদেশ যাত্রা : ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড ও জার্মানী ভ্রমণ। ইউরোপীয় জীবনের 'সামাজিক স্বাধীনতা' দেখে তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন। কিন্তু প্যারিসের স্টক এক্সচেঞ্জ দেখে তাঁর মনে হয়েছিল 'বিভীষিকা', আর গিলোটিনে শাস্তিদানের দৃশ্য তাঁকে এতদূর বিচলিত করে যে তিনি প্রায় তৎক্ষণাৎ প্যারিস ত্যাগ করেন। সুইজারল্যান্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁর খুব ভালো লাগে। 'ল্যুসের্ন' গল্প লেখেন যাতে বুর্জোয়া সমাজের নীতিবোধ তীক্ষ্ন সমালোচনা করেন (ভবঘুরে এক গায়কের গান শুনে দামী হোটেলের বাবুরা একটা ফুটো পয়সাও লোকটিকে দিল না)।

১৮৫৮। 'তিনটি মৃত্যু' গল্প লিখলেন। গল্পটি জনৈকা ধনী মহিলার যন্ত্রণাকাতর মৃত্যু, একজন কৃষকের শান্তভাবে মৃত্যুবরণ ও একটি ভূপাতিত বৃক্ষের অপূর্ব মৃত্যুকে উপজীব্য করে লেখা।

১৮৫৯। 'সুখের সংসার' নামে একটি বড়ো গল্প রচনায় ব্যস্ত।

১৮৫৮- ইয়াস্নায়া পলিয়ানায় চাষী ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল খুলে
১৮৬২।

নিজেই পড়াতে লাগলেন। শিক্ষকতার দিকে এ সময়েই প্রথম ঝংকেছিলেন।

১৮৬০ সালের ফেব্রুয়ারিতে বন্ধু কবি আ. ফেৎ-কে লিখলেন: 'আমাদের বেশি কিছু শেখার তো দরকার নেই; আমরা যা করব তা হল — যে অল্প সামান্যটুকু জানি তা মার্ফুৎকা আর তারাস্কা-কে শেখাব।'

১৮৬০। চাষী জীবন নিয়ে গল্প রচনা: 'একটি সরল কাহিনী' এবং 'তিখোন ও মালানিয়া'। দুটি গল্পই অসমাপ্ত থেকে যায়।

১৮৬০- দ্বিতীয়বার বিদেশ ভ্রমণ: জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স,
১৮৬১। বৃটেন ও বেলজিয়াম। লন্ডনে আ. ই. গের্ৎসেনের সাথে আলাপ। রুশ লেখক ও বিপ্লবী গের্ৎসেন স্বেচ্ছানির্বাসন গ্রহণ করে সেখানে 'স্বাধীন রুশ প্রকাশালয়' স্থাপন করেছিলেন।

'ডিসেম্বরবাদী' নামে একটি উপন্যাসের পরিকল্পনা নির্মাণ ও লেখা শুরু; পরবর্তী 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসের মৌলিক অনুপ্রেরণা এ রচনার নিকট ঋণী। গল্প শুরু করলেন 'পলিকুশ্‌কা', শেষ হল ১৮৬২ সালের ডিসেম্বরে।

১৮৬০- 'একটি ঘোড়ার কাহিনী' — 'পক্ষিরাজ' রচনার আরম্ভ,
১৮৬৩। সমাপ্ত হয় ১৮৮৫ সালে।

১৮৬১- ভূমিদাস প্রথা বিলোপের পর তল্‌স্তোয়কে মধ্যস্থ নিযুক্ত

১৮৬২। করা হয়। মধ্যস্থ হিসেবে তাঁর অন্যতম দায়িত্ব ছিল জমিদার ও চাষীদের ভিতরে জমির ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে গোলমাল লাগলে তাতে মধ্যস্থতা করা।

'ইয়াস্নায়া পলিয়ানা' নামে শিক্ষাসংক্রান্ত পত্রিকা প্রকাশ। নিজের শিক্ষাবিষয়ক ধ্যানধারণা প্রবন্ধাকারে উপস্থিত করলেন। শিক্ষাবিদদের কাছে আবেদন যাতে তাঁরা 'জনগণের প্রবল কণ্ঠস্বরের' দিকে মনোযোগ দেন; 'স্বেচ্ছাশিক্ষার' নীতি সমর্থন করলেন, — 'স্বেচ্ছাশিক্ষার' মূল লক্ষ্য ছিল ছেলেমেয়েদের জ্ঞানলাভের প্রয়োজনীয়তার স্বাভাবিক বিকাশকে লালন করা।

১৮৬২। তল্‌স্তোয়ের অনুপস্থিতিতে পুলিশের ইয়াস্নায়া পলিয়ানা তল্লাসি। সন্দেহ করা হয় যে তল্‌স্তোয় বেআইনী কাগজপত্র ছাপাচ্ছেন ও জমিয়ে রাখছেন।

রাজদরবারের চিকিৎসক আ. ইয়ে. বের্সের অষ্টাদশ বর্ষীয়া কন্যা সোফিয়া আন্দ্রেইয়েভ্‌নার পাণিগ্রহণ। পারিবারিক জীবনে গণ্ডগোল।

প্রথম সন্তান সের্গেইয়ের জন্ম ১৮৬৩ সালে। তল্‌স্তোয় দম্পতির সর্বমোট তেরোটি ছেলেমেয়ে হয়। সর্বশেষ সন্তান ইভান জন্মায় ১৮৮৮ সালে।

সোফিয়া তল্‌স্তায়া সম্বন্ধে মাক্সিম গোর্কি লিখেছেন: 'তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কে কিছু বলবার পূর্বে সর্বপ্রথম যা একজনের মনে রাখা দরকার তা হল — তল্‌স্তোয় অত্যন্ত আবেগপ্রবণ শিল্পীচরিত্র হওয়া সত্ত্বেও সোফিয়া আন্দ্রেইয়েভ্‌নাই প্রায় অর্ধ শতক ধরে তাঁর

জীবনে একমাত্র নারী ছিলেন। এই মহিলাই ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ, সত্যিকার, এবং মনে হয় তাঁর একমাত্র সঙ্গী।'

১৮৬৩। ইয়াস্নায়া পলিয়ানায় বসে 'যুদ্ধ ও শান্তি' রচনা শুরু। সাত বৎসরব্যাপী ঐকান্তিক শ্রমের ফসল এই গ্রন্থটি বহুবারই তিনি ঢেলে সাজান, অবশেষে সম্পূর্ণ করেন ১৮৬৯ সালে।

১৮৬৪- সর্বপ্রথম দুই খণ্ডে তলস্তোয়-রচনাবলী প্রকাশ করলেন
১৮৬৫। ফ. স্তেল্লোভ্স্কি, সেণ্ট পাটার্সবুর্গ থেকে।

১৮৬৫- 'রুস্কি ভেস্তনিক' (রুশী অগ্রদূত) নামে মস্কোর একটি
১৮৬৬। পত্রিকা '১৮০৫ সাল' শিরোনামে 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসের দুটি অংশ প্রকাশ করে।

১৮৬৭। বিখ্যাত বরদিনো যুদ্ধ যেখানে সংঘটিত হয়েছিল, তলস্তোয় সেখানে বেড়াতে যান এবং স্থানীয় জনপদটি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

১৮৬৭- 'যুদ্ধ ও শান্তি'র আলাদাভাবে দুটি সংস্করণ প্রকাশিত
১৮৬৯। হয়।

উপন্যাসটি ভীষণভাবে সম্বর্ধিত হয়। পরস্পরবিরোধী নানা প্রকার সমালোচনা বেরিয়েছিল। তৎকালীন সমস্ত প্রখ্যাত সাহিত্যিক গ্রন্থটিকে রুশ

সাহিত্যে এক অপূর্বদৃষ্ট ঘটনা হিসেবে স্বাগত জানিয়েছিলেন। 'যুদ্ধ ও শান্তি' বেরুবার সাথে সাথে তলস্তোয়, গণ্ডারভ যেমন বলেছেন, 'রুশ সাহিত্যে সত্যিকার এক সিংহ' (লেভ) রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। তুর্গেনেভ, যিনি এ বইটি নিয়ে বহুকিছু লিখেছেন, ছাপার অক্ষরে নিজস্ব মতামত দিয়েছিলেন এভাবে: 'মহাকাব্যিক বোধে জারিত এই বিশাল গ্রন্থটি; আমাদের শতাব্দীর প্রথম দিকে রাশিয়ার গণজীবন ও ব্যক্তিজীবন যথার্থ এক কারিগরের হাতে প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে... মহান এক লেখকের মহান সৃষ্টি এটি — এবং এটাই হচ্ছে যথার্থ রাশিয়া।' 'যুদ্ধ ও শান্তি'কে 'রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস' ও 'আধুনিক সাহিত্যের গর্ব' বলে অভিহিত করলেন সাহিত্যিক নিকোলাই লেস্কোভ। দস্তয়েভ্স্কি লিখলেন 'যুদ্ধ ও শান্তি'র জনক বিষয়ে: 'আমি এই অকাট্য সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি যে সাহিত্যিকের শুধু কাব্যরসবোধ থাকলেই চলবে না, তিনি যা অংকন করছেন সেই বাস্তব সম্বন্ধে পুংখানুপুংখ জ্ঞান (ঐতিহাসিক ও অধুনাকালের) থাকাও দরকার। আমার ধারণায়, এ জাতের উজ্জ্বল স্রষ্টা একজনই মাত্র আমাদের আছে আর তিনি — কাউণ্ট লেভ তলস্তোয়।' তলস্তোয়কে লিখিত একটি পত্রে আফানাসি ফেৎ বইটির উপর মন্তব্য করলেন: 'প্রাত্যহিক জীবনের ঐকাহিকতা আঁকতে গিয়ে আপনি সব সময়েই বীরবত্তার জাজ্বল্যমান আত্মপ্রকাশের স্বাভাবিকতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।' তুর্গেনেভ এক পত্রে গুস্তাভ ফ্লবেয়রের প্রতিক্রিয়া

জানালেন তলস্তোয়কে: 'একেবারে পয়লা নম্বরের ব্যাপার! শিল্পী বটে! মনস্তাত্ত্বিক বটে!.. আমার তো মনে হয়েছে, এমন অনেক অনুচ্ছেদ আছে যা শেক্সপীয়র লিখতে পারতেন! পড়তে পড়তে — যদিও বেশ কিছু সময় লেগেছে পড়তে — সব সময়ে আনন্দে শিহরিত হয়েছি! চমৎকার, সত্যিই চমৎকার!' মার্কিন লেখক জ. ফরেস্ট ১৮৮৭ সালে লিখলেন তলস্তোয়কে: 'আপনার কুশীলবেরা আমার কাছে জীবন্ত, সত্যিকারের লোকজন যেমন ঠিক আপনি নিজে, রুশ জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তারা।'

১৮৬৮। 'রুস্কি আর্খিভ' (রুশী সংগ্রহমালা) পত্রিকায় তলস্তোয়ের প্রবন্ধ বেরুল: 'যুদ্ধ ও শান্তি' গ্রন্থ বিষয়ে গুটি কয়েক কথা'।

বিভিন্ন সমালোচনার জবাবে তিনি তাঁর এই সৃষ্টির মৌলিকতা, ঐতিহাসিক মালমসলা এবং তৎসঙ্গে ইতিহাসপ্রক্রিয়া বিষয়ে তাঁর নিজস্ব দার্শনিক মত প্রকাশ করলেন এখানে।

১৮৭০। 'যুদ্ধ ও শান্তি' সমাপ্তির পরে গভীর আত্মিক অবক্ষয় অনুভব করেছিলেন তলস্তোয়।

গ্রীক ভাষা শিক্ষা, মূলে হোমার পাঠ।

১৮৭০- ১৮৭২। জার প্রথম পিটারের আমল নিয়ে মালমসলা সংগ্রহ শুরু করলেন নতুন এক ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখবেন বলে। বেশ কিছু পরিচ্ছেদ লিখলেন, কাটাকুটি করলেন।

১৮৭১- শিশুদের জন্য গল্প রচনা, তাঁর শিশুগ্রন্থ 'অআকখ'
১৮৭২। প্রকাশিত হল। 'এক এই অআকখ লিখতেই আমাকে পরবর্তী শ'খানেক বছরকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে। এ রকম বই লিখতে গেলে গ্রীক, ভারতীয় ও আরবী সাহিত্য জানা দরকার, সেইসঙ্গে প্রকৃতিবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা ও পদার্থবিজ্ঞানও, — আর ভাষা নিয়ে কাজ করা তো এক সাংঘাতিক ব্যাপার : প্রত্যেকটা জিনিস যাতে সুন্দর, ছোট্ট, সহজ হয়, তারো চেয়ে জরুরী যাতে স্বচ্ছ ও সহজবোধ্য হয় সেদিকে দেখা দরকার।' (১৮৭২ সালের এপ্রিলে আ. আ. তল্‌স্তায়াকে লেখা পত্র থেকে)।

১৮৭২। বিদেশী ভাষায় তাঁর প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত : 'কসাক' গ্রন্থের ইংরেজি ভাষান্তর বেরুল নিউ ইয়র্ক থেকে (অনুবাদ : এ. স্কাইলের)। তল্‌স্তোয়ের বিশ্বখ্যাতির শুরু। তুর্গেনেভ ভূমিকাসহ ফরাসী 'Le Temps' পত্রিকায় 'দুই হুসার' বেরুল ১৮৭৫ সালে। তুর্গেনেভ লিখলেন যে, 'যুদ্ধ ও শান্তি'র পরে তল্‌স্তোয় রুশ সাহিত্যে 'নিশ্চিতভাবে প্রথম স্থানের অধিকারী'। ফরাসী ভাষায় ১৮৭৯ সালে, ১৮৮৫-১৮৮৬ সালে জার্মান ভাষায় এবং ১৮৮৬-১৮৮৭ সালে ইংরেজিতে (প্রথমে নিউ ইয়র্ক ও তারপর লণ্ডন থেকে) 'যুদ্ধ ও শান্তি' প্রকাশিত হল। আশি দশকের মাঝামাঝি সময়ে 'আন্না কারেনিনা' অনূদিত হল আর 'পুনরুত্থান' রাশিয়ায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে একই সময়ে বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় তার অনুবাদ বেরিয়ে গেল।

১৮৭৩। 'আন্না কারেনিনা' রচনা শুরু, সমাপ্ত হল ১৮৭৭ সালে।

'এই উপন্যাস — সত্যিকারের একটা উপন্যাস, আমার জীবনে এই-ই প্রথম — আমার আত্মাকে যেন টেনে বের করে এনেছে; এবারের বসন্তকাল নানাবিধ দার্শনিক অনুসন্ধিৎসায় ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও আমি ওতেই ডুবে ছিলাম... আপনা আপনিই উপন্যাসটির পরিকল্পনা মাথায় এসে গিয়েছিল, আর ঐ ঐশ্বরিক পুশ্‌কিনকে ধন্যবাদ — তাঁর বই খেয়াল-খুশিতেই পড়তে শুরু করেছিলাম, নতুন আনন্দ নিয়ে তাঁর সব রচনা ফের পড়ে ফেলা গেল' (১৮৭৩ সালের মে মাসে ন. ন. স্ত্রাখভকে লেখা চিঠি থেকে)।

সামারা অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ বিষয়ে চিঠি লিখলেন 'মস্কোভ্‌স্কিয়ে ভেদমস্তি' (মস্কো বিবরণী) পত্রিকায়। সামারা প্রদেশের মর্মান্তিক অবস্থার বিশদ চিত্র তুলে ধরলেন। এ চিঠির ফলে অনাহারক্লিষ্ট চাষীদের সাহায্যার্থে চাঁদা ওঠা শুরু হয়ে গেল। সব মিলিয়ে নগদ ১৮ লাখ ৬৭ হাজার রুবল এবং ২১ হাজার পুদ খাদ্যশস্য সংগ্রহ হয়েছিল।

শিল্পী ই. ন. ক্রাম্‌স্কোয় ছবি আঁকলেন তল্‌স্তোয়ের (তাঁর সেরা প্রতিকৃতিগুলোর অন্যতম) ইয়াস্নায়া পলিয়ানা গিয়ে।

১৮৭৪। শিক্ষকতা চালিয়ে যাওয়া; 'গণশিক্ষা বিষয়ে' নামে একটি প্রবন্ধ লিখলেন; 'নতুন করে অআকখ' এবং 'রুশ পাঠমালা' প্রণয়ন (উভয় গ্রন্থই ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত)।

১৮৭৫- 'রুস্কি ভেস্ত্নিক' পত্রিকায় 'আন্না কারেনিনা' প্রকাশিত
১৮৭৭। হল।

১৮৭৬। সংগীতস্রষ্টা পিওতর চাইকোভ্স্কির সাথে আলাপ। মস্কো কন্সার্ভেটোরিতে চাইকোভ্স্কির 'আন্দান্তে' শুনতে শুনতে কেঁদে উঠেছিলেন।

১৮৭৮। পৃথক গ্রন্থ হিসেবে 'আন্না কারেনিনা' বেরুল।

উপন্যাস সমাপ্তির প্রাক্কালে বইটির অন্তর্নিহিত ভাবনা সম্পর্কে তল্স্তোয় লিখলেন: 'কোনো রচনাকে উৎকৃষ্ট করতে হলে তার মধ্যে যে প্রধান ও মৌলিক ভাবনা বর্তমান, তাকে ভালোবাসতে হবে। 'আন্না কারেনিনা'য় আমাকে **'পরিবারের** চিন্তা পেয়ে বসেছে, 'যুদ্ধ ও শান্তি'তে পেয়ে বসেছিল **'জাতির'** চিন্তা' (স. আ. তল্স্তায়া কর্তৃক লিপিবদ্ধ)।

এই উপন্যাস বিষয়ে সাহিত্য সমালোচক ভ. স্তাসভ লিখলেন: 'কাউণ্ট লেভ তল্স্তোয় যে উচ্চ মানে আসীন, রুশ সাহিত্যে সেখানে আর কেউ কখনো যেতে পারে নি। এমন কি পুশ্কিন ও গোগলও প্রেম ও আবেগ সম্পর্কে তল্স্তোয়ের ন্যায় গভীরতা ও তীক্ষ্ন সততা নিয়ে লিখতে পারেন নি... সমগ্র উপন্যাসটিতে কী সৌন্দর্য ও সৃজনক্ষমতাই না ভাস্বর হয়ে উঠেছে, এই প্রথম বারের মতো শৈল্পিক সত্যের কী অপূর্ব ক্ষমতা ও গভীরতাই না প্রকাশিত হয়ে উঠল! তাঁর সামনে পড়ে থাকা আমাদের সমগ্র সাহিত্যে অপরিচিত সমস্ত

ঘটনা ও চরিত্র ভাস্করের নিপুণ হাতে তিনি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। অনাগত ভবিষ্যেও 'আন্না কারেনিনা' প্রতিভার এক বিশাল উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে পরিগণিত হবে।' দস্তয়েভ্স্কি লিখলেন: 'শিল্প হিসেবে 'আন্না কারেনিনা' সম্পূর্ণতঃ ত্রুটিহীন।'

'রুশ ও বিশ্ব-সাহিত্যে মহত্তম সামাজিক উপন্যাস' হিসেবে বইটিকে সনাক্ত করেছিলেন টোমাস মান।

১৮৭৮- ১৮৭৯। ডিসেম্বরবাদী ও প্রথম নিকোলাইয়ের রাজত্বকাল নিয়ে এক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা শুরু। ১৮৫৬ সালের ক্ষমাপ্রদর্শনের পর সাইবেরিয়ার নির্বাসন থেকে প্রত্যাগত ডিসেম্বরবাদী প. ন. স্ভিস্তুনভ, ম. ই. মুরাভিওভ-আপোস্তল এবং আ. প. বেলিয়ায়েভের সাথে আলাপ পরিচয়।

১৮৭৯। রাশিয়ার দুই শতাব্দীর (১৭-১৯ শতক) ইতিহাসের মালমসলা জোগাড় করে তার উপর উপন্যাস রচনা শুরু। এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের মূল উপজীব্য — ভূমিদাস প্রথার অধীনে রাশিয়ার গ্রামীণ জীবনধারা।

রুশী 'বিলিনি' (মহাকাব্যিক বীরগাথা) ও লোকগাথার কথক ভ. প. শেচগলেনক ইয়াস্নায়া পলিয়ানা গিয়ে তল্স্তোয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তল্স্তোয় শিল্পীর কথকতা শোনেন এবং লোককাহিনীগুলো লিখে নেন — এগুলো থেকেই পরে তিনি তাঁর লৌকিক গল্পধারা নির্মাণ করেছিলেন।

তল্‌স্তোয়ের বিশ্ববীক্ষার সংকট তুঙ্গে পৌঁছুল। জন্ম ও ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত তাঁর এতদিনের অভিজাত পরিমণ্ডল ও তাঁর ধ্যানধারণার সাথে চিরতরে বিচ্ছেদ ঘটল তাঁর।

ব্যক্তিগত মালিকানা, শোষক রাষ্ট্র, সরকারপোষিত ধর্ম ও শাসক শ্রেণীর আত্মতোষী নীতিবোধের বিরুদ্ধে সমালোচনা তল্‌স্তোয়ের সাহিত্য ও জনকল্যাণমূলক রচনার প্রধান বিষয় হয়ে উঠল। একই সঙ্গে তাঁর মধ্যে নীতিশিক্ষা প্রচারের আবেগও তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে।

১৮৭৯- ‘স্বীকারোক্তি’ লিখছেন, এবং দার্শনিক ও ধর্মীয়
১৮৮০। প্রবন্ধাদিও। রুশ চার্চের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ন সমালোচনা।

তরুণ সাহিত্যিক ভ. ম. গার্শিন ও চিত্রী ই. ইয়ে. রেপিনের সাথে সাক্ষাৎ।

১৮৮১। ‘লোকে কী নিয়ে বাঁচে’ গল্প লেখা শেষ হল।

জার দ্বিতীয় আলেক্সান্দ্‌রের হত্যাকারী বিপ্লবীদের মৃত্যুদণ্ড মোকুফ করার অনুরোধ জানিয়ে সম্রাট তৃতীয় আলেক্সান্দ্‌রের নিকট পত্র প্রেরণ। (এ পত্রে কোনো কাজ দেয় নি)।

তল্‌স্তোয় নিজের দিনপঞ্জীতে লিখলেন: ‘ব্যাপারটা এ নয় যে অর্থনৈতিক বিপ্লব ‘হতে পারে’, কেননা এটা ‘ঘটবেই’। এই যে এতদিন পর্যন্ত ঘটে নি সেটাই আশ্চর্য।’

১৮৮২। মস্কো শহরের জনসংখ্যা নির্ধারণকল্পে তিন দিন ব্যাপী আদমশুমারিতে তাঁর অংশগ্রহণ এবং শহরের দরিদ্র ও অন্ত্যজ শ্রেণী সম্পর্কে প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়।

'তাহলে কী করা দরকার?' প্রবন্ধ লেখা শুরু (সমাপ্ত ১৮৮৬ সালে)।

তল্‌স্তোয় পরিবার মস্কোর দোল্‌গো-খামোভ্‌নিচেস্কি লেনের একটি বাসায় (এটি বর্তমানে তল্‌স্তোয় মিউজিয়ম) চলে এলেন।

১৮৮৩। পরবর্তী কালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোগী ভ. গ. চের্ৎকোভের সাথে আলাপ।

১৮৮৩-১৮৮৪। ধর্মবিশ্বাস ও নীতিবোধ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণা লিপিবদ্ধ করতে লাগলেন 'কিসে আমার বিশ্বাস?' প্রবন্ধে।

১৮৮৪। ন. ন. গে কর্তৃক তল্‌স্তোয়ের প্রতিকৃতি নির্মাণ।

বড়ো গল্প রচনা শুরু: 'অপ্রকৃতিস্থের স্মৃতিচারণ' (অসমাপ্ত) এবং 'ইভান ইলিচের মৃত্যু' (১৮৮৬ সালে সমাপ্ত)।

ইয়াস্নায়া পলিয়ানা ছেড়ে চাষীভুষো ও সাধারণ লোকজনের মধ্যে বসবাসের সিদ্ধান্ত।

বন্ধু ভ. গ. চের্ৎকোভের সহযোগিতায় সাধারণপাঠ্য গ্রন্থাদি প্রকাশনার জন্য 'পস্রেদ্‌নিক' (মাধ্যম) প্রকাশনালয় প্রতিষ্ঠা।

১৮৮৫- ‘পস্রেদনিক’এর জন্য এক গ্নচ্ছ লোককাহিনী রচনা:
১৮৮৬। ‘দ্নই ভাই ও সোনা’, ‘ইলিয়াস’, ‘যেখানেই প্রেম সেখানেই ঈশ্বর’, ‘দাউ দাউ জবালিয়ে দিলে সে আগ্নন নেভাতে পারবে না’, ‘মোমবাতি’, ‘দ্নই ব্নড়ো’, ‘বোকা ইভানের গল্প’, ‘একজনের কতটুকু জমি দরকার?’ ইত্যাদি।

১৮৮৬। সাহিত্যিক ভ. গ. করলেন্‌কোর সাথে সাক্ষাৎ।

নাটক লিখলেন ‘অন্ধকারের ক্ষমতা’, সেন্সর কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হল।

‘শিক্ষার পরিণাম’ কমেডি রচনা শ্নর্ন (সমাপ্ত ১৮৯০ সালে)।

১৮৮৭। ন. স. লেস্কোভের সাথে আলাপ। গোর্কি বলেছেন এই লেখক সম্পর্কে তল্‌স্তোয়ের ধারণা ছিল: ‘লেস্কোভের লেখা পড়ে অনেক উপকার পাওয়া যায়, তিনি একজন যথার্থ লেখক... ভাষার উপরে প্রচণ্ড দখল এবং ম্নখের ভাষাকে যেমন ইচ্ছে তেমন ব্যবহার করতে পারেন।’

‘ক্রয়টজার সোনাটা’ গল্প লেখা শ্নর্ন, শেষ হয় ১৮৮৯ সালে। কাহিনীর বিষয়বস্তু: অবিশ্বাসী সন্দেহে স্ত্রীহত্যা। শাসক শ্রেণীর নৈতিকতার ম্নখোস খ্নলে দেয় গল্পটি, ফলে জার আমলের সেন্সরশিপে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। অবশ্য বছর তিনেক পরে ১৮৯১ সালে স. আ. তল্‌স্তায়ার বহ্ন চেষ্টাচরিত্রে অন্নমতি প্রাপ্তির পর তল্‌স্তোয়-রচনাবলীতে সংগৃহীত হয়।

রোম্যাঁ রোলাঁ (সে সময়ে একোল্ নর্মাল সুপেরিয়্যের বিদ্যায়তনের ছাত্র) নিজের 'আবেগস্পন্দিত প্রশংসা' জানিয়ে এবং তৎসহ জীবন-মৃত্যুর অর্থ ও শিল্পের উদ্দেশ্য জানতে চেয়ে চিঠি লিখলেন তল্স্তোয়কে। তল্স্তোয় উত্তরে এক সুদীর্ঘ পত্র পাঠিয়েছিলেন।

১৮৮৮। বড়ো গল্প 'জাল সার্টিফিকেট' লেখা শুরু, ১৯০৪ সালে মধ্যপথে অসমাপ্ত রেখেই রচনাটি পরিত্যক্ত হয়।

১৮৮৯। 'শয়তান' উপন্যাস শুরু (শেষাংশের দ্বিতীয় পাঠ ১৮৯০ সালে রচিত)।

প্রখ্যাত আইনজীবি আ. ফ. কোনি-র সাথে আলাপ-আলোচনার ফলশ্রুতিতে 'কোনি সাহেবের গল্প' শুরু, পরে এটিই 'পুনরুত্থান' উপন্যাসের ভিত্তিবস্তু রূপে ব্যবহৃত হয়েছিল। রচনাটি ১৮৯৯ সালে সমাপ্ত হয়েছিল।

১৮৯০। চের্ৎকোভ্কে লেখা একটি চিঠিতে তল্স্তোয় তাঁর 'ফাদার সিয়েগির্' গল্পের প্রথম পাঠের খসড়া জানান। (বইটি ১৮৯৮ সালে লেখা শেষ হয়)। মঠে স্বেচ্ছানির্বাসিত জনৈক রাজপুরুষের বাসনামলিন প্রলোভন, পতন ও প্রব্রজ্যা নিয়ে কাহিনীটি নির্মিত। মঠবাসীর নিঃসঙ্গ জীবন সম্পর্কে তল্স্তোয়ের তৎকালীন মনোভাব তাঁর দিনপঞ্জীতে লিপিবদ্ধ: 'ঠিকই, মঠবাসীর জীবনযাত্রায় অনেক ভালো দিক আছে: প্রলোভন জয় খুবই একটা জরুরী ব্যাপার, আর নির্দোষ প্রার্থনাতেই সময় কাটিয়ে

দেওয়া। সবই খুব চমৎকার, বুঝলাম, কিন্তু ঐ সময়টা নিজের ও অন্যের অন্নসংস্থানের পরিশ্রমেই বা ব্যয়িত হবে না কেন?' এবং এর পরেই লিখেছিলেন: 'ওদের দুর্ভাগ্য যে ওরা অন্যের পরিশ্রমের উপর বেঁচে থাকে। ওরা দাসত্বপোষিত সন্ত।'

১৮৯১। 'রুস্কিয়ে ভেদমস্তি' ও 'নোভয়ে ভ্রেমিয়া' (নতুন কাল) পত্রিকায় চিঠি লিখে ১৮৮০ সালের পরে লিখিত সমস্ত গ্রন্থাদির লেখক-সংরক্ষিত সর্বস্বত্ব বর্জনের কথা প্রচার করলেন।

১৮৯১- রিয়াজান্ প্রদেশে অনাহারক্লিষ্ট কৃষকদের জন্য
১৮৯৩। সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা। দুর্ভিক্ষের উপর রচিত প্রবন্ধমালা।

১৮৯২। 'শিক্ষার পরিণাম' কমেডি মালি থিয়েটারে অভিনীত হল।

১৮৯৩। গী দ্য মোপাসাঁ-রচনাবলীর জন্য ভূমিকা রচনা।

বোর্দো-র সাহিত্য অধ্যাপক জুল লেগ্রা কর্তৃক ইয়াস্নায়া পলিয়ানা ভ্রমণ।

অভিনেতা-পরিচালক ও মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা কন্স্তান্তিন স্তানিস্লাভ্স্কির সাথে সাক্ষাৎ।

১৮৯৪। 'কৃষকের কাহিনী' গল্পগ্রন্থের ভূমিকা রচনা। বইটি সাধারণ জনগণের মধ্য থেকে উদ্ভূত জনৈক লেখক স. ত. সিমিওনভের লেখা।

১৮৯৪- 'মনিব ও মানুষ' গল্প লিখলেন।

১৮৯৫।

১৮৯৫। আন্তোন চেখভের সাথে সাক্ষাৎ। সৃজ্যমান, তখনো অসমাপ্ত, নতুন উপন্যাস 'পুনরুত্থান'এর পাণ্ডুলিপি পড়তে দিলেন।

নিজে মনোযোগ দিয়ে চেখভের রচনা পড়লেন: চেখভের গদ্যের প্রশংসা করলেন, বাহ্‌বা দিলেন, কিন্তু নাট্যবস্তু ভালো লাগল না। গোর্কি বলেছেন যে, চেখভকে তল্‌স্তোয় 'পছন্দ করেছিলেন, যখনই তাকাচ্ছিলেন মনে হচ্ছিল দৃষ্টি দিয়ে তাঁর মুখে হাত বুলাচ্ছিলেন, যা মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল বড়ো কোমল'।

ফরাসী অধ্যাপক পোল বোয়ে ইয়াস্নায়া পলিয়ানা বেড়িয়ে গেলেন।

'অন্ধকারের ক্ষমতা' নাটক অভিনীত হল মালি থিয়েটারে।

চাষীদের দৈহিক শাস্তিদানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ প্রবন্ধ রচনা: 'লজ্জা'।

১৮৯৬। বড়ো গল্প 'হাজি মুরাদ' লেখা শুরু করলেন (১৯০৪ সাল অবধি এর উপর কাজ করেছিলেন)।

পরবর্তী তল্‌স্তোয়ের সর্বাপেক্ষা কাব্যগুণসমৃদ্ধ ও উৎকৃষ্টতম গল্পসমূহের অন্যতম এই কাহিনীটি ১৯১১ সালের পূর্বে অর্থাৎ তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় নি। তরুণ বয়সে তল্‌স্তোয় যখন ককেশাসে ছিলেন সে সময়ের কিছু নাটকীয় ঘটনা গল্পটির উপজীব্য: হাজি মুরাদ

নামে জনৈক পাহাড়ী ব্যক্তি রুশীদের পক্ষে চলে যায়, কিন্তু পরে সে নিজের পরিবারটিকে বাঁচাবার জন্য পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়, — তার পরিবার তখনো শামিলের করায়ত্ত ছিল; তার অনুসরণকারীরা তাকে ধরে ফেললে সে দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত ঐ অসম যুদ্ধে লড়ে যায়। কাহিনীটির অন্তর্নিহিত ভাবধারা প্রসঙ্গে তল্‌স্তোয় লিখেছেন: 'হাজি মুরাদ ও তার দুর্ভাগ্যই যে শুধু আমাকে আকর্ষণ করেছিল তা নয়, সে যুগের দুই যুযুধান স্বেচ্ছাচারী — শামিল ও নিকোলাই — যারা এশীয় ও ইউরোপীয় রাজাত্যাচারের প্রতিভূ ছিল বলা যায়, তাদের অদ্ভুত অন্তর্লীন সাযুজ্যও টেনেছিল আমাকে।'

১৮৯৭- 'শিল্প কী' নামক সন্দর্ভ রচনায় ব্যস্ত।

১৮৯৮। 'জ্যান্ত মড়া' নামে একটি নাটকের পরিকল্পনা মাথায় ঘুরছে।

১৮৯৮। তুলা প্রদেশে অনাহারী কৃষকদের কল্যাণে সাহায্য অভিযান সংগঠনে ব্যাপৃত।

'বুভুক্ষা না কি অন্য কিছু?' প্রবন্ধ রচনা।

জার সরকারের অত্যাচারে দেশ ছেড়ে কানাডায় পলায়মান দুখবোর ধর্মীয় সম্প্রদায়কে 'ফাদার সিয়েগি' ও 'পুনরুত্থান' গ্রন্থ বিক্রীর সমস্ত অর্থ দান।

প্রখ্যাত চিত্রী লেওনিদ পাস্তের্নাক, যিনি পরে 'পুনরুত্থান'কে সচিত্রিত করবেন, ইয়াস্নায়া পলিয়ানা বেড়িয়ে গেলেন।

১৮৯৮- 'পুনরুত্থান' নিয়ে খাটাখাটুনি। কারাগার পরিদর্শন এবং
১৮৯৯। কারাগারের কক্ষপাল ও রাজবন্দীদের সাথে আলাপ-আলোচনা।

১৮৯৯। সেন্সর কর্তৃক ছাঁটকাট করা 'পুনরুত্থান' 'নিভা' (শস্যভূমি) পত্রিকায় প্রকাশিত হল। পূর্ণ অসংক্ষেপিত সংস্করণ প্রকাশিত হল ইংলণ্ডে, ভ. গ. চের্ৎকোভের দ্বারা।

তলস্তোয়ের শোনা একটি সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি রচিত: জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির সাথে আদালতে অভিযুক্তা একটি মেয়ের দেখা হয়ে গেলে তিনি চিনতে পারেন যে এককালে তিনি তাকে প্রলুব্ধ করে ভ্রষ্ট পথে নিয়ে গিয়েছিলেন বলেই সে আজ বারবণিতা; তখন নিজের অপকীর্তির জন্য অনুশোচনা হয় এবং মেয়েটিকে তিনি বিবাহ করতে চান। কাহিনীটি তলস্তোয়ের হাতে নির্মিত হতে হতে বিশাল অবয়ব ধারণ করে এবং সমকালীন রুশজীবনের অসংখ্য অনুপুঙ্খ চিত্র ভিড় জমায় তাতে: মস্কো, সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, রাশিয়ার গ্রামাঞ্চল, সাইবেরিয়া, আদালত, জেলখানা এবং নির্বাসন — সমস্ত কিছু।

১৮৯৯- 'সমকালীন দাসত্ব' — পুঁজিবাদ ও শ্রম সম্পৃক্ত প্রশ্নাবলী
১৯০০। নিয়ে রচিত প্রবন্ধ।

১৯০০। ম্যাক্সিম গোর্কির সাথে সাক্ষাৎ। দিনপঞ্জীতে লিখলেন:

'সুন্দর আলাপ-আলোচনা হল। ভদ্রলোককে ভালো লাগল। জনগণের সত্যিকার সুহৃদ।'

আর্ট থিয়েটারে আ. প. চেখভের 'কাকা ভানিয়া' দেখে এলেন।

'জ্যান্ত মড়া' রচনা শুরু।

১৯০১। যাজকীয় বিচারসভা সিনোদ (রাশিয়ার অর্থোডক্স চার্চের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধারী সংগঠন) রায় দিল যে, চার্চের নীতিপালনে অপারগ হওয়ায় তল্স্তোয়কে ধর্মত্যাগী ঘোষণা করা হল।

'সিনোদ প্রদত্ত রায়ের জবাবে' প্রবন্ধ লিখলেন।

চার্চ কর্তৃক বহিষ্কৃত হলেও মস্কোর রাস্তায় জনগণ তাঁকে সম্বর্ধনা জানাল।

অসুস্থতার জন্য ক্রিমিয়ার গাস্প্রা নামক স্থানে চলে গেলেন।

জার দ্বিতীয় নিকোলাইকে চিঠি লিখলেন ('জার ও তাঁর পার্শ্বচরদের প্রতি') জমির ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপ ও 'নিজেদের মনোভাব ও প্রয়োজন প্রকাশে বাধাদানের জন্য অত্যাচার প্রয়োগ' বন্ধ করার অনুরোধ জানিয়ে, ২৬শে মার্চ তারিখে।

১৯০২। ইয়াস্নায়া পলিয়ানায় প্রত্যাবর্তন।

১৯০৩। 'স্মৃতিচারণ' রচনা শুরু (১৯০৬ সাল অবধি এই গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন।

'বল-নাচের পর' রচনা: বর্বর সামরিক শাস্তিদানের উপরে গল্পটি লেখা।

১৯০৩- 'শেক্সপীয়র ও নাট্য বিষয়ে' প্রবন্ধ রচনা।

১৯০৪।

১৯০৪। সংঘটিতব্য রুশ-জাপান যুদ্ধের জন্য দায়ী ঘটনাপ্রবাহ উদ্বেগের সাথে পর্যবেক্ষণ। প্রবন্ধ রচনা: 'পুনরায় ভেবে দেখুন!'

১৯০৫। চেখভের 'প্রিয়তমা' গল্পের উত্তরলেখ রচনা। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য রচনা: 'রাশিয়ায় সামাজিক আন্দোলন' ও 'সবুজ ছড়ি'টি প্রবন্ধ এবং 'কর্নেই ভাসিলিয়েভ', 'আলিওশা গর্শোক্', 'বৈঁচি' ও 'বুড়ো ফিওদর কুজ্মিচের মৃত্যুর পরে পাওয়া কাগজপত্র' প্রভৃতি গল্প। ডিসেম্বরবাদী ও গেৎর্সেনের রচনাবলী পাঠ।

গেৎর্সেন সম্পর্কে দিনপঞ্জীতে তাঁর মন্তব্য: 'আজকের যত সব আজেবাজে লোকদের বহু উপরে তাঁর আসন, একমাত্র ভবিষ্যতেই ইনি পঠিত হবেন।'

রুশ বিপ্লব সম্পর্কে ভ. স্তাসভকে চিঠি লিখলেন: 'স্বেচ্ছায়, নিজে যেচে আমি এদেশের দশ কোটি কৃষকের প্রবক্তার ব্রত বেছে নিচ্ছি এই বিপ্লবে।'

১৭ই অক্টোবর তারিখে জার ঘোষিত ইশতেহারে জনগণের নাগরিক অধিকার দান ও গণপরিষদ — 'গসুদার্স্ত্‌ভেন্নায়া দুমা' (রাষ্ট্রীয় পরিষদ) গঠনের কথা বলা হল। তল্স্তোয় বললেন: 'জনগণের জন্যে ওখানে কিছু নেই।'

জর্জ বার্নার্ড শ' প্রথম চিঠি লিখলেন তল্‌স্তোয়কে। নিজের গ্রন্থাদিও পাঠালেন।

১৯০৬। গল্প রচনা: 'কিসের জন্যে?' এবং প্রবন্ধ: 'রুশ বিপ্লবের তাৎপর্য'। ১৯০৩ সালে শুরু করা গল্প 'ঐশী ও মানবিক' সমাপ্ত করলেন।

১৯০৭। রুশ জনগণের দুরবস্থা ও জমির ব্যক্তিগত মালিকানা বিলোপ সম্পর্কে চিঠি লিখলেন প. আ. স্তলিপিনকে। শিল্পী মিখাইল নেস্তেরভ ইয়াস্নায়া পলিয়ানা গিয়ে তল্‌স্তোয়ের প্রতিকৃতি অঙ্কন করলেন।

পোলিশ পিয়ানোবাদিকা ভান্দা লান্দোভ্‌স্কা হার্পসিকর্ড বাদ্যে প্রাচীন ফরাসী লোকনৃত্য ও প্রাচ্য লোকসঙ্গীতের সুর বাজিয়ে শোনালেন তল্‌স্তোয়কে। তল্‌স্তোয় শিল্পীকে বলেছিলেন: 'এই হল আসল শিল্প যার উপরে ভাগ্‌নের-বীথোফেনরা বেড়ে উঠে পরে বিকৃতিসাধন করেছে। সত্যিকার শিল্প মেহনতী মানুষের হাতে তৈরি হয়, আর সকলে তা বুঝতেও পারে: সেখানে একজন ইরানী ঠিকই বুঝে নেয় রুশীকে, বা রুশী ইরানীকে... আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ — এ রকম বাজনা শোনালেন বলে তো বটেই, তাছাড়াও শিল্প সম্পর্কে আমার মত আপনিও সমর্থন করছেন।'

১৯০৮। মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে প্রবন্ধে স্বমত প্রকাশ: 'নীরব থাকতে পারি না!'

৮০-তম জন্মদিন। 'প্রলেতারি' সংবাদপত্রের ৩৫

সংখ্যায় লেনিনের প্রবন্ধ বেরুল 'লেভ তল্‌স্তোয় — রুশ বিপ্লবের দর্পণ'।

১৯০৮- 'কেউই দোষী নয় পৃথিবীতে' বড়ো গল্প রচনা।
১৯১০।

১৯০৯। 'হত্যাকারী কারা? পাভেল কুদ্রিয়াশ' গল্প এবং 'পথচারীর সাথে আলাপ' ও 'গ্রামাঞ্চলে সংগীত' প্রবন্ধদ্বয় লিখলেন।

আফ্রিকার ট্রান্সভাল এলাকায় হিন্দুদের দুরবস্থা জানিয়ে তল্‌স্তোয়কে চিঠি লিখলেন মহাত্মা গান্ধী। নিজের বই পাঠালেন 'Self-Rule for India'। উত্তরে তল্‌স্তোয় লিখলেন: 'আপনার বই অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পড়েছি; কেননা আমার মতে, আপনি যা নিয়ে আলোচনা করেছেন — পরোক্ষ প্রতিরোধ — তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার, কেবল ভারতের জন্যেই নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্যেও।'

তল্‌স্তোয়ের ইংরেজ অনুবাদক ও জীবনীকার আইলমার মোড ইয়াস্নায়া পলিয়ানায় আগমন করলেন।

১৯০৯- 'গ্রামাঞ্চলে তিন দিন' সন্দর্ভ রচনা।
১৯১০।

১৯১০। গল্প 'খোদিন্‌কা'। কাহিনীটির উপজীব্য একটি ঘটনা — খোদিন্‌কা নামে একটি ময়দানে জার সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাইয়ের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে: জারের হাত থেকে প্রসাদ স্বরূপ মিষ্টান্ন গ্রহণের জন্য দরিদ্র লোকজন এত হুমড়ি খেয়ে পড়ে যে ভিড়ের চাপে বহু লোক প্রাণ হারায়।

মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে ভ. গ. করলেন্‌কোর প্রতিবাদ মুখর প্রবন্ধ ‘একটি প্রাত্যহিক ঘটনা’ প্রকাশের জন্য সাধুবাদ জানিয়ে তাঁকে চিঠি লিখলেন তল্‌স্তোয়।

স্টক্‌হোল্মে অনুষ্ঠিতব্য শান্তি সম্মেলনের জন্য রিপোর্ট তৈরি।

প্রবন্ধ রচনা: ‘আসল উপায়’ (মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে)।

তাঁর দীর্ঘদিনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার সদিচ্ছায় ইয়াস্নায়া পলিয়ানা ছেড়ে এলেন; ইচ্ছা — সাধারণ জনগণের মধ্যে বাস করবেন। ভ্রমণকালে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলেন, মস্কো-কুর্স্ক্‌ লাইনে আস্তাপভো নামে এক স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে পড়লেন।

৭ই (নতুন পঞ্জিকামতে ২০শে) নভেম্বরে সকাল ৬টা ৫ মিনিটে দেহাবসান ঘটল।

কিংবদন্তীর সেই জীয়নকাঠি ‘সবুজ ছড়ি’টি — যা পৃথিবীর সকলকে সুখী করবে — যেখানে লুকানো আছে, ঠিক সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল।

তল্‌স্তোয়ের মৃত্যু উপলক্ষে লেনিনের প্রবন্ধ ‘ল. ন. তল্‌স্তোয়’ প্রকাশিত হল ‘সৎসিয়াল-দেমোক্রাৎ’ (সোশ্যাল-ডেমোক্রাট) সংবাদপত্রের ১৮ সংখ্যায়। তিনি লিখলেন: ‘তল্‌স্তোয় এত সমস্যা তুলে ধরতে পেরেছিলেন এবং শিল্পীক্ষমতার এত শীর্ষদেশে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন যে তাঁর সৃষ্টি বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদের মধ্যে পরিগণিত।’

লিদিয়া অপুল্‌স্কায়া